# স্বস্তিকা

দাম : ৭০ টাকা

পূজাসংখ্যা ১৪৩৩, ৫ অক্টোবর, ২০২৬



# স্বস্তিকা

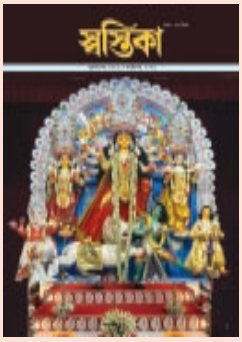
*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

**পূজাসংখ্যা**

৭৯ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ১৭ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৫ অক্টোবর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮,

Website : www.eswastika.com



**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল**

**রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ৭০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।


# সূচীপত্র


**দেবী মাহাত্ম্য**

মহিষাসুর বধের তত্ত্বকথা ▮ স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ ▮ ১৯

**উপন্যাস**

বাঙ্গলার গ্রামে একটি দিন ▮ এষা দে ▮ ৪০

মহাবীর শ্রীহনুমান ▮ গোপাল চক্রবর্তী ▮ ৬৯

দাশপাড়ার এক সাবিত্রী ▮ গিরিধারী ধর ▮ ১১৪

স্বাহা ▮ প্রবাল ▮ ১৩২

বনবহ্নি — রানি শিরোমণি ▮ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▮ ২০১

**গল্প**

শকুন্তলা ▮ মৌ চৌধুরী ▮ ১০৭

ইংলিশ জেঠু — ১৯৭১ ▮ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ▮ ১৮৫

**ছোট গল্প**

সাম্প্রতিক ▮ দেবদাস কুণ্ডু ▮ ২২৯

মৃত্যুর প্যাকেট ▮ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ▮ ২৪১

মানবজমিন ▮ গার্গী দেব ▮ ২৫৪

**প্রবন্ধ**

ভারতাত্মা থেকে ভারতমাতা ▮ কিঙ্কর সামানন্দ ▮ ২১

অসুরনাশিনীর অষ্টশক্তি ▮ নিখিল চিত্রকর ▮ ৩৩

বাঙালির পুতুল যেন এক মাঠ সরলতা ▮ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ▮ ২১

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা— মানবমুক্তির এক মহাকাব্য ▮ ড. আশিস গিরি ▮ ১০৩

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা ▮ ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ▮ ১৯৫

দ্রোহকাল (২০২৩-২০২৬) ▮ সুজিত রায় ▮ ২২১

সঙ্ঘ মানে সাধনা ▮ বিজয় আঢ্য ▮ ২৩৫

রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদ— বিশ্ববিদ্যায়ের অঙ্গনে ভিন্ন ধারার অনুরণন ▮ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ▮ ২৫০

**ভ্রমণ**

ভিয়েতনাম দেখে এলাম ▮ ডা: মধুসূদন পাল ▮ ১৭৯

**চলচ্চিত্র**

বলয়গ্রাসে রাজেন তরফদার ▮ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▮ ২৪৫



# মহিষাসুর বধের তত্ত্বকথা

**স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ**

পৌরাণিক উপাখ্যানে দেখা যায়—দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। এখন এই মহিষাসুরের পরিচয় সম্বন্ধে আমাদের জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে মহিষ হলো একপ্রকার পশুর নাম। আর অসুর কথার অর্থ সুর-বিরোধী। যে দেবদেবী কিছুই মানে না। শক্তি আছে কিন্তু তা অসৎ পথে পরিচালিত। পুরাণে রম্ভাসুরের পুত্র; সে ঘোরতর বলীয়ান এক অসুর। যে যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াজাল বিস্তার করে বিভিন্নরকম ভয়ঙ্কর রূপ ধরে দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বিভিন্ন রূপের মধ্যে তিনি মহিষের রূপধারণ করে দেবীকে আক্রমণ করেছিল। একাধারেই মহিষ ও অসুর। তাই এর নাম মহিষাসুর। একাধারেই পশুর গুণাবলী আর অসুরের গুণাবলী বিদ্যমান। পশুর গুণাবলী হলো আহার, নিদ্রা আর মৈথুন। অপর দিকে অসুরের গুণাবলী, গীতায় আছে—দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।। (১৬/৪)

অর্থাৎ যারা আসুরী অবস্থালাভ করেছে তাদের মধ্যে দেখা যায়— ধর্মধ্বজিত্ব, ধন ও স্বজননিমিত্ত দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, কর্কশ ব্যবহার, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অবিবেক। আসুরিক ও পাশবিক এই দুটি ভাব-শক্তিতে বলীয়ান মহিষাসুর। সে দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন মায়াজালে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে দশদিক থেকে আক্রমণ করেছিল। তাই দেবীদুর্গাও দশ হাতে যুদ্ধ করে দুর্দমনীয় মহিষাসুরকে পরাজিত করেন।

উপরোক্ত উপাখ্যানটি গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় দেবতাদের ও অসুরের মধ্যে সংগ্রাম চিরকালের। যেন সু ও কু'র মধ্যে লড়াই।

মানবের অন্তরেও দৈবশক্তির সঙ্গে আসুরিক শক্তির লড়াই সর্বদাই লেগে আছে। প্রতিটি মানবের মধ্যে এই মহিষাসুরের গুণাবলী বিদ্যমান। মানব মন তিনটি গুণে গুণান্বিত। তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ। দেখা যায় তমোগুণের অধিকারী মানবের মধ্যে পাশবিকতা অর্থাৎ পশুর ভাবগুলো বেশি বিদ্যমান—আহার, নিদ্রা, মৈথুন এদের সর্বস্ব। আবার রাজোগুণ প্রধান মানুষে দেখা যায় তারা কর্মের প্রতি আসক্ত। কিন্তু সে কর্ম নিষ্কাম নয় সকামকর্ম। যা মানবকে মুক্তির পরিবর্তে বন্ধনের কারণ হয়। আমরা এটি অসুরের মধ্যে দেখতে পাই।

আর সত্ত্বগুণের অধিকারীর মধ্যে দেখা যায় দৈবীশক্তি বা সৎগুণাবলী। গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে দেবী সম্পদের কথা বলা হয়েছে—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।। (১৬/১)
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।। (১৬/২)
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।। (১৬/৩)

অর্থাৎ যাঁরা দৈবী সম্পদলাভ করেছে তাঁদের ভয়শূন্যতা, ব্যবহারকালে পরবঞ্চন ও মিথ্যাকথন-বর্জন, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, সামর্থ্যানুসারে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, অবৈরভাব, অনভিমান, ক্ষমা, পরোপকার, নিরহংকারিতা ও ঈশ্বর প্রণিধান। এগুলি হলো দৈব শক্তি।

মানব মনে আসুরিক ভাবগুলো এবং পাশবিক ভাবগুলো প্রবল থাকায় দৈবীভাবগুলো যা সত্ত্বগুণজাত তা প্রকাশিত হতে পারে না। কিন্তু সাধনার মাধ্যমে আসুরিক, পাশবিক ভাবগুলো দূরীভূত করতে পারলে দৈবভাবগুলোর স্ফুরণ ঘটে। তখনই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়। সে ভগবান লাভের যোগ্য হয়ে মানব জীবন সার্থক করে।

দুর্গাপূজার কাঠামোতে দেখা যায়, দেবী দুর্গার পদতলে মহিষাসুরের অবস্থান। যুদ্ধের পূর্বে অসুরের ধারণা ছিল দেবী দুর্গা সামান্য অবলা নারী যা কিনা পুরুষের ভোগের বস্তু। কিন্তু মহিষাসুর পরাজিত হয়ে উপলব্ধি করেছে—দেবী দুর্গা নারী হলেও ভোগের বস্তু নয়। দেবী দুর্গার ত্রিশুল তার বক্ষে বিদীর্ণ হলে মহিষাসুরের মধ্যে আসুরিক ও পাশবিক ভাব ত্রিশুলের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় তারমধ্যে দৈবীভাবগুলো জেগে উঠেছে। তাই দেবী দুর্গাকে সে জগজ্জননী সম্বোধন করে স্তব শুরু করে।

মূলত একই মায়ের দু'টি সন্তান একটি দেবতা, অন্যটি অসুর। মহিষাসুরের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দুর্গা অসুরকেও নিজ সন্তান জ্ঞান করে তাঁরই পদতলে স্থান দিয়েছেন।

শ্রীমা সারদা দেবী বলতেন, সন্তানের যদি ধুলো কাদা গায়ে লাগে তাতো মা-ই সে ধুলো ঝেড়ে, কোলে তুলে নেয়। ফলে মহিষাসুর এখন আর অসুর নয়। দেবতার আসনে স্থান লাভ করে ভক্তের নিকট পূজনীয় হলো।

মানবের মধ্যেও তমোগুণজাত, রজোগুণজাত, পাশবিক আসুরিক ভাবগুলো বিদ্যমান। এগুলো সাধনার মাধ্যমে মানুষ দূর করতে পারলে যোগ্যতা অর্জন করে দেবতার আসনে উন্নীত হতে পারে। যে যত সৎচিন্তা, সৎধ্যান, সৎকাজ করবে ততই তার ভেতর থেকে অসৎভাবনা তিরোহিত হবে।

অর্থাৎ আসুরিক ভাব দূর হবে দৈবীভাব প্রবল হবে। তখন কাম-ক্রোধাদি হ্রাস পেয়ে তার মধ্যে জাগ্রত হবে জীবের প্রতি ভালবাসা, প্রেম, ক্ষমা, দয়া, পরোপকার, অহিংসা। প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি, আনন্দ। যা মানবের কাম্য। ফলে আসুরিক ও পাশবিক সম্পন্ন ব্যক্তিও ক্রমে সৎ মানুষে পরিণত হতে পারে। সমাজের নিকট গ্রহণীয়, আদরণীয়, স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। মহিষাসুর বধে দেবীদুর্গা যুদ্ধক্ষেত্রে মহিষকে ও অসুরকে বধ করেন ত্রিশূলরূপ অস্ত্র দিয়ে। মহিষাসুরের এই ভাব দু'টি মানব মনেও রয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানীরাই নিম্ন স্তরের প্রাণী। তাদের মধ্যে পাশবিক ও আসুরিক ভাবই প্রধান। আর তা দূর করতে দেবী প্রয়োগ করলেন জ্ঞানরূপ ত্রিশূলকে। কারণ প্রকৃত জ্ঞান হলে কু-ভাবগুলো দূর হয়ে সু-ভাবে পূর্ণ হয়। অজ্ঞানরূপ ভাবগুলো দূর হয়। সিংহের পিঠে এবং অসুরের দেহে দু'পা সজোরে চেপে রেখে যুদ্ধ করেছেন অসুরের সঙ্গে। মানব মনের পাশবিকতা ও আসুরিকতা দূর করতেও তদ্রূপ শক্তভাবে মানসিকতা বা পুরুষকার নিয়ে কু-ভাবগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে সৎভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরূপে মানব মনেও দৈবী শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ দেবভাবাপন্ন হতে পারে। দেবী দুর্গার আরেক নাম—'ত্রিনয়নী'। তাঁর তিনটি নয়ন নেই, তবে সাধনার মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। তৃতীয় নয়ন দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়। দেবী দুর্গা তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে জীবের অজ্ঞানরূপ আসুরিকতা দূর করেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে দেশলাই জ্বালালে মুহূর্তেই সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। তদ্রূপ আমাদের মনের অজ্ঞানতাও দেবী দুর্গার কৃপায় তাঁর পূজা করে, ধ্যান করে, মনের মলিনতা দূর করে, শুদ্ধতায় ভরে উঠে পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হতে পারি। সমাজের অসুর শ্রেণীর মানবের পরিবর্তন হয়ে সব দেবমানব হবে, সমাজ হবে সত্যযুগের। বিশ্ব হবে আনন্দময়।

*(লেখক ঃ অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, যশোর)*



# ভারতাত্মা থেকে ভারতমাতা

**কিঙ্কর সামানন্দ**

'বন্দে মাতরম্' ভারতবর্ষের তথা আপামর ভারতবাসীর জীবন ইতিহাসের এক অনন্য উন্মোচন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এই ভারতমাতার বন্দনা শুধুমাত্র একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত নয়; ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অনন্য অঙ্গ। দার্শনিক দৃষ্টিতে এবং আধ্যাত্মিক অনুভবে মাতৃভূমি তথা চিন্ময়ী দেশমাতৃকার প্রতি আত্মনিবেদন ও আত্মবলিদানের এক অনবদ্য উচ্চারণ। এই সঙ্গীত সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি এবং জাতির চৈতন্যগত প্রেরণাকে

এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আজও বেঁধে রেখেছে। ভারতবাসীর মননে প্রেরণার মূলমন্ত্র এই সঙ্গীতে ভারতমাতা কোনো ভৌগোলিক সীমানায় সীমায়িত হননি। তিনি শক্তি, জ্ঞান, সমৃদ্ধি, করুণা ও সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে জগদ্‌বাসীর স্মরণে, মননে সর্বদা অনুরণিত হয়েছেন। এই মাতৃভাব শুধুই আবেগপ্রসূত নয়; মানবসুলভ দৃঢ় ও পূর্ণ অনুভব, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সত্যের প্রতি নত-নম্রতার উপাদানে প্রকাশিত। বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণ সর্বত্রই মা শক্তিরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেছেন, মাতৃদেবো ভব[১], অর্থাৎ মা দেবতুল্য মর্যাদায় সর্বদা অধিষ্ঠিতা। মায়ের মধ্যেই ঈশ্বরীয় স্নেহ, ত্যাগ ও করুণার একত্র মেলবন্ধন ঘটেছে। এই মাতৃতত্ত্বই মাটিরূপ, অধিষ্ঠানরূপ, আশ্রয়রূপের মধ্যেও নিহিত হয়ে আছে। যে ভূমি আমাদের জীবন, অন্ন, জল, বাসস্থান, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তিনি ভারতীয় চিন্তনে ও মননে মায়ের মর্যাদায় অভিষিক্তা হন।

ভারতীয় পরম্পরায় শাক্তধারা, উপনিষদীয় চিন্তনে, পৌরাণিক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে আছে এই 'বন্দে মাতরম্' রূপ মাতৃবন্দনা। এই সঙ্গীতের দার্শনিক ব্যাখ্যা এমন এক অভিনবত্ব উন্মোচন করে, যেখানে নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শ যে একত্র সমাবিষ্ট হয়ে আছে সেটা বোঝা যায়।

**দেবীরূপে সুশোভিতা চিন্ময়ী ভারতমাতা**

সঙ্গীতে অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বসমূহ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অভিনব উন্মোচন। এবং এর শিকড় প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রোথিত। আমরা লক্ষ্য করি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেতনায় উদ্ভাসিত মাতৃভূমি ও বৈদিক ঋষিদের বীক্ষণে প্রকাশিত মাতৃমূর্তির মধ্যে গভীর সাযুজ্য রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে মা হলেন—পৃথিবী, প্রকৃতি, ভূমি, দেবী এবং আরও অনেক কিছু। তাই ঋষির দৃষ্টিতে ভারতভূমি দেবীরূপে বন্দিতা। দেবী শব্দটি বৈয়াকরণের মতে, দিব্ ধাতুর উত্তর অচ্ + ঈপ্ এইরূপে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই দিব্ ধাতুটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১. দ্যুতি, ২. স্তুতি, ৩. মোদ, ৪. ক্রীড়া, ৫. গতি। যখন অব্যক্ত আদ্যাশক্তি স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিতা হন, তখন দিব্ ধাতুর অর্থ দ্যুতি বা আলোকচ্ছটা বলে বুঝতে হবে। যখন মুক্তির জন্য এবং কাম্য বিষয় প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে স্তুতিযোগ্যরূপে ধরা দেন তখন তিনি 'দেবী'। আবার যখন আনন্দময়ী শক্তিরূপে প্রতিভাত হন তখন 'মোদ' অর্থ গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। জ্ঞানময়ী চিৎশক্তি। আর দিব্ ধাতুর অর্থ হলো 'দ্যুতি'।

এই মাকে যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী লীলাময়ী শক্তি বলে জানব তখন অর্থ হবে 'ক্রীড়া'। প্রেরিকা শক্তি বলে স্বীকার করলে অর্থ হবে—গমন অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি গমন, অথবা বিষয়ের প্রতি প্রেরিকা শক্তি হবেন দেবী। এই দেবীশক্তিই হলেন ভারতমাতা। যিনি মৃন্ময়ী ভূখণ্ডের অন্তরালে চিন্ময়ী পরাশক্তি। আর এই চিন্ময়ী মা-ই শত্রুনাশিনী, মোদয়িত্রী ও পালনকর্মী। ভারতমাতা তাই প্রাণবন্ত, সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও আধ্যাত্মিক চেতনার উৎসরূপে বন্দিতা। এই দৃষ্টির সুন্দর প্রকাশ হয়েছে অথর্ববেদের ভূমিসূক্তে।

**জীবনদায়িনী ভারতমাতা**

এই ভূমিসূক্তে ভূমিরূপী মা স্বাভাবিক সৌন্দর্য, দয়া, করুণা ও আশ্রয়দাত্রীরূপে প্রকাশিতা। বৈদিক ঋষি সেই সত্যই উপলব্ধি করে বলেছেন—পৃথিবী তাঁর মাতা। তিনি পৃথিবীর পুত্র।[২] মা ও সন্তানের এমন ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধকেই ঋষি পৃথিবীর সঙ্গে নিজের সত্তাকে আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। সেই মা বসুন্ধরা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং।
শস্যশ্যামলাং মাতরম্। বন্দে মাতরম্।।

এই পঙ্‌ক্তিতে মাতৃভূমির যে চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে, তা শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা নয়; বরং ঋত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের নৈতিকতার সুষম প্রকাশ। এখানে মাতৃভূমি পর্যাপ্ত জল, উর্বর ভূমি, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র এবং শীতল সমীকরণের আধারস্বরূপা। অসীম বৈচিত্র্যে পূর্ণ সেই মায়ের স্বরূপ বর্ণনার আগে ঋষি অনুভব করেন যে, পৃথিবীর অস্তিত্ব কতকগুলি মৌলিক নীতির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম মন্ত্রেই তাই বলা হয়েছে, সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করে আছে যে অবিনাশী বৃহৎ সত্তা, তেজস্বী মহাজাগতিক নিয়ম যাকে আশ্রয় করে সেই বিশ্ব সদা সচল, যে কোনো কর্মের অনুষ্ঠানকারী নৈতিক শক্তি পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। সেই পৃথিবীই আমাদের সমস্ত ভূত ও ভবিষ্যতের পালিকা। সমগ্র বিশ্বের চালিকা শক্তি।[৩] এই পৃথিবী বীর্যবতী, ওষধিসমূহের ধারণকর্ত্রী, নদী, সমুদ্র, শস্য-ফসলে পরিপূর্ণা। পৃথিবী সব কিছু দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছেন।[৪] যিনি সমগ্র বিশ্বকে ভরণ-পোষণ করেন, যিনি সম্পদের আধার, প্রতিষ্ঠাদাত্রী বা স্বয়ং প্রতিষ্ঠা, হিরণ্যরক্ষা এবং জগতের স্থাপনকারিণী, সেই পৃথিবী বৈশ্বানর অর্থাৎ সমস্ত জগতের অগ্নিকে ধারণ করেন; যাঁর কাছে ইন্দ্র বৃষতুল্য---সেই মাতৃরূপিণী পৃথিবীই সকল সম্পদের আধারস্বরূপা।[৫]

এ প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডের এক- নবতিতম অধ্যায়ের ৪৮ ও ৪৯ সংখ্যক দুটি শ্লোকে শাকম্ভরী দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। দেবী সেখানে বলেছেন, ''হে দেবগণ! অতিবৃষ্টির সময়ে আমি আমার নিজের দেহ থেকে বিনির্গত প্রাণসঞ্জীবনী শস্যসমূহের দ্বারা সমস্ত জগদ্‌বাসীর ভরণ-পোষণ করব, একারণে আমি বিশ্ববাসীর নিকট শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব।''[৬] প্রসঙ্গত, আমরা শাকম্ভরী দেবীর রূপটি স্মরণ করব। শাকম্ভরী পদ্মবনে বাস করেন, তিনি চতুর্ভুজা। একটি হাতে বাণের দ্বারা পরিপূর্ণ মুষ্টি, আর একটিতে আছে পদ্ম। তৃতীয় হাতটি অনন্ত রসবিশিষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা মৃত্যুহরণকারী ফুল-ফল-পাতা মূলযুক্ত শাকরাশিতে পরিপূর্ণ। চতুর্থ হাতে তিনি উজ্জ্বলকান্তি ধনু ধারণ করে আছেন।[৭] দেবীভাগবতে বলা হয়েছে, কোনো এক সময়ে একশো বছর বৃষ্টি না হওয়ার ফলে পৃথিবীতে আর কোনো শস্য উৎপত্তির উপায় ছিল না, তাই ভগবতী শাকম্ভরী নিজের শরীরজাত শাকসমূহ দিয়ে জীবের পোষণ করেছিলেন। যতদিন নতুন শস্য উৎপন্ন হয়নি, ততদিন দেবী সব প্রাণীকেই তাদের আহারের উপযোগী নানা রসপূর্ণ খাবার প্রদান করেছেন। সেই সময়ে তিনি শাকের দ্বারা সৃষ্টির সকলকে ভরণ করেছিলেন বলে তাঁর

শাকম্ভরী নাম প্রচারিত হলো। এই শাকম্ভরী দেবীই দুর্গাপুজোয় নবপত্রিকারূপে পূজিতা হন। রামায়ণে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গা যে শস্যাধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিতা হতেন, তার উল্লেখ আছে। শরৎকালে শস্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় নবপত্রিকার পূজা হয়। আর চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে এই দেবীরই পূজা হয় অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণারূপে। এই মাতৃকাশক্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা' তাই কেবল প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সমষ্টি নন; তিনি সকলের প্রাণস্বরূপা, প্রাণদাত্রী, প্রাণরক্ষয়িত্রী ও সভ্যতার প্রতীক।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মাতৃভূমিকে 'শস্যশ্যামলাম্' বলে বন্দনা করেছেন, সেই মাতৃভূমি শুধু উর্বর জমি নয়, তিনি জীবনের লালন-পালনকারিণী, অন্নদাত্রী এবং সকল জীবের আশ্রয়দাত্রী 'মা'-রূপে প্রতীয়মানা। তাই ঋষির মননে সবুজ শস্যে ভরে ওঠা ভূমি যেন শাকম্ভরী দেবীরই প্রকাশ, যিনি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে জীব-জগৎকে ধারণ ও পালন করেন। আর 'শস্যশ্যামলাং' শব্দটি বৈদিক পৃথিবীর মাতা, পৌরাণিক শাকম্ভরী এবং শাক্তধারায় জগন্মাতা—এই তিনটিকে একত্রে সমন্বিত করেছেন।

বৈদিক ঋষি ভূমিসূক্তে বলেছেন—বিশ্বদাত্রী অর্থাৎ সকল বস্তুর দানকারিণী পৃথিবীকে দেবতারা নিদ্রারহিত হয়ে অপ্রমত্তভাবে বা প্রমাদহীনভাবে রক্ষা করেন, তাই পৃথিবী সমগ্র জীব-জগতের প্রিয় মধুময় বিষয়সমূহ প্রদান করেন, তেজ অর্থাৎ দীপ্তির দ্বারা সিঞ্চিত করেন।[৮]

ভারতভূমি তাই আমাদের তেজ ও শক্তি সমন্বিত উত্তম রাষ্ট্র প্রদান করেছে।[৯] যেখানে পরিক্রমণশীল জলরাশি দিবা-রাত্র সমানভাবে প্রমাদরহিত-ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বহুস্রোতা হয়ে জল বা দুগ্ধ ক্ষরণ করেন, তেজের দ্বারা আমাদের সিঞ্চিত করে থাকেন।[১০] ভারতীয় সভ্যতার তিনটি মৌলিক স্তম্ভ—জীবন, সমৃদ্ধি এবং অন্ন। ভারতভূমি তথা মাতৃভূমি সেই শক্তি, যিনি এই তিনটি মূল উপাদানের ধারক ও দাত্রী। দেবী শাকম্ভরী, অন্নপূর্ণা এবং পৃথিবী—এঁরা সকলেই অন্ন, কৃষি, উর্বরতা ও জীবনরক্ষার অধিষ্ঠাত্রী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় মাতৃভূমি ভারতবর্ষ এই দেবীভাবেরই প্রকাশক্ষেত্র।

**মঙ্গলময়ী ও কান্তিরূপিণী ভারতমাতা**

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের পরবর্তী পঙ্‌ক্তি—

''শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত--যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্।
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং
বরদাং মাতরম্। বন্দে মাতরম্।।''

ভারতমাতার অঙ্গনে রাত্রিকাল শুভ্র জ্যোৎস্নায় পুলকিত। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত রাত্রিসূক্তে দেখা যায়, রাত্রিদেবী চারিদিকে বিস্তার লাভ করে তাঁর আগমনের বার্তা জনমানসে প্রকাশ করেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা সকল প্রকার শোভা সম্পাদন করেন।[১১] যাস্কাচার্যের মতে, 'রম্' ধাতুর সঙ্গে ত্রিপ্ প্রত্যয়যোগে রাত্রি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যে সময়ে প্রাণিবর্গ স্ব স্ব কর্ম থেকে বিরতি নেয়, ওই সময়ই রাত্রি—'উপরমন্তি দিবাচরাঃ সব্যাপারেভ্যঃ।'[১২] দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় যেভাবে শস্যশ্যামলা ভারতমাতা প্রকাশিত হন, একইভাবে রাতের বেলায় রাত্রিদেবীর জ্যোতির উদ্‌গমেই অন্ধকার নাশ হয়।[১৩] পাখিদের আশ্রয় যেমন বৃক্ষ, তেমন কল্যাণকারিণী রাত্রিদেবীর ক্রোড়েই আমাদের সুষুপ্তি ঘটে। জগতের সকল প্রকার রব রাত্রিদেবীর আগমনেই নীরব হয়। পশু-পাখি প্রভৃতি সকলই ভারতমাতারূপিণী নিদ্রাদেবীর কোলে নিজেদের সমর্পণ করে। ভারতমাতার কোলে দিব্য অলঙ্কারভূষিতা, কল্যাণকারিণী প্রস্ফুটিত ফুল ও বৃক্ষরাজিতে সুশোভিতা, হাস্যময়ী, মধুরভাষিণী এবং সুখ ও বরদানকারী রাত্রিদেবী স্বর্গস্থ দেবকুল এবং পৃথিবীস্থ প্রাণিকুলকে, স্থাবর-জঙ্গমকে সমাবৃত করে রেখেছেন বা বলা ভালো, রক্ষা করে চলেছেন। তাই বলা যায়, ভারতমাতার কোল যেন সমগ্র প্রাণিকুলের উত্তম আশ্রয়। এই পঙ্‌ক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতমাতার এমন এক রূপ প্রকাশ করেছেন, যেখানে চাঁদের শান্ত ও স্নিগ্ধ আলোয় রাত্রিকাল যেন মানব, জীব-জগৎকে আন্তর-আনন্দ প্রদান করে। ফুলে-ফলে ভরে থাকা গাছপালা যেন অপরূপ প্রাকৃতিক মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের দ্যোতক। এইভাবে ঋষি বঙ্কিমের গভীর মননে মাতৃরূপিণী ভারতভূমির ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্য উন্মোচিত হয়েছে যা আজও সর্বসাধারণের অন্তরে নাদরূপে সর্বদা অনুরণিত হয়। মাতৃভূমি ভারতের এই শান্ত, স্নিগ্ধ পবিত্র ও সমৃদ্ধ রূপচিত্রটি ভারতবাসীর আন্তর দেশপ্রেম ও গভীর শ্রদ্ধা উদ্দীপ্ত করে।

ভারতমাতা সদা হাস্যময়ী, মধুরভাষিণী এবং সুখ ও বরদানকারী। ভারতীয় শক্তিসাধনায় আদ্যাশক্তির সৌম্য ও করুণাময় প্রকাশ বহুবার নানা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় বিবৃত হয়েছে। এইরূপে তিনি ভয়ঙ্করী নন; তিনি স্নেহময়ী জননী, আশ্রয়দাত্রী, অভয়দাত্রী ও বরদা। মায়ের মুখ সবসময়ই প্রসন্ন হাসিতে পরিপূর্ণ, তাঁর মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি সবসময়ই মধুময়, যা তাঁর সন্তানকে সুখ ও বর প্রদান করে। মাতৃরূপিণী শক্তির প্রসন্নতায় সকল বাধা, সঙ্কট দূরীভূত হয়। দেবীমাহাত্ম্যে এই ভগবতী অম্বাকে প্রসন্ন হওয়ার প্রার্থনা জানানো হয়েছে।[১৪] দেবীর প্রসন্ন মুখই ভক্তের পরম আশ্রয়। মায়ের মধুময়ী ভাষা যেন মাতৃসত্তার জ্ঞান, প্রেম, করুণার একত্র সম্মেলন। মায়ের ভাষায় সন্তানের প্রতি মায়ের মায়া, মমতা, স্নেহ—এই সবেরই প্রকাশ হয়। ঋষি বঙ্কিম এই পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, একমাত্র ভারতমাতার গর্ভ থেকেই প্রাচীন বেদের মন্ত্র, ঔপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব, কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবানের গীতার উপদেশ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের জীবনদর্শন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছে। এই সকল বৈদিক ও পৌরাণিক ভাষা আমাদের জীবন-দর্শনে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যের বীজ বপন করে রেখেছে। করে চলেছে।

প্রসঙ্গত, আমরা এখানে ঋগ্বেদের দেবী সূক্তকে স্মরণ করতে পারি। এই সূক্তের ঋষি মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা বাক্। তিনিও একজন মন্ত্রদ্রষ্টা। একবার বাক্ পরাশক্তিকে আপন আত্মারূপে প্রত্যক্ষ করেন। তারপর ব্রহ্মরূপিণী হন। সেদিন এক অপূর্ব উপলব্ধিতে তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত হলো। তিনি বলে উঠলেন[১৫]—''আমি সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকদের সব ধন আমিই দিই। আমি স্বাত্মারূপে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ

করেছি, আমি ব্রহ্ম। আমি যজ্ঞাইদের মধ্যে প্রথম-স্থানীয়া। বহুভাবে প্রপঞ্চরূপে আমি অবস্থিতা, সকল ভূতে জীবভাবে প্রবিষ্টা। সেইজন্য সমগ্র দেশে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমারই আরাধনা করে।" এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, বাগ্‌দেবীই সমগ্র জগতের প্রধানা। বাক্ বা শব্দ দিয়েই তো ভাষার প্রকাশ। সেই ভাষা যখন সুমধুরা মায়ের মুখনিঃসৃতা তখন তা জগতের প্রাণস্বরূপা। বাগ্‌দেবী নিজের স্বরূপ উন্মোচন করে বলেছেন— ''আমিই কারণরূপে বিশ্বভুবনের উৎপত্তিস্থল এবং আমিই স্বয়ং বিশ্বভুবনরূপে বর্তমান। বায়ুর মতো সহজে আমি বিশ্বের মধ্যে অন্তরে ও বাইরে বিচরণ করি। ব্রহ্মচৈতন্যরূপে আমি আকাশের সীমা পেরিয়ে গিয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছি, এই পৃথিবীকেও ছাড়িয়ে অবস্থান করছি। আবার স্ব-মহিমায় দ্যৌ-পৃথিবীরূপ অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হয়েছি।"[১৬] বাক্‌রূপিণী মায়ের ভাষাই তাহলে জগৎ প্রপঞ্চের মূল আধার। যে ভাষা সত্য, জ্ঞান ও ধর্মের বাণীরূপে ঐক্য, স্বদেশ প্রেমের আহ্বান জানায়। মধুরভাষিণীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতমাতার যে অলঙ্করণ করেছেন তা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ঐক্যসূত্রে আজও গেঁথে রেখেছে।

এই ভারতমাতাই সুখদা, বরদা। তিনি একদিকে যেমন সমগ্র ভারতবাসীকে সুখ প্রদান করেন, তেমনি বর প্রদানও করে থাকেন। সুখ মানুষকে সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ ও সর্বথা পূর্ণ করে। 'সুষ্ঠু খং যস্মাৎ তৎ সুখম্।' 'খ' মানে আকাশ, এখানে আকাশ বাকি চারটি ভূতের অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটিরও প্রতিনিধি। তাই সুখের অর্থ দাঁড়াল—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং ভৌতিক পদার্থসমূহ যে তত্ত্বে বা স্থিতিতে সুষ্ঠু, সুন্দর ও অনুকূলবোধক হয়, তা-ই সুখ। সুখ-ই আত্মা, শ্রুতি বলছেন---'তস্যৈ বানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।'[১৭] এই প্রেক্ষায় সুখ বলতে বৈষয়িক সুখকেও বোঝাবে। তখন ব্যুৎপত্তি হবে এইরকম—'সুষ্ঠু শোভনানি প্রসন্নানি খানি—শ্রোত্রপ্রভৃতীনি ইন্দ্রিয়াণি যস্মাৎ' অর্থাৎ যে অনুভব হলে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি প্রসন্ন ও স্ফূর্তিসম্পন্ন হয়, তা-ই সুখ। মা তাঁর সন্তানের কাছে যেভাবে সুখের জন্য, ভালো থাকার জন্য সবরকম উপকরণ সামনে এনে দেন, ঋষি বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ভারতমাতাও আমাদের সকল সন্তানের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সম্মান সহ ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি—এই সব কিছু দিয়েই লালন-পালন করে চলেছেন। সেই ভারতমাতাই আবার আমাদের যা 'বর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সেই বিষয়ও প্রদান করেন। মানুষের জীবনযাত্রার পথে পুরুষার্থ চারটি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভারতামাতা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গনে সমগ্র মানবজাতির জীবনের পরম আদর্শরূপে চতুর্বিধ পুরুষার্থের প্রদাত্রী। পুরুষার্থ তো মানুষের শক্তি, সমৃদ্ধির আধার। মানুষের স্বভাব হলো সে যে পরিস্থিতিতে অবস্থান করে তার থেকে আরও ভালো পরিস্থিতি অর্থাৎ উন্নতির জন্য সবসময় চেষ্টা করে। এই উন্নতি প্রাথমিকভাবে জাগতিকই। তাকে বলা হয় অভ্যুদয়। কিন্তু অভ্যুদয় তো সাময়িক। অভ্যুদয়ের চেহারা চিরকাল একরকম থাকে না! অপরদিকে মানুষকে তো সুখে থাকতে হবে চিরকাল—এই আকাঙ্ক্ষায় তার উত্তরণ হয় নিঃশ্রেয়সে। ধর্মের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ও প্রয়োজন হয় অভ্যুদয়ের হেতুরূপে।[১৮] সেই ধর্মনির্দিষ্ট কর্মের প্রতি মানুষের যে প্রেরণা, সেটাও 'ধর্ম' বলেই পরিচয় দিয়েছেন জৈমিনি।[১৯] ধর্ম হলো স্বভাব, পরিচয়, নিয়ম, প্রেরণা, প্রাপ্তি—যার সব ক'টিই মানুষের প্রাণে প্রকাশিত হয় মায়ের হাত ধরে। বঙ্কিমও ভারতমাতা যে সমগ্র ভারতবাসীর চেতনায় তপস্যা, অহিংসা, সত্য, ঋত, দয়া, দান, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সদাচার—এইসব ধর্মীয় গুণাবলীর উদ্ভাসন ঘটান—এই বিষয়টি তাঁর কালজয়ী রচনায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া শাস্ত্রমুখেও তো জানা যায় যে, ভারতভূমিই বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ ও নানা দর্শনশাস্ত্রের জন্মক্ষেত্র। ভারতমাতার কোলেই মানবজাতি ধর্ম, ন্যায়, সত্য, অহিংসা, করুণা, মুদিতার শিক্ষা অর্জন করে। তাই ভারত ধর্মদাত্রী।[২০] ধর্মই সমগ্র জগতের ভিত্তিপ্রস্তর। মাতৃরূপে ভারতভূমি বরদা হস্তে মানবসমাজকে ধর্ম দান করেন। মানবতা প্রদান করেন। সকলকে একাত্মতার অভিমুখে প্রেরিত করেন।

এই ভারতমাতাই কিন্তু মানবজাতির জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত বস্তুর জোগান দেন, তা রক্ষা করেন ও সেই সবের বৃদ্ধিও ঘটান। তাই বলা যায়, মাতৃরূপে ভারতভূমি মানবজাতিকে 'অর্থ'ও সংগ্রহ করে দেন। পুরুষার্থের অন্তর্গত 'অর্থ' শব্দের দ্বারাও মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করাকেই বোঝায়। কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিতে 'অর্থ' শব্দের মুখ্য অর্থ হলো 'ভূমি'। কৌটিল্য অবশ্য মানুষের বৃত্তিকেও অর্থ বলেছেন। 'মনুষ্যাণাং বৃত্তিঃ অর্থঃ। মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ।[২১] মানুষের যাবতীয় জীবিকার যা মূলাধার বা উৎস তা-ই অর্থ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ধন, ধান্য, বস্ত্র, বাড়ি ঘর ইত্যাদি বাঁচার জন্য যা যা প্রয়োজন তার যে প্রধান উৎস, সেটাই অর্থ। যেহেতু 'মাটি'ই সকল প্রাণীর সুস্থির আধার, তাই 'মাটি'ও অর্থ। মহর্ষি শুক্রাচার্য 'মাটি'র মহিমা কীর্তন করে বলেছেন, মাটি হলো সব প্রাণীরই সুখের খনি।[২২] আচার্য বাৎস্যায়নের মতে, বিদ্যা, ভূমি, সোনা-রুপা, পশু, ধনধান্য, বাসনকোসন, বন্ধু ইত্যাদির অর্জন, রক্ষণ ও বর্ধনই হচ্ছে অর্থ।[২৩] মহাভারতকার বলেছেন, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, শিল্প এমনি নানা উপায়, যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ঘটে থাকে, তাকে অর্থ বলে ভাবা যেতে পারে।[২৪] সুতরাং নানা শাস্ত্রের পরিক্রমায় বলাই যায়, ভারতমাতা অর্থদাত্রী। উর্বর ভূমি, নদী, বন, খনিজ, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের জীবিকা ও সমৃদ্ধি দান করেন। 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বিশেষণগুলিই তাঁর অর্থদাত্রী রূপকে উন্মোচিত করে।

প্রাণিকুলের জীবনযাপনের যা কিছু সুখ-সামগ্রী, তা-ই কাম। কাম থেকেই আমরা কাঙ্ক্ষিত কর্ম সম্পন্ন করে থাকি, ইন্দ্রিয়রাও সুখ অনুভব করে থাকে। তাই ধর্ম, অর্থের মতোই কামও পুরুষার্থের মর্যাদা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতমাতা তাই কামদাত্রীও। এখানে কাম বলতে শুধু ইন্দ্রিয়সুখ নয়; শাস্ত্রসম্মত, ন্যায়সঙ্গত ও সৌন্দর্যময় জীবন যাপনের সকল শুভ আকাঙ্ক্ষাকেও বোঝায়, যা ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে মানুষের জীবনকে আনন্দময় ও পরিপূর্ণ করে। সেই অর্থে বরদা অর্থে ভারতমাতা জীবকুলকে কাম প্রদানও করে থাকেন।

আবার এই ভারতমাতা মোক্ষও দান করেন। মুক্তি লাভের জন্য একমাত্র সাধনক্ষেত্র হলো ভারতভূমি। এখানেই বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বেদান্ত-এর অসংখ্য মুনি-ঋষি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন এবং সমস্ত জীবকুলকে সেই মোক্ষমার্গের পথিকও করেছেন।[২৫] এই কারণে ভারতমাতা মোক্ষের পথও প্রদর্শন করেন। ভারতীয় ও সনাতনী ছাড়া অন্যের কাছে 'মোক্ষ'রূপ অমূল্য সম্পদের সংবাদও পাওয়া যায় না।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ অর্জনের প্রধান উপায় মানবজীবন। মাতৃরূপে ভারতভূমি সেই জীবন, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দান করেন। তাই এখানেই চারটি পুরুষার্থ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। ভারতমাতা তাই বরদা। শুধুমাত্র জাগতিক বস্তুগত বরই তিনি দান করেন না; বরং ধর্মের আদর্শ, অর্থের জোগানের উপায়, কামের বিশুদ্ধ প্রয়োগ এবং মোক্ষরূপ পরমপদও প্রদান করেন। এই কারণেই ঋষি বঙ্কিম ভারতমাতাকে সুখদা বরদারূপে বন্দনা করেছেন।

**ভারতমাতার বীর্য, সংহতি ও আত্মশক্তি**

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের পরবর্তী পংক্তি—

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং,
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।

এই পঙ্‌ক্তিতে কোটি কোটি মানুষের একত্র কণ্ঠস্বর জাতির ঐক্যবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যের প্রতীককে নির্দিষ্ট করেছে। ঠিক যেভাবে প্রাচীন বৈদিক সংজ্ঞান সূক্তে সকলকে সমবেত হওয়ার ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই সূক্তে একই সঙ্গে, একই ভাবনায় ভাবিত হয়ে সকলকে একই লক্ষ্যে চলার কথা বলা হয়েছে। ঐকমত্যের এই ভাবনাই সংজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ্য জ্ঞান। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ভাবগৌরবে বিশেষ সমৃদ্ধ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মকথার দ্যোতক। বেদের ঋষিই বিশ্বমানবের এক উদার মিলনক্ষেত্র রচনায় সকলকে আহ্বান করেছেন। বিশ্ববিধাতার লীলাচ্ছলে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে বিভেদের বেড়াজাল বাঁধেন। এই বিভেদ তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, যার ফলে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়। তাই ঋগ্বেদসংহিতার সংজ্ঞান সূক্তে ঋষি সমগ্র মানবজাতিকে একাত্মতার ঐক্যমন্ত্রে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন—'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—'তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক্।'[২৬] যজ্ঞভাগ গ্রহণে দেবতাদের মধ্যে যেমন কোনো দ্বন্দ্ব দেখা যায় না, তেমনি মানব সাধারণের অন্তঃকরণ ও অভিপ্রায় এক হলে,[২৭] একই মন্ত্রে মন্ত্রিত হলে তাদের আর কোনো বাধা থাকে না। ঋষি সংবননের কণ্ঠে ঐক্যবন্দনার এই মন্ত্রটি কেবল প্রাচীন ভারতের নয়, আধুনিক ভোগসর্বস্ব বিভেদদীর্ণ জগতেরও মর্মবাণীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। ঋষি বঙ্কিমও এই মন্ত্রে ভারতমাতাকে জাতীয় ঐক্যের জীবন্ত প্রতীকরূপে প্রকাশিত করেছেন।

ভারতমাতা কোটি কোটি মানবের সম্মিলিত প্রয়াসে শক্তি, কর্ম, আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার প্রতীকস্বরূপা। ভারতবাসীর কোটি কোটি বাহু কেবলই অস্ত্রশস্ত্র ধারণে শক্তিশালী নয়, তারা তেজ, বীর্য, ওজঃ, সহিষ্ণুতা এবং ধর্মরক্ষার আদর্শে বলীয়ান নাগরিক। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে পরম শক্তির কাছেও তেজ, বীর্য, বল, ওজঃ, উদ্যম শক্তি ও সহন শক্তির প্রার্থনা করা হয়েছে।[২৮] সম্মিলিত রাষ্ট্র নাগরিক তাই চরিত্র, জ্ঞান, নৈতিকতা ও আত্মসংযমের সমন্বিত শক্তি। ভারতের মাটিতেই ব্রহ্মতেজে দীপ্ত ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, আবার বীর, ধনুর্ধর, মহরথী ক্ষত্রিয়রাও এই ভারতমাতারই সন্তান। ব্রাহ্মণদের জ্ঞাননৈপুণ্যে আর শূদ্রের সেবানৈপুণ্যে ভারতমাতা শক্তি-সমন্বিতা। অথর্ববেদের রাষ্ট্রাভিবর্ধন সূক্তে দেখা যায়, ঋষি বশিষ্ঠ, অভিবর্ত্মনি অথবা ব্রাহ্মণস্পতি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, ''হে রাজন্! আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, হিংস্র ও শত্রুভাবাপন্ন যে সকল শত্রুসেনা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত, আপনি তাদের পরাভূত করুন। সমগ্র প্রাণিজগতের ওপর ন্যায়সঙ্গতভাবে আপনাকে শাসনভার গ্রহণে দেবশক্তি সহায়তা করুন। সূর্যদেব উদিত হয়ে আপনার রাষ্ট্রকে তেজ, জ্যোতিঃ ও সমৃদ্ধিতে আলোকিত করুন। আমাদের শুভ ও সত্যনিষ্ঠ বাণী সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আপনি শত্রুবিনাশী, পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হয়ে আমাদের রাষ্ট্রের অনুকূল এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণে সদা নিয়োজিত থাকুন।''[২৯]

রাষ্ট্রাভিবর্ধন সূক্তে যেখানে ন্যায়পরায়ণ রাজার মাধ্যমে রাষ্ট্ররক্ষা ও প্রজাকল্যাণের প্রার্থনা করা হয়েছে; সেখানে ভারতমাতা সেই রাষ্ট্রশক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে কল্পিত হয়েছেন। এই কারণেই কোটি কোটি ভারতবাসীর সম্মিলিত কণ্ঠই রাষ্ট্রাভিবর্ধন সূক্তের বৈদিক রাষ্ট্রচেতনার এক অব্যর্থ মন্ত্র, যা জাতীয়তাবোধের উদ্দাম করে। ধর্মনিষ্ঠতা আনে। সামূহিক দুর্বলতা বিনষ্ট করে।

ভারতমাতা কখনই অবলা নন; তিনি শক্তিরূপে সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে দেবীদূত- সংবাদে দেখা যায়, দেবী সকল প্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা থাকেন।[৩০] নাগোজী ভট্ট শক্তি বলতে কার্যজনন সামর্থ্যকে বুঝিয়েছেন। তত্ত্বপ্রকাশিকায় শক্তি সামর্থ্য বা উৎসাহকে বোঝায়। শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেব শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রণবপ্রেমামৃত ভাষ্যে বলেছেন, শক্তি শারীরিক বল। নিঃস্বার্থ পরোপকার উদ্দেশে প্রযুক্ত হলেই তা সাত্ত্বিক। ন্যায্য স্বার্থরক্ষায় প্রযুক্ত হলে তা রাজস এবং অন্যান্য কার্যে প্রযুক্ত হলে তা তামস।[৩১] প্রসঙ্গত, ত্রিক্‌সিদ্ধান্তসম্মত শক্তিতত্ত্বটি স্মরণ করে কীভাবে দেবী সকল প্রাণীতে শক্তিরূপে অবস্থান করেন, তা দেখে নেব। পরমেশ্বরের হৃদয়ে সিসৃক্ষা উৎপন্ন হওয়ামাত্র তিনি দুইরূপ হয়ে যান। শিবরূপ ও শক্তিরূপ। শিব প্রকাশরূপী এবং শক্তি বিমর্শরূপিণী। 'বিমর্শ' শব্দের অর্থ এখানে পূর্ণ অকৃত্রিম অহং-এর স্ফূর্তি। এই স্ফূর্তি সৃষ্টিতে বিশ্বাকারে, স্থিতিতে বিশ্বপ্রকাশে এবং সংহারে বিশ্বসংহরণরূপে প্রকাশিত হয়।[৩২] উপনিষদ্ বলেছেন—'বলমসি' আপনি হলেন 'বল'।

ভারতমাতা এমন এক সর্বশক্তিময়ী জননী, যিনি অসংখ্য শক্তির আধার, জ্ঞান ও ধর্মের দ্বারা সন্তানদের মুক্তির পথে পরিচালিত

করেন। আবার সমগ্র ভারতবাসীর অন্তর ও বাহ্য সকল শত্রুকে পরাভূত করার শক্তি প্রদান করেন। দেবীসূক্তে দেবী বলছেন, ''যাকে ইচ্ছা আমি বলবান, অথবা স্তোতা, অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান করতে পারি। যিনি শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন, তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার করে দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি।''[৩৩] এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক ঋষি সমস্ত প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক দেবীশক্তি নিহিত আছেন, সেটা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। ঋষির দর্শনে উদ্ভাসিত এই দেবীশক্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় যুগপ্রয়োজনে ভারতমাতারূপে প্রকটিতা। তিনি সকল আশ্রিতের দুঃখহারিণী, বিশ্বজননী, বিশ্বেশ্বরী, চরাচরের অধীশ্বরী।[৩৪] যিনি বিপদ থেকে রক্ষা করেন, দুঃখ হরণ করেন, পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলছেন,[৩৫] পরমেশ্বরের শক্তি বিচিত্র কার্যকারিণী। সেই শক্তি জ্ঞানরূপ বল দ্বারা সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ভারতমাতাও জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী। অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও বলের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াশক্তি। জ্ঞান বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, বল অর্থাৎ উৎসাহ এবং ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যাপার বা নানা কার্যে জীবকে নিরত করেন। আবার রক্ষাও করেন।

শাস্ত্রে বলেছেন—রিপু অর্থাৎ শত্রু হলো ছয়টি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। বেদ, উপনিষদ্, গীতা ও পুরাণের আলোকে ভারতমাতা মানুষের অন্তরে জ্ঞান, ধর্ম, সংযম, ত্যাগ, বিনয় ও ঐক্যের চৈতন্য জাগিয়ে ষড়রিপু নাশ করেন। গীতায় শ্রীভগবান্ আমাদের ছয়টি আসুরী সম্পদ নাশের কথা শিখিয়েছেন। বলেছেন—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এই আসুরী প্রবৃত্তি নাশ হলে তবেই আত্মোন্নতি সম্ভব— যা সমগ্র জাতির উন্নতির একমাত্র কারণ। মলিন-চিত্ত, অল্প-বুদ্ধি, ক্রূরকর্মা ও অনিষ্টকারী ব্যক্তিরাই জগতের বিনাশের মূল। আর বেদ, উপনিষদ্, গীতা, পুরাণ—সবই আমাদের শিষ্টাচার ও সদাচার শিখিয়েছে। যা ধর্ম ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে একাত্মতার মন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত করে ঐক্যবদ্ধ করে আজও। ঐক্যই শত্রু- শাতন সামর্থ্য।

ভারতমাতা হলেন রিপুদলকারিণী। তিনি মানুষের চেতনায় ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ও আমাদের এই একাত্মতার শিক্ষাই দেয়। 'সহ নীববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।'[৩৬] অর্থাৎ আমরা একসঙ্গে রক্ষিত হই। একসঙ্গে জ্ঞানলাভ করি, একসঙ্গে শক্তি অর্জন করি। ঐক্যবদ্ধতাই জাতির উন্নয়নের মূল মাধ্যম। গীতায় শ্রীভগবান্ও এই একই পরামর্শ দিয়েছেন।[৩৭]

**ভারতমাতা ঃ জ্ঞান, ধর্ম, শক্তি ও ভক্তির রূপ**

'বন্দে মাতরম্'-এর চতুর্থ স্তবকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চারণ হলো—

'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।'

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতমাতার অপরূপ চিত্র এই স্তবকে অঙ্কন করেছেন। ভারতমাতা বিদ্যাস্বরূপা। তিনিই ধর্ম, আবার হৃদয়ের মর্মরূপে সেই মা-ই বিরাজিতা। মানবশরীরে প্রাণরূপে সেই মায়েরই স্পন্দন হয়। বাহুতে শক্তিরূপে সেই মা-ই নিয়ত কর্মরতা। আন্তর ভক্তিরূপে সেই মা-ই বন্দিতা। ভারতবর্ষের মন্দিরে মন্দিরে পূজিতা দেবীমূর্তি ভারতমাতারই প্রতীকস্বরূপা। তাই ভারতমাতা বন্দনার আধার স্বরূপা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর নারায়ণী স্তুতিতে দেবীকে সমস্ত বিদ্যার মূর্তিস্বরূপা[৩৮] বলে বন্দনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে বিদ্যা আঠারো প্রকার। সেগুলি হলো—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ঋগ্-যজুঃ-সাম-অথর্ব এই চতুর্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র—এই আঠারো প্রকার বিদ্যা।[৩৯] বিষ্ণুপুরাণে বিদ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, মুক্তিফলদায়িনী আত্মবিদ্যা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি সব-ই দেবীস্বরূপা।[৪০] ভারতমাতা জ্ঞানের আধার। প্রজ্ঞার আধার। আত্মমুক্তির একমাত্র ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। মুনি-ঋষিদের জ্ঞানসাধনার এই ভূমি ভারত। তাই জননী ভারতমাতা হলেন জ্ঞানস্বরূপা ও জ্ঞানময়ী। যিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তরিত করেন।

দেবী মুক্তিদায়িনী নারায়ণী সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করেন।[৪১] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশ খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে নারায়ণ স্বয়ং বলছেন—''যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী, প্রকৃতি ও সকলের পরমা জননী এবং যিনি মৎপরা ও মম সদৃশ, তিনিই নারায়ণী।[৪২] ভারতমাতাও দেবী নারায়ণীরই স্বরূপবিশিষ্টা। উপনিষদেও দু'টি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে। পরা ও অপরা।[৪৩] এর মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই সকলই অপরা বিদ্যা। আর পরা বিদ্যা হলো ব্রহ্মবিদ্যা। আত্মজ্ঞান। ভারতবর্ষই এই বিদ্যাসমূহের আঁতুড় ঘর এবং জননীস্বরূপা।

ভারতমাতা ধর্মস্বরূপা। ধর্ম হলো স্বভাব, পরিচয়, নিয়ম, প্রেরণা, আবার প্রাপ্তিও। ঋক্সংহিতার ভাষ্যে আচার্য সায়ণ ধর্মের ধারণ ও ধারক দু'রকম অর্থই গ্রহণ করেছেন। অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞ এবং যজ্ঞের দ্বারা লভ্য পুণ্যফলকে ধর্ম বলা হয়েছে। ধর্ম প্রথমে কর্ম ও তারপরে কর্মের ফলরূপে বিস্তৃত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ধর্মের তিনটি প্রকার বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ধর্মস্কন্ধ হলো যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। দ্বিতীয় ধর্মস্কন্ধ হলো তপস্যা অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত। তৃতীয়টি হলো আজীবন আচার্য গৃহে বাস করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে দেহের অবসান। বৃহদারণ্যকে ঋষি বলেছেন, ধর্ম হলো নিয়ামক এবং তার স্বরূপ হলো সত্য। মীমাংসা দর্শনে জৈমিনি বলছেন, যা কিছু মঙ্গলজনক, তাই ধর্ম। ধর্ম প্রসঙ্গে কণাদের মতটি এইরকম—''যতোঽভ্যুদয়- নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।'' আবার যা যেখানে যে সম্বন্ধে থাকে তাকেও ধর্মই বলা হয়েছে। ধর্মের প্রধান অর্থ হলো

মানুষের সকল কর্তব্য-কর্ম। কর্তব্য-কর্ম করলে যে ফললাভ হয় অর্থাৎ পুণ্য, তা-ই ধর্ম। ধর্মকে আমরা নিয়মরূপেও দেখি, দেখি ঋত, সত্য রূপে। ধর্ম আরও নানা রূপে এসে ধরা দিয়েছেন ধর্মশাস্ত্রে, বিভিন্ন সংহিতায়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্।।

মনু এ প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে ঐগুলি সাক্ষাৎ ধর্মের লক্ষণ। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতুষ্টি ও সম্যক্ সঙ্কল্পজ কাম– এগুলি হলো ধর্মমূল। আত্মতুষ্টি আর সঙ্কল্পজন্য যে কাম যাজ্ঞবল্ক্য এদের মাধ্যমেও ধর্মকে চিনতে বলেছেন।

ধর্মের অভিনব ব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করেছিলেন তাঁর আচার্য গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। ঊনিশ শতকের ধর্মীয় আন্দোলনের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীব-শিব তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মকে নবরূপে তুলে ধরলেন সেকালের ধর্মভ্রষ্ট মানুষের কাছে। যেখানে জীব ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি। সমগ্র বিশ্বে সেই একটিই পরম সত্তার প্রকাশ। যখনই মানুষের মধ্যে জেগে উঠবে এই সুপ্তবোধ, তখনই সে উপলব্ধি করবে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ। ধর্মের স্থান অন্তরে— 'ধর্মো হৃদি সমাশ্রিতঃ।'

ভারতমাতা ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রের কলেবরে ব্যক্তি, সমাজ ও বিশ্বকে ধারণ, রক্ষা ও সুসংহত করে রেখেছেন। তিনি আমাদের ধারণ করেন, রক্ষা করেন এবং সমাজকে স্থিতিশীল রাখেন।[৪৪] ভারতবর্ষ এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ঋষি-মুনিদের ধর্ম, সংস্কৃতি, তপস্যা, ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শময় জীবন যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভারতমাতা সমগ্র ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত চেতনা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখা যায়, দেবী সমস্ত ভূতের অন্তরে চেতনারূপে অবস্থান করেন।[৪৫] নাগোজী ভট্ট চেতনা শব্দের অর্থ করেছেন, 'নির্বিকল্পা যা চিচ্ছক্তিঃ।' অর্থাৎ নির্বিকল্পা চিৎশক্তি হল চেতনা। এই চেতনাই মর্ম শব্দের পর্যায়বাচী। শ্রীওঙ্কারনাথদেব শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রণবপ্রেমামৃত ভাষ্যে বলেছেন, চেতনা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিহেতু অন্তকরণ-শক্তি বিশেষের নাম।[৪৬] তা চিত্তের ব্যাপার-রূপ, জ্ঞানশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বের নাম চিত্ত। মহত্তত্ত্বের দুটি শক্তি—একটি জ্ঞানশক্তি ও অপরটি ক্রিয়াশক্তি। অর্থাৎ চেতনা একাধারে জ্ঞানশক্তি সমন্বিতা ও ক্রিয়াশক্তি সমন্বিতা। এই চেতনা আবার তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে জ্ঞান পরম্পরাক্রমে সত্ত্ব নামক অদৃষ্টের বা সুখের বা দুঃখ নিবৃত্তির হেতু অথবা সত্ত্বগুণের হেতু তা-ই সাত্ত্বিক। যেমন—ইষ্টদেবতার পূজা, শ্রীমন্দির দর্শন। সময়বিশেষে নিজ আত্মীয়ে রত থাকা রাজস, সস্পৃহ পরদারাদি-দর্শন তামস। এই চেতন সত্তাই ভারতবাসীর মর্ম। এই চেতনাও 'মা'। তিনি জাতির আত্মা, আদর্শ, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সত্তার কেন্দ্রবিন্দু। জাতির আত্মপরিচয়। জীবনী শক্তি। বেঁচে থাকার আদর্শভূমি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু নির্মাণকারিণী—এই শাস্ত্রমুখে বোঝা যায় যে, ভারতমাতা জ্ঞান, নৈতিকতা, প্রেম, আদর্শ ও আত্মসত্তার আধারস্বরূপা।

তিনিই আবার আমাদের শরীরে প্রাণস্বরূপা। প্রাণ স্থূল পদার্থ নয়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম শক্তি। 'প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি।'[৪৬] নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণক্রিয়াকে 'প্রাণ' নামেই অভিহিত করা হয়। সমগ্র বিশ্বের জীবন-তত্ত্বের প্রধান বিষয় হলো বায়ু, ঠিক তেমনি মানুষের জীবনের প্রধান বিষয় হল প্রাণ। যেভাবে রথের চাকার নাভিতে শলাকাগুলি যুক্ত হয়ে থাকে, সেইভাবে প্রাণের মধ্যেই সমগ্র জগৎ প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে।[৪৮] কৌষীতকি উপনিষদেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন রথের চাকার বেড়ি শলাকাগুলিতে প্রবিষ্ট, আবার শলাকাগুলি চাকার কেন্দ্রে প্রবিষ্ট, তেমনি এই ভূতমাত্রাগুলি প্রজ্ঞামাত্রায় প্রবিষ্ট। প্রজ্ঞামাত্রাগুলি প্রাণে প্রবিষ্ট। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা।[৪৯] জগতের যাবতীয় জিনিষ এই প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত। উপনিষদ্ তাই বলেছেন, এমন প্রাণই পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আচার্য, ব্রাহ্মণ।[৫০] প্রাণ হল সর্বাত্মক। ক্রিয়া, কারক, ফল—এই সমস্তই প্রাণ। সবকিছুর কেন্দ্রে একমাত্র প্রাণই রয়েছে। যেভাবে গাড়িকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে গেলে ঘোড়াকে সঙ্গে যুক্ত করা হয়; সেইভাবে রথস্থানীয় শরীরে প্রাণযুক্ত হয়ে রয়েছে। এখানে ঘোড়া হলো বল ও শক্তির প্রতীক। একইভাবে শরীরেও শক্তি ও বল রয়েছে। প্রাণের শক্তির দ্বারাই শরীর গতিযুক্ত হয়।[৫১]

প্রাণের নিবাসস্থান এই শরীর। শরীর প্রাণের দ্বারাই রক্ষা পায়। জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ভারতভূমি আমাদের জীবনধারণের উপকরণ প্রদান করে। প্রাণশক্তি, জীবন সত্তা, অস্তিত্বের বিকাশের মূল ভিত্তি এই ভারতভূমি। ভারতমাতার প্রাণস্বরূপিণী শক্তিতেই সমগ্র ভারতবাসী প্রাণবন্ত, কর্মক্ষম ও ঐক্যবদ্ধ থাকেন। প্রাণ না থাকলে যেমন শরীরের আর অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি ঋষি বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ভারতাত্মা জননী দেশমাতৃকা-প্রসূত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন হয় না। তাই প্রাণশক্তিরূপিণী, জীবনের চৈতন্যরূপিণী ভারতমাতার বন্দনা করা ভারতসন্তানদের অবশ্য কর্তব্য।

দেশমাতৃকা হলেন ভক্তিস্বরূপিনী। 'ভজ্ সেবায়াম্' ধাতুর দ্বারা 'স্ত্রিয়াং ক্তিন্'[৫২] এই সূত্রানুসারে 'ক্তিন্' প্রত্যয় দ্বারা ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আসলে 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের ভাবরূপে অর্থ হলো— 'ভজনং ভক্তি'। কিন্তু বৈয়াকরণরা এখানে কৃদন্ত প্রত্যয়ের অর্থ করেছেন, পরিবর্তিত অর্থ। অতএব, সেই ক্তিন্ প্রত্যয় অর্থান্তরেও প্রযুক্ত হতে পারে। 'ভজনং ভক্তিঃ', 'ভজ্যতে অনয়া ইতি ভক্তিঃ', 'ভজন্তি অনয়া ইতি ভক্তিঃ' ইত্যাদি 'ভক্তি' শব্দ-এর ব্যুৎপত্তি হতে পারে। এক্ষেত্রে ক্তিন্ প্রত্যয়ের অর্থ 'প্রেম' পর্যায়বাচী। ভক্তি অথবা ভজন শব্দ ক্রমশ 'ক্তিন্' ও 'ল্যুট্' প্রত্যয়ের দ্বারা সম্পন্ন হলে অর্থ হবে, সেবায় নিষ্ঠা লাভ করাই ভক্তি। অতএব, ভক্তি শব্দের বাস্তবিক অর্থ হলো সেবা। গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে, 'তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী।'[৫৩] তাই বলা যায়, সেবাই ভক্তির প্রধান সাধন। ভগবানে চিত্তকে স্থির করাই ভক্তি।[৫৪] চিত্তের স্বভাব হলো কোনো লৌকিক অথবা অলৌকিক বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও মনন দ্বারা তার আকারতা লাভ করা। ভক্তিরসায়নে তাই বলা হয়েছে—'চিত্তে দ্রুতে প্রবিষ্ঠা যা গোবিন্দাকারতা স্থিরা সা ভক্তিরিত্যভিহিতা।[৫৫] অর্থাৎ চিত্ত দ্রবীভূত হয়ে যখন গোবিন্দের আকারে স্থিতি লাভ করে, তাই-ই

ভক্তি। শাস্ত্রের নিরিখে ভক্তি যেভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনন্য প্রেম ও আত্মসমর্পণ, একইভাবে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর সেবা, ত্যাগ, আত্মবলিদান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা। ঋষি বঙ্কিমের মননে ভারতমাতা দেবীরূপে বন্দিতা। সেই দেবীর প্রতি আত্মনিবেদনের আহ্বান জানিয়েছেন ঋষি বঙ্কিম। দেশমাতৃকাই 'ভক্তি'রূপে সকলের হৃদয়ে প্রকাশিতা হন। বঙ্কিম তাই রাষ্ট্রের নৈতিক মূল্যবোধের সেবায় আত্মোৎসর্গের এই জাগরণ মন্ত্রে সমগ্র ভারতবাসীকে পুনর্জাগরণের চিরন্তন আহ্বান করেছেন।

**দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী—ত্রিশক্তি-সমন্বিতা ভারতমাতা**

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের পঞ্চম স্তবকটি হলো—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।'

ভারতমাতা দুর্গারূপে পূজিতা। তিনিই দশপ্রহরণধারিণী। দেবী দুর্গা হলেন আদ্যাশক্তি মহাপ্রকৃতিরই একটি রূপ। সেই সূত্রে তিনি সচ্চিদানন্দরূপিণী, জ্যোতির্ময়ী, চিন্ময়ী মা পরা প্রকৃতি। পরম করুণাময়ী মা বিশ্বজননী। মা হচ্ছেন সন্তানের অভয় আশ্রয়। বাৎসল্য ও কারুণ্যের ঘনীভূতা মূর্তি। মাতৃরূপে সেই দুর্গা সর্বশক্তিস্বরূপা ও সর্বার্থদায়িনী।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দুর্গা নামের আক্ষরিক নিরুক্তি করেছেন। সেখানে আমরা দেখি দুর্গা শব্দ বিচ্ছেদ করলে পাঁচটি অক্ষর পাওয়া যায়—দ্ + উ + র্ + গ্ + আ। এর মধ্যে দ্-এর অর্থ দৈত্যনাশ। আর দৈত্য শব্দের অন্তরালে আছে আমাদেরই ছ'টি রিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্গ। উ শব্দের অর্থ জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিনটি তাপ নাশ করে পালন করাকে বোঝায়। র্-এর দ্বারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিনরকম রোগের নাশ সূচিত হয়ে থাকে। আর গ্-কারের দ্বারা জীবের পাপের বিনাশকে বোঝায়। আ হচ্ছে ভয় ও শত্রু-হন্তৃবাচক। সুতরাং 'দুর্গা' শব্দের অর্থ দাঁড়াল—যিনি জীবের কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু ধ্বংস করেন, ত্রিতাপ হরণ করেন, ত্রিতাপ নাশ করেন, রোগ, শোক ও দুঃখ দূর করেন।

পাঁচটি অক্ষর নিয়ে তৈরি এই দুর্গা নামের আর একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, মাটি দিয়ে গড়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—সবটাই পঞ্চভূতেরই আসা, যাওয়া ও থাকা। এছাড়া জগতের আর কোনো উপাদান নেই। পঞ্চভূত কিন্তু ঈশ্বরের আত্মশক্তি থেকে উৎপন্ন হয়, তারপর তাঁকে আশ্রয় করেই অবস্থান করে। ঐ ঈশ্বরশক্তিই হচ্ছেন জীবের জীবাত্মা। ফলত দেখা যাচ্ছে যে, যে আত্মশক্তি থেকে এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি, যিনি এই ভূতপঞ্চকের অধিষ্ঠাত্রী, প্রেরয়িত্রী এবং পঞ্চভূতময়ী, আত্মশক্তিস্বরূপা সেই মূলা প্রকৃতিই হচ্ছেন দুর্গা। সব প্রাণীই তাদের চোখ, কান, নাক, রসনা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে যা উপলব্ধি করতে পারে, তিনি হলেন দুর্গা। তেমনি বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সব প্রাণীই যা কিছু করে তারও উৎস হলেন দুর্গা। শাস্ত্র বলেছেন, জীবের সব ইন্দ্রিয়ই ওই আত্মশক্তিকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়, অবস্থান করে আর তার দ্বারা সব বিষয়-উন্মুখতা লাভ করে। এই শক্তিই দুর্গা। তিনি সর্বময়ী, সর্বব্যাপ্তা বা ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপে সর্বত্র বিরাজমানা।

রামায়ণে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে[৫৬] দেবী দুর্গার শস্যাধিষ্ঠাত্রী রূপটি ফুটে ওঠে। অবশ্য কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে দুর্গের মধ্যে যে সকল দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের অন্যতমা হলেন অপরাজিতা।[৫৭] অনেকে মনে করেন, এই অপরাজিতাই মা দুর্গা। স্কন্দপুরাণেও দেখা যায়, মহাদেব কাশী রক্ষা করার জন্য নন্দীকে প্রতি দুর্গে দুর্গাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দিয়েছিলেন—'প্রতি দুর্গং দুর্গারূপাঃ পরিতঃ পরিবাসয়।'[৫৮] মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীকে শাকম্ভরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] দেবীমাহাত্ম্যে[৬০] অবশ্য এর কারণের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন—সেখানে বলা হয়েছে, বঙ্গদেশে প্রতি বছর শরৎকালে শস্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে শাকম্ভরী দেবীর অর্চনা করা হতো। এই শাকম্ভরী আবার পৃথিবীর বা ধরিত্রীরও অপর নাম। মাটি খোঁড়ার সময় পৃথিবীর গর্ভ থেকে জনকনন্দিনী সীতার জন্ম হয়েছিল বলে সীতাকেও ধরিত্রীদেবী বা শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হয়। এই পৃথিবীই দেবী দুর্গা, কারণ সমগ্র সৃষ্ট জীবকে তিনি বক্ষে ধারণ করেন এবং শস্য বিতরণ করে প্রাণীদের জীবন রক্ষা করেন। সূর্য যেমন বিশ্বের প্রাণ ধারণের কারণ, কেননা সূর্য তাপ বিকিরণ না করলে পৃথিবী ঠাণ্ডায় বরফে পরিণত হতো অথবা বৃষ্টির অভাবে উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হতো। ঠিক তেমনি দেবী দুর্গাও হচ্ছেন বিশ্বজননী। তিনি প্রাণরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং তাদের দুর্গতি বা দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেন। এই দুর্গাদেবীই অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা।

দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা নামেই বেশি পরিচিতা। দুর্গা শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো দুঃখ বা দুর্গতি নাশ করেন যিনি—'দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।'[৬১] কারণ এই দুর্গাই সংসাররূপ সাগর পারাপারের একমাত্র তরণী। এই দেবী দুর্গাই মহিষাসুরমর্দিনী, ত্রিনয়না, জটাসমন্বিতা। আর তাঁর সেই জটায় চন্দ্রকলা শোভা পায় অপরূপ রূপে। মায়ের গাত্রবর্ণ অতসী ফুলের মতো এবং তাঁর চোখগুলি নীলোৎপলের মতো। তাঁর দশটি হাতে দশটি অস্ত্র। অসুর বিনাশের জন্য দেবতারা তাঁকে সেই অস্ত্র দান করেছেন। তাঁর ডানদিকের হাতগুলিতে ত্রিশূল, খড়্গ, শক্তায়ুধ, চক্র এবং একটি জ্যা-রোপিত ধনুক। এবং বাম হাতগুলিতে নাগপাশ, অঙ্কুশ, খেটক, পরশু ও ঘণ্টা। দেবী দুর্গা তাঁর দশভুজে দশ প্রহরণে সমন্বিতা। যে দশটি অস্ত্রের দ্বারা দেবী মানবের আন্তর অসুররূপ অজ্ঞান, অহংকার, অধর্ম, অন্যায়, অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে নৈতিকতা, সংযম, একাগ্রতা, সাহস, স্থৈর্য, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার সম্পদে পূর্ণ করেন।

বঙ্কিমের মননে ভারতমাতাও সমগ্র জাতির অশুভের বিনাশ ঘটিয়ে জাতিকে নৈতিকতায় সমৃদ্ধ করেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তায় ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শেখান। ভারতমাতা এইভাবে সমগ্র ভারতবাসীকে নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান সাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, দান ও বাইরের ইন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, ভূতসমূহে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, অচাঞ্চল্য, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা, নিরভিমানতা রূপ দৈবীসম্পদে ঋদ্ধ করেন। এই সাত্ত্বিক গুণাবলীই ভবিষ্যৎ জাতির শুভ ও কল্যাণের প্রতীক। দুর্গারূপিণী ভারতমাতা তাই দশপ্রহরণধারিণী।

বাণীরূপিণী বিদ্যাদায়িনী। অর্থাৎ দেবী সরস্বতীর স্বরূপেও তিনি বিরাজমানা। নিরুক্তকার যাস্ক দেবী সরস্বতীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'দেবীরূপা নদীরূপা চ' অর্থাৎ ইনি দেবীরূপে এবং নদীরূপেও পরিচিতা। বাগ্‌দেবী সরস্বতী তাই পরবর্তী সময়ে জলদায়িনী নদীরূপেও সম্মান লাভ করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অম্ভৃণ ঋষির বিদুষী কন্যা ছিলেন বাক্ আর সেই বাক্ বিদ্যারূপিণী দেবীই সরস্বতী নামে পরিচিত হয়েছেন। সরস্বতী জ্ঞানদাত্রী, বিদ্যা ও বুদ্ধিদাত্রী ও সৃষ্টিশক্তি। জ্ঞানরূপা ও পরমার্থদায়িনী। যোগবশিষ্ঠে বলেছেন, পরমাত্মার স্পন্দনশক্তি থেকে যখন নাম-রূপাদি সব কিছু সৃষ্টি হয়, তখন তাঁকে বলে সরস্বতী।[৬২]

বাক্‌স্বরূপা সরস্বতীর অন্য নাম রয়েছে। তিনি বাণী, শব্দকারিণী শক্তি। বেদ ও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শক্তি। বিশ্বকর্মা বাক্‌শক্তিকে আশ্রয় করে প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেন। প্রজাপতিই বাক্‌স্বরূপা সরস্বতীর পতি।[৬৩] প্রজাপতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু তাই বাক্। এই বাক্‌শক্তিই হলেন সারদা। দেশমাতৃকা।

ভারতমাতাকে জ্ঞানদাত্রীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বিভূষিত করেছেন। কারণ তিনি শব্দস্বরূপা এবং শব্দসম্ভূতা। আর ভারতেই বেদের মন্ত্র, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব, নানা দর্শন সম্প্রদায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভাগবত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ ইত্যাদির বিকাশলাভ ঘটেছে। ভারতমাতা তাই জ্ঞান ও শিক্ষার ভূমি। সাহিত্য ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতমাতা বর্ণাত্মিকা ভাষারূপে সমগ্র জাতির চিন্তার বিকাশ ঘটান। জাতির অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও সৃজনী শক্তিকে ন্যায় ও মূল্যবোধের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে। বিদ্যাদায়িনী ভারতমাতা তাই সরস্বতীরূপে যুগযুগান্তরে বন্দিতা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মননে সুজলা সুফলা ভারতমাতা আবার কমলা রূপেও আরাধিতা। বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্মী সৌভাগ্যদায়িনী ও ঋদ্ধিদায়িনী। জগৎকর্তা বিষ্ণুর পত্নী বা পালিকা শক্তিরূপে লক্ষ্মীদেবী ভূষিতা। তিনি গৌরবর্ণা, সর্বালঙ্কার-সমন্বিতা, সুরূপা ও পদ্মের ওপর অবস্থিতা। তিনি দুই হাতের মধ্যে দক্ষিণ হস্তে বর ও বাম হস্তে ঐশ্বর্য ও শ্রীর প্রতীক সুবর্ণ-কমল ধারণ করে আছেন। তাঁর একপাশে অক্ষমালা ও অপর পাশে অঙ্কুশ রয়েছে। তিনি চন্দ্র ও সূর্যের মতো প্রভাযুক্ত। তাঁর অপর নাম শ্রী। তিনি দারিদ্র্যনাশিনী, ধন-সম্পদদায়িনী। 'শ্রী' শব্দের অনেক মানে। যেমন—ধন-ধান্য, শস্য, পশু, প্রজা, ভৃত্য, পরিজন, গৃহশোভা, লাবণ্য, রূপ, তুষ্টি, পুষ্টি, আয়ু, কীর্তি, বুদ্ধি, যশ, ধর্মপ্রতিষ্ঠা। সুখ, শান্তি, বিদ্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ধর্ম, অর্থ, কাম—লক্ষ্মী এই সবই দিয়ে থাকেন।

ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ও ধর্মাচরণের জন্য জাগতিক বস্তুর দরকার হয়। গ্রাসাচ্ছাদন সকলেরই প্রয়োজন। মঠ, মন্দির, ধর্ম, কর্ম, দান, যজ্ঞ, পূজা, ব্রত, আর্তের সেবা, তীর্থে ভ্রমণ, শাস্ত্রাদি পাঠ, ইষ্টপূর্তাদি কর্ম সবকিছুতেই মা লক্ষ্মীর কৃপা প্রয়োজন। লেখাপড়া করতে গেলেও প্রয়োজন। ধন হলো মানুষের বাহ্য প্রাণ। বায়ুপুরাণ বলেছেন, যে যার ধন হরণ করে সে তার প্রাণই হরণ করে। পরের ধন হরণ করা তাই নরহত্যার মতো পাপ। ধন প্রাণস্বরূপ বলেই ধন নাশ হলে মানুষ শোকে আকুল হয়ে যায়।[৬৪] মহাভারতকার বলেছেন, রাজ্য যাতে ধ্বংস না হয়, তাই ধন সংগ্রহ করে রাখতে হয়। দুর্ভিক্ষের সময়, অসুস্থতার সময় ধন দরকার হয়। বৃদ্ধ বয়সে জীবন-নির্বাহের জন্য ধন অত্যন্ত দরকারী। সাহস ও অমর্ষপূর্ণ শত্রুদের প্রতীকারের জন্য ধন প্রয়োজন। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যও ধন লাগে। তাই নিজের ধন নিজের কাছে রক্ষা করতে হয়।[৬৫] লক্ষ্মী এই ধনের দেবতা। তিনি বিষ্ণুপত্নী। পালিনী শক্তি। ঐশ্বর্যরূপিণী হলেন দেবী লক্ষ্মী।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে লক্ষ্মীস্বরূপা ভারতমাতা ভূমি, নদী, জলাশয়, গাছপালা, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ঐশ্বর্যে আমাদের নিয়ত পুষ্ট করে চলেছেন। বেদের শ্রীসূক্তেও এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, শ্রীদেবী সর্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী, সর্বদা পুষ্টিদায়িনী, সমৃদ্ধিদাত্রী ও কল্যাণময়ী। ভারতমাতা ঐশ্বর্য, শ্রী, সমৃদ্ধির দেবীরূপে স্বীকৃত ও সমালঙ্কৃতা। পদ্মাসনে আসীনা দেবী লক্ষ্মী মানুষের আন্তর ও বাহ্য সন্তাপ দূর করে শান্তি ও পরম তৃপ্তি প্রদান করেন। ভারতমাতাও তেমনি অন্ন, জল, বাসস্থান ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে তার সন্তানদের নিয়ত পুষ্ট করে চলেছেন। ভারতমাতাকে বঙ্কিম তাই লক্ষ্মীরূপা বলে বন্দনা করেছেন—

'শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।'

**নির্ণয়**

বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক পটভূমিতে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম্' কোনো বিচ্ছিন্ন সাহিত্যকীর্তি বলে মনে হয় না। বরং এটি এক প্রাচীন সভ্যতাগত অন্তর্দৃষ্টির আধুনিক প্রকাশ। এই সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মাতৃমূর্তি একইসঙ্গে উর্বর ভূমি, সমৃদ্ধির উৎস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আধার এবং দিব্য নারীত্বের এক প্রতিভূ। ভারতীয় সভ্যতায় আধ্যাত্মিকতার পরিসরে মাতৃরূপে চিত্রিতা ভারতমাতার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তি ও আত্মনিবেদন, কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যবোধ এবং সমষ্টিগত শ্রদ্ধার আন্তরিক নিবেদন ঘটেছে এই সঙ্গীতের পরতে পরতে। বঙ্কিমচন্দ্র মহাজাগতিক শক্তিরূপিণী ভারতমাতাকে সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্নিহিত চেতনা, শক্তি ও অস্তিত্বের মূল ক্ষেত্র বলে অভিহিত করেছেন। ভারতবাসীর জীবনযাপন, জীবন ধারণ, লালনপালনে সদা ব্রতী এই ভারতমাতা। দেবীসূক্তের সর্বব্যাপী মাতৃশক্তির ধারণাই পরবর্তীকালের শাক্ত মতে মহামায়া, আদ্যাশক্তি ও জগজ্জননী রূপে বিকাশিতা হন। 'বন্দে মাতরম্'-এ সেই ঐতিহ্য নতুন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। ভারতভূমি তাই

কোনো একটি জড় ভূখণ্ড বা সাধারণ কোনো দেশমাত্র নয়। চিন্ময়ী মহাশক্তিরই এক বিশেষ প্রকাশ হলেন ভারতমাতা। 'বন্দে মাতরম্' -এর তাত্ত্বিক দর্শনে বৈদিক মাতৃভাবনার পাশাপাশি পৌরাণিক দেবীমাহাত্ম্যও প্রকাশিত হয়েছে। পৌরাণিক অম্বিকা, দুর্গা, চণ্ডিকা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মহামায়ারূপিণী দেবীমূর্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতমাতারূপে উদ্ভাসিতা। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মাতৃমূর্তি কোনো একক দেবীর সীমায় আবদ্ধ নন। তিনি একইসঙ্গে শক্তি, বিদ্যা, সমৃদ্ধি ও ধর্মের আধারস্বরূপা। তিনি একদিকে যেমন করুণাময়ী জননী, আবার তিনি অধর্মবিনাশিনী শক্তিও। ন্যায় ও ধর্মরক্ষার জন্য সর্বদা অস্ত্রধারণ করে আছেন। তিনি সজ্জনের গৃহে শ্রী, জ্ঞানীর মধ্যে বুদ্ধি, ধার্মিকদের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং মহৎ মানুষের মধ্যে বিনয়রূপে বিরাজমান। এই মাতৃভূমি ভারত তাই জীবনদায়িনী পোষণকারিণী জননী।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে যে আদর্শে মাতৃবন্দনা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ সেই আদর্শকে জীবন্ত কর্মসূচিতে পরিণত করলেন। তিনি মনে করেছিলেন, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে শুধুই উচ্চারণের মধ্যে সীমায়িত করা নয়, বরং মাতৃভূমির সেবার জন্য নিজেদের শক্তিমান্ করে তোলা। মাতৃভূমিকে দুর্গারূপে কল্পনা করা হলে তাঁর সন্তানদেরও দুর্বল, জড় ও ভীরু হয়ে থাকা চলে না। তাদের মধ্যেও সেই শক্তি, ক্ষাত্রবীর্য, কর্মস্পৃহা জাগরণের প্রয়োজন। এই কারণেই স্বামীজীর দেশপ্রেম ছিল নিছক আবেগের নয়, তা ছিল সাধনা, তপস্যা ও কর্মের আহ্বান। স্বামীজী অনুভব করেন, ভারতমাতার পূজা কেবল মন্দিরে নয়, মানুষের মধ্যেই করতে হবে। তাই জগদ্‌বাসীর কাছে মাতৃভূমিই আরাধ্যা দেবী হন। বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমিকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামীজী সেই দেবীকে কীভাবে দরিদ্রের সেবা, অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আত্মবিশ্বাসের জাগরণ এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের মাধ্যমে পূজা করতে হয় তা শেখালেন। তাঁর কাছে দেশসেবা ও ঈশ্বরসেবা অভিন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই এই সঙ্গীত শুধু শব্দে সীমাবদ্ধ রইল না, বিবেকানন্দের বাণীতে তা পরিণত হলো জাতীয় শক্তি, আত্মমর্যাদা ও কর্মযোগের সম্মিলিত এক মন্ত্র। যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে ভারতবাসীর মনে প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম্' এই চেতনাকে জাতীয় জাগরণের শক্তিতে রূপান্তরিত করে। শ্রীঅরবিন্দের ভবানী ভারতীতে ভারতমাতা জাগ্রত শক্তির রূপ ধারণ করেন, যিনি তাঁর সন্তানদের আত্মশক্তি, ত্যাগ ও কর্মের পথে আহ্বান জানান। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতমাতা, বিবেকানন্দের জাগ্রত ভারত এবং শ্রীঅরবিন্দের ভবানী ভারতী—সবকিছুতেই প্রকাশ পায় একই মূল উপলব্ধি—এই ভূমি জীবন, সংস্কৃতি ও চেতনার আধার। এই কারণে 'বন্দে মাতরম্' নিছক একটি গান নয়; এটি একটি সভ্যতার আত্মস্মৃতি, যেখানে মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের নিজের উচ্চতর মানবিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

**তথ্যসূত্র**

১। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, শীক্ষাবল্লী, অনুবাক্–১১।

২। 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ।'—অথর্ববেদসংহিতা, দ্বাদশ কাণ্ড, ভূমিসূক্ত, ১২।

৩। 'সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্মযজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।।
—ঐ, ১।

৪। 'নানাবীর্যা ওষধীর্যা বিভর্ত্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ।।'
—ঐ, ২।

৫। 'বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু।।'
—ঐ, ৬।

৬। 'ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভুবি।'
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য।

৭। 'একস্যাং মুষ্টৌ বাণান্, একস্মিন্ হস্তে কমলম্, একস্মিন্ হস্তে পুষ্পাদিকম্, একস্মিন্ ধনর্বিভর্ত্তি ইত্যর্থঃ। দক্ষাধো হস্তাদিবামাধোহস্তপর্যন্তম্ আয়ুর্ধ্যানম্।'— দেবীভাগবত, ৭.২৮.৩৫–৩৬, শৈবনীলকণ্ঠ টীকা।

৮। 'যাং রক্ষন্ত্যস্বপ্না বিশ্বদানীং দেবা ভূমিং পৃথিবীমপ্রমাদম্।
সা নো মধু প্রিয়ং দুহামথো উক্ষতু বর্চসা।।'
—অথর্ববেদসংহিতা, দ্বাদশ কাণ্ড, ভূমিসূক্ত, ৭।

৯। 'সা নো ভূমিস্ত্বিষিং বলম্ রাষ্ট্রে দধাতূত্তমে।।'—ঐ, ৮।

১০। 'সা নো ভূমির্ভূরিধারা পয়ো দুহামথো উক্ষতু বর্চসা।।'
—ঐ, ৯।

১১। 'রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যহক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধিশ্রিয়োহধিত।।"
—ঋগ্বেদসংহিতা, দশম মণ্ডল, রাত্রিসূক্ত,১।।

১২। নিরুক্ত দ্রষ্টব্য।

১৩। 'ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ'
—ঋগ্বেদসংহিতা, ১০, ১২৭, ২।

১৪। 'প্রসীদা ভগবত্যম্বে প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসীদ সর্বভূতেশি দেবি ত্রাহি জগদম্বিকে।।'
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী মাহাত্ম্য।

১৫। 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা বাদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।।'
—দেবীসূক্ত, ৩।

১৬। 'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব।।—ঐ, ৮।

১৭। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২.৭।

১৮। 'যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।'—বৈশেষিক সূত্র, ১.১।

১৯। 'চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ।'—মীমাংসাসূত্র, ১.২।

২০। 'ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা।'—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১.১১.১।

২১। অর্থশাস্ত্র, বিনয়াধিকারিক দ্রষ্টব্য।

২২। শুক্রনীতি দ্রষ্টব্য।

২৩। ন্যায়সূত্র, বাৎস্যায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব দ্রষ্টব্য।

২৫। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৮.৬৬।
২৬। ঋগ্বেদ, ১০.১৯১.২।
২৭। 'সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।'—ঐ, ৪।
২৮। 'তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্য ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।'
—কৃষ্ণযজুর্বেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৪.৪২।
২৯। 'অভিবর্তেন ভণিনা যেনেন্দ্রো অভিবাবৃধে।
তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেঽভি রাষ্ট্রায় বর্ধয়।।'—রাষ্ট্রাভিবর্ধন সূক্ত, ১।
৩০। 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।'—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫.৩৪।
৩১। ঐ, প্রণবপ্রেমামৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৩২। 'বিমর্শো নাম বিশ্বকারেণ বিশ্বপ্রকাশেন বিশ্বসংহরণেন চ
অকৃত্রিমাহমিতি স্ফুরণম্।'—পরাপ্রবেশিকা দ্রষ্টব্য।
৩৩। 'যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং
সুমেধাম্।'—দেবীসূক্ত, ৫।
৩৪। 'দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।'
—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১.৩।
৩৫। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া।'—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬.৮।
৩৬। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শান্তিমন্ত্র।
৩৭। 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।'
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২.১৩।
৩৮। 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি.....।'—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১.৬।
৩৯। 'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারঃ মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দশ।।
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গন্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু।।'—তত্ত্বপ্রকাশিকা দ্রষ্টব্য।
৪০। 'যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী।।
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।।'—বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য।
৪১। 'সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।'—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১.৮।
৪২। 'সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা।
মম তুল্যা চ মন্ময়া তেন নারায়ণী স্মৃতা।।'
—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণেশ খণ্ড, ৭।
৪৩। 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে.... পরা চৈবাপরা চ।'
—মুণ্ডকোপনিষদ্, ১.১.৪।
৪৪। 'ধারণাদ্ধর্মমিত্যহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।'
—মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯.৫৮।
৪৫। 'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্য ভিধীয়তে।'
—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫.১৯।
৪৬। ঐ, প্রণবপ্রেমামৃত ভাষ্য।
৪৭। 'সর্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তিগুণপ্রদর্শনার্থম্। অন ইতি প্রাণস্য প্রত্যক্ষং
নাম।'—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৫.২.১, শাঙ্করভাষ্য।
৪৮। 'প্রাণে সর্বং সমর্পিতম্।'—ঐ, ৭.১৫.১।
৪৯। 'প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা।'—কৌষীতকি উপনিষদ্, ৩.৮।
৫০। 'প্রাণো পিতা, প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা....।'
—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭.১৫.১।
৫১। 'শরীরে প্রাণা যুক্তঃ।'—ঐ, ৮.১২.৩।
৫২। অষ্টাধ্যায়ী, ৩.৩.৯৪।
৫৩। গরুড়পুরাণ, ২১৯.৩।
৫৪। কল্যাণ পত্রিকা, ভক্তি অঙ্ক, পৃষ্ঠা–৩৬২।
৫৫। ভক্তিরসায়ন, ২.১।
৫৬। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২.৪.৩।
৫৭। ঐ, ২.৪.৫।
৫৮। স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, উত্তরার্ধ, ৬৯.১৭৮।
৫৯। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯১. ৪৫।
৬০। দেবীমাহাত্ম্য, ৯২.১১।
৬১। দুর্গাসপ্তশতী, ৪।১১।
৬২। 'সরস্বতী সৃষ্টিশক্তিরূপা আদ্যা প্রকৃতি।
সরণাৎ সর্বসৃষ্টীনাং কথিতৈষা সরস্বতী।।'—যোগবাসিষ্ঠ দ্রষ্টব্য।
৬৩। 'প্রজাপতি বৈ বাচস্পতিঃ।'—শতপথব্রাহ্মণ, ৫.১.১.১৬।
৬৪। 'যদেতদ্রবিণং নাম প্রাণ হ্যেতে বহিশ্চরাঃ।
স তস্য হরতি প্রাণান্ যে যস্য হরতে ধনম্।।'—বায়ুপুরাণ দ্রষ্টব্য।
৬৫। মহাভারত, শান্তিপর্ব দ্রষ্টব্য।

*With Best Compliments from -*

**A**

**Well Wisher**

*KN*

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

**MAZZA DENIM**
Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries
Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

*With Best Compliments From-*



S. K.
KAMANI

**Autoply Harness Industries**

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)
2, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013

**Phone : 2213-2971, 2213-2907**

***Manufacturers of***

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable,
PVC Tape, Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

**Ph. No. Office : 2248-9947**

Deals in : Marble, Granites Tiles, Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

**KAJARIA CERAMICKS LTD.**
**'NAVEEN'** brand tiles
**REGENCY CERAMICES LTD.**
**BELLS CERAMICES LTD.**
**ORIENT TILES**

*Showroom :*
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
**Show Room - 24004154 / 24002858**

*Godown :*
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
**Godown : 2403-4014**



# অসুরনাশিনীর অষ্টশক্তি

নিখিল চিত্রকর

জগৎ পরিব্যাপ্ত এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তি। আদিভূতা সনাতনী। বিভিন্ন কালপ্রবাহে তিনি বিভিন্ন রূপে আবির্ভূতা হন জগতের কল্যাণের জন্য। পারিপার্শ্বিক দানবীয়, আসুরিক, পৈশাচিক ও পাশবিক শক্তিকে পরাজিত করে শান্তিসুধা সিঞ্চন করেন। তিনিই আনন্দপ্রবাহের উৎস।

কখনো দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য বা কখনো ভক্তের মঙ্গলের জন্য তিনি অস্ত্র ধারণ করেন। এই যেমন এখন তিনি দুই অহংকারী অসুররাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন।

**যুদ্ধের প্রারম্ভে ঃ**

একবার শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুর মহাশক্তিধর হয়ে উঠল। অহংকার ও ক্ষমতার তাড়নায় তারা ত্রিলোক অধিকার করে বসল। দেবতাদের বিতাড়িত করে সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বায়ু, ও অগ্নির ওপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করল শুম্ভ-নিশুম্ভ। এমনকী দেবতাদের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞের আহুতি বা 'হবি'র ওপরও ভাগ বসালো তারা। এই 'হবি' গ্রহণ করেই তো পুষ্টি লাভ করেন দেবতারা! অগ্নিই তাঁদের পুষ্টিগ্রহণের একমাত্র মাধ্যম। শুম্ভ-নিশুম্ভ অগ্নিদেবকে নিজেদের আয়ত্তে এনে যজ্ঞাহুতির পুরোটাই হরণ করতে থাকল। নিরুপায় হয়ে পরাজিত ও দুর্বল দেবতারা জোট বেঁধে নগনন্দিনী দুর্গার শরণাপন্ন হলেন। তাঁর স্তব করলেন। মহাদেবী প্রসন্না হলে তাঁর শরীরের কোষ থেকে উদ্ভূত হলেন দেবী কৌশিকী। কৌশিকীর আবির্ভাবে দেবী দুর্গার গাত্রবর্ণ হলো কালো। সেই থেকে তিনি সমাদৃতা হলেন কালিকা বা কালী নামে।

সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ডর কাছে দেবী কৌশিকীর অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শুনে শুম্ভ-নিশুম্ভ দূত পাঠালো বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। দেবী কৌশিকী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শুম্ভ-নিশুম্ভকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। একথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠল শুম্ভ-নিশুম্ভ। চণ্ড-মুণ্ডর সঙ্গে বিশাল অসুরবাহিনী পাঠালো দেবীকে বন্দি করে নিয়ে আসতে। বলাবাহুল্য, তাদের সবাইকে ধরাশায়ী করলেন কৌশিকী। এতে শুম্ভ-নিশুম্ভ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এবার তারা সমস্ত দৈত্যকুলকে নির্দেশ দিল একযোগে মহাদেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তাদের নেতৃত্ব দিল সেনাপতি রক্তবীজ।

**রক্তবীজের ঝাড় ঃ**

কথায় বলে রক্তবীজের ঝাড়। অর্থাৎ আগাছার বাড়। যতই কাটো না কেন, তার শেষ নেই। যেমন মনের ষড়রিপু। কাম,ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এদের দমন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় বইকী। যাই হোক, সমস্ত দৈত্য সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে যখন আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে, তখন মহাশক্তি দুর্গার আরেক রূপ দেবী কালিকা এলেন। তিনিও দৈত্যদের প্রতিহত করলেন। রক্তাক্ত রণাঙ্গনে দৈত্যদের ছিন্নভিন্ন দেহের স্তূপ জমা হতে থাকল। সেনাপতি রক্তবীজ এবার যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। রক্তবীজকে যতই আঘাত করা হয়, তার দেহের এক একটা রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ে অবিকল তারই মতো নতুন রক্তবীজ জন্ম নেয়। ব্যাপারটা অনেকটা আধুনিক বিজ্ঞানের ক্লোন-কনসেপ্টের মতোই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের প্রতিলিপি গঠন করতে করতে একসময় সমস্ত রণাঙ্গন ছেয়ে গেল লক্ষ লক্ষ রক্তবীজে। এই দেখে দেবতারা উদ্বিগ্ন হলেন। দেবতাদের অস্থিরতার দরুন তাঁদেরই শ্রীঅঙ্গ থেকে সৃষ্টি হলো অষ্টশক্তির।

**অষ্টশক্তির ইতিকথা**

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র অষ্টম অধ্যায়ে মহাদেবী দুর্গার অষ্টশক্তির উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন ব্রহ্মাণী,মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, বারাহী বা যজ্ঞ বারাহী,নারসিংহী ও চণ্ডিকা। প্রথম সাতজনের উদ্ভব সাতজন দেবতার শ্রীঅঙ্গ থেকে। আর চণ্ডিকার সৃষ্টি স্বয়ং আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার শ্রীঅঙ্গ থেকে। সমরক্ষেত্রে শুম্ভ-নিশুম্ভের বিপুল সৈন্য যখন দেবী কৌশিকী, দেবী কালিকা ও মহাদেবীকে ঘিরে ফেলেছে, তখন সেই অসুরদের বিনাশ করতে ব্রহ্মা, কার্তিকেয়, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ও অন্য দেবতাদের মহাবীর্য ও মহাবল শক্তিরাশি নির্গত হয়ে দৈবীশক্তিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লেখিত—

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ।।
ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকা যযুঃ।।

অষ্টশক্তির মধ্যে প্রথমে এলেন ব্রহ্মাণী। ইনি ব্রহ্মার শ্রীঅঙ্গ থেকে সৃষ্ট। হংসযুক্ত বিমানে তাঁর আগমন। হাতে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। অক্ষমালায় নিহিত রয়েছে মন্ত্রশক্তি ও কমণ্ডলুতে অমৃতবারি। অমৃতবারি ছিটিয়ে তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন ও অভক্তকে নাশ করেন। ব্রহ্মাণী হলেন নাদ ও ব্রহ্মশব্দধারিণী।

এরপর ত্রিশূল হাতে আগমন মাহেশ্বরীর। বৃষ তাঁর বাহন। মাথায় চন্দ্রকলা। দুই বাহুতে জড়িয়ে আছে দুই মহাসর্প- অনন্ত ও বাসুকী। বৃষ ধর্মের প্রতীক। ত্রিশূল ত্রি-গুণ অর্থাৎ স্বত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণ নাশ করে মানুষকে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করায়।

দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় বা কুমারের অঙ্গীভূত শক্তি হলেন কৌমারী। ইনি ক্ষত্রিয় শক্তির মূর্ত প্রতীক। মায়া বিস্তার করে শত্রুদলের নজর থেকে নিজের সৈন্যদের গোপন করে রাখেন বলে তিনি গুহ-রূপিণী। ময়ূরবাহনা দেবী কৌমারী কামজয়ী, রিপুজয়ী এবং চিরকুমারী।

বৈষ্ণবী শক্তি গরুড়াসনা। চারহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গ। বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণের মূল শক্তি বৈষ্ণবী। তাঁর শঙ্খে 'ওঁ' ধ্বনির প্রতিসরণ। চক্র কর্মধারা, গদা ন্যায়দণ্ড ও খড়্গ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ। আসুরিক শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে সত্য ও ধর্ম সংস্থাপন করেন দেবী বৈষ্ণবী।

বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহের আত্মীক শক্তি হলেন বারাহী বা যজ্ঞবারাহী। সিংহবাহিনী বারাহীর দুই হাতে গদা ও চক্র।

ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহের অঙ্গীভূত শক্তিই নারসিংহী। তাই তিনি অর্ধমানবী-অর্ধসিংহী। অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী।

এরপর এলেন দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী। গজবাহিনী ঐন্দ্রীর হাতে বজ্র। জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তাঁর অধিকারে। সবশেষে আবির্ভূতা হন চণ্ডিকা শক্তি। স্বয়ং জগজ্জননী মহামায়ার শ্রীঅঙ্গ থেকে উৎসারিত হয়েছেন তিনি। মহাকালের প্রলয়ঙ্কারী শক্তি চণ্ডিকা। তিনি কালাতীত। অর্থাৎ কাল বা সময় তাঁর অধীন। তাই তিনি অজেয়। তাঁর আরেক নাম 'অপরাজিতা'। জটাজুটধারিণী চণ্ডিকা ভীষণা, করালবদনা। স্বয়ং শিবকে তিনি দূত করে পাঠিয়েছিলেন শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে। যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে। তাই চণ্ডিকার অপর নাম শিবদূতী।

**রক্তবীজবধ ঃ**

যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্টশক্তি,যোগিণী-সহ অন্যান্য মাতৃশক্তিরা যুদ্ধ করছেন। অষ্টশক্তির প্রহারে সবাই নিহত হলেও রক্তবীজ ক্রমশ অজেয় হয়ে উঠছে। এসব দেখে আস্ফালনরত শুম্ভ-নিশুম্ভ ধরেই নিয়েছে মহাশক্তির পরাজয় এবার আসন্ন। দেবতারা প্রমাদ গুনলেন। তাঁদের বিষণ্ণ দেখে চণ্ডিকা সহাস্যে কালীকে বললেন, 'চামুণ্ডে ! তুমি তোমার মুখগহ্বর মেলে ধরো। প্রসারিত করো তোমার রসনা (জিভ)। অস্ত্রের আঘাতে যখনই রক্তবীজের শরীরের রক্তবিন্দু বাইরে পড়বে তুমি সঙ্গে সঙ্গে তা পান করবে।' চণ্ডিকার কথামতো কালিকা দেবী সারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জিহ্বা ছড়িয়ে দিলেন। রক্তবীজের শরীর থেকে নির্গত প্রত্যেক রক্তবিন্দু পান করলেন। এরপর চণ্ডিকা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে গদা, পাশ, শূল দিয়ে উপর্যুপুরি আঘাত করতে থাকলেন রক্তবীজকে। তার শরীর থেকে রক্তের স্রোত নির্গত হলো। হাতে খর্পর (রক্ত ধারণ করার পাত্র) নিয়ে সেই রক্ত পান করলেন কালী। ফলে নতুন রক্তবীজ আর জন্মাতে পারলো না। একসময় ক্ষয় হতে হতে, রক্তশূন্য হয়ে পতন হলো মহাসুর রক্তবীজের।

**স্থান-কাল-পাত্র ঃ**

এই আদি-অন্তহীন বিশ্বচরাচরে একমাত্র মহাশক্তিই ধ্রুবক। তিনিই

*With Best Compliments*
*From :*



**Shree**
**Charity Trust**

দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই আদ্যাশক্তি। তিনিই মহামায়া। তিনিই আবার বিষ্ণুর যোগমায়া। যুগেযুগে এই মহাশক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাপ্রবাহের বিচ্ছুরণ ঘটেছে। তার ক্ষয় নেই, তার লয় নেই। তার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। তাঁকে নতুন করে কেউ উদ্ভাবন করেনি। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই তিনি বিরাজমান। মহাশক্তি নিত্যা।

বিজ্ঞানে শক্তির নিত্যতা সূত্রও তো তাই-ই বলে। শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, তাকে রূপান্তর করা যায় মাত্র। এই যে অষ্টশক্তি উৎসারিত হলেন দেবতাদের শ্রীঅঙ্গ থেকে তাও তো মহাশক্তির রূপান্তর। রক্তবীজ বধের পরবর্তী সময়ে দেবী যখন শুম্ভাসুরকে বধ করতে চলেছেন, শুম্ভ তখন ছলনার আশ্রয় নিয়ে দেবীকে বলে, ''হে কৌশিকী! এই বধ্যভূমিতে আমি একা। আর তুমি অর্বুদ সংখ্যক যোগিনী, মাতৃকাশক্তি, অষ্টশক্তির সাহায্য নিয়ে আমার সঙ্গে অসম-যুদ্ধে উন্মত্ত হয়েছ। এটা অন্যায় যুদ্ধ!'' দেবী হাসলেন। বললেন-—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।।

অর্থাৎ, 'এই জগতে একমাত্র আমিই আছি। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে? ওরে দুষ্ট! দেখ্ আমার বিভূতিসমূহ আমাতেই প্রবেশ করছে।'

এই বলে মহাশক্তি তাঁর মাতৃকাশক্তি, যোগিনী ও অষ্টশক্তিসমূহকে নিজের মধ্যেই আত্তীকরণ করলেন। তারপর সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে রণচণ্ডীরূপিণী মহাদেবী দণ্ডায়মান হলেন। দেবীর কথায়—

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্য্যদাস্থিতা।

তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মহাশক্তি যেখানে একাই অগণিতের সমান, সেখানে কেন অষ্টশক্তি বা অন্যান্য শক্তির প্রয়োজন হলো? এর উত্তর মহাকালের অমোঘ সূত্রে বাঁধা পড়ে আছে। যদিও মহাকালও মহাশক্তির অধীন। দেখছেন না, মহাকালীর (মহাশক্তি) পায়ের তলায় শব হয়ে পড়ে আছেন স্বয়ং মহাকাল। আমরা বলি শিব। শিবের 'ই'-কারাত্মক শক্তি হলেন মহাকালী। সেই শক্তি না থাকলে শিবও শব হয়ে পড়ে থাকেন। রক্তবীজ হোক অথবা শুম্ভ বা নিশুম্ভ যেকোনো আসুরিক শক্তিই হোক না কেন, তাদের বধ করা দেবীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু মহাশক্তি দুর্গাকে অষ্টশক্তির সাহায্যেই এই সমস্ত অসুরকে বধ করতে হবে এটাই নিয়তি। তাই বলে, যা হবার তা সময়েই হয়। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে ঘটে।

**তথ্যসূত্র ঃ**

১। 'সাধন সমর' ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রী সত্যদেব,গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর। ২। 'চণ্ডী চিন্তা' মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রী চণ্ডী প্রেস, কলকাতা। ৩। 'শ্রীশ্রী সপ্তসতী দুর্গা' গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।

*With Best Compliments From :*

**ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY**
**AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED**
**ALL INDIA PACKERS & MOVERS**

**Phone : Mobile : 9830020245 / 9831010261 / 9051060808 / 9163311779**
**E-mail : Kolkata@allindiatpt.com/airtalogistics@gmail.com**
**Web-site : www.allindiatpt.com**
**(H.O- 28, Black Burn Lane, Kolkata-700 012)**
**Behala : 363, Diamond Harbour Road, 14 No. Bus Stand,**
**M : 8981006500**

**TIME GURANTEED DELIVERY TRANSPORTERS FOR ALL OVER INDIA MARINE TYPE ISO CONTAINER TRUCKS AVAILABLE.**
**SPECIALIST IN ODC CARGOES BY HEAVYDUTY TRUCKS & TRAILERS.**
**SPECIALISTS IN PACKING OF HOUSEHOLD GOODS & TRANSPORTATION BANK APPROVED (IBA)**

**BRANCHES & ASSOCIATES ALLOVER INDIA**

*With Best Compliments From -*

# Willowood Chemicals Limited

**An ISO 9001 : 2008 Certified Company**

*Alloy Group*

**UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.**

**AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.**

**RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.**

**Aluminium & Hardware People**

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

AN ISO 9002 COMPANY
HINDAL ALUMINIUM LIMITED

NALCO
Aluminium Sheet Coil

ALOM
Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Phone : 4050 3400

**E-mail :** info@alloyindia.com **Website :** www.alloyindia.com



# বাঙ্গালির পুতুল যেন এক মাঠ সরলতা

ড: রাজলক্ষ্মী বসু

রবি ঠাকুরের 'নতুন পুতুল' আরও একবার পড়াই যায়। কিষণলাল, যিনি, রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুল গড়লেন, তিনি ছিলেন মেলায় আসা নতুন কারিগর। কিছু রং দিত, কিছু দিত না। সেই পুতুল কিছু গড়ত, কিছু গড়ত না। দেখে মনে হতো পুতুল যেন কোনোকালেই ফুরাবে না। কিষণলাল নতুন সময়ের দাবি মেনে পুতুল গড়ল, অনেক বাহবা জুটল। কিন্তু প্রবীণের দল সেটাকে শিল্প অসম্মান বলে মনে করলেন। তাঁদের পছন্দ হলো না সেসব পুতুল। রাজকন্যারা বুড়ো পুতুলশিল্পীকে ছেড়ে কিষণলালের পুতুলে মেতে উঠল। বুড়োর মন ভাঙল, হতাশা এল। তিনি চলে গেলেন মেয়ের বাড়ি। নাতনির সঙ্গে দাদুর তখন কথা কাটাকাটি। বিষয় সেই কিষণলাল। নাতনি চায় দাদু আবারও পুতুল গড়ুক। কিন্তু দাদুর আত্মবিশ্বাস আর নেই। অবশেষে দাদু আবারও পুতুল গড়তে মন দিলেন। অর্থাৎ এই গল্প থেকে স্পষ্ট হয় পুতুল শুধুমাত্র খেলা নয়। তা শিল্প, সৃষ্টি, সৃজনশীলতা, বোধ, দরদ, কালের চাহিদা, তা একঝুড়ি সারল্য আবার এক আকাশ সাফল্যও। কিষণলালের মতো নতুন শিল্পী এলেই যে পুরনো দাদু পুতুল গড়বেন না, তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং কচিকাঁচার চাহিদার জোরেই কিষণলাল ও দাদু দুইই থাকে। পুতুলে পুতুলে খেলাই হয় যে কেবল। হয় ঘর সাজানো। কখনও লৌকিক আচার পূজা। হয় ভালবাসার বিনিময়। পুতুলে পুতুলে কখনওই ঝগড়া হয় না, খুনসুটি হয় না। তাই পুতুল শুধুমাত্র সৃষ্টিই নয়, আমাদের অনেক অনাসৃষ্টির উপশম করতে পারে পুতুল।

পুতুল কি আর নেহাতই হাতের খেলনা! পুতুল আসলে সংস্কৃতির সূচক। কৃষ্টির চিহ্ন। শিশু ভোলানাথের 'পুতুল' ছড়ায় দেখি রথের পাঁচ পয়সার পুতুলের জন্য শিশু মনের সে কী টান। রঙিন পুতুলে শিশুর এমন মন পড়ে যে, গুরুমশাই রেগে আগুন! পুতুল গেল ভেঙে। আসলে যেটা ভাঙে তাতো মন। পুতুলের মতো হেলাফেলা করছে আমরা কথার কথা বলি ঠিকই। কিন্তু পুতুলতো আমরা আগলে রাখি। বাঙ্গালি মেয়েদের পুতুল যত্ন, পুতুল সংরক্ষণ, পুতুলের সংস্কৃতি যদি দেখি—সে তো এক মহাসমুদ্র। সে কোনো খেলনা নয় তখন। সে একখানা আস্ত দেশ, বোধ, রুচি, মাটির দলিল। যেখানে যেমন মাটি, তার উপর নির্ভর করে তেমনই পুতুল। যেন মানুষের মরফোলজি! কৃষ্ণনগরের পুতুল আর মেদিনীপুরের পুতুল এক হবে না। যেমন মানুষের গাত্রবর্ণ ভিন্ন, তেমনই মাটির জন্য পুতুলের আকৃতিও ভিন্ন। রাজ্যজুড়ে এই বৈচিত্র্য যেন এক বিরাট পুতুল মেলা। আজ সেই পুতুলহাটে হাঁটব। নেড়েচেড়ে দেখব পুতুল ডালি। তাদের নাম পরিচয় বয়স জানব।

ঘোড়সওয়ারি পুতুল, পুলিশ পুতুল, বাবু পুতুল, ছাঁচের পুতুল, দুর্গা-কালী পুতুল, হিম পুতুল, যো পুতুল, পাটের পুতুল, রানি পুতুল,

গালার পুতুল, শিব- দুর্গা কাঠ পুতুল, রেল পুতুল, মালিক গাজির ঘোড়া, দীপাবলী পুতুল আরও কত কী। সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন, সমাজ যত উর্বর পুতুল তত বৈচিত্র্য ধরে। বঙ্গের পুতুল বৈচিত্র্য বিশ্বের কোনোদেশে, কোনো রাজ্যে নেই।

রবিঠাকুর যোগেই নিবন্ধের সূচনা। এই ঠাকুরবাড়ির পুতুল বিবর্তনে কম অবদান নেই। কলকাতার ঘোড়সওয়ারি পুতুল আসতই না, যদি ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা অন্দরমহল ছেড়ে সেদিন ময়দানে জুতো পরে, মাথায় টুপি লাগিয়ে ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে না যেতেন।

সেদিনতো বাঙ্গালি তথা সারা দেশের অন্দরমহলে ঝড় উঠল। করে কী মেয়েরা! সেই রেনেসাঁর ঝড় লাগল কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায়। কলকাতার ঘোড়ায় চড়া মেয়েদের পুতুল তৈরি হলো। যেন রুচিবোধের স্বাধীনতার এক অসম্ভব বিবর্তন দলিল। নারী মুক্তির ইঙ্গিত হয়ে রইল ঘোড়াসওয়ারি পুতুল। পুতুল স্বীকৃতি দিল বাইরের আলো, খোলা আকাশ, ডানা মেলা মেয়েদের নবজাগরণের জন্য বড্ড দরকার। পুতুল সেদিন খেলনা নয়, হলো মুক্তির প্রতীক। আজিমগঞ্জ কাটোয়ার দিকে গেলে কাঁঠারিয়াতে এখনও খোঁজ মেলে পুলিশ পুতুলের। যাদের মাথায় লালটুপি। এরাও ঘোড়ার পিঠে টগবগ করে চলে। ঠগি কমিশনের ফাইলে লেখা আছে ইংরেজ আমলের চতুর দারোগাদের কীর্তি। কর্নওয়ালিস নতুন পুলিশ ব্যবস্থা শুরু করলে জমিদার পৃষ্ঠপোষক ঠগিদের বেগ পেতে হয়। এই পুলিশ পুতুল সেই ঠগিদের ঠেকানোর ইতিহাস মনে করায়।

মজিলপুরের বাবুপুতুলেরও এক নিবিড় ইতিহাস আজকেও জেগে রয়েছে। যশোরের দত্ত জমিদারেরা মজিলপুরে এসে বসবাস শুরু করেন প্রায় দুই শতাব্দী আগে। তাঁদের এক পেয়াদা ছিলেন, নাম কালীচরণ। তাঁর আরও একটা গুণ ছিল পুতুল বানানো। তিনিই বানাতে শুরু করলেন মাটির টেপা পুতুল। রংবেরঙের তাদের জামা, চোখ মুখ হাসি। মজিলপুরে এখনও এক খোল, দু-খোলের পুতুল পাওয়া যায়। কলসি কাঁধে মেয়ে, বেনেবউ, পৌরাণিক দেবদেবী। যেন রূপকথার এক সিরিজ। আবার জয়নগরের ছাঁচের পুতুল যেন এইমাত্র কথা বলে উঠবে। এমন নিটোল তার গড়ন। হাতে টেপা পুতুলের থেকে এ বেশ কিছুটা অন্যরকম। এই পুতুলের ভিতরটা ফাঁপা। পুতুল পুড়িয়ে তারপর রং করা, তারপর গর্জন তেল মাখানো। বিষ্ণুপুরের হিঙ্গুল পুতুল সেও এক ঐতিহ্য। ষষ্ঠী পুতুল, হিঙ্গুল পুতুল কাছাকাছি হলেও। ষষ্ঠীর কাঁধে শিশু থাকে, যা হিঙ্গুলে থাকে না।

এই পুতুলের সব রংই গাছগাছালির থেকে তৈরি। পুতুল উজ্জ্বল করতে লাগানো হয় সিনাবার, এক লালচে খনিজ। বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় সিনাবার পাওয়া যায়। হিঙ্গুল পুতুলের আবার কখনও কখনও পরনে ফ্রক। মাথায় রিবন। উচ্চতা? মাত্র এক আঙুল। বাঁকুড়ার কার্তিক ফৌজদারের বংশধর শীতল। হিঙ্গুল পুতুল শীতল ফৌজদারের পরিবার বানাতো। তারপর বংশপরম্পরায় পরিবারের মেয়েরাই এই পুতুল বানিয়ে চলেছে। আগে মজিলপুরের বাবু পুতুলের কথা হলো। একই ভাবে আছে দুর্গা- কালী পুতুল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই পুতুল বানিয়ে যাচ্ছে মন্মথনাথের পরিবার। ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম, যে ক'ঘর পটুয়া তাঁরাতো পটে আঁকেনই। তার সঙ্গে আঙুল টিপে যো পুতুল গড়েন। বেলে মাটিকে হাতের তালুতে নিয়ে তাঁরা গড়ে তোলেন পাখি, কুকুর, বাচ্চা, মা ও সন্তান। যো পুতুল যাঁরা বানান অর্থাৎ পটশিল্পীরা মুসলমান। অথচ নিঃশব্দে তাঁরা হিন্দুত্বকেও বহন করছেন সাবলীল ভাবে।

উত্তরবঙ্গের দিকে পুতুল হাটে পাওয়া যায়। রায়গঞ্জের মালিক গাজির ঘোড়া। শরীরে তার নকশা আলতো দুলকি।

তার গ্রীবা ঋজু। যদিও এই ঘোড়ার ইতিহাস বাঙ্গালি সংস্কৃতির পরিপন্থী। বকতিয়ার খিলজির ঘোড়া বদাউন থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত দৌড়াত। ঘোড়ার বীরত্বে প্রশংসা করতেই হবে। কিন্তু বর্বর আগ্রাসী খিলজি বাঙ্গালির ইতিহাসে কালো অধ্যায়, বিকৃত সময়। কিন্তু ঘোড়ার শ্রম যখন শিল্পীর দক্ষতায় ফুটে ওঠে, তখন তা শুধুমাত্রই শিল্প। মুর্শিদাবাদের পাটের পুতুল খুব মিষ্টি জনপ্রিয়। এদের নাম আছে— খেদি নাকি, বুঁচি নাকি, চেপটি। পাটের সব জিনিস তৈরির পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে খেদি বুঁচিদের গড়া হয়। তাদের পাটের জামা রঙিন। পাট বঙ্গদেশের সোনার সুতো। তাই এই খেদি বুঁচিরাও ভারী সোনা মেয়ে। হাওড়ার রানি পুতুল আবার একেবারেই


# M.T. GROUP

Estd. 1954

**M.T. MECHANICAL WORKS**
**M.T. INTERNATIONAL**
**EN. EN. ENGG. WORKS**

D-75, Phase - V, Focal Point, Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128 Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com Visit us at : www.mtexports.com

***Manufacturers :***
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

অন্যরকম। এর গড়ন ষষ্ঠীপুতুলের মতো হলেও এরা আদৌ তা নয়। পোড়া মাটির পুতুলে লাগে অভ্র প্রলেপ। লাগে গাঢ় গোলাপি রং। খুব যে আকর্ষণীয় তা বলব না, তবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এও স্বতন্ত্র। বর্ধমানের নতুন গ্রামের সূত্রধর সম্প্রদায়ের মানুষরা দারুণ এক শিল্প সম্ভাবনাকে টিকিয়ে রেখেছেন।

তাঁরা কাঠের শিব-দুর্গা মূর্তি বানান। মূলত ত্রিকোণা কাঠের টুকরো সংগ্রহ করে এমন পুতুল গড়া চলে। রাজা রানি, রামায়ণের চরিত্র থেকে লক্ষ্মীর পেঁচা। শ্রীচৈতন্য ভক্তি আন্দোলনকালে এই পুতুল খুব প্রচার পেল। কখনও চণ্ডীমঙ্গল তো কখনও দুর্গার আদুরে মূর্তি। যেন বাঙ্গালির চিরকালের এক সাংস্কৃতিক রুচি রং তুলিকে হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে রেখেছে। পূর্ব মেদিনীপুরের গালার পুতুল এই অঞ্চলের সিগনেচারি স্টাইল।

অত্যন্ত যত্ন পরিশ্রম মনযোগের ফসল এই পুতুল। উজ্জ্বল তাদের রং। আরও আশ্চর্য, পুতুলের মাটি সংগ্রহ হয় উই ঢিপির থেকে। সেই মাটি চারদিন জলে ভেজানো থাকে। মাটি গেঁজিয়ে উঠলে তার থেকে কাঁকড় পৃথক হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের মির্জাবাজারে দীপাবলীর সময় গেলে দেখা যাবে বাতি পুতুল, অসংখ্য প্রদীপ হাতে পুতুল। পুতুলটি দেখলে মনে হবে যেন এক নারী। তারা কেউ আবার ঘোড়ায় চড়ে। যেন ঠাকুর বাড়ির ঘোড়সওয়ারী পুতুলের মতো এরাও অমাবস্যা অন্ধকার দূর করতে এসেছে। যেন আবারও পুতুল প্রতিষ্ঠা করল যা অশুভ, যা অন্ধকার তা দূর হোক নারীর হাতেই। আমাদের জীবনশৈলী জীবন্ত হয় পুতুলের রূপে রঙে হাসিতে এবং অবশ্যই তার মাটিতে। লোকায়ত শিল্প থেকে আঞ্চলিক রীতিকে পাকাপাকি প্রকাশ করে পুতুল। প্রত্যেকটি আঞ্চলিক পুতুল পরিবেশবান্ধব। তারা অর্থনৈতিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার্থে ভূমিকা পালন করবে যদি তাদের যথাযথ বাণিজ্যিক প্রসার করা যায়। বাঁকুড়ার সান্দ্রার যে বোঙা হাতি, তা কি আর শুধুমাত্র পুতুল? তা সাঁওতাল দেবতা সিংবোঙাকে উৎসর্গ করার জন্য তৈরি। মুর্শিদাবাদের কাঁঠালিয়ার কুমোরেরা তৈরি করেন গ্রামের নকসীকাঁথা। জাঁতা পেশাইত মহিলা, গয়লানি, চুল বাঁধা মেয়ে আরো কত কী। এইসব পুতুলের দেহ তৈরি হয় চাকে। মুখ হয় ছাঁচে। হাত পা তৈরি হয় হাতে। উত্তর দিনাজপুরের কুনুরে যে মা ও ছেলে পুতুল গড়া হয়—তা কর্মরত নারীর চিত্র। কখনও পিঠে সন্তান, কখনও কোলে।

তাঁতিবেড়ে, উত্তর চব্বিশ পরগনার নজরনগরে চাকা লাগানো নৌকা, পাল্কি তৈরির চল আছে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বাস্তবধর্মী। ঘূর্ণির পুতুল তৈরি শুরু সেই কোন কালে রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হল বাস্তবমুখী পুতুল গড়ার রীতি।

আজকের সফ্‌ট টয়, বারবি ডলের বাজারে এইসব বাঙ্গালি সংস্কৃতির পুতুল তার বাণিজ্যিক দর অনেক হারিয়েছে। শিশুরা এইসব পুতুল চেনেই না। অথচ এই পুতুলগুলি পরিবেশবান্ধব, অর্থনৈতিক বাস্তুতন্ত্রেও অনেক বেশি দেশীয় স্থানীয় বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যদি তা যথাযথ দিশা পথ বাণিজ্য কৌশল পায়। সফট টেডি দেখতে অনেক সময়ই বেশি আকর্ষণীয় কিন্তু তা আদৌ শিশু স্বাস্থ্যবান্ধব নয়।

আমাদের বঙ্গের পুতুল শুধুমাত্র শিল্পে না, বাণিজ্য ঘরেও তারা একঘর হাসি হাসুক। তারা তা থৈ বলে নেচে উঠুক। পুতুল নাচেও তো ছন্দ কেটেছে। এ আমাদের বাঙ্গালিদের অযত্ন। ডিজে বাজিয়ে নিজেরা নাচি কিন্তু পুতুল নাচের কী হাল সে খোঁজ রাখি কই। বঙ্গের মেলা সংস্কৃতিতে পুতুল বিক্রির সঙ্গে পুতুলনাচ প্রদর্শনটাও ছিল এক রৈখিক অঙ্গ।

১৮৮৫ সালে নাট্যগোষ্ঠী জ্ঞানদা চক্রবর্তী পুতুলনাচ সংস্থা গঠন করেন। পৌরাণিক জনপ্রিয় পালা বারবার জীবন্ত হয়েছে পুতুল নাচে। পুতুল নাচের সঙ্গে এক নিবিড় ইতিহাস বাণিজ্য যোগ ছিল একটা সময়। গঙ্গারিডি সভ্যতায় যখন পুতুলনাচ হচ্ছে তখন গ্রিসের সঙ্গে ছিল বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সেই সময় বঙ্গের থেকে তামা, গুড়, গন্ধদ্রব্য, মাটির খেলনা, মশলা, রেশম রপ্তানি করত গ্রিসে। তখন থেকেই বঙ্গের পুতুলনাচ পৌঁছায় গ্রিসে। তা ছড়াল সারা ইউরোপে। ইউরোপে পুতুল নাচ অনেক উন্নত হলেও আমাদের পুতুল নাচ; পুতুল নাচেই আটকে গেল। এখানে পুতুল নাচে, সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানে দরকার পুতুল এবং নাটক পালা। কৃষ্ণনগরের গিরিশ আচার্য, তারু মিয়াঁ, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার রাজ হোসেন, কালু মিয়াঁ, এমন বহু শিল্পীর হাতে সুতোতে নেচে, ঘাড় নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, অভিব্যক্তি প্রাণময় করে তুলত পুতুল। ওরা আমাদের মত আচরণ করত পুতুল নাচিয়েদের দক্ষতায় গুণে। বঙ্গে সবথেকে বেশি প্রচলিত ছিল ডাং পুতুল। এছাড়াও ছিল কাপড়ের পুতুল, তারের পুতুল ও বেণী পুতুল। ছোটো যাত্রাপালার রূপান্তর পুতুল নাচ। নদীয়ার পুতুল নাচ যে কতটা ঐতিহ্যের তার প্রমাণ পাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-র 'কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়'-এ। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী জানা যায়, কুহক সম্প্রদায়ের জীবিকা ছিল পুতুলনাচ দেখানো। আমরা বাঙ্গালিরা বলি আহ্লাদি পুতুল। মূলত কৃষ্ণনগরে মাটির একধরনের পুতুল তৈরি হতো শুধুমাত্র পুতুল নাচের আগে শিশুদের ভোলানোর জন্য। রাধাবল্লভ জীউয়ের মেলাতেও এই আহ্লাদে পুতুল আসত। সেই পুতুল দেখার আনন্দে কিন্তু বুড়ো আর শিশুর ভেদ ছিল না। নদীয়ার বেণী পুতুলের বৈশিষ্ট্য, তাতে শুধুমাত্র মানুষরূপী পুতুলই নাচত এমন নয়, পশুপাখিরূপী পুতুলও নাচত। পুতুল নাচ—পুতুল, মানুষের সংলাপ, কাহিনি, পিছন থেকে হাতের টানে জীবন্ত করা মানুষরূপী পুতুলশৈলীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ সংযোগ সহাবস্থান। পুতুল নাচ কেবলমাত্রই নৈপুণ্য নয়, এ একদল আড়ালের সহযোগীদের সঙ্গে পুতুলের ভাব বিনিময়। পুতুলগুলো মানুষ হয়ে ওঠে। আর আমরা অজান্তেই পুতুল। পুতুল এবং পুতুলনাচ দুইই আমাদের ঐতিহ্য অহঙ্কার, আবার লুপ্তপ্রায়ও।

"আমার এই ছোট্ট ঝুড়ি, এতে রাম রাবণ আছে
দেখে যা নিজের চোখে হনুমান কেমন নাচে।
এ সুযোগ পাবেনা আর, বল ভাই কি দাম দেবে—
পুতুল নেবে গো পুতুল...।"

আমাদের পুতুল যতক্ষণ জীবন্ত ততক্ষণ সরল সরস সংস্কৃতিটাও নাচবে, চোখ পিটপিট করে ইতিহাস-দেশ-কালকে দেখাবে। এক ঝাঁপি পুতুল আসলে এক মাঠ সরলতা, অকৃত্রিমতা। □

# বাঙ্গলার গ্রামে একটি দিন

এষা দে





'মা, তাড়াতাড়ি করো। সাতটা বেজে গেছে। সাড়ে সাতটা টার্গেট। 'উফ, এই বয়সে অত তাড়া করতে পারি? ব্যাগ গোছাতেই তো কত সময় যায়। এত ওষুধটষুধ নিতে হয়।

'একটা চেঞ্জ নিয়েছো তো? বাই চান্স যদি কাপড় বদলাতে হয়। গত বছর মনে আছে 'নদীর কুলে' রেসর্টে বিকেলের চায়ে হাত ফস্কে পুরো তোমার শাড়িতে পড়ে গিয়েছিল? ভাগ্যিস সঙ্গে একসেট শাড়ি ব্লাউজ ছিল।

'এই জন্যেই বলি, তোদের ওই সব রেসর্ট ফেসর্টের প্রোগ্রামে আমাদের মতো বুড়িদের নিস না। এবারে তো আবার এত লম্বা জার্নি। সঙ্গে দুটো বড়ো বোতল জল নিতে হবে। কী? সব রেসর্টে বোতলের জল পাওয়া যায় ? আরে রাস্তায় তো লাগতে পারে। আমার আবার দু'ঘণ্টা পর পর বাথরুমে যাওয়ার কথা। তোদের হাইওয়ের পেট্রোল পাম্পের টয়লেট, মানে পাবলিক টয়লেটের যা ছিরি। সঙ্গে 'পি সেফ' নিতে হয়। কী যে বিরক্তিকর।

'ই কোলাইয়ে ক'বার ভুগলে মনে নেই? ডাক্তার মিত্র তো বলেই দিয়েছেন, জল খাবে আর জল ছাড়বে। হিহিহি।'
'ফাজলামি রাখ। 'কী যে বাংলা বল না তুমি।

'ফাজলামি আবার কী। এটা কি তোমার 'দ্যাশের বাষা' নাকি?

'তোরা তো কখনো দেখলি না, মায়ের দেশ, বাপের দেশ। মর্ম কী বুঝবি?' 'আর বুঝে কাজ নেই। খালি লোক আর লোক গিজগিজ করছে। তার ওপর ওইতো এতো টুকু একটা জায়গা। আমাদের একটা স্টেটের সমান। তোমাকে বলেছি? এবারে কোম্পানির অ্যানুয়েল কনফারেন্স হচ্ছে মুম্বাইতে, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া থেকে আমি এক মাত্র মেয়ে ডিলার।'

'বাপস কী ফান্ডা! ওনলি ওম্যান ডিলার বলে কথা। ফটো উঠবে। তোর ওই শর্মাজ বুটিকের শাড়ি নিতে ভুলিস না।'
খাওয়ার টেবিল থেকে ফোঁড়ন কাটে ছোটো ভাই তোতন। ধীরে সুস্থে ডিমের পোচটা কায়দা করে মুখে ঢোকাতে ঢোকাতে । দিদির উইক এন্ড প্রোগ্রামে সে আর তার স্ত্রী থাকে না। তাদের সব আলাদা প্রোগ্রাম। টুং টাং টুং টাং। টুং টাং টুং টাং।

'ওই যে রে তোর ঢঙের মোবাইল বাজছে। এমন হাইফাই পিয়ানো বাজনা রিং টোন নিয়েছিস যে নিজেই শুনতে পাস না। 'না কি তোর মতো তারস্বরে 'দিল দিওয়ানা' বাজবে? যা যা বেশি বাতেল্লা দিস না।

হ্যালো? অনিদি? বিনিদি এসে গেছে? কাল রাতেই এসে রয়েছে? ভালোই হলো। তোমরা রেডি? হ্যাঁ আমরা প্রায় রেডি, জাস্ট পাঁচটা মিনিট দাও। দরজার সামনে থেকো। আমি আর ভেতরে গাড়ি ঢোকাবো না।'

ডিসেম্বরের শুরু। এবারে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পরিষ্কার হালকা নীল আকাশ। খোলা জায়গায় বেড়াবার, দিনযাপনের পক্ষে আদর্শ আবহাওয়া। একটি টাটা সুমোতে ঠাসাঠাসি করে চলেছে ড্রাইভার বাদে, আটটি প্রাণী, মিলি ও তার মা প্রতিভা , তার পিসতুতো দুই দিদি বিনিতা অনিতা এবং তাদের মা নিভাননী অর্থাৎ মিলির বড়ো পিসি ও তাঁর সারাক্ষণের আয়া, মায়া, যে এত ঠেসে গেছে যে প্রায় তাঁর কোলে বসা, এবং মিলির খুড়তুতো বোন রুমকি ও তার মা অপর্ণা।

পুরো প্রমীলা পার্টি। মায়েদের পরনে সব ছাপা সিল্কের শাড়ি, কার্ডিগান, তার ওপর শাল জড়ানো, কান মাথা ঢেকে স্কার্ফ, একেবারে শীতের মোকাবিলায় প্রস্তুত। মেয়েদের আধুনিক পোশাক, সেই প্রায় পা পর্যন্ত ম্যাক্সি ড্রেস, তলায় লেগিংস, ম্যাচিং কার্ডিগান বা লেটেস্ট ফ্যাশানের কোট। এরা সবাই স্বাধীন জেনানা, মহিলা শিল্পোদ্যোগী, ডিজিট্যাল ক্রিয়েটর না কী সব করে বুঝতেই পারা যায় না, একজন আধা সরকারি কনসার্নে আধিকারিক ছিল, অন্যজন অবশ্য সেকেলে মার্কা স্কুল টিচার, (এখানে মাথায় চাঁটি )। প্রত্যেকে দরকারে অদরকারে একা একা হিল্লি দিল্লি করে বেরায়। তাছাড়া পুরুষমানুষ হাতের কাছে কই। পিসতুতো বড় দাদা সস্ত্রীক সর্বদা শ্বশুরবাড়িতে ছুটির দিন কাটায়, তার বউ একমাত্র মেয়ে কিনা। মিলির বর ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে।

বিনিতা ওরফে বিনি, সেই আদর্শ বাঙ্গালি নারী, একাধারে আধুনিক ও রক্ষণশীল, স্বামী ও দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে বছর বিশেক এলআইসিতে চাকরি করে দিব্যি সংসার ও জীবিকা এক সঙ্গে চালাচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক গুরুর উদয় হলো এবং তাঁকে নিয়ে এমন মেতে গেল যে চাকরি থেকে ভিআরএস নিয়ে বসল, সংসার থেকেও ছুটি। অতঃপর তার অবহেলিত বরের অল্পবয়সি একটি রিসেপশানিস্টের সঙ্গে জমে গিয়ে পরিবার ত্যাগ। ছেলে-মেয়েরা মায়ের আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্মে বীতশ্রদ্ধ। তারা দাঁড়িয়ে যাবার মতো অবস্থায় আসতেই যে যার রাস্তা করে নিয়েছে। বিনির ভ্রূক্ষেপ নেই। একা ফ্ল্যাটে গুরুদেবের বিরাট ছবি টানিয়ে দিনরাত নাম জপ, ধ্যানে ব্যস্ত। নয়তো গুরুজির আশ্রমে অগণিত ভক্তের সঙ্গে বসে তাঁর বাণী শ্রবণ। মুশকিল হলো হাঁটু কনকন করলে, পড়ে গিয়ে হাত ভাঙলে, ভাইরাল অ্যাটাক করলে গুরুদেব দেখেন না। একলা ফ্ল্যাটে তখন আপন লোক চাই। মায়ের বয়স আশি পেরিয়ে নব্বই ছুঁই ছুঁই, তার ওপর কন্যার গুরুভক্তি ও ফলে তার সংসারের এই হালে একেবারেই সন্তুষ্ট নন। দেখা হলেই কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণ করেন। তিনি বরং জামাইয়ের পক্ষে। ছোট বোন অনি তার অগতির গতি। হ্যাঁ, সে দায়ে বেদায়ে তাকে দেখাশুনা করে। অন কন্ডিশান যে তার কাছে গুরুদেব বা জপতপ ধ্যান এসব কথা উচ্চারণ করতে পারবে না। অনি নিজে একেবারে মুক্ত নারী। বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্সি, লোকচক্ষে একা। কানা ঘুসো শোনা যায় তার বাঙালির চেয়ে বেশি বাঙালি অর্থাৎ বাঙ্গালিতর এক উত্তর ভারতীয়,স্থায়ী বয়ফ্রেন্ড আছে, তার সঙ্গে বিদেশটিদেশ ঘোরে, সে আবার বিবাহিত কিনা, কিন্তু রহিস আদমি। তার যোগাযোগেই বেশ ক'বছর প্রোমটার ডেকোরেটারদের সঙ্গে লাইন করে ঘর সাজানোর সৌখিন জিনিসেরপত্রের ব্যবসা চালিয়েছিল। কিছু টাকা পয়সা করে নিয়ে এখন নিজেই অন লাইনে কী যেন করে। বিধবা মায়ের দায়দায়িত্ব

তার। আজকাল বাঙালি সমাজে বাপের বাড়িতে সাবালিকা মেয়েরা স্থায়ী হলে সেটাই দস্তুর। বাকি রুমকি একমাত্র কলকাতায় স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করে। একটি নামী স্কুলের শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যা আমেরিকায়, রিসার্চ করছে । স্বামী সুজয় আলিপুর আদালতে বেশ ভালো পশার ওয়ালা উকিল। এত ব্যস্ত যে উইক এন্ড আউটিং তার চলে না, তার বিশ্রাম মানে বাড়িতে ভালো খাওয়াদাওয়া করে ঘুম। অনেক সাধাসাধিতেও আজ সঙ্গে আসতে রাজি করানো যায়নি। রুমকির মা অপর্ণা মেয়ের কাছেই থাকেন, ছেলে রণজয়ের চাকরি ও সংসার দিল্লিতে যেখানকার গরম আর ঠাণ্ডা কোনোটাই তাঁর সহ্য হয় না। সব পরিবারেই আধুনিক ছেলে-মেয়ের শাসনে মায়েদের বৈধব্যের সাদা শাড়ি নিরামিষ খাওয়া,একাদশী-অম্বুবাচীর মতো কৃচ্ছ্র সাধন ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়েছে। তারাই অভিভাবক। 'আশির ওপরে বয়স বলে উপোস করে থান পরে ঠাকুরঘরে বসে হরিনাম জপ করবে, সেটি হচ্ছে না। বাবা গেছেন, আমরা তো আছি। যেমনটা তোমাদের আমরা দেখতে অভ্যস্ত তেমনই পোশাকআশাক পরবে, আমাদের সঙ্গে সমান তালে চলবে।' তাদের সাফ কথা। নিভাননীর বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও দিদিকে দিব্যি সঙ্গে নিয়ে এসেছে অনি। বিনি পুরো গ্রুপের মধ্যে লম্বায় চওড়ায় মায়ের মতো, অর্থাৎ সাধারণ বাঙ্গালি পুরুষকে টেক্কা দেয়। মায়া আয়া বটে, কিন্তু এক্কেবারে রোগা প্যাঁকাটি,ছোটখাটো। দরকার মতো বিশাল কায়া নিভাননীকে হুইল চেয়ারে ঠেলা, অন্য দুজন সিনিয়র সিটিজেনকে যারা কেউই একেবারে তন্বী নন, বাথরুমে হেল্প করা ইত্যাদিতে বিনি কাজে লাগবে। স্বার্থ ছাড়া বাস্তবে মেয়েরা আজকাল কিচ্ছু করে না। তারা আর শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্র নয়।

রবিবার, রাস্তা ফাঁকা। শহর ছাড়িয়ে, এমনকী হুগলি ব্রিজ ছাড়িয়ে হাইওয়েতে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না। দুদিকে আর ঘর বাড়ি নেই। গাড়ি চলছে হু হু করে। দু'ধারে ফাঁকা মাঠ দেখতে দেখতে নিভাননী বলেন, 'বাব্বা, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কলকাতার ওই ঘিঞ্জি, সরু গলি আর গায়ে গায়ে সেঁটে থাকা বাড়ির মধ্যে যেন দম আটকে আসে।'

প্রতিভা বলে ওঠে, 'যা বলেছ দিদি। এ দেশের লোকে বাড়ি বানায় দেখ, কোন দিকবিদিক জ্ঞান নেই। আরে পুব দক্ষিণ একটু খোলা রাখ। সেসব এরা জানেই না।'

সেকালের বিএ পড়া অপর্ণা যোগ করেন, 'ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ কীট। সাধে কী আর কবি বলেছেন।'

'এই রে তোমার আবার রবিঠাকুর এসে গেল।' শিক্ষিকা মেয়ে রুমকির মৃদু স্বরে হালকা অনুযোগ। মিলি তার সঙ্গে যোগ দেয়, ' বাব্বা, সারা জীবন তো তোমরা ওই ঘিঞ্জি গলিতেই কাটালে, এখনো অভ্যেস হলো না। কই আমাদের তো কিচ্ছু খারাপ টারাপ লাগে না।

'তোদের আর কেন কিছু লাগবে। তোদের তো এই শহরেই জন্মকর্ম। আমাদের তো তা নয়। হাতপা ছড়িয়ে আমরা মানুষ হয়েছি। কত বড় জায়গা জুড়ে সব বাড়ি ঘর উঠোন। হাঁটাচলা করেও কী সুখ। জায়গার কোনো অভাব ছিল না। চারিদিকে খোলামেলা, গাছপালা, পুকুরডোবা মাঠঘাট খালবিল, আর নদীর কথা তো বাদই দিলাম। আমরা তো সব ও দেশে জন্মেছি রে।

অনি মিলি রুমকির কোরাস, 'দ্যাশের কেত্তন শুনুম না। শুনুম না।'

এবারে বিনির মঞ্চে প্রবেশ। গুরুজনদের রক্ষায় এগিয়ে আসে, 'ওদের বাদ দিন তো। যা হয়েছে না এরা! মাথায় শুধু আজকের দিনটা, কাজ আর মজা, ব্যস ওই জীবন। পুরো বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনারা আমাকে বলুন। আমার খুব ভালো লাগে আগেকার দিনের কথা, ওপার বাংলার গল্প।'

'এখানে নয়, এখানে নয়।' আবার কোরাস। ড্রাইভার ছোটু অনেক দিন চাকরি করছে। সর্বদা তার মহিলা শিল্পোদ্যোগী মালকিনকে নিয়ে তার কাজের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যায়। এবার সে বলে ওঠে,' সামনে আজাদ হিন্দ ঢাবা আতা হ্যাঁয়, বিরেকফাস্ট খাবেন না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গাড়ি লাগা,' মিলির নির্দেশ।

'শোন, জলখাবারে বেশি কিছু খেও না, তাহলে দুপুরে খেতে পারবে না।

কত যেন রে মাথা পিছু নিচ্ছে?' নিভাননী জানতে চান।

'এমন কিছু না, মাথাপিছু হাজার টাকা।'

'শুনলি এদের কথা। মানে আমাদের ন' জনের জন্য ন'হাজার! এ টাকায় আমাদের সকলের বাড়িতে পুরো সপ্তাহের কাঁচা বাজার হয়ে যায়, জানিস?' নিভাননীর অভিযোগ।

'উফ মা, তোমাকে না কত বুঝিয়েছি কমার্সিয়েল হিসেব বাড়ির খরচের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

আরে লাভ না করলে বিজনেস চলবে কী করে ? ' অনির সওয়াল।

'তার ওপর একটা ঘরের ভাড়া, পুরো দিনরাতের। শুধু বাথরুমের জন্য। কোনো মানে হয়।' প্রতিভা যোগ করেন।

'মা, তোমরা হিসেব বন্ধ করতো।' মিলি ধমক লাগায়।

অপর্ণা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন এবার মুখ খোলেন।

'আমাদের বয়সে দুপুরে খাওয়ার পর একটু না গড়িয়ে নিলে চলে না। ওদের মতো আমরা তো সারাদিন অফিস কাছারি করতে অভ্যস্ত নই। লবিটবিতে ওই পাঁচ জন বাইরের লোকের ব্যবহার করা বাথরুমে যেতে বাপু কেমন গা ঘিন ঘিন করে।

'এইতো হক কথা। সাধে কী আর ছোট মামিকে আমরা মিষ্টি মামি বলি।' অনি সুযোগ পেয়ে একজন গুরুজনকে দলে টানে।

'আর আমি বুঝি তোদের তিতা মামি?' প্রতিভা অনুযোগ করেন।

'ওমা, তুমি যে আমাদের টকঝালমিষ্টি মামি, একেবারে মুখরোচকের চানাচুর। বাঙ্গালির সফল উদ্যোগ, মাড়োয়ারির সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে।' হাহাহা হিহিহি।

'দিদি ঢাবা আ গিয়া—'

'চল চল, ভিতরে চল, গাড়ি লাগিয়ে দে,'

মিলি বলতে বলতে ছোটু গাড়ি কম্পাউন্ডের ভিতরে ঢুকিয়ে পার্ক করে। হাইওয়ের ওপর অবস্থান, দুরপাল্লার যাত্রীদের নিয়মিত থামা, শারীরিক প্রয়োজন ও লঘু/গুরু ভোজনের উপযুক্ত চমৎকার স্থান। দিব্যি আধুনিক এবং পরিষ্কার তকতকে ওয়াশরুমে সকলে পালা করে ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং রুমে ঢোকে। বিরাট রেস্তরাঁ, এই সকালেই বেশ খদ্দের জুটে গেছে। বসেই মেনু নিয়ে বিতর্ক, বেড়াতে এসে বাড়ির নিত্য নৈমিত্তিক টোস্ট ডিম চলবে না, লুচি আলু ছেঁচকি চাই।

'আরে এখানে লুচি নেই, পুরি সবজি, তাও আবার আটার পুরি। প্রচণ্ড হেভি, আমাদের বাঙ্গালি পেটে বোমার মতো পড়বে,' 'দুপুরের লাঞ্চ-এর বারোটা'। ইত্যাদি।

ওয়েটার কলম প্যাড হাতে দাঁড়িয়ে। 'আচ্ছা ইধার হালকা জল খাবার কিছু মিলেগা? নিভাননীর রাজ ভাষার ওপর হামলায় নির্বিকার ওয়েটার খাঁটি বাংলায় জবাব দিল, 'পেপার ধোসা নিন, হালকা হবে।'

'বেশ তাই দিন। আমরা ন'জন— 'আমরা নর্থ ইন্ডিয়ান ঢাবায় সেদো পেপার ধোসা খাবো না, না না।'

'আলু পরোটা নিন, এখানকার ফেমাস ডিশ, সঙ্গে দই আর ফ্রেশ পুদিনার চাটনি।' খাঁটি বঙ্গীয় ওয়েটারের সাজেশান গৃহীত।

তিন জন সিনিয়রের পেপার ধোসা, বাকিদের আলু পরোটা অর্ডার দিতে দিতে ছোটু অনুযোগের স্বরে বলে, 'দিদি হামার জন্যে পুরি সবজি আচ্ছা হতো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ওর অল্প বয়স, খাক পুরি সবজি ওর দেশের খাবার খাক। আচ্ছা, মায়া, তুমিও কি পুরি;'

'না না মাসিমা,আমি দিদিদের সঙ্গে আলু পরোটাই খাবো।'

তিন রকম অর্ডার হলেও বেশ তাড়াতাড়িই এসে গেল। আসলে খদ্দেররা সব তো যাত্রী, কেউ এখানে বিশ্রাম করতে আসে না। বেশি সময় লাগালে চলবে কেন। খাওয়া শেষে মৌরি মিছরি চিবোতে চিবোতে সমবেত রায়, পেপার দোসা সাউথ ইন্ডিয়ান দোকানের মতো না হলেও মোটামুটি চলনসই, আলু পরোটা দারুণ, পুরি-সবজিও ঠিক হ্যাঁয়।

আবার গাড়িতে। স্থান পরিবর্তন করে বসা হলো। তবে ড্রাইভারের পাশে মিলি। এই সিটে তার মৌরসিপাট্টা, কারণ গাড়িটা তার নিজস্ব কোম্পানির, তাছাড়া তার মোবাইলে জিপিএস ধরেই যাওয়া হচ্ছে, যদিও অনিতাও জিপিএস দেখছে, রিসর্টের সন্ধানটা তো তার মারফতে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের মানচিত্র তার নখদর্পণে। কত জায়গায় যায়, ভিডিও তোলে, পোস্ট করে উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মে। রীতিমতো পেশাদার। তাতে রেসর্টগুলো থেকে নিশ্চয় কিছু উপার্জন হয়। অনিতা ঠিক জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ নয়।

প্রবীণারা পেটে কিছু পড়তেই ঝিমিয়ে গেছেন। খানিক ক্ষণ সবাই চুপচাপ। রাস্তার দু'দিকে কখনো ফাঁকা মাঠ, কখনো ছোট বসতি অর্থাৎ সেই পরপর ঝুপড়ি দোকানের সারি, ছড়ানো ছিটানো আবর্জনা। যেমন তেমন করে তৈরি ছিরিছাঁদ হীন বাড়ি ঘর। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ঘেয়ে হয়ে যায়। ভ্রমণ বিশারদ অনিতার খেদ, 'কবে যে আমরা এই ঝুপড়ি দোকান আর যত্রতত্র নোংরা থেকে নিষ্কৃতি পাব। ফরেনে গেলে নিজেদের দেশের রাস্তাঘাট, এই ঝুপড়ি আর নোংরার কথা ভাবলে লজ্জা হয়। ফিরতে ইচ্ছে করে না। সাধে কী আর আজকাল ছেলে-মেয়েরা সব বিদেশে যাবার জন্য প্রাণপাত করছে। এই দৃশ্য কেউ দেখতে চায় না,'মিলি যোগ করে।

'আর একবার ওদেশে যেতে পারলে ফেরত আসার নাম নেই।' সগর্বে খেদ প্রকাশ করে রুমকি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখনও ফাঁকা মাঠ, ক্বচিৎ বড় কিছু গাছ। সেও খানিক বাদে একঘেয়ে। নিভাননী ঝিমোচ্ছেন। প্রতিভা এক সময় দুঃখ করেন, 'আশ্চর্য, গ্রামট্রাম নেই, কলকাতার বাইরে এসেছি, মাঠ ভরতি ধান দেখব, সবুজের কোলে বাঙলার গ্রাম দেখব। না, সব খালি।'

'আরে দিদি, হাইওয়ের ধারে ওসব থাকে না।' অপর্ণার মন্তব্য।

'একটু ভিতরে ঢুকলে সব পাবে, মাইমা, কোনো চিন্তা নেই।' অনির আশ্বাস দান।

'ছট্টু, আস্তে চালা, সামনে মোড় থেকে আমাদের হাইওয়ে ছেড়ে বাঁ দিকে ছোট রাস্তায় ঢুকতে হবে।' মিলির নির্দেশ। বলতে বলতে এসে গেল টার্নিং। 'এই রাস্তাটা দিয়ে ৪০ কিলোমিটার গিয়ে আর একটা রাইট টার্ন, সেখান থেকে ১৫ কিলোমিটার।'

এবারে সরু রাস্তা, দু'দিকে একটু ঢালু। কিছুটা গিয়ে ইতস্তত

*With Best Compliments From :*



**Banwarilal Sharma**

গাছ পালা, ঝোপঝাড়। ভিতরে দূরে একতলা বাড়িটাড়ি দেখা যায়, সব পাকা বাড়ি নয়। বড়ো রাস্তা থেকে সেসব লোকালয়ের দিকে আরও সরু সরু রাস্তা চলে গেছে। সেখান দিয়ে লোক নিয়ে ট্রেকার আসছে। এমন অবস্থায় স্পিড নেওয়া যায় না। হাইওয়ের মতো ধেয়ে আসা বিশাল বিশাল দৈত্যের মতো দশ-বারোটা চাকাওয়ালা ট্রাকের দৌরাত্ম্য নেই বটে কিন্তু মাঝে মধ্যে প্যাসেঞ্জারভরতি বাস আসা যাওয়া করছে। সরু রাস্তায় তাদের জায়গা দিতে কসরত করতে হচ্ছে ছোটুকে।

'আর কতক্ষণ?' নিভাননী প্রশ্ন করেন।

'মোটে ২০ কিলোমিটার এসেছি। বললাম না, ৪০ কিলোমিটার যেতে হবে। 'সে কী রে এতক্ষণে মোটে ২০।'

'দেখছই তো এটা হাই ওয়ে নয়, এখানে কী করে স্পিড নেবে। কেন তোমরা তো দ্যাশের মতো গাছপালা ঝোপ ঝাড় খানাডোবা চাইছিলে, এই তো সব আছে। এখন ঘ্যান ঘ্যান করছ যে বড়!' অনির ধমক খেয়ে গুরুজনেরা চুপ। 'আসলে তোমাদের এতক্ষণ ধরে ছোট্ট স্পেসে ঘেঁষাঘেসি করে বসে থাকার তো অভ্যেস নেই। তাই একটু অধৈর্য। একটা কাজ কর, মনটা অন্যদিকে দাও। সুন্দর কিছু একটা স্মৃতি মনে কর। দেখবে আর খারাপ লাগছে না। গুরুদেব বলেন জগৎ আমাদের মনের ভিতরে, বাইরে যা দেখি সেটা মায়া। 'বিনির মনস্তাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক বক্তৃতা।

অনির গম্ভীর কণ্ঠে ওয়ার্নিং, 'গাড়িতেই গুরুকে এনে ফেললি।' অপর্ণা তাড়াতাড়ি মাঝখানে পড়েন,' বিনি তো পরামর্শটা মন্দ দেয় নি। বড়দি মনে আছে আমরা সেই সেবার বটানিক্যালে পিকনিকে গিয়েছিলাম? তখন ওঁরা সবাই ছিলেন। কী বিরাট দল হয়েছিল আমাদের। মনে আছে?'

'তখন মিলির সবে বারো ক্লাসের টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে— 'আর রুমকি তখন দশ ক্লাসে, রণ ইঞ্জিনিয়ারিঙে সেকেন্ড ইয়ার,' প্রতিভার সঙ্গে অপর্ণাও সেদিনের কথায় মেতে যান।

ওদিকে মিলি সামনের সিটে এক মনে জিপিএস দেখে যাচ্ছে। 'ছোটু, সামনে আর একটা টার্ন, এবারে বাঁয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখিস একটু নীচু আছে রাস্তাটা।' কিছুটা যেতেই গাড়ি নাচতে থাকে।

'বিল্কুল রদ্দি রাস্তা', ছোটুর অভিযোগ।

'আসলে আমরা তো একেবারে ইন্টিরিয়রে যাচ্ছি, খাঁটি পল্লীগ্রামে। এখানে রাস্তাঘাট তেমন নেই, ডেভেলপমেন্ট তো নামকা ওয়াস্তে। 'রুমকির শিক্ষিকাসুলভ ব্যাখ্যা।

' উফ্ বাবা রে, কী ঝাঁকুনি। 'নিভাননী কাতরে ওঠেন।

'দেখলে তো, এই জন্যেই জোর করে কোমরের বেল্টটা পরিয়ে দিয়েছিলাম। তখন পরতে চাইছিলেই না। না পরলে তোমার কোমর ব্যথার কী হাল হতো বলতো।'

অনি অভিভাবকত্ব ফলায়। রুমকিও মাকে ঘাড়ে কলার পরিয়ে এনেছে,স্পন্ডিলাইসিস আছে কিনা। মিলি মায়ের নিক্যাপ দুটো নিয়ে এসেছে, সে রকম হাঁটা হাঁটি করতে হলে পরিয়ে দেবে। মোটে ১৫ কিলোমিটার পথ কিন্তু রাস্তার গুণে যেন ৫০ মনে হচ্ছে। এখন দুদিকে বেশ ঘন জঙ্গলের মতো গাছপালা।

'একী রে, এযে পুরো বনবাসে যাচ্ছি,' নিভাননীর স্বর আরও কাতর।

'কেন, দ্যাশে তো এমনই সব ছিল, ছিল না? সেখানে সব পিচঢালা রাস্তা ছিল বললে তো চলবে না। তাছাড়া শুধু রাস্তা দিয়ে আর ক'টা জায়গায় বা যেতে, সেখানে তো একটা দুটো নদী না পেরিয়ে, নৌকোতে না চেপে, কেউ কোথাও যেতেই পারত না। বাব্বা কী ডিফিকাল্ট লাইফ। ভাবাই যায় না।' অনি বড্ড ঠোঁটকাটা।

'অভ্যাস, সব অভ্যাস', মৃদু কণ্ঠে বলেন প্রতিভা।' 'আমার কোন দিন অভ্যাস হত না। জলে আমার যা ভয়।' শান্ত রুমকি পর্যন্ত মন্তব্য করে।

গাড়ি চলেছে তো চলেইছে। অনি মৃদু স্বরে প্রায় গুন গুন করে গান ধরে, 'শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে পথের?'

'হি হি হি। অনিদি, তুমি পারোও বটে।' 'আরে এটা তো সেই কবে কার গান, আমাদের সময়কার,তুই জানলি কী করে?' প্রতিভা বিস্মিত। 'জেঠিমা, আজকাল এ সব গান ক্লাসিক হয়ে গেছে, মোবাইল ছোঁয়ালেই শুনতে পাওয়া যায়।' রুমকির জ্ঞানদান।



অবশেষে কোনো এক সময় পথের শেষ হলো। সামনে একটা সরু মেঠো রাস্তা, গাড়ি যায় না। দূরে গোরুবাছুর আটকাবার মতো কাঠের ফটক। দু'দিকে মস্ত উঁচু জেলখানা টাইপের পাঁচিল চলে গেছে। দরজা খুলে নামতে নামতে মিলি বলে,' অবশেষে পৌঁছানো গেল। এসো পিসিমণি নামো।

'এতক্ষণ বসে থেকে পা একেবারে পাথর। মায়া, ধরো।'

'হুইল চেয়ার লাগবে নাকি? না? পারবেন তো? বেশ, মাসিমা নামুন।'

একে একে সবাই নামে। সামনে কোনো ঝকঝকে নির্মাণ নেই, নেই সহাস্য রিসেপশান। ফাঁকা মাঠের মধ্যে বুনো গাছপালা। তলায় মাটির রাস্তা আর এতক্ষণ রাস্তার দু'ধারে যে দৃশ্য দেখতে দেখতে আসছিল সেটাই যেন চলেছে। দু'দিকের ন্যাড়া জমিতে পার্থক্য বিশেষ নেই। সবাই একটু যেন দমে যায়।

'ছোটু, তুই দুটো ব্যাগ নে, বাকিরা , আরে এগুলো আমরা নিজেরাই নিতে পারি, জাস্ট শপিং ব্যাগের মতো তো।'

সবাই আস্তে আস্তে এগোয়। কাঁচা মাটির এবড়োখেবড়ো রাসশেওড়া, এখান ওখানে ইতস্তত ধুলো মাখা বড় বড় হেলাফেলায় বেড়ে ওঠা আটপৌরে শাল শেওড়া অশ্বত্থ গাছগুলির নেহাত সাধারণ গ্রাম্য চেহারা। কী গাছ খেয়াল করতেও মন চায় না। তার সঙ্গে যেন মানানসই সাদাসিধে ভঙ্গিতে আটপৌরে শাড়িপরা দু'টি শামলা স্ত্রীলোক দ্রুত পদে কাছে এসে বলে, 'দিন

দিদি আমাদের দিন।' ওদের হাত থেকে ব্যাগগুলো নিতে যায়।

মেয়েরা মাল বইছে! কেমন অস্বস্তি লাগে। লিঙ্গ সাম্যে সকলেই ঘোর বিশ্বাসী হলেও মাল বওয়ার মতো কাজটাজ যেন পুরুষ করলেই তারা স্বস্তি বোধ করে।

'থাক থাক, আরে এগুলো আমরাই নিয়ে যেতে পারব।' মিলি অনি বিনি রুমকি সমস্বরে বলে ওঠে। ওরা ছাড়ে না, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। 'দিন দিদি আমাদের হাতে দিন।' শেষে বাধ্য হয়ে গোটা দুয়েক ব্যাগ আর জলের বোতলগুলো ওদের দেয়। ওদের থেকে এক মাথা লম্বা বিনি নিজেরটা ছাড়ে না। সবাই এগোয়। একেবারে যেন গ্রাম। কোনো পরিকল্পনা নেই, বাহারি রঙ্গন কী পঞ্চমুখী জবা নেই, নেই মোরম ফেলা রাস্তা, দু'দিকে কেয়ারি করা শীতের মরশুমি চন্দ্রমল্লিকা ডালিয়া এমনকি আটপৌরে গ্যাঁদা ফুলের রঙচঙে বাহার। রুমকি সাবধান করে, 'দেখে হাঁটো, মাটি সমান নয় কিন্তু।'

মিলি আর অনি ফিসফিস করে, 'যা গাঁইয়া স্যাম্পল, এদের অফিসটফিস রিসেপশানটান আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

দূরে একটি একতলা টালির চালের বড় বাড়ি, মাটি থেকে বেশ উঁচুতে, চওড়া কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। পুরো বাড়িটার দৈর্ঘ্য বরাবর লম্বা টানা ঢাকা চওড়া বারান্দায় কিছু আসবাবে বসার জায়গা। আটদশ জনের বসে খাওয়ার মতো কয়েকটা টেবিল ও হেলান ছাড়া কাঠের বেঞ্চিও রয়েছে, যেন স্কুলের টিফিন খাবার আয়োজন। সঙ্গের স্ত্রীলোক দু'টির মধ্যে বয়স্কা পৃথুলাটি সিনিয়র মনে হচ্ছে, সেই বলে, ' মাসিমারা, দিদিরা এখানে একটু বসুন। এতটা রাস্তা এলেন। শরবত খাবেন তো।'

'তোমাদের অফিসটা কোথায়? এই যা, তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।'

'না না তুমিই বলুন। আমরা গাঁয়ের মানুষ, ওসব আপনি টাপনি শোনার অভ্যাস নেই। হ্যাঁ, যা জানতে চাইছিলেন, অফিস বলুন, বসার জায়গা বলুন, খাবার জায়গা সব এই খানেই।'

'ও'। সবাই যেন একটু দমে গেল। বসে চারিদিকে তাকায়। কাঠের মোটা মোটা আসবাবপত্র। টেবিল চেয়ার কোনো কিছুতে যেন পালিশ নেই। এক কোণে ছোট একটা কাঠের স্ট্যান্ডে একটা বড় মাটির কলসী রাখা। ও বাবা, কলসীর গায়ে নীচের দিকে ঝকঝকে পিতলের কল। তলায় মস্ত মাটির জালা রাখা। ও হরি হাত ধোয়ার বেসিনের দিশি সংস্করণ। তাই বল, এখন মাথায় ঢোকে, এথনিক টাচ। সাজসজ্জা সব গ্রামীণ জীবনের। হাত মোছার নতুন গামছা থেকে দেওয়ালে এখানে ওখানে হাতপাখা আর কুলোর সারি, ওপরে পাকা ছাদ নয়, টালির তলায় কাঠের কড়িবরগার মতো ফ্রেম থেকে ঝুলছে বড় বড় শুকনো ধুঁদুল, এককালে পা ঘসার জন্য কেনা হতো। পুরো ব্যাপারটাই পরিকল্পিত, রেসর্টের বিজ্ঞাপনেই ছিল, খাঁটি বাঙ্গলার পল্লী গ্রাম, ঘরোয়া আবহ, পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা। পিছনে দেওয়ালে দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে। একটার ভেতরে দেখা যাচ্ছে অফিস। অন্যটা দিয়ে সোজা গেলে বোধ হয় ভাঁড়ার ও রান্নাঘর। অনি আর মিলি অফিসে ঢুকে দু'মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল।

'আরও এক জন গাঁইয়া মহিলা ওখানে। বললেন, ওসব আধার কার্ড চেকটেক কিছু করার নেই, আমরা অত কাগজপত্রে বিশ্বাস করি না।'

'মোস্ট পিকিউলিয়ার। কোনো রেসর্ট এ রকম ঘরোয়া ঢিলেঢালা দেখিনি।'

এবারে আরও একটি ওই এক সাজসজ্জার স্ত্রীলোক, ইনি মধ্যমা, ট্রেতে করে মোটা মোটা ঝকঝকে কাঁসার গেলাস ভর্তি পানীয় এনে টেবিলে রাখল।

'ঠাণ্ডার মধ্যে চা কফি পেলে ভালো হতো। 'অনি গোমড়া মুখে বলে।

'বেশ তো, দিদি, করে দিচ্ছি। ক'জন খাবেন ? চা না কফি? কফি? দু'জন? একটু বসুন। '

নিভাননী ধমকের সুরে বলেন, 'তোদের সব সময় আবদার। এঁরা শরবত করে ফেলেছিলেন— 'না না মাসিমা, কিচ্ছু অসুবিধা নেই। আপনারা এতটা রাস্তা গাড়িতে এক টানা বসে এসেছেন। একটু হাত পা ছড়ান। কিছু মুখে দিন। তার পর আপনাদের ঘরে নিয়ে যাব, জিনিস পত্র রাখবেন। নিশ্চিন্তে ঘোরাঘুরি করবেন, কত কী এখানে দেখার, আপনারা তো সবাই কলকাতা থেকে এসেছেন?'

হুঁ হুঁ। সবাই মাথা নাড়ে। শরবতে চুমুক দিয়ে এক বাক্যে রায়, 'না খুব ভালো করেছে, ঠিক পরিমাণ লেবুর রস, মিষ্টি, আবার একটু গন্ধলেবুর ছোঁয়াও আছে।' 'পাতিলেবু গন্ধলেবু সব আমাদের গাছের। এখানে যা খাবেন সব এই 'বাঙ্গলার গ্রামে'র ফসল।' 'ওমা তাই নাকি!' সমস্বরে বিস্ময় ও হর্ষ প্রকাশ। 'সবাই মিলে ন্যাকামি করো না, নেটে এসব দেখেই তো সিলেক্ট করা হয়েছে,' চাপা গলায় অনির ধমক। 'সারাদিন আছেন, সব ঘুরে দেখুন।' 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই তো এত দূর আসা।'

শরীরে একটু ওআরএস প্লাস ভিটামিন সি পড়তেই সকলে চাঙ্গা। পৃথুলার নির্দেশে এক জন তন্বী চলল তাদের গাইড হয়ে। বাড়িটির এক ধার দিয়ে পিছনের দিকে হালকা কিন্তু উঁচু দরমার বেড়ার আড়ালে এক ফালি খোলা জায়গা, দু'চারটি মাঝারি গাছ, পিছনে মামুলি কয়েকটি ঘর। সামনে দুটো বড় গাছে বাঁধা দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছে।

'দারোয়ান, মালি, যারা দিনরাত সারা বছর থাকে তাদের কোয়ার্টার।

'আর তোমরা?'

'আমরা সবাই এই কাছের গ্রামে থাকি। যখন গেস্ট আসেন, আমরা আসি, ঘরদোর ঝাড়ামোছা রাঁধাবাড়া পরিবেশন ধোয়াধুয়ি সব করি। আবার তাঁরা চলে গেলে আমরাও গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই।' সরল অকপট স্বীকারোক্তি।

'দ্যাখ মোটে কয়েকটা পার্মানেন্ট আর বেশিরভাগ ক্যাজুয়েল স্টাফ দিয়ে কেমন দিব্যি চলাচ্ছে। 'সামনে এগিয়ে যেতে যেতে



অনি বলে।

‘একটা জিনিস খেয়াল কর গেস্টদের সার্ভিস দেয় যে মেয়েরা, তারাই ক্যাজুয়েল, আর পুরুষরা দিব্যি পার্মানেন্ট। কী আনফেয়ার।’

অনি আর মিলি রেসর্টের পুরুষবাদী প্রশাসনিক চরিত্র সমালোচনায় লেগে যায়।

‘বি প্র্যাক্টিকাল। রেসর্ট তো চলে শীতের তিনটে মাস, মেরে কেটে আর একটা। বাকি সময় তো রেসর্টে বলতে গেলে কেউ আসে না। তখন রাঁধুনিটাধুনি দিয়ে কী হবে। কিন্তু মালিকে বছরভর গাছপালা খেত দেখতে হয় বা দারোয়ানকে পাহারা দিতে হয় পুরো প্রপার্টি।’ রুমকি ব্যাখ্যা করে।

‘স্ত্রীলোকগুলো বেশ হাসিখুশি, ভাবভঙ্গিতে মোটেই অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না।’ বিনি মানুষের মনোভাব বুঝতে এক্সপার্ট।

‘এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের রোজগারের কীই-বা উপায় আছে। তবুতো এখানে কয়েক মাস কাজ পায়। সেটাই বা কম কীসের।’ অপর্ণা ছোটদের আলোচনায় ইতি টানেন। এদিকে কথা বলতে বলতে তন্বীর নেতৃত্বে সবাই গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে মেঠো রাস্তা ধরে পৌছেছে একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনে একটি এক তলা চারকোণা মাটির বাড়ি। লাল টালির মতো দেখতে ছাদ। চার দিকে চারটি দরজা। বাইরে চওড়া টানা বারান্দা চারদিকে ঘেরা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠতে উঠতে তন্বী জানায়, ‘এইটা হচ্ছে, বনলতা কটেজ, এর এক নম্বর রুম আপনাদের।’

বনলতা ! মিলি, রুমকি, অনি ও বিনির পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি।

‘অন্য কটেজ গুলোর নাম কী?’ প্রতিভা জিজ্ঞাসা করেন।

‘ঝুমকো লতা, মালতী লতা, কুঞ্জ লতা। প্রত্যেকটাতে এরকম চারটে করে ঘর।’

‘শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ নয়, জীবনানন্দের বাংলা,’ ‘হিহিহি।’ বাংলায় এম.এ. অনির মন্তব্যে সমবেত প্রতিক্রিয়া।

বনলতা ঘরটি বেশ বড়। দেওয়ালে হাত দেয়,মাটির মতো দেখতে, কিন্তু গাঁথনি আসলে ইটের। গৃহসজ্জায় মাটির ছোঁয়া। হ্যারিকেনের মতো ইলেক্ট্রিক লাইট। খাটের পাশে বেডসাইড টেবিলে ল্যাম্প দু'টি যেন প্রদীপ। গ্রামের ডেকর, ব্যবস্থায় মডার্ন। মোটামুটি যা যা প্রয়োজন সব আছে। প্রতিভা সর্বাগ্রে বাথরুম ইন্সপেকশান করে রিপোর্ট দিলেন, না সব ঠিক আছ, সাদা টালির মেঝে দেওয়াল, পোর্সেলিনের বেসিন, ডবলিউ সি সঙ্গে টয়লেট শাওয়ার, নতুন ছোট্ট সাবান, ধোপ দুরস্ত তোয়ালা। ‘যাই বল, বাথরুমে কিন্তু গ্রামের কালচার চলবে না, সেখানে মডার্ন শহুরে ব্যবস্থা চাই।

আচ্ছা, তোমরা দ্যাশে এই ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে কী

ভাবে? ওখানে তো কলের জল মডার্ন বাথরুম কিস্যু ছিল না।'

'যে সময়ে, যেখানে যেমন ব্যবস্থা তেমন চলতাম। তখন এসব চোখে দেখা দূরস্থান, শুনিইনি।'

'থ্যাংক গড, এখানে চলে এসেছিলে। আমরা তো ভাবতেই পারি না.....

'অনির কথার মধ্যে পড়ে বিনি, ' আরে বাথরুমটা কি জীবনের সব? তোদের মনটার একেবারে বারোটা বেজে গেছে। যে দেশ আর মানুষকে নিয়ে আমাদের জীবন....

'দিদি, প্লিজ তোর গুরুগিরি রাখ।'

প্রতিভা ধমক লাগান,' সবাই বাজে কথা রাখ দেখি। এই ক'বছর হল তো টালির চেকনাই, ডব্লিউসি, বেসিন সব হয়েছে। তার আগে এতো বছর তো ওই সিমেন্টের মেঝে, চৌবাচ্চায় রাখা জলে স্নান করতি, আর সেই এখন যাকে বলিস ইন্ডিয়ান স্টাইল ইয়ে তাইতে ছোটো বেলা থেকে অভ্যস্ত ছিলি। দেখ দিদি, কী ফুটানি হয়েছে এদের।'

'যে যে ফ্রেশ হতে চাও, যাও। এখানে বসে সময় নষ্ট করে কী হবে।' অপর্ণা প্রসঙ্গ বদলে দেন। সবাই একে একে যায়, অল্প বয়সিরা ঝটপট ব্যাগ থেকে সাজের জরুরি সরঞ্জাম বের করে মেকআপ রিটাচ করে নেয়। নিভাননী হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন, 'এই অজ পাড়া গাঁয়ে কাদের দেখাবি সাজগোজ?'

'পিসিমণি, ফুলের ফুটিয়াই সুখ।' রুমকির পর্যন্ত শিক্ষিকাসুলভ গাম্ভীর্য ত্যাগ।

এবারে সবাই রেডি। বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করে প্রথম দর্শনে গোটা ব্যাপারটা যতটা এলোমেলো মনে হয়েছিল ততটা মোটেই নয়। একটা মোটামুটি পরিকল্পনামাফিক সব কিছু। সেই ইতস্তত বড়ো বড়ো এলেবেলে গোছের গ্রামের মতো পরিবেশ। মধ্যে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে মেঠো রাস্তা। বাঁ দিকে প্রথমে চলে। দু'জনে কোনোক্রমে পাশাপাশি যেতে পারছে। প্রায় লাইন করে।

'কী পিসিমণি, হাঁটতে পারবে তো, নাকি ছোটুকে বলব?

'আরে, খুব পারব। ছোটোবেলায় আমরা কি আর ট্রামেবাসে চড়েছি? সর্বত্র এই পা দু'খানাই তো ভরসা ছিল। এখন না হয় বাতের ব্যথায় কাবু।'

কিছুটা গিয়েই সমবেত বিস্ময়, কী সুন্দর সবুজ আর সবুজ। এদিকে ওদিকে একের পর এক বড়ো বড়ো চারকোণা খেত। অনি আর মিলি দৌড়ে এগিয়ে যায়, 'ওমা, দ্যাখো দ্যাখো, ওগুলো সব বাঁধাকপি। কী অপূর্ব লাগছে, চারদিকে ঘন সবুজ পাতা ছড়িয়ে মাঝখানে হালকা সবুজ ফুলটি যেন ফুটে আছে। সব্জি যে এত সুন্দর হতে পারে, কেউ ভেবেছিলে?' কথার সঙ্গে মোবাইলে ক্যামেরায় ছবি। রুমকি আর বিনি পিছন পিছন দৌড়ে আসে। মায়েদের নিয়ে আস্তে ধীরে আসে মায়া।

বিশাল এলাকা জুড়ে পর পর খেত। বাঁধাকপি, ফুলকপি গেল এবার কী। 'আরে বাপস, এসো এসো, দ্যাখো তোমরা ভাবতেই পারবে না কীসের খেত। 'যে যার নিজের গতিতে গিয়ে হাজির হয়। ব্রোকলি! ব্রোকলি! অনি, বিনি রুমকি মিলি মোহিত।

'ইস্, ভাগ্যিস 'বাঙ্গলার গ্রাম' চুজ করা হলো। বাজারে একটা ব্রোকলির কত দাম বলতো। আর ফুলকপি বাঁধাকপি তো বছর ভর এখন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রোকলি শুধু শীতে। খানদানি ব্যাপার।'

'আরে রাখ তোদের ব্রোকলি। যত্ত সব বিলাতি হুজুগ। ব্রোকলি দিয়ে একটা পদের নাম কর দেখি যে খেয়ে ফুলকপির ডালনা কি বাঁধাকপির চচ্চরির মতো মুখে লেগে থাকে।'

'কেন ব্রোকলির সুপ, তারপর তারপর স্টারফ্রাই ব্রোকলি—'

'সব ঢঙ্গের ইউটিউবের রান্না,' প্রতিভাও ননদের দলে। অপর্ণা মৃদু হেসে ব্যাল্যান্স রাখেন , 'খেতে যাই হোক, উপকার নাকি ভীষণ।'

'এইতো আমার মিষ্টি মামি জিন্দাবাদ।' অনির কথা শেষ নাহতেই এবারে অন্যদিকে এগিয়ে যাওয়া মিলি ও রুমকির আবিষ্কার, 'এখানে দ্যাখো কী রকম টমাটো ফলেছে।'

বিনি পিছিয়ে নেই, 'আর বেগুন দেখবে না? ঐযে ওদিকে।' ক্রমে পালং শাক, শালগম থেকে শিম, কড়াইশুঁটির সাক্ষাৎ লাভ। সঙ্গে চলে ছবি তোলা । অন্যদিকে পাতিলেবু, গন্ধলেবুর মতো স্থায়ী গাছ কত। নানা শেডের সবুজ আর সবুজ। বেশিক্ষণ ভালো জিনিসও ভালো লাগে না। ক্রমে একঘেয়ে হয়ে যায়। অনভ্যস্ত পা আর চলতে চায় না। শীতকাল হলেও সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। এখন বেশ একটু গরম লাগছে। বয়স্করা শাল, স্কার্ফ খুলে মায়ার জিম্মায় দিয়ে দিয়েছেন। নিভাননী, প্রতিভা, অপর্ণার যেন পা ধরে আসে। কিন্তু মেয়েদের উৎসাহের শেষ নেই। তারা আবিষ্কারের আনন্দে এগিয়েই চলেছে। আর জায়গাটাও এত বিরাট, প্রায় একটা ছোটোখাট গ্রাম। নীরব সঙ্গিনী বোঝাবাহক মায়া কিন্তু খেয়াল রেখেছে। মোবাইলে সময় দেখে মৃদু স্বরে বলে, 'মাসিমা, অনেকটা দূর চলে এসেছেন, আবার ফিরতে হবে। একদিনে এত হাঁটা আপনাদের উচিত নয়।'

'কিন্তু ওরা কি ফিরতে চাইবে?' অপর্ণার সংশয়। 'বেশ তো দিদিরা বেড়ান, আপনারা ফিরে চলুন, রাস্তা হারাবার তো ব্যাপার নেই। একটাই পথ।' 'তবু ওদের বলে দিতে হবে আমরা ফিরছি। 'অনি, বিনি', 'মিলি', 'রুমকি।' নিভাননী, প্রতিভা, অপর্ণার বিফল প্রয়াস।

'মাইজি হামি ডেকে আনছি।' দেবদূতের মতো ছোটুর মাটি ফুঁড়ে উদয়। সে যে আগাগোড়া ছায়ার মতো তাদের পিছন পিছন ছিল কেউ খেয়াল করেনি। এক দৌড়ে ওদের কাছে উপস্থিত ও সকলের অ্যাবাউট টার্ন।

'এমা তোমরা টায়ার্ড হয়ে গেছ, না? সরি সরি, আমরা এত এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম টাইমটা খেয়াল ছিল না।' বিনির অনুতাপ প্রকাশ।

'ও বাবা, দেখ কাণ্ড, দেড়টা বেজে গেছে যে। তোমাদের খাওয়ার টাইম—

'আরে ছাড়, বেড়াতে এসে অত টাইম রাখা যায় না।'

'তাছাড়া কত দেরিতে ঢাবাতে খেলাম। চল এখন।' দিদিকে

থামিয়ে দিয়ে অনি ফেরার রাস্তা ধরে।

'ওই রাস্তায় গিয়ে কী হোবে? ইতো রুমে যাবার রাস্তা। ইখন কি রুমে যাওয়া জরুরি ? খানা খাবার টাইম হয়নি? বরং ওই রিসিপ্সন বিল্ডিঙে চলুন।' দলে একমাত্র মরদ হিসেবে ছোটু যে শুধু মালকিনদের খেয়াল রাখছে তাই নয়, এরমধ্যে পুরো 'বাঙ্গলার গ্রামে'র ভূগোল তার আয়ত্ত করা হয়ে গেছে। দিব্যি অন্য রাস্তা দিয়ে সে শর্ট কাটে সেই প্রথম বাড়িটা অর্থাৎ রিসেপশান কাম লাউঞ্জ কাম ডাইনিং কটেজে নিয়ে এলো।

পৃথুলা ও মধ্যমার সহাস্য অভ্যর্থনা, 'কী দিদিরা, মাসিমারা কেমন দেখলেন 'বাঙ্গলার গ্রাম'? আরও অনেক কিছু আছে। লাঞ্চের পর দেখবেন। এখন খাবেন তো। বসে পড়ুন। একটু দেরি হবে। আমরা সব একেবারে বেড়েই আনি কিনা।' আড় চোখে তিন বয়স্কার সাদা সিঁথির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা, 'মাসিমারা সবাই আমিষ খাবেন তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমিষ খাবার তো বুকিঙের সময় বলে দিয়েছিলাম।' মিলি বিরক্ত সুরে বলে।

'আমরা তবু একবার জিজ্ঞাসা করে নিই। বয়স্করা আছেন কিনা। বসুন বসুন। জলটল কিছু খাবেন? দেবো?'

'এই যা, জলের বোতল সব বনলতায় পড়ে আছে।' মিলি ও অনির সমস্বরে আক্ষেপ।

'তাতে কী হয়েছে, জল তো আমাদেরই দেওয়ার কথা। আনছি।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিল করা বড়ো দু'বোতল জল উপস্থিত।

'একটা গেলাস হলে ভালো হয়। বোতল থেকে খাওয়া অসুবিধা।'

'দিচ্ছি।' থালায় বসানো আটখানা ঝকঝকে কাঁসার গেলাস হাজির।

'আমার না খুব দেশের কথা মনে পড়ছে,' নিভাননী খানিক বাদে বলেন।

'এইটা পুরো বাজে কথা, মা। দ্যাশে সেসময় এরকম কমার্শিয়াল স্কেলে এতো বাঁধাকপি ফুলকপি ব্রোকলি টমাটোর ক্ষেত মোটেই ছিল না।

'না না। আমি ওরকম এক এক করে মেলাচ্ছি না। কিন্তু এই যে খোলা মেলা, গ্রামের মতো চারিদিক। এক তলা সব বাড়ি, মেয়েদের এই সাজপোশাক, পরিবেশ, কেন জানি দেশের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা প্রতিভা, তোর কিছু মনে হচ্ছে না? তোরও হচ্ছে? এক অপর্ণা তো খুব ছোট ছিল ওর বোধ হয় মনে নেই।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে দু'হাতে দু'টি ঝকঝকে কাঁসার থালা হাতে পৃথুলার প্রবেশ, পিছনে মধ্যমার হাতে মস্ত কাঁসার থালায় বাটির সারি। নিভাননী আর প্রতিভার সামনে থালা দু'টি রেখে বাটি গুলো সার দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হলো।

'বাপ রে, এ কী করেছেন এ যে জামাই আদর,' সভয়ে সমবেত আর্তনাদ। থালার মাথায় বাটি বসিয়ে সাইজ করা ভাত, তলায় সারি দিয়ে ভাজাভুজি, করলা, পালংশাক, ছোট্টছোট্ট বড়ি, ঝিরিঝিরি করে কাটা আলু, লম্বা করে ফালি কাটা গোটা বেগুন । থালার বাইরে সার দিয়ে সাজানো বাটিতে ডাল, লাউঘন্ট, ফুল কপি আর কাতলা মাছের ঝোল, সর্ষেবাটা দিয়ে পার্শে, মুরগির মাংস, চাটনি।

'কী বিশাল কাণ্ড, একেবারে জামাইষষ্ঠীর ভোজ। এত খাওয়া যায় নাকি । তুলুন তুলুন।

'না না মাসিমা আমাদের 'বাঙ্গলার গ্রামে' এটাই রীতি। আমরা সবাইকেই এরকম ভাবে আপ্যায়ন করি। তা ছাড়া যা খাবেন সব 'বাঙ্গলার গ্রামে'র ফসল। বাইরের জিনিস বলতে শুধু চাল আর ডাল।'

তার কথা শেষ হতে না হতে আরও দু'টি থালা ও বাটির সম্ভার উপস্থিত। অন্য টেবিলে আট-প্লাস-এক ছোটুর খাবার আসতে আসতে বেশ খানিকক্ষণ কেটে যায়।

'তোমরা আরম্ভ করে দাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' অনি হুকুম করতে করতে এবারে আবার মধ্যমা নিঃশব্দে এসে খানিকটা করে গলানো গাওয়া ঘি ভাতের সামনে ঢেলে দিতে থাকে আর থালায় করে পৃথুলা এক রাশ কুচো মাছ ভাজা নিয়ে হাজির।

'এটা আমাদের এখানকার স্পেশাল মাছ, খেয়েই দেখুন, কোথাও পাবেন না। মৌরলা মাছের মতো কিন্তু মৌরলা নয়।'

প্রতিভা বলেন, 'কিছু মনে করবেন না একটা খালি থালা প্লিজ আনুন, যেগুলো খেতে পারবো না, তুলে রাখি। খাবার নষ্ট করা উচিত নয়।'

'না না মাসিমা আস্তে আস্তে খান, ঠিক পারবেন, ওই অতটুকু তো ভাত—'

অনেক জোরাজুরিতে শেষে একটা থালা এলো, যে যা পারবে না তুলে রাখে। মায়া ইতস্তত করছে, নিভাননী বলেন, 'তুমি ছেলে মানুষ, সব খাবে। কিচ্ছু তুলো না, খাও, আরও লাগলে চেও, তৃপ্তি করে খাও।'

এদিকে অনি ধমক দিচ্ছে, 'আরে যা পারো খাও না, অত ভাবাভাবির কী আছে।'

ইংরিজিতে রুমকি যোগ করে, ' খেলেও যা টাকা দিতে হবে, না খেলেও তাই দিতে হবে।' প্র্যাক্টিকাল নির্দেশ।

'তাই বলে অসভ্যের মতো গাণ্ডে পিণ্ডে গিলবো নাকি', বিনির বিরক্ত টিপ্পনী, বৈরাগী বলে কথা।

অপর্ণা চুপ করেইছিলেন। এবার সন্তর্পণে মুরগির বাটিটা এক ধারে সরিয়ে রাখেন। তাঁর দেখাদেখি নিভাননী ও প্রতিভাও অপছন্দের বাটিগুলো সরালেন।

'এক মিনিট। দিদিভাইরা তোমরা কেউ আমাদের গ্রুপ ছবি তুলে দিতে পারবে? সব সেট করে দিচ্ছি, খালি টিপবে।'

অতঃপর অনি ও মিলির যৌথ নির্দেশে দু'কোণ থেকে সকলের ছবি তোলা শুরু।

'এই তোমরা ন্যাচারাল হও। ওরকম কাঠ হয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে! খাও, ভাত মাখো মুখে তোল। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যস্, শাটার। আবার, রিপিট। দেখি কেমন হলো? ফাইন। এবারে

উল্টো দিক থেকে।' বেশ কয়েকটা ছবি তোলার পর অনি জানায় সে এডিট করে বিনি, মিলি আর রুমকির মোবাইলে ফরোয়ার্ড করে দেবে।

নিভাননী খেতে খেতে মোহিত। 'ঠিক দেশের রান্নার মতো। কত কাল পরে গ্রামের রান্না খেলাম। এদের পাল্লায় পড়ে কত বিচিত্র খাদ্য যে খেতে হচ্ছে। যেমন ধর, এই বিরিয়ানি। অসহ্য। আর পারা যায় না। নকল জাফরান দেওয়া এত্ত ভাত, এক পিস বুড়ো খাসির ছিবড়েওলা মাংস, বোমার মতো একটা জ্যোতি আলু। কী মোগলাইয়ের ছিরি।'

'দিদি, তন্দুর ভুলে গেলে? আধপোড়া ওই ইয়া মোটা ব্রয়লার চিকেনের ঠ্যাং আর বিশাল নান, গলা দিয়ে যেন নামতে চায় না।' প্রতিভার সংযোজন।

'নইলে চাইনিজ। মিক্সড ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেনের গাছ গজিয়ে গেল পেটে।' অপর্ণা ফোঁড়ন কাটে।

'দেখেছিস দেখেছিস, এত বাইরে নিয়ে যাই,তবু বড়দের মন আর পাওয়া গেল না।' অনি মিলি ও রুমকির সমবেত অভিযোগ। বিনি গম্ভীর ভাবে বলে, 'কেন মিলির লাস্ট জন্মদিনে আমাদের বঙ্গ আউটিং, বাঙ্গালি খাওয়া হলো, ভুলে গেলে?'

'ওরে বাবা, মনে করাস না, পকেট একেবারে গড়ের মাঠ করে দিয়েছিল শুধু ডাব চিংড়ি আর ভাঁপা ইলিশে, বাপ রে।' অনি আঁতকে ওঠে।

'নলেন গুড়ের আইস ক্রিমটার দাম যোগ করিস।' রুমকি কুটুস করে চিমটি কাটে।

'আমাদের সময়ে কলকাতায় মিষ্টির দোকানে কচুরি আর ছোলার ডাল ছাড়া দিশি খাবার মানে ছিল পাইস হোটেল। তারপর হলো রাস্তায় ফুটপাতে সারি দিয়ে সস্তার ভাত ডাল তরকারি মাছ।' প্রতিভার কথায় অপর্ণা যোগ করে।

'কোনোটাই আমাদের মানে বাড়ির মেয়েদের জন্য ছিল না। এখন দিব্যি পরিবার-সহ পাড়ায় পাড়ায় বাঙ্গালি খাবার খেতে যাওয়া হয়। দাম একেবারে গলা কাটা কেন? কী ব্যাপার বল দেখি।' নিভাননী কৌতূহলী।

'ক্লায়েন্টেলের ওপর ডিপেন্ড করে প্রাইসিং।'

'আর লোকেশান বা পাড়া। সাউথে দামটা বেশি।' মিলি আর অনি বাণিজ্যিক তথ্য পরিবেশনে এক্সপার্ট। কোনো ক্রমে খাওয়া শেষ করতে না করতে যখন আবার মধ্যমা থালার মধ্যে বাটি সাজিয়ে এসে বলল, 'শেষ পাতে একটু মিষ্টি মুখ করুন। পায়েস খাবেন তো। আমাদের নিজেদের গোরুর দুধের।'

কোরাসে আর্তনাদ, 'না না আর পারব না।'

এরা ছ'জন তিন বাটি ভাগ করে খেল। এক মাত্র মায়া এক বাটি আর ছোটু দু'বাটি পায়েস নিঃশেষ করে মান রাখল। এবারে সেই কলসী বেসিনে হাত ধুয়ে নতুন গামছায় মুছে, মধ্যমার এগিয়ে দেওয়া ভাজা মশলা একটু মুখে পুরে সকলের শেষ কথা, 'নড়াচড়া করা যাচ্ছে না।'

'আমরা সব এক একটা শিকার গেলা অজগর।' অনির মন্তব্যে হাসতেও যেন কষ্ট। পৃথুলা এসে খাবারের গুণাগুণ জিজ্ঞাসা করলে সকলের এক বাক্যে আহা উহু। নিভাননী আবার তাঁর দেশের স্মৃতির কথা উল্লেখ করলেন।

'যাক, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের রান্না আপনাদের বাংলাদেশের মতো জেনে ভালো লাগল।'

বাবা রে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভার্সেস আপনাদের বাংলাদেশ! অনি আর মিলির প্রায় গালে হাত। পৃথুলা রীতিমতো ডিপ্লোম্যাটিক। 'গ্রামে বেড়াতে এসে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকবেন কেন। এখানেই খোলা জায়গায় বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। ডান দিক দিয়ে যান,দেখবেন।' মধ্যমা আর তন্বী পরামর্শ দেয়।

প্রথমে ফুলের মেলা। একটা মোরম ফেলা রাস্তার দু'ধারে, কোমর উচ্চতার সব ঝোপের মতো গাছে অজানা বেশ বড়ো সাদা ধপধপে কলকে আর তারার মিক্সচার সব ফুলের মেলা। কী ফুল কেউ নাম জানে না। শেষে একটা মাঠের মতো খালি জায়গায় সারি সারি আধ শোয়া হয়ে পা এলিয়ে দেবার মতো পাটা ফেলে তৈরি লম্বা এক একটি ন্যাড়া কাষ্ঠাসন। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। মোটেই সুখপ্রদ মনে হলো না। সকলে এগোয়। তার পর দেখা যাচ্ছে বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছের সারি। হ্যাঁ এগুলো চেনা যাচ্ছে, আম জাম কাঁঠাল সফেদা আরও কত কী। মিলি আর অনি মাঝখানের সরু মেঠো পথ দিয়ে আগে ভাগে এগিয়ে গেছে। প্রায় আবিষ্কারের আনন্দে তাদের চিৎকার, 'এসে দেখ।' সকলে আসে, দেখে সামনে বিরাট একটি চারকোণা পুকুর, পাড় ধরে তাল গাছের সারি।

'আরে এযে দেখছি একেবারে তালপুকুর।' 'বেশ গভীর মনে হচ্ছে। জল একেবারে টলটল করছে।' 'ভুড়ি কাটছে। মাছ আছে।'

'থাকবেইতো। সেই সব মাছই আমরা এক্ষুনি খেলাম।'

নিভাননী একটু পিছিয়ে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

'মা, তুমি কথাটথা বলছ না কেন, শরীর ঠিক আছে তো?' অনিতার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন। মাথা হেলিয়ে জানান 'আছে।'

'তাহলে এমন চুপচাপ হয়ে গেলে যে? ক্লান্ত?' নিভাননী মাথা নাড়েন, না। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'চল ওই তক্তা গুলোতেই একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক।'

একে একে সকলে এসে সন্তর্পণে কাষ্ঠাসনে গা এলিয়ে দেয়। একটু পরেই প্রায় সমস্বরে মন্তব্য, 'আরে মন্দ লাগছে না।'

'এই যে মাথার দিকটা ঢালের মতো উঁচু তাই আরাম হচ্ছে,' রুমকির ব্যাখ্যা। অনি দু'হাত ছড়ায়। 'আঃ, কী আরাম।'

মিলি গান ধরে, 'এমনই করেই যায় যদি দিন যাক না– অ–। 'অনি যোগ দেয়, 'মন উড়েছে উড়ুক না রে মেলে দিয়ে মনের পাখনা, যাক না–আ--'

প্রতিভা না বলে পারেন না, 'হ্যাঁ, তোদের তো মন সব সময়ে খালি উড়ছে। আজকের দিনটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। সংসার করা নেই, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকা নেই, ছেলেপুলের নাম নেই'।

'আহ মা, আবার তুমি ভাঙা রেকর্ড বাজাতে শুরু করলে। এই জন্যেই–' 'শান্তি শান্তি , চুপ কেউ এখানে ঘর সংসারের কথা

বলবে না। বেড়াতে এসেছি।' অনি-বিনির দ্বৈত কণ্ঠে শাসন।

'থাক না, মেজদি। আমাদের দিনকাল তো আর নেই। এরা যেমন থাকলে সুখী হয়, থাকতে দাও। বয়স তো কারো কম নয়। কিছু করার নেই।' মৃদু স্বরে অপর্ণা বোঝান।



নিভাননী একেবারে চুপচাপ। যেন কিছু কানেই যায়নি। খানিক ক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর এক কোণ থেকে মায়া, যার অস্তিত্ব সকলে ভুলেই গিয়েছিল, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'মাসিমা, শরীর ঠিক লাগছে তো, নাকি ঘরে গিয়ে বিছানায় একটু শুয়ে নেবেন?'

নিভাননী মাথা নাড়েন। না, এখানেই ঠিক আছেন। আরও খানিক ক্ষণ যায়। ছোটোরা মোবাইল খুলে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে পড়ে। বড়দের চোখ বন্ধ। নিভাননী এক সময় মুখ খোলেন। খুব আস্তে আস্তে যেন নিজের মনে কথা বলছেন, কেউ শুনল কী না শুনল কিছু আসে যায় না।

'এই পুকুরটা যেন ঠিক আমাদের দেশের বাড়ির পুষ্করিণী। হুবহু। সেখানেও মাছ ছিল। তখন তো ফ্রিজটিজের বালাই ছিল না, গ্রামে প্রত্যেক দিন বাজারই-বা কোথায়। খেতের কাজের মুনিষ যারা থাকত সবাই জাল ফেলে মাছ ধরতে জানত। প্রতি দিন টাটকা মাছ। বড়ো মাছ ছোটো মাছ যা উঠত তাই খাওয়া হতো। মাচার লাউ-কুমড়ো কী কাঁচাকলা বেগুন পেঁপে থোড়। ঝুনো ডাব তো গাদা করে রাখা থাকত। ছাড়িয়ে নারকেল ভাঙা হতো প্রায় প্রতি দিন। মুড়ি নারকেল। কী রান্নায়। হিন্দুর বাড়িতে বেশিরভাগ মেয়েরাই থাকতাম। জোয়ান পুরুষ তো সব বাইরে, গাঁয়ে তাঁদের জমিজায়গা চাষবাস দেখা ছাড়া মাইনর স্কুল মাস্টারি বা ছোটো ডাক্তারখানা খুলে প্র্যাক্টিস বা দোকানদারি ছাড়া আর কাজ কী। পড়াশোনা শেখা মানেই গাঁয়ের বাইরে কাজ। তার পর রিটায়ার করে গ্রামে ফেরা। তবে আমাদের বাড়িতে অবশ্য সবাই ছিল। অনেক জমিজায়গা, ধান ছাড়া পাটচাষ হতো। আমাদের ওখানে সাদা পাট। কর্তারা নিজেরা না দেখলে চলে? এসব বিক্রির উপার্জনেই তো সংসার চলে। ঠাকুরদাদারা তিন ভাই, প্রত্যেকে ছেলে-মেয়েসহ কাছাকাছি থাকতেন। তাঁদেরও জমিজায়গা ছিল— ছিল এক-এক জনের ছেলে-মেয়েসহ পরিবার। মানে শুধু চৌধুরীদের তিনপুরুষেরই বিশাল এলাকা জুড়ে বসবাস। আমাদের পরিবারেই ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, বাবা-কাকারা মিলে কত জনের এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া। বিরাট হেঁশেল। প্রতিভা, তোরা তো বোধহয় এভাবে সবাই মিলে গ্রামে থাকিসনি?'

'ছুটিছাটায় যেতাম। গ্রামে ভিটেটো ছিল, জমিজায়গা ছিল। তবে সব জ্ঞাতিদের হেফাজতে,' প্রতিভা উত্তর দেন। 'দিদি যা বললেন, আমাদের ওখানেও পড়াশোনা জানা পুরুষমানুষ সব বাইরে। আমার বড়ো জ্যেঠামশাই কলকাতায় চাকরি করতেন আর এক জন তো আরও দুরে সেই জামশেদপুরে, টাটা কোম্পানিতে। ঠাকুমা, ঠাকুর্দা পার্টিশানের বহু বছর আগেই বড়ো ছেলের কাছে চলে গিয়েছিলেন। সঙ্গে করে ঠাকুমার আদরের বড়ো নাতি আর ঠাকুর্দার নয়নমণি বড়ো নাতনিকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি আর ছোটোভাই বরেন শুধু বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্রামে থাকতাম। ওখানে কলকাতার মতো বাড়িতে ঝি-চাকর থাকত না। একটা বাসন মাজার ঝি ছিল। ব্যস, বাকি সব নিজেদের। মা রান্না তো করতেনই, সঙ্গে সব রান্নাঘরের কাজ, বাটনা বাটা থেকে নারকেল কোড়ানো, শাকসবজি কুটনো কোটা, উনোন ধরানো, নিকনো সব করতেন। আমি ঘরদোর মোছামুছি, সকলের কাপড়জামা কাচা, সেই দশবারো বছর বয়স থেকে করেছি। স্কুলে পড়তাম বলে ঘরের কাজ থেকে রেহাই ছিল না।'

'বাব্বা, আমি হলে তো আর পড়তেই এনার্জি পেতাম না। কী টাফ লাইফ, ভাবা যায় না,' রুমকির রায় দান। 'তুমি যে অত ঘরের কাজ করেও স্কুলের চৌকাঠ ডিঙ্গোতে পারলে সেটাই একটা কীর্তি।' মিলি মাকে বাহবা দেয়।

'আরে তখন সব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের এক অবস্থা ছিল। ঘরের কাজ মেয়েদের করতেই হবে। বিয়ে হবে তো। জানিস, দেশে কোনো কোনো অঞ্চলে বিয়ে হয়ে নতুন বউ শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতেই তাকে একটা জ্যান্ত শোলমাছ কাটতে দেওয়া হতো।'

'কী ভয়ংকর। পুরো বর্বর।' সকলের জানা, অনির শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায়ের অন্যতম কারণ। তার দুই বিবাহিত ননদের একদিন বাপের বাড়িতে দুপুরে খাবার কথা। তার বর সেই উপলক্ষ্যে বাজার থেকে এক কিলো জ্যান্ত কইমাছ নিয়ে এসেছিল এবং শাশুড়ি অনিকে কাটতে বলেছিলেন, রান্নাটা তিনিই করবেন। তখনি অনির এক বস্ত্রে স্বামীগৃহ ত্যাগ।

অপর্ণা যে চুপ করে আছেন কেউ খেয়াল করে না। 'ছোটো, তুই কত বয়স থেকে কলকাতায় রে?' প্রতিভার প্রশ্ন।

'তা বছর পাঁচেক বয়স বোধহয়।' 'তোর তাহলে আর দেশের কথা কিছু মনে নেই। অবশ্য মনে করেই-বা কী হবে। দেশে কি আর শান্তিস্বস্তি ছিল। আমি তো বহু কষ্টে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। রাস্তায় বেরোলেই মুসলমান ছেলের দল।'

'উফ, তোমাদের এত্ত প্রেজুডিস, এই জন্যেই মুসলমানরা তোমাদের দেখতে পারত না।' মিলি আর অনির যৌথ সেকুলার টিপ্পনী।

'আহা, তোরা তো সেই পরিবেশ দেখিসনি, কিছুই জানিস না। বাড়ি থেকে স্কুলে হিন্দু মেয়েদের যাওয়াটাই সমস্যা। রাস্তায়, মোড়ে দাঁড়িয়ে মুসলমান ছেলেরা সব ইচ্ছে করে শুনিয়ে শুনিয়ে অসভ্য অশ্রাব্য কথা বলত। আশ্চর্য ব্যাপার হলো ওদের বোনেরা দিদিরা আমাদের সঙ্গে পড়ত, বাড়িতে আসা-যাওয়া করত, তারা সব চমৎকার মেয়ে ছিল। কত বন্ধু ছিল আমার, বিলকিস, সায়রা, ফতিমা, হাসিনা। এখনো কয়েকটা নাম মনে আছে। আমি তো

গান শিখতাম, বাবা বাড়িতে মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন, অত ঘরের কাজ, পড়াশোনা, তার মধ্যেও বাবার খুব শখ ছিল আমি গান করি। আমার গলা নাকি যেমন মিষ্টি তেমন সুরেলা, সর্বদা বলতেন। স্কুলে সব অনুষ্ঠানে গাইতাম, রাগপ্রধান, কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীত।

হ্যাঁ রে, বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ওই মুসলমান মেয়েরাও খুব গান শুনতে ভালোবাসতো। ওদের বাড়িতে তো শিখতে দিত না। আমাদের বাড়ি এলেই আমাকে ওরা গান গাইতে বলত। আবার গলা মেলাতে চেষ্টা করত।

'আচ্ছা, মাইমা, কখনো জিজ্ঞাসা করনি ওদের ভাই, দাদারা ওরকম অসভ্য কেন?' বিনির প্রশ্ন।

'করেছি। কতবার। সেই এক উত্তর। খুব লজ্জিতভাবে বলত, কিসু খারাপ ভাবিস না রে। হিন্দু মাইয়া দ্যাখলেই আমাগো মরদগুলার শরীর গরম হইয়া যায়। অরা কী করব। আল্লা দিসে অমন শরীর।' এবারে একসঙ্গে উঠে বসে মিলি অনি বিনি রুমকি।

'কি! হিন্দু মেয়ে দেখলে শরীর গরম হয়! শরীর কি হিন্দু-মুসলমানের আলাদা! ইয়ার্কি মারবার জায়গা পায়নি।'

'তোমাদের ওখানে পুলিশ টুলিশ ছিল না? মগেরমুলুক নাকি?

'হ্যাঁ রে মগের মুলুকই বটে।'

'শুনেছি '৪৬ সালে নোয়াখালীতে হিন্দুদের ওপর প্রচণ্ড হামলার সময় বহু হিন্দু মেয়েকে রেপ করা হয়েছিল। তার পর বাঙ্গলার তখনকার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি নাকি বলেছিল, হিন্দু মেয়েরা বেশি সুন্দর দেখতে, তাই রেপড্ হয়।' নিভাননী আস্তে আস্তে যোগ করেন।

'কী এক খানা দ্যাশ', মিলি ঠোঁট উল্টোয়। 'তা মেজোমাইমা, তোমরা এ'সব সহ্য করে দ্যাশে ছিলে কেন?'

অনির প্রশ্নের উত্তরে প্রতিভা বলেন, 'পেটের দায়ে। জ্যাঠামশাইরা দু'জন কলকাতা আর জামশেদপুরে ভালো চাকরিতে এস্টাব্লিশড। কিন্তু বাবা ছিলেন ডাক্তার, তাঁর চেম্বার দেশে, মানে ফরিদপুরের একটা শহরে। বাবার ডাক্তারিতে খুব পশার ছিল, সারা অঞ্চলের লোক চিকিৎসার জন্য আসত। ওষুধের দোকানও খুলেছিলেন। শহরের বাইরে পাঁচখানা গাঁ থেকেও লোকে ওষুধ কিনতে আসত, বাবার রোগীরা তো বটেই। ডাক্তারি সঙ্গে দোকানের রোজগার, এসব ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ কী করবেন। কলকাতায় কি ডাক্তারের অভাব? অবশ্য জ্যাঠারা ঠাকুর্দা সমানে লিখছিলেন চলে আসতে।' চুপ করে যান প্রতিভা।

'তাহলে শেষে এলেন কেন?' কোণ থেকে প্রশ্ন করে মায়া।

নিঃশ্বাস ফেলেন প্রতিভা। 'শেষ পর্যন্ত সেই চলে আসতেই হলো। আমরা পঞ্চাশের দাঙ্গাও সহ্য করেছিলাম। আসলে সে আমলে বেশিরভাগ এলএমএফ পাশ করা ডাক্তার হতো, বাবা ছিলেন এমবিবিএস। তাই খুব খাতির ছিল। শহরের অনেক মধ্যবিত্ত মুসলমান বন্ধু ছিলেন। পরিবারের সকলের, আত্মীয় পরিজনের চিকিৎসা করাতেন। পঞ্চাশের সেই ভীষণ সময়ে তাঁরা জোর করে বলেছিলেন, ' এইটা হইলো আপনার চৌদ্দ পুরুষের ভিটা, ইন্ডিয়ায় ক্যান যাইবেন, আমরা কি পর? কিস্যু চিন্তা করবেন না। আপনারে, আপনার পুরা আমরা ফেমিলিরে প্রোটেকশান দিমু।' দিয়েওছিলেন। সে সময়টা আমরা কোনোমতে কাটিয়ে দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আর কোনো দিনই স্বাভাবিক হলো না। যে কোনো হিন্দু পূজা পার্বণ এলেই কিছু না কিছু অঘটন ঘটত। আমার মুসলমান বন্ধুরা প্রায়ই কথায় কথায় জানতে চায় কবে ইন্ডিয়া চলে যাব, অমুকে গেছে তমুকে গেছে। কয়েক বছরের মধ্যেই স্থানীয় একটি মুসলমান ছেলে ডাক্তার হলো। ঢাকাতে মেডিকাল কলেজে পোস্টেড। তার বাপ আফজল আলি ছিল ব্যবসায়ী, আমাদের খুব পরিচিত, আমরা ভাই-বোন আলিচাচা ডাকতাম। একদিন বাবাকে বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনে তো নিচ্চয় ইন্ডিয়া চইলা যাইবেন যাইবেন করতাসেন। তা যখন যাইবেন আমারে কইবেন, আপনার চ্যাম্বার দুকান সব আমি কিন্যা নিমু। বাজার দরের চাইতে বেশিই পাইবেন।'

'ছেলেকে এখানে বসাতে চান বুঝি?' বাবা জানতে চান।

'হঃ, ঢাকায় হাসপাতালে আর কয়টা ট্যাহা পায়। হেইখানে আপনের চ্যাম্বারে বসলে আপনার পেশেন্টগুলা পাইব, দুকান তো আপনার লক্ষ্মী। পোলাটার শাদি দিসি, বালবাচ্চা হইব, আয় তো বাড়াইতে হইব, বোঝেন ত।'

অনেক বছরের পেশেন্ট ওদের, বাড়িসুদ্ধ লোক। এদিকে মা মাথা খেয়ে ফেলছিল বাবার, আমাকে কলকাতায় মানে ইন্ডিয়ায় বিয়ে দেওয়ার জন্য। পার্টিশানের পর কলকাতার পাত্র কেউ পূর্ববঙ্গের মেয়ে বিয়ে করে? ঠাকুরদা রাগ করে লিখলেন, 'ফরিদপুরে প্রতিভার কী ভবিষ্যৎ ভাবিয়াছ কি?' গড়িমসি করে করে শেষে বাবা ঠিক করলেন চেম্বার আর দোকান আগে বিক্রি করে তারপর এই বসতবাড়ি, সব শেষে গাঁয়ের ভিটে, জমিজায়গার ব্যবস্থা করবেন। তারপর কলকাতায় চলে যাওয়া হবে। ক'বছর হলো পাসপোর্ট ভিসা হয়েছে। সব মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার সরিয়ে ফেলেছে। এবার আলি চাচাকে চেম্বার আর দোকান বিক্রির সিদ্ধান্তের কথা জানালেন বাবা। 'এত দেরি করলেন ক্যান। অ্যাখুন তো আপনাগো জমিবাড়ির দাম অ্যাক্কেরে পইড়া গ্যাসে। জানেন তো আমাগো সংবিধান হইসে, আমরা পূর্ব পাকিস্তান হইসি, আর ইস্ট বেঙ্গল নই। আর সারা পাকিস্তান হইল গিয়া ইসলামিক রিপাবলিক। আপনারা হইলেন সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন। দ্যাশের কোনো বড়ো পোস্ট আপনারা পাইবেন না। ইসলামের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা চলবো না। ভোট আপনাগো আলাদা। এই অবস্থায় আর কত দাম পাইবেন।

'মোটে ৪০ হাজার টাকা চেম্বার আর দোকানের দাম ঠিক হলো, একেবারে জলের দরে ছেড়ে দেওয়া। তাও সই। আলিচাচা একদিন দলিল তৈরি করে বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে নগদ টাকা ৪০ হাজার টাকা হাতে দিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা বাবা শেষবারের মতো চেম্বার থেকে ফিরে মায়ের হাতে টাকাটা দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে তাঁর ইজি



চেয়ারটাতে গা এলিয়ে বসেছেন। মুখ চোখ বসে গেছে। মন ভীষণ খারাপ। আর একটা চেয়ারে মা। পাশে চাদর ঢাকা তক্তপোশে আমি আর বরেন, তার তখন বয়স বছর পনেরো, ক্লাস নাইনে পড়ে, তার ভবিষ্যৎও চিন্তার। এখন কলকাতার স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড অনেক উঁচু, পারবে কিনা। সবাই বাবাকে বোঝাচ্ছি, মন খারাপ করে কী হবে, আমাদের তো আর কোনো উপায় ছিল না। রাত বাড়ে । আমরা খেতে বসব এমন সময় দরজায় জোরে কড়ানাড়া। বরেন খুলতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে আলিচাচা সঙ্গে জনা চারেক ষণ্ডা মার্কা লোক। আমরা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি কী হয়।

বাবা বিস্মিত, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন,‘ কী ব্যাপার, দলিলে কিছু অসুবিধা—’

‘না দলিল সব ঠিক আছে। অসুবিধা হইল নগদ ওই ৪০ হাজার টাকা। ওইটা ফিরাইয়া দিতে হইব।’

‘মানে , কী বলছেন, আপনি তো কিনেছেন, দাম তো আপনিই ঠিক করেছিলেন, ফেরানোর কথা উঠছে কেন?’ বাবা হতভম্ব।

‘ভালোয় ভালোয় দিয়া দ্যান, দেখতাসেন ত?’ বাকি সকলের হাতে এত বড় বড় খোলা ছুরি ঝক ঝক করে উঠল।

‘শোনেন আপনে মুসলমানের অনেক টাকা লইসেন, ঢঙ্গের প্রেস্ক্রিপসন লিখ্যা, দাওয়া বেইচ্যা। আর ট্যাহা পাইবেন না। সকালে যা লইসেন, ফিরাইয়া দ্যান। যান, বাইর কইরা আনেন। নয়তো বিবি পোলা আছে না, আর জোয়ান মাইয়া? অ্যাদের দ্যাখতাসেন?’

‘চুপ করুন। দিচ্ছি।’ বাবা ভিতরে এসে মায়ের দিকে তাকাতেই মা নিঃশব্দে শোবার ঘর থেকে সিন্দুক খুলে টাকার বান্ডিলটা এনে দিলেন। বাবা নীরবে হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে আলিচাচার হাতে দিলেন। গুণে নিয়ে কোনো কথা না বলে দলবল-সহ দরজা দিয়ে বেরতে গিয়ে থেমে দাঁড়ান। মুখ ফিরিয়ে বলেন, ‘শোনেন আবার থানায় গিয়া নালিশ করবেন না। আবশ্য কইরাও কিস্যু লাভ হইব না। ইংরাজের আইন কে মানে।? তা ছাড়া আমার লোকে নজর রাখতাসে। মনে থাকে য্যান।’ সদলে বেরিয়ে গেলে বাবা দরজা বন্ধ করে ভিতরে আসেন।

'চল তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই। আর এক রাতও এখানে থাকা নয়।'

আমরা হতভম্ব। মা কিন্তু নয়। আসলে পঞ্চাশ সালের পর হিন্দুরা বুঝে গিয়েছিল যেকোনো দিন চলে যেতে হবে। '

৫২ সালে পাসপোর্ট ভিসা চালু হতেই পাসপোর্ট আর একটা ইমার্জেন্সি প্ল্যান করে রাখা। কী কী সঙ্গে নেবে, কেমন করে নেবে। পাসপোর্ট, টাকাপয়সা সোনাদানা, সম্পত্তির দলিল,পরীক্ষার সার্টিফিকেট, দু'চারখানা জামাকাপড়। খাবার আর কারও গলা দিয়ে যেন নামছে না। মা বললেন, 'তোমরা সবাই জোর করে করে খাও, এর পরে আর কখন নিজেদের বাড়িতে খেতে পারব কে জানে।' নিজেই সব চেয়ে কম খেলেন। 'যাই সব গোছগাছ সারি।' হাতে করে যে টুকু আমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারব। গয়নাগাটি আমাদের জামাকাপড়ের মধ্যে রুমাল লাগিয়ে পকেটের মত সেলাই করে ভরে নেওয়া হলো। নগদ টাকা বেশির ভাগ বাবার কাছে, কিছু কিছু আমাদের প্রত্যেকের কাছে, যদি অবস্থা গতিকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। প্রত্যেকের কাছে কাগজের স্লিপে কলকাতার বাড়ির আর জামশেদপুরের ঠিকানা। তখন এত রকমের লাগেজ নেওয়ার মতো ব্যাগ সুটকেস হতোই না। সবাই মিলে বেরলে সেই স্টিলের ইয়া ভারী ট্রাংক বেরতো, বিছানাপত্তর সব হোল্ডলে নিতে হতো। তোরা তো সে সব দেখিসইনি।

'আমি দেখেছি, ছোটবেলায় সেই পুরী বেড়াতে যাওয়ার সময় বাক্স বিছানা নিতে হয়েছিল।' বিনি সগর্বে জানাল।

প্রতিভা চুপ করে গিয়েছিলেন। কোণ থেকে মায়া আস্তে করে জিজ্ঞাসা করে, 'তারপর কী হলো মাসিমা?'

'বাবার ডাক্তারি ব্যাগটায় সকলের পাসপোর্ট, দরকারি দলিল, কাগজপত্র, পরীক্ষার সার্টিফিকেট সব প্যাক করা হলো। একটা ছোট অ্যাটাচি ছিল, তাতে সকলের একটা করে চেঞ্জ ঠাসাঠাসি করে ঢোকানো হলো। বাবা মাকে বললেন, গায়ের ভারী সোনার গয়না খুলে সঙ্গে নিয়ে নাও, যদি কিছু নেহাত পরতেই হয় একেবারে হালকা পর। আর শোন, হিন্দু বলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার দরকার নেই, হাতের শাঁখা খুলে ফেল, কপালে সিঁদুরের টিপটাও মুছে দাও—'

'কী যে বলো, আমি এয়োস্ত্রী হয়ে—,'

'তুমি শাঁখাসিঁদুরে এয়োস্ত্রী নও, আমি বেঁচে থাকলেই তুমি সধবা থাকবে। নাও কথা বাড়িও না।' মা চোখের জল মুছতে মুছতে ভিতরে গেলেন, আমি পিছন পিছন। কপালে টিপ ধুয়ে মা শাঁখা পলা সব খুলে সব উঠোনের মধ্যে তুলসীমঞ্চের মাটিতে পুঁতে দিলেন। নিজের হাতের মোটা বালা খুলে শুধু তিনগাছা চুরি আর লোহা বাঁধানো থাকল। তবে কানে গলায় একটু সোনা রইল। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাড়ির মেয়েদের গায়ে সোনা না থাকলেই সন্দেহ করবে। গলার মোটা দড়ি হারটা খুলে রেখে সরু একটা গোট হার পরে নেন। সধবা নারীর তো গলা খালি রাখতে নেই। আর মায়ের গায়ে সোনা, এত বড় মেয়ের কান গলা খালি তো হতে পারে না। আমার হাতের চুরি দু'গাছা, কানে রিং আর গলায় সরু চেনটা পরাই রইল।

'আমরা রেডি,' মা ঠাণ্ডা গলায় বললেন। রাত বারোটা। বাবা বললেন, এই মাঝ রাতে পরিবার নিয়ে বাইরে বেরলে পুলিশ টুলিশের নজর পড়বে। তা ছাড়া সব তো অন্ধকার, রাস্তায় চলাই দুষ্কর । একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক। শুয়ে নাও। চারটে নাগাদ রওনা দেবো।'

মা আর বাবা শক্ত কাঠের মত শুয়ে, বুঝতে পারছিলাম এত টুকু তন্দ্রাও আসেনি। বরেন কিন্তু ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। 'ওরে তোরা ওঠ,' আমারও কখন একটু চোখ লেগে এসেছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসি। দরজা জানালা যে ক'টা খোলা ছিল সব ভালো করে এঁটে, সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। মা বললেন, 'এসো, সকলে তুলসীতলায় শেষ বারের মতো প্রণাম করি।' করলাম। মায়ের দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। বাবা আস্তে করে মায়ের পিঠে হাত রাখেন, 'আমরা তো একসঙ্গে আছি। চল—।'

সবাই খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ভাগ্যিস দুটো কড়া ছিল, সদরের তালাটা ওখানেই লাগানো হলো। অন্ধকার হলেও খুব অসুবিধা নেই, মা ছাড়া আমাদের তিনজনের মোটামুটি রাস্তাঘাট চেনা। যেতে হবে মাদারিপুর ঘাটে। অবশ্য অন্য ঘাটও ছিল। পূর্ববঙ্গে যাতায়াত মানে নদী পার হওয়া, খানিকটা বাসে, খানিকটা স্টিমারে, তার পর ট্রনে। এখানকার মতো ছিল না। বেশিরভাগকেই কলকাতা যেতে হলে প্রথমে গোয়ালন্দ পৌঁছতে হতো। সেখানে আবার স্টিমারে করে পদ্মা পেরিয়ে স্টেশন থেকে যে যেখানে যাবার যেত। আমরা মাদারিপুরে থাকায় সুবিধা ছিল—আড়িয়াল খাঁ ধরে স্টিমারে একেবারে এখানকার ঘাট থেকে সোজা গোয়ালন্দ ঘাটে নামতে পারব। সেখানে ট্রেন ধরে পৌঁছাব কলকাতা। বাবা তো কথায় কথায় বলতেন ইংরেজদের দয়ায় স্টিমার লঞ্চ ট্রেন সব হয়েছে। আগে কী অবস্থা ছিল। নৌকোয় শুধু সময় নয়, রোদে-জলে কষ্ট কত ছিল, আর সময় লাগার কথা তো ছেড়েই দাও। যাই হোক, আমরা তো হাঁটছি। নিঃশব্দে। সকলের মনে ভয়। আলিচাচা কি লোক লাগিয়ে রেখেছে? নজর রাখছে? পিছন পিছন কেউ আসছে না তো? আমাদের যাত্রার শুরু থেকে শেষ ভয় আর ভয়। মাদারিপুর ঘাটে ভয়। আলিচাচা যদি সত্যি ওই গুন্ডাদের আমাদের ওপরে নজরদারি করতে বলে থাকেন, ওরা তো প্রথমেই এখানে হাজির থাকবে। তারপর স্টিমারে সারাক্ষণ ভয়, সব তো মুসলমান মাঝিমাল্লা, যাত্রীরাও বেশিরভাগ। আশ্চর্য, আজন্ম তো এদের সঙ্গে বাস করে এসেছি, নির্ভয়ে। এক সন্ধ্যায় সব বদলে গেল।' চুপ করলেন প্রতিভা।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, 'তারপর?'

' আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে প্রচুর স্টিমার চলত। বাবা বলতেন পূর্ব বঙ্গে নদী গুলোকে কাজে লাগিয়ে জলপথে ব্রিটিশরা যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করেছিল নিজেদের স্বার্থে। যেমন মাদারিপুর থেকে পাট, সোনালি আঁশ ছিল সোনার ফসল, যেত নারায়ণগঞ্জের পাটকল গুলোতে। কত টাকার কারবার ছিল। তবে

আমরা নেটিভরা সুবিধা পেতাম বইকী। পাটের ব্যবসা থেকে স্টিমার যাত্রা। আমাদের প্ল্যান স্টিমারে সোজা গোয়ালন্দ ঘাটে নামব। সেখান থেকে ঢাকা মেইল রাত এগারোটায় ছেড়ে পরদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় শিয়ালদা পৌঁছায় বা চিটাগাং এক্সপ্রেস দুপুর ২টো ৩৫ মিনিটা ছেড়ে শিয়ালদা পৌছবে রাত ১১টা ১৫য়। যেটা পাওয়া যায়।

শেষে আমরা ঢাকা মেইল ধরলাম। ভয়ে সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কিন্তু আমরা কি আর সোজা শিয়ালদা পৌঁছতে পারব? দর্শনা এখানকার বর্ডার, ওপারে গেদে হচ্ছে ভারত। আমরা তো ওখানকার বাস তুলে দিয়ে আসছি। রিফিউজি, যে নামটা শুনতে বাবা এতকাল চাননি। দর্শনাতে ট্রেন আটকে আমাদের সবাইকে নামানো হলো। সারি বেধে দাঁড় করিয়ে পুলিশ আর আনসার বাহিনীর চলল চেকিং । সে কী সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। মনে করতেও চাই না। মেয়েদের শরীরে হাত দিয়ে গায়ের গয়না, বেশিরভাগের পেট, কাপড়ে লুকানো সোনা সব কেড়ে নিল, পুরুষদের কাছ থেকে টাকা পয়সা। কলকাতার সঙ্গে বহু দরকারে তো বরাবর যাতায়াত, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের, বিশেষত হিন্দুদের। কাজেই বাবার গল্প হলো, 'কলকাতায় নিকট আত্মীয়ের অসুখে দেখতে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসব, তাই জামাকাপড় বেশি নিইনি। আমরা পার্মানেন্টলি দেশ ছাড়ছি না।' তাতে ভবি ভুলল না।

'রোগী আত্মীয়রে দ্যাখতে যাইতাসেন সঙ্গে এত দলিল কাগজ ক্যান? ও, খালি বাড়িতে রাখতে ভরসা নাই! আর এমবিবিএস সার্টিফিকেটটা? পেশেন্টের ট্রিট্‌মেন্ট লইয়া কথা কইলে কইলকাতার ডাক্তার যদি না শোনে! জব্বর গল্পখান বানাইসেন। ঠিক আসে, যাইতে চান যান।'

মা চেকিং-য়ের সময় খুব সাহস করে বললেন, 'আমি নিজেই সব গয়না দিয়া দিতাসি কারও গায়ে হাত দিবেন না।' বলে আমাদের দু'জনের গায়ের সব গয়না খুলে ওদের হাতে দিলেন। পেট কাপড় উলটে দেখানো হলো, না, আর কিছু নেই। তবে মায়ের আর আমার সায়ায় সেলাই করা লুকানো গয়নাগুলো বেঁচে গেল। ভারতে ঢুকতে গেদেতে আর এক প্রস্থ চেকিং। তবে ওখানে সমবেদনা, সদ্ব্যবহার। আমাদের নিজেদের লোক খোদ কলকাতায় আছে জেনে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাদের সাহায্যে শিয়ালদা শেষমেশ পৌঁছানো গেল।'

'কলকাতায় এসে আপনি কলেজে পড়লেন? আর গানও নিশ্চয়ই শিখলেন।' মায়া আজ খুব কথা বলছে।

'নারে, সে সব কিছুই হলো না। একা জ্যাঠামশায়ের ওপর আমাদের পুরো সংসার। চেম্বার খুলতে হলে যে মূলধন লাগে সেটা কই। তাছাড়া ততদিনে বড়দির বিয়ের বয়স প্রায় পার হতে চলেছে। তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া দরকার। গয়না অন্তত লাগবে না। কিন্তু বাকি খরচ, আমাদের দু'বেলা খাওয়া-পরা। জ্যাঠামশাইয়ের চাকরিতে আর কতই-বা মাইনে, নিজের তিন মেয়েকে পার করতে হয়েছে, ছেলে ছোটো, তখনও পড়ে। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, দাদা-দিদি আবার তার মধ্যে আমরা চারজন গিয়ে পড়েছি। তিনতলা বাড়ির একতলায় তিনটি ঘরে একটি খোলা উঠোনে বাস। একেবারে গিজিগিজি। আমাদের এরকম ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস অভ্যাস ছিল না। খুব অসুবিধা হতে লাগল। শেষে যাদবপুরে রিফিউজি কলোনিতেই ঠাঁই নিতে হলো। বাবা কোমর বেঁধে লাগলেন পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কারা কারবার করে তাদের সন্ধানে। তখন কলকাতায় রিফিউজিদের নিজেদের বৃত্ত তৈরি হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তো কোনো উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনাই ছিল না। যে যেখানে পারে জবরদখল করে বসেছে, আর পাঁচটা উদ্বাস্তুকে বসতে সাহায্য করছে।

দু'চারজন মুসলমানের সন্ধান পাওয়া গেল যারা হাওয়ালা মারফত ওপারের সঙ্গে লেন-দেন করে। আমাদের মতো কত সর্বস্ব ফেলে রেখে পালিয়ে আসা পরিবার ছিল তার ইয়ত্তা নেই। একজন করিতকর্মা এবং হেল্পফুল দালালের মারফত যেনতেন প্রকারেণ দেশের বাড়ি জমি একে একে বিক্রি হয়ে গেল। কতদূর আইনের মতে হলো কে জানে। কারণ সেগুলো তো সব এনেমি প্রপার্টি হয়ে যাওয়ার কথা। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা বাবা হাতে কিছু টাকা পেলেন। দালালের কৃপায়। সব মুসলমান তো খারাপ নয়। হ্যাঁ, তারও লাভ হলো, সেতো স্বাভাবিক। এবারে কলোনির বাড়িটা পাকা করে, দিদির বিয়ে দেওয়া হলো। দাদার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ, বরেনের স্কুল, সকলের ব্যবস্থা করে আর আমার কপালে কিছু রইল না। ঘরের কাজেই সারাটা দিন কাটত।'

'সেই ঘরের কাজে এক্সপার্ট ছিলি বলেই তো আমাদের সংসারের হাল ফেরাতে পারলি।' নিভাননী সান্ত্বনা দেন।

'আমরাও তো রিফিউজি হয়ে কয়েক বছর আগে চলে এসেছিলাম। তুই যখন এলি তখন সংসারে কোনো ছিরিছাঁদ ছিল না। তুই লক্ষ্মীমন্ত বলেই শ্রী এলো।'

'নোট কর নোট কর, ননদিনীর মুখে ভাদ্দরবৌয়ের গুণগান,' অনির জোর গলায় মন্তব্য। সমবেত হাস্য।



'আচ্ছা,আপনারা কেন এলেন মাসিমা?' আবার মায়ার প্রশ্ন। এই বাঙ্গলার গ্রামে এসে প্রত্যেকের ওই বাঙ্গলার গ্রাম ত্যাগের ইতিবৃত্ত শোনার তার ইচ্ছে হয়েছে, সুযোগ হয়েছে।

'আর সে সব কথা মনে করতেও ইচ্ছা করে না, মনে করিও না।'

'তবু, অন্তত কী ঘটেছিল সেটা একটু বলুন,' মায়া আজ নাছোড়বান্দা।'

'জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকেই বড়দের মুখে শুনতাম হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কথা। কখনও ঢাকা, কখনো নোয়াখালী।

আসলে অনেক বছর ধরেই সারা পূর্ববঙ্গে এসব চলেছে, যেন হিন্দুদের জীবনে এটাই স্বাভাবিক। হিন্দুদের দোকানপাট, ঘরবাড়ি জ্বালানো, বাড়িতে, মন্দিরে গৃহদেবতা ভাঙচুর, বেশি শুনতাম। খুনজখম, ধর্ষণ, জোর করে কলমা পড়ানো আমাদের সামনে বড়রা প্রায়ই চেপে যেতেন। ছোটোরাও শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, বন্যা বা দুর্যোগে যেমন লোকে অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রকৃতির মর্জি, মানুষের সহ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তার মধ্যে কিছু কিছু গ্রামেগঞ্জে শান্তির জীবন ছিল। যেমন আমাদের গ্রামে। অনেক মুসলমান আমাদের জমিতে খাটত, কিছু মধ্যবিত্ত স্কুল টিচার, সরকারি চাকুরে, সম্পন্ন ব্যাবসায়ী মুসলমানও ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের দিব্যি ভালো সম্পর্ক। ছোটোকাকা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, পড়াশোনায় মন, স্কুল মাস্টার হয়েছিলেন। তার বন্ধু ও কলিগ নাসিরুদ্দিনকে তো আমরা নাসির চাচা ডাকতাম। ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব। নাসির চাচার মেয়ে জিনত আর আমি ছিলাম হলায় গলায় বন্ধু। ছুটির দিনে পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত, এক সঙ্গে আদাড়েবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, দস্যিপনা, ওটা আমিই বেশি করতাম, ও মুগ্ধ দর্শক ছিল। ওর ওপরে আবদুল ভাই অন্য মুসলমান ছেলেদের মতো একেবারেই ছিল না। ঠিক আমাদের মাসতুতো খুড়তুতো ভাইদের মতো। ওর সঙ্গেও খুব ভাব ছিল। আমি বয়সের তুলনায় অনেকটা লম্বা, এদিকে ছেলেদের মতো দোড়াদৌড়ি, এর গাছের আম, ওর গাছের পেয়ারা পেরে আনতে ওস্তাদ ছিলাম। আমার মতো তরতর করে গাছের চড়তে গাঁয়ে কোনো মেয়ে দূরের কথা কোনো ছেলেও পারত না। মা রাগ করে বলত, 'তুই মাইয়া না বাঁদরী।' আবদুল ভাই খেপাত, 'ননী বাঁদরী ননী বাঁদরী।'

'ওমা, পিসিমণি তুমি একেবারে টম বয় ছিলে', রুমকির মন্তব্যে সমবেত হাস্য। 'ওই বাঁদরী বল আর টম বয় বল, ওই জন্যেই তো সবাই রক্ষা পেল।'

'কী করে? বলো বলো'।

'আমার বয়স তখন কত , বছর চোদ্দ-পনেরো। বাড়িতে কিছুদিন ধরে সকলের মনমেজাজ খারাপ। একেতো স্বাধীনতার পর ইংরেজের শাসনে যেটুকু আইন শৃঙ্খলা ছিল তার জলাঞ্জলি হয়ে গেছে। তার ওপর ব্যবসায়ে ধাক্কা, কলকাতায় আর পাট পাঠানো যাচ্ছে না, পরিবারের প্রধান আয়ের সোর্সে টান। নতুন বাজার খুঁজতে হচ্ছে। তবু যাহোক ধান চালটা ছিল। এদিকে জমিদারি উচ্ছেদের কথা চলছে, আমরা তো খাতায়কলমে জমিদার নই। তবুও জমির আয়ে জীবনধারণ তো বটে। এর মধ্যে কোথায় জন্মাষ্টমীতে কী বাধা পড়ল, কোথায় দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পোস্টার পড়েছে, কোথায় বিজয়ায় হিন্দু বাড়িতে হামলা হলো, ক'টা হিন্দু দোকান কোথায় পুড়ল ইত্যাদি খবর পাঁচকান হয়ে আসছে।

এই তো দু'মাস আগেই শুনেছিলাম কী তেভাগা না কি আন্দোলন করা কমিউনিস্ট ধরতে হিন্দু সাঁওতাল সব চাষিদের আর তাদের হিন্দু নেতাদের ওপর সাংঘাতিক মার চলছে। পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, কত মরল, কত কী হলো তার ঠিকঠিকানা নেই। বড়রা এ সব নিয়ে কথা বলে, আবার নিত্যকর্মে লাগে। যেন যতক্ষণ একেবারে নিজেদের গায়ে না লাগছে ততক্ষণ সব আগের মতো চলবে। তাদের দেখাদেখি আমরা ছোটোরাও এসব শুনি কিন্তু মনে রাখি না।

কবে যেন শুনলাম আমাদের মৈমনসিং জেলাতেই কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজার আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে মেঘনার ওপর দিয়ে লম্বা ভৈরব ব্রিজের মাঝ খানে নাকি ট্রেন থামিয়ে প্রত্যেক কামরা থেকে বেছে বেছে ধুতি পরা দেখে হিন্দু বলে দা তরোয়াল সব দিয়ে কেটে নদীতে দেহ ফেলে দিয়েছে। যারা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে চেষ্টা করেছে, তাদের তীরে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুসলমানরা পাথর ইট সব ছুড়ে ছুড়ে মেরেছে। হাজার হাজার হিন্দু মারা গেছে। খুনিরা প্ল্যান করে ভৈরব বাজার জংশন থেকেই ট্রেনে উঠে সব কামরায় ঢুকে বসেছিল। ট্রেন পুরো ব্রিজের ওপরে উঠে মাঝখানে আসতেই থেমে যায় আর তারা অ্যাকশান শুরু করে। পুরোটাই পরিকল্পিত গণহত্যা। না, গণহত্যা শব্দটা তখন শুনিনি, হাজারে হাজারে খুন শুধু শুনেছি। তবে ওটাতো হয়েছে কিশোরগঞ্জে, আমরা তো জামালপুর সদরের গ্রাম ফুলপুরে।

মা বলতে লাগলেন, 'ননী আর যত্রতত্র ছাড়া গোরু হইয়া ঘুইরা বেড়াইবি না, তুই এখন বড় হইতাসস, তাছাড়া দিনকাল ভাল না,'

আমি এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিয়ে যথারীতি ইস্কুল থেকে ফিরে দুটো মুখে দিয়ে ব্যস বাড়ি থেকে হাওয়া। তখন শীতকাল, বোধ হয় মাঘ মাসের শেষ। চমৎকার মিষ্টি রোদ, যা আরাম ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু কারও বাগিচায় ফলফুলুরি নেই, এই যা মুশকিল শীতে। আমাকে দেখে জিনত ডাকে, 'ননী আমাদের বাড়ি আয়, লুডো খেলুম। আবদুল ভাই ঘরে আছে, তুই তাকে হারাবি না?, আয়।' আমার চেয়ে দু'তিন বছরের বড়, আবদুল ভাই ক্লাস নাইনে পড়ে, ভালো পড়াশুনায়। আমার বই দেখলেই গায়ে জ্বর আসে বলে ধরে ধরে জ্ঞান দেয়, 'ননী ল্যাখাপড়ারে মন দে, অঙ্ক আর ইংরাজি এই দুইটা মেইন, বোঝলি? ভাল কইরা পড়বি।' উফ। তাছাড়া 'বাঁদরী বাঁদরী' বলে খেপায়। সব মিলিয়ে আমার ভীষণ রাগ। আজ লুডোতে দেখে নেবো।

ওদের বাড়িতেও আলাদা আলাদা অনেক ঘর, আমাদের মতো বাবা-কাকা-জ্যাঠারা এক সঙ্গে থাকে। সামনে আবদুল আর রফিকের ঘরে শতরঞ্চি বিছিয়ে আমি জিনত, ওর চাচাতো বোন রেহানা আর আবদুলভাই লুডো নিয়ে বসি। কিন্তু জিততে পারছি কই। গাছে উঠতে, দৌড়াতে আমি চ্যাম্পিয়ন কিন্তু লুডোয় লবডঙ্কা। ওটাতে আবদুলভাই চ্যাম্পিয়ন। দু'টো গেমে হেরে প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ, এইবার হারাতেই হবে। তাড়া আছে, শীতের বেলা, অন্ধকার বল। বাড়ি ফিরতে হবে।

গুটি ঠিক করতে না করতে বাইরের দিকের দরজা হুড়মুড়

করে খুলে পাঁচ ছ'জন ছোকরা ঢুকে পড়ে। একটা ওদের চাচার ছেলে হামিদ, বাকিরা অচেনা। 'আরে আরে, এখানে ক্যান? কী করেন কী, আমরা মাইয়ারা আছি,' বলে জিনত উঠে দাঁড়ায়। আমরা সবাই উঠে পড়ি।

'হেইটা ওই চৌধুরী বাড়ির মাইয়া না?' হামিদ বলে। 'হিন্দুর মাইয়াটার লগে বইস্যা তরা কী করতাসস, অ্যাঁ?' বাকিরা একযোগে 'হিন্দুর মাইয়া হিন্দুর মাইয়া' করতে থাকে। জিনত আর রেহানা দৌড়ে ভিতরে চলে যায়। আমি কোণের দিকে বসেছিলাম। খানিকটা হতভম্ব হয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াই।

'শরীরটা দ্যাখ, লম্বায়চওড়ায় জব্বর হইসে, খালি রংটা আর মুখটা আল্লা দেন নাই। হা-হা-হা।' আর একজন বলে, 'আরে গায়ের রং, রূপ এ সব দিয়া কী হইব। আসল জিনিস ঠিক আসে', বলতে বলতে খপ করে আমার হাত ধরে।

'অ্যাই কী বেত্তমাজি করতাসস?' বলতে বলতে আবদুলভাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। ততক্ষণে আমিও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছি।

'খবরদার, অর গায়ে হাত দিবা না।'

'ক্যান তোর অ্যাত দরদ ক্যান? মাস্টার বাপের পোলা খালি বইখাতা জানস, হিন্দুদের লাখান। খবর রাখিস, কইলকাতায় হিন্দুরা কী করতাসে? আমাগো ফজলুল হক, শের-এ-বাঙ্গালরে কাইট্যা ফেলাইসে, আর তুই হিন্দু মাইয়ার সাথে রঙ্গরস করিস? তুই না মোছলমানের পোলা?'

ফজলুল হকটা আবার কে। নাম বোধ হয় শুনেছি শুনেছি। আমি কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই আবদুল বলে ওঠে, 'যা যা বাজে গুজব। আর সইত্য হইলেও তাতে আমাগো হিন্দুদের কী দোষ? এই হামিদ, এরা কারা?'

'এরা সব আমাগো ফৌজ, কাল আনসার বাহিনী আইব, এই ফুলপুরে অ্যাকশান শুরু হইব। আশপাশে কত গ্রামে অ্যাকশান শুরু হইয়া গ্যাসে, জানস না? লক্ষ্মণপুর, সাপমারি,'

'আরে কাল ক্যান, আইজ অ্যাখুনি শুরু কইর‍্যা দেই। অ্যাই মাইয়াটারে দিয়া।'

'খবরদার তোমরা আগাইবা না। অর আব্বুরে আমি চাচা ডাকি, অরে আমি অ্যাতটুকা বয়স থিক্যা জানি, আমার ছুট বুইনের লাখান।

' 'চাচা ডাকস! চাচা আপন চাচি পর, চাচির মাইয়া শাদি কর। হক্কলে মিল্যা করুম, তরেও ভাগ দিমু। হা-হা-হা।'

ওরা এগিয়ে আসার আগেই আবদুলভাই এক ধাক্কায় আমাকে বাইরের দরজার সামনে ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে, ' পালা, ননী, খুব জোরে দৌড়া, পালা।'

আমার ততক্ষণে হুঁশ পুরো এসে গেছে। এক লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমি ছুটতে শুরু করি। পিছন পিছন আবদুলের চিৎকার শুনি, 'না, আমি কপাট ছাড়ুম না, ননীর গায়ে হাত লাগাইতে দিমু না।'

পালটা চিৎকার, 'হালার পো হালা, বেইমান, হিন্দুর হইয়া লড়স! তর কলিজার এত জোর! দ্যখ তোর পিরিতের কী করি।' আর্তনাদ ভেসে আসে 'আল্লা আল্লা!'

আবদুল ভাইয়ের গলা, না! থমকে যেতে গিয়ে সামলে নিই। আমাকে বাঁচাবার জন্য দরজা আগলেছে আবদুল ভাই। আমাকে বাঁচতেই হবে। কিন্তু সামনে বিশাল মাঠ, এখনো আবছা আলো আছে, এতগুলো জোয়ান মরদ যদি পিছু নেয়! বাঁ-দিকে সাহাদের মস্ত ফলের বাগান। গ্রীষ্মকালে আমি কত আম জাম পেরেছি। সাঁ করে ঢুকে যাই। এখানে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। একটু ভিতরে গিয়ে একটা বড় মতো গাছ বেছে চড়তে শুরু করি। যতটা পারা যায় ওপরে উঠে বসি।

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়া গেল। চারিদিকে তাকাই। এখানে থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে মাঠের ওদিকে আবদুলদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু কী হচ্ছে না হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। আবছা চীৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসে। বাইরে চারিদিক নিস্তব্ধ বলেই বোধ হয় এত দূর থেকে শুনতে পাই। মাঠে কিছু লোক, না? হাতে লণ্ঠন উঁচু করে কী দেখছে। আমাকে খুঁজছে। আমি আরও গাছের ডালের পাতার সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা করি। না, এদিকে আসছে না। খালি মাঠে খোঁজাখুঁজি করছে। আস্তে আস্তে সব নিস্তব্ধ আর অন্ধকার হয়ে যায়।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। শেষে ঘুম পেতে লাগল। সাবধানে নেমে বাগিচার বাইরে আসি। বোধ হয় কৃষ্ণ পক্ষ, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। দূরে জিনতদের বাড়ি থেকে মিট মিটে আলো আসছে, কিন্তু তেমন কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমি বাগিচা থেকে বেরিয়ে ধার ঘেঁষে চলি, দরকার হলে ফট করে ভিতরে ঢুকে যাব। পাড়াবেড়ানি বলে গ্রামের মাঠঘাট রাস্তা সব নখদর্পণে। তাই সাবধানে মাঠঘাট পেরিয়ে অন্ধকারে প্রায় হাতড়ে হাতড়ে বাড়ি পৌছতে পারলাম। পৌঁছে দেখি এক কাণ্ড, রাত ন'টা বাজে, আমার এত দেরি দেখে খোঁজাখুঁজি করতে লোকে বেরিয়ে পড়েছে। আমি ঢুকতেই মায়ের গর্জন, 'আইজ তরে আমি কাইট্যা ফ্যালাইমু, জোয়ান মাইয়া মাঝ রাইত কইরা বাড়ি ফেরস।' ঠাকুমা মাঝখানে পড়েন, 'আহা, ঘটনা কী আগে শুনবার লাগব।'

বাড়িসুদ্ধ লোক আমাকে ঘিরে বসে আমার বৃত্তান্ত শোনে। ঠাকুর্দা-বাবা-কাকারা সব শুনে আলোচনায় বসেন। দু'মাস হলো সেই যে হিন্দুরা কমিউনিস্ট, তেভাগার লিডার বলে মারদাঙ্গা শুরু হয়েছে, তারপর থেকে নিত্যনতুন গুজবের বাহানায় লুঠপাট, খুনজখম, মেয়েদের ওপর অত্যাচার, ঠাকুরদেবতা ভাঙচুর, কুকাজ আর কত কী চলছে।

'সারা পূর্ববঙ্গ ধরেই চলতাসে সেই '৪৬ সাল থিক্কা। ইংরেজ তাড়ইয়া কী ভুল করলাম—' মেজকাকার মন্তব্য।

'আরে '৪৬ নয়, সেই ১৯০৫ সালের পর থিক্কাই নিশ্চিন্তে আর কখন থাইকতে পারলাম। যেই এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল ব্যস এক্কেরে মাথায় চইড়া বসল।'

ঠাকুর্দার বিলাপ বাবা থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'এখন হেইসব বেকার কথা রাখেন, শিরে সংক্রান্তি। প্রাণ মান ধন সব যাইতে

বসছে। কী করন সেইটা স্থির করেন।' আলোচনায় ঠিক হল, বাবা, মেজ ও সেজকাকা স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে এখনই দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবেন। তখনো পাসপোর্ট হয়নি, বাবাদের পারমিট ছিল যাতায়াতের, ব্যবসার জন্য করানো ছিল। ঠাকুর্দা ঠাকুমার এ বয়সে এ ভাবে তাড়াহুড়ো করে যাওয়া পোষাবে না, তাছাড়া তাঁরা চৌদ্দ পুরুষের ভিটেতে মরবেন স্থির করেছেন। ছোটো কাকা দেশ ছাড়তে রাজি নন, তিনি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমান শতশত বছর পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে এসেছে, এখন যেটা হচ্ছে সেটা স্রেফ রাজনীতি, বেশিদিন চলতে পারে না, একদিন না একদিন শুভবুদ্ধির উদয় হবেই হবে। তাছাড়া তিনি তো অবিবাহিত, স্ত্রী-কন্যার সমস্যা নেই। বরং বাবা-মাকে দেখার জন্য রয়ে গেলে সকলের মঙ্গল। মেজসেজ ঠাকুর্দাদের কিছু বলা হল না, কারণ দু'বাড়িতেই নাকি কেউ কেউ পলিটিক্স করে। ছোটো কাকা সুবিধামতো পরে জানাবেন।

অতএব আমাদের যাওয়ার প্রস্তুতি। সঙ্গে ওই প্রতিভা যা বলল, যা আমরা নিজেরা বইতে পারি। এমন সামান্য কিছু নিয়ে রাত্রিশেষে রওনা। কলকাতায় কোথায় উঠব? আমাদেরই গ্রামের ঘোষবাড়ির হরেন্দ্রনাথ, আমাদের হরেন জ্যাঠা ছিল বাবার ছোটোবেলার বন্ধু। হরেন জ্যাঠা পড়াশোনায় ভালো ছিলেন, কলকাতার কলেজে পড়ে পাশটাস করে সরকারি চাকরি করেন। তাঁর ঠিকানা আছে। প্রথমে সেখানেই উঠে তারপর একটা ব্যবস্থা। আসলে হরেন জ্যাঠার ভরসাতেই আমাদের দেশ ছাড়ার প্ল্যান করা হলো। তবে কারবারের সূত্রে কিছু চেনাজানা ছিল, দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনও ছিল, তবে কলকাতায় নয়।'

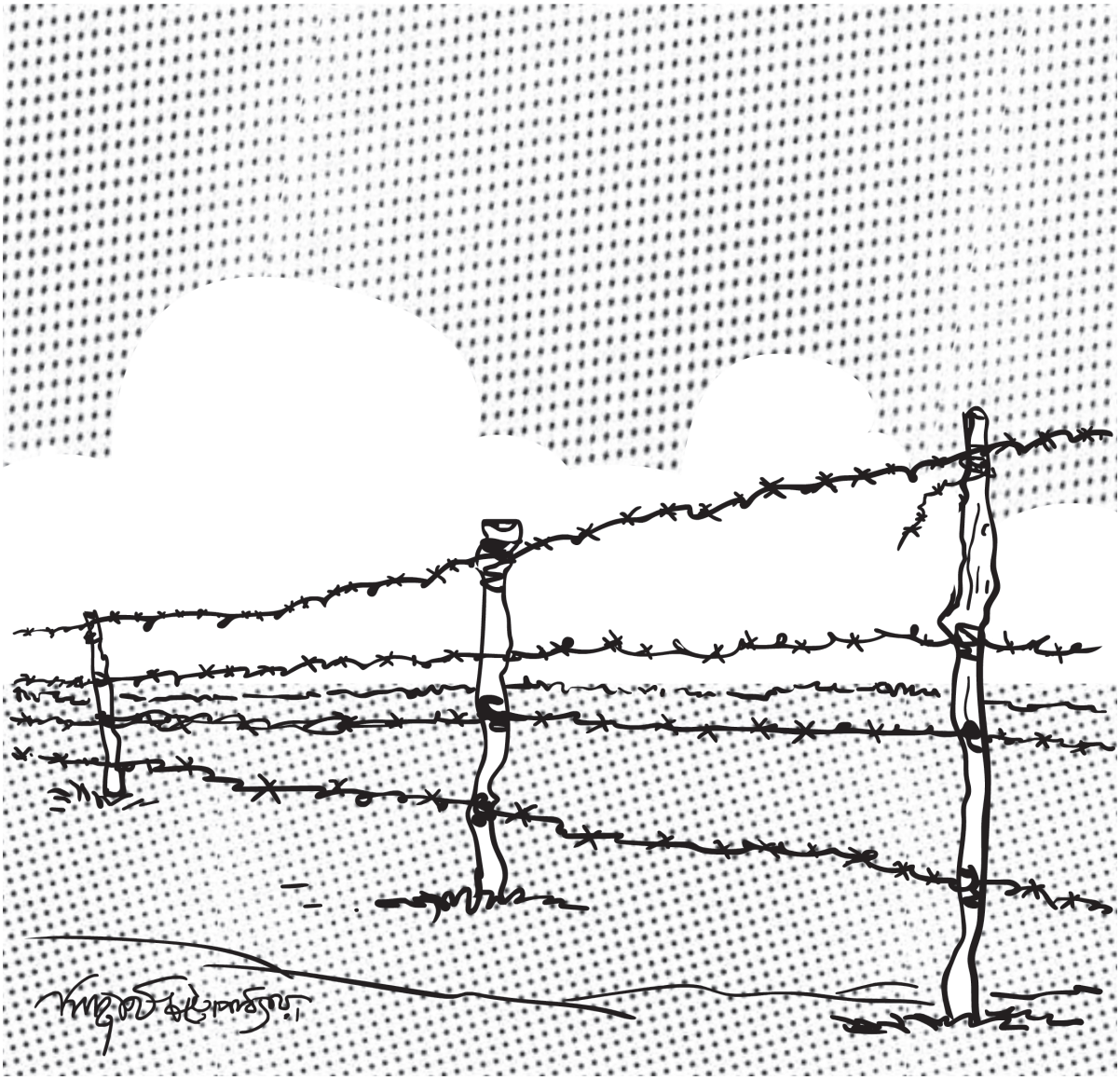
'অ্যাত পুরুষের অ্যাত জমিজায়গা, কারবার। আর আমার পোলারা হইব উদ্বাস্তু, রিফিউজি। ভগবান এও তুমি আমার অদৃষ্টে লিখসিলা।' ঠাকুর্দার শেষ কথা।

নিভাননী চুপ করলেন। সকলেই চুপ। মায়া জিজ্ঞাসা করে, 'তারপর কীকরে পৌঁছালেন এখানে।'

'আর কী করে। ওই মেজো যা বলল। মোটামুটি এক গল্প। তবে পার্থক্য হলো সেটা ৫০ সাল, চারিদিকে হিন্দু খেদানো চলছে, আমরা জামালপুর সদরে যেতেই দলে দলে সঙ্গী পেলাম। তবে যাওয়া তো সহজ ছিল না। গ্রামে তো সব দাঙ্গাবাজ এসে গেছে। তাই শেষ রাতে চুপিচুপি পায়ে হেঁটে ছাড়তে হলো। গাঁয়ের সীমানার বাইরে এসে তারপর দুটো বলদ গাড়ি নেওয়া হলো। প্রথমে সদর। সেখানে থেকে সরিষাবাড়ির জগন্নাথ ঘাটে যমুনানদী, রেল স্টিমার ফেরিতে পেরিয়ে সিরাজগঞ্জ, সেখানে ঈশ্বরদি রেলস্টেশনে। ঈশ্বরদির নাম শুনেছিস? পাবনা জেলায়। সেখান থেকে ইস্ট বেঙ্গল মেইল ধরে রাণাঘাট হয়ে শিয়ালদা।

সর্বত্র সাংঘাতিক ভিড়। হাজার নয়, লাখ লাখ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছাড়ছিল। এমন জেলা ছিল না যেখান থেকে হিন্দুরা সব ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে পালাচ্ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের বিধান রায়ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। কাজেই রাণাঘাটে আমাদের তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। হলো কলকাতায় পৌঁছাবার পর। নেহরু থেকে বিধান রায় কারও কোনো প্ল্যান ছিল না কীভাবে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের থইথান হবে। ফলে যে যেখানে পেরেছে জবর দখল করে থাকতে বাধ্য হয়েছে। যেমন এই যাদবপুরে। তখন এটা শহরের প্রান্ত ছিল। ওখানে বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারিরা থাকত। যুদ্ধ শেষ হবার পর সৈন্যদের ব্যারাক খালি পড়ে ছিল। ১৯৪৭ সালেই উদ্বাস্তুরা ওখানে গিয়ে বসল। পরে সরকার তাদের উৎখাত করতে চাইলে সবাই মিলে এমন লড়াই করল যে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হলো আর জমি সব উদ্বাস্তুদের নামে হয়ে গেল। তাই তো আমাদের এলাকার নাম বিজয়গড়। বাবারাও ওখানেই বাসা করলেন, প্রথমে কোনো মতে টিনের চাল, এক তলা। তারপর পাকা বাড়ি। আস্তে ধীরে মেজকাকা সেজকাকা কাছাকাছি বাড়ি করেন। আমরা যখন আসি তখন ওখানে ইস্কুল হয়ে গেছে। আমি কিছুদিন পড়েছিলাম। মন ছিল না। ম্যাট্রিকটা কোনো ক্রমে পার করা। বাবার বন্ধু হরেন জ্যাঠার কথা বলেছিলাম যিনি সরকারি চাকরি করতেন, ওঁর ওখানেই প্রথমে আমরা এত লোক উঠেছিলাম। ওঁর পরামর্শেই বিজয়গড়ে আসা, থাকা সব, 'এখন জায়গা দখল না করলে পরে আর পাইবা না।' তাঁর ছেলেই তোদের পিসেমশাই। হ্যাঁ উনি এম.কম. পাশ ছিলেন, আর আমি ম্যাট্রিক, তারপর চেহারা তো এই। তখনকার দিনে গ্রামসূত্রে সম্পর্কের, বন্ধুত্বের খুব দাম ছিল। সরকারের কোনো ট্যাক্সের ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। কাজের সূত্রেই অনেক জানাশোনা ছিল। সেই কানেকশানেই বাবাদের ব্যাবসাট্যবসা শুরু করতে সুবিধা হলো। তবে পাটের কারবারের সুবাদের কিছু নিজেদেরও জানাশোনা ছিল। ছোটখাটো কন্ট্র্যাক্টরি, মাল সাপ্লাইটাপ্লাই দিয়ে শুরু। খুব পরিশ্রম করতে হয়ে ছিল, ওঁরা তো কলকাতার বাজারের কিছুই জানতেন না। তবে ব্যবসার ধারা তো পরিবারে ছিল। তাই কিছু করতে পারলেন। হরেন জ্যেঠা প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আমার ভাইয়েরা কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছে, সবাই সায়েন্স পড়ত। তখনো ক'টা বিলাতি কোম্পানি ছিল, সেখানে চাকরিও করেছে। বড় কিছু নয়। তাই ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতেই লাগল। ওই কী সব বলে, কোম্পানির সব ডিলার না কি। প্রতিভা তার আগেই ঘরে এসেছে, তখন খুব টান টান অবস্থা। বাবা-কাকারা সবাই এক ছাদের তলায়। খুব খাটুনি গেছে ওর। তারপর অবস্থা একটু ফিরলে আস্তে আস্তে সব ভিন্ন হলো। ওই যাদবপুরেই প্রথমে মেজ কাকা ও পরে সেজ কাকা ভিন্ন জায়গায় বাড়ি করল। তারপর এক বাড়িতে তাদের ছেলেরা দোতলা তিনতলা তুলে ভিন্ন হলো। এখন যার যার তার তার। আমরা সব এখানকার মতো হয়ে গেলাম। দেশের ভাষা কবে ছেড়ে দিলাম মনেও নেই। মানসিকতাও ছাড়লাম। কারও আর পাঁচ-ছ'টা ছেলেপুলে নেই। আমার তিনটে, ভাইদের দু'টো করে, সব এম.এ. পর্যন্ত পড়েছে। মিলি আর রুমকিকে তো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো হয়েছে।'

'আচ্ছা মাসিমা, দেশে যে ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, ছোটোকাকা রয়ে



গেলেন, তাঁদের কী হলো? আপনারা আসার পর দিন যে অ্যাকশান হবার ছিল?'

নিভাননী চুপ করে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'হ্যাঁ অ্যাটাক হয়েছিল, আনসাররা গাঁয়ের গুন্ডাদের সঙ্গে নিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকে সব আসবাবপত্র, ঠাকুরঘর ভেঙে চুরে দিয়ে গোলায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আর অশ্রাব্য গালিগালাজ, দুইটা শুটকা বুইড়া-বুড়িকে রাইখ্যা জোয়ানরা পালাইসে। এগুলারে মাইরাও সুখ নাই। ছোটোকাকাকে বেদম পিটছিল, ওই হামিদ, রেহানার চাচাতো ভাই, ও বাঁচায়,'

'পরানটা রাখ, কামে দিব। হালার পো মালাউন অঙ্কের মাস্টার। আমাগো পোলাগুলারে শিখাইব।'

'মেজসেজ ঠাকুর্দাদের, বাকি গ্রামের কী হলো?'

'শোন, এসব আর জিজ্ঞাসা করিস না। মনে করতে ইচ্ছা করে না। আর পাঁচটা হিন্দুর যা হয়েছিল তাই হলো।' কিছুক্ষণ নীরবতা।

এবার মায়ার প্রশ্ন, 'আচ্ছা মাসিমা, সেই যে আপনার আবদুল ভাই যে আপনাকে বলতে গেলে বাঁচাল, তার কী হলো কোনো খবর পরে পেলেন?'

নিভাননী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'হ্যাঁ। পরে ছোটোকাকার চিঠিতে জানতে পারি আবদুল কপাট দু'হাতে আগলে দাঁড়িয়েছিল বলে হামিদের দলবল মেরে ওর দুটো হাতই ভেঙে দিয়েছিল। ডান হাত কোনোক্রমে কাজ চলার মতো হয়েছিল, বাঁ হাতটা হয়নি। তখন তো ডামাডোল চলছে। ঠিক মতো চিকিৎসা পায়নি। ডাক্তার বেশিরভাগ হিন্দু, তারা চলে যাচ্ছে। চিকিৎসা, লেখাপড়া সব কিছুর বিশৃঙ্খল অবস্থা। তবে ওই অবস্থাতেই আবদুল ভাই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিল। ছোটোকাকাই নিজে যত্ন নিয়ে পড়িয়েছিলেন। পরে ওই স্কুলেই টিচার হয়েছিল।'

'উনি রয়ে গেলেন, না? ওর ছেলেমেয়ে আছে?' নিভাননী নিরুত্তর।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলেন, 'ছোটোকাকা বিয়ে করেননি। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর গ্রামে রামঠাকুরের আশ্রম করেছিল। না না, এই রামঠাকুর রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র নন। দেশে এক জন রামঠাকুর ছিলেন। এঁর জন্ম ফরিদপুরে, নোয়াখালীতে প্রধান আশ্রম ছিল। পূর্ববঙ্গে তাঁর ভক্ত চারিদিকে। ছোটোকাকা গ্রামে তাঁর আশ্রম খুলেছিল। স্কুলের পর ওখানেই থাকত। কিছু ভক্তও আসত, সন্ধ্যায় রামঠাকুরের নাম গান হতো।

শোন, আমাদের যাদবপুরেও রামঠাকুরের আশ্রম আছে, কৈবল্যধাম।'

'তারপর?' নিভাননী চুপ করে থাকেন।

মায়া আবার বলে, 'তারপর?' 'তারপর আর কী। '৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় রাজাকাররা আশ্রমে হামলা করে। অন্য ভক্তদের সঙ্গে ছোটোকাকাও মারা যায়।'

'উনি খুন হন!' 'কই তুমি, বাবা কেউ তো আমাদের বলনি!'

বিনি, অনির এক যোগে নিভাননীকে আক্রমণ।

'তোমরা তো সব সময় দেশ সম্বন্ধে খালি ভালো ভালো কথাই বলে আসছ। এটা তোমরা ঠিক করনি। বাস্তবকে গোপন করা অন্যায়', অনি রাগ করে।

বিনি বোনের হাত ধরে, 'চুপ কর। বুঝতে চেষ্টা কর। মানুষ যদি দুঃখ কষ্ট না ভোলে তাহলে বাঁচতেই পারবে না। যাই ঘটুক, জীবন থমকে থাকে না। ঠিক চলে।'

'রাখ তো তোর গুরুগিরি। আপনজনের এমন পরিণতি ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জানতে পারল না। আমার তো দেশ সম্পর্কে ধারণাটাই বদলে যাচ্ছে।'

'দ্যাটস আনফেয়ার, অনিদি। পিসিমণি তো বললেন কত ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটছিল।'

'হ্যাঁ বললেন। সেগুলো জাস্ট খবরের কাগজের খবর। অমুক স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় এত নরনারী নিহত, এত জখম, এত অপহৃত, ধর্ষিত,এত সম্পত্তি ধ্বংস। এসব তো আমাকে টাচ করে না। কিন্তু ছোড়দাদুর খুন হওয়া! তুই বুঝতে পারছিস না? এটা তো আমার এখানে লাগে,' বুকে একটা থাপ্পড় মারে।

'অনিদি হ্যাজ আ পয়েন্ট,' মিলির সমর্থন। 'আমাদের শেখানো হয়েছে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ইংরেজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির ফল, আগে বরাবর হিন্দু-মুসলমান ভাইভাই ছিল। পার্টিশান ব্যাপারটাই বজ্জাতি, ইংরেজদের করা। আর পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা নাকি সব বিহার থেকে যে সব মুসলমান রিফিউজি গিয়েছিল, তাদের কীর্তি। বাঙ্গালি মুসলমানদের নয়। পিসিমণির আর মায়ের কথায় তো দেখছি সব দেশের লোকেরাই করেছে, অন্তত তারাই পালের গোদা। আমাদের পুরো ভুল বোঝানো হয়েছে। ওখানকার মাটিতেই বিদ্বেষ।' রুমকি ক্ষোভ উগরে দেয়।

'আবদুল ভাইকে ভুললে চলে না,' বিনি মনে করায়।

'ভুলছি না। কিন্তু আবদুল ভাই ব্যতিক্রমী এক জন, আর ওরা অসংখ্য। ইংরেজিতে একটা কথা আছে না? এক্সেপশানস প্রুভ দ্য রুল?' শেষ কথা রুমকির, ভালো ছাত্রী তো।

মায়া চুপ করে শুনছে। 'ছোটো মাসিমার নিজের কোনো কথা নেই, উনি তো জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকে কলকাতায়। কী সৌভাগ্য।'

অপর্ণা নীরবে মাথা হেলায়, হ্যাঁ সৌভাগ্য। জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকে কলকাতায়। বয়স্কদের চোখ বন্ধ। ছোটোরা মোবাইলে ব্যস্ত। মিলি সারাক্ষণ ঝুঁকে ঝুঁকে অনির মোবাইলে দৃষ্টি দিয়ে যাচ্ছে। খানিক ক্ষণ পরে জানায়, 'তোমাদের সব কথা রেকর্ড করা হয়ে গেছে, ইন ফ্যাক্ট ভিডিয়ো। অনিদি এডিট করে সবাইকে ফরওয়ার্ড করে দিও, প্লিজ।'

'শিওর।'

সবাই চুপ। প্রতিভা প্রায় ঘুমিয়ে। রিল্যাক্সড্, যেন একটা বিশাল ভার মাথা থেকে নেমে গেছে। নিভাননী নীরব, তাঁর গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। শুধু মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে যাচ্ছেন, না না না। অপর্ণা মৃদু স্বরে বলেন, 'দিদি, ওরা বুঝবে না। এমন অনেক কষ্ট আছে যা বলা যায় না। বললে আবার কষ্ট।'

নিভাননী মাথা হেলান, 'হ্যাঁ, এই জন্যেই আমি দেশের কথা মনে করতে চাই না। যে টুকু করি ভালোটাই করি।'

'আপনাদের বংশের তাহলে ভিটেতে আর কেউ নেই?' মায়া প্রসঙ্গ বদলাতে যায়।

'আছে। বললাম না, ঠাকুর্দারা তিন ভাই ছিলেন। আমাদের পর তাঁদেরও বেশির ভাগ দেশ ছাড়েন। কেউ কেউ অসমে কেউ উত্তরবঙ্গে। আসলে যার যেখানে কুটুম্ব বন্ধু বা জানাশোনা ছিল সেখানেই প্রথমে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর সব ছড়িয়ে গেছে। খালি সেজ ঠাকুর্দার মেজোছেলে রয়ে গিয়ে ছিল। সে জমিজমা চাষবাস নিয়ে আওয়ামি লিগটিগ করে টিকে আছে। বাকি সব চলে এসেছে।'

'আমরা রাঙামামা বলি। একবার তিন মেয়েকে নিয়ে


SAHARA®

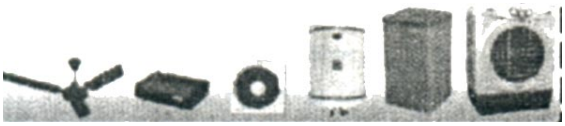
Air Coolers, Storage Water Heaters, Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans, Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

*Manufacturers of :*

**SAHARA Electrical Appliances**

D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com



এসেছিলেন। মেয়েগুলো কী গাঁইয়া। বোন বলে ভাবতেই পারা যায় না। যেমন সেকেলে শাড়িব্লাউজ, তেমনই সাজগোজের ছিরি। সব খালি ছেলেপুলে ঘরসংসার নিয়ে আছে। বড় জোর সিনেমা। আর কিছু জানে না।' অনি যোগ করে। 'আর বাঙ্গলায় তো মা গঙ্গা।'

'রুমকির শিক্ষিকা সুলভ টিপ্পনি। হি-হি-হি। নিভাননী ধমক দেন, 'জামালপুরের গ্রামে মানুষ হয়ে এর থেকে বেশি আর কী হবে। তোদের সঙ্গে তুলনা করিস কেন।'

'তোমরা রিফিউজি হয়ে কলকাতায় না এলে আমাদেরও ওই অবস্থা হতো।' বুঝদার বিনি পর্যন্ত এখন এদের দলে যোগ দিয়েছে।

'বলিস না দিদি, বলিস না। দ্যাশের কথাতো ভাবলেও ভয় করে!' অনি ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুল ঠিক করে লিপস্টিক মেরামত করতে করতে বলে।



ভয় ভয় ভয়। অপর্ণার কাছে দেশ মানে শুধু ভয়। ভাগ্যিস ওকে কেউ দেশের কথা জিজ্ঞাসা করে না। সবাই যখন চলে এলো, তখন ওর তো মোটে পাঁচ বছর বয়স ছিল, জ্ঞান হয়নি বটে কিন্তু মুখে বুলি ফুটে গিয়েছিল।

আচ্ছা, জ্ঞান হওয়ার আগে কি কিছু মনে থাকে? কেমন আবছা সব ছবি। অনেক অনেক ছবি। ঠাকুর্দার কাছে বসে একদিন বলছি, 'উঠানে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, ঠাকমা আলপনা দিতাসে, ধানের শীষ, তার দুই পাশে লক্ষ্মীর পা। মা লক্ষ্মী পা ফেইল্যা ফেইল্যা ঘরে ঢুকব।'

'কোথায় তুই ঠাকমার লক্ষ্মীর পা আঁকা দেখসস, হেইটা বৈশাখ মাস। গত বৎসরের কথা বলতাসস? না, তর ঠাকমা আলপনা দেয় নাই, বুড়ি তো বাতের ব্যাদনায় কোঁ কোঁ করতাসিল।' ঠাকুর্দা হেসে তাকে শুধরাতে যান।

'গত বৎসরের আগের বৎসর চতুর্দশীর রাইত জাইগ্যা মা বাড়ি ঘর উঠান সব ভইরা আলপনা দিসিলেন। বাবা আপনে ভুইল্যা গেসেন। সকালে উইঠ্যা আমরা তাজ্জব। কী যে সুন্দর, এক্কেরে ছবি।' মা এবার শ্বশুরমশাইকে শোধরান।

'অ্যাতটুকু মাইয়ার মনে আছে আর আমাগো নাই! আশ্চর্য। বুঝলা বৌমা তোমার এই মাইয়াটার মগজে একটা ক্যামেরা আছে। অ্যাক্কেরে মুভি ক্যামেরা। খালি ছবি তোলে। শুধু ক্যামেরা নয়, রেকর্ডিংও চলে।'

অনেক অনেক ছবি আছে অপর্ণার অ্যালবামে। ভিডিয়ো। শীত কাল। মায়ের হাতে দুধভাত খেয়ে লেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে আমি শুয়ে। আজ রাতে বাবা মা ফিস ফিস করে কেন কথা বলছে। 'কাজীর চর, খাসেরহাটে হামলা হইসে, সাতানিতে নন্দীরা দুই ভাই, বেশ পয়সা করসিল, দুইজনেই খতম। ডাক্তার ব্যানার্জি, আরও এক ডাক্তার দুই জনই খুন।'

'ডাক্তার মাইরা কী লাভ । অরা কি শুধু হিন্দুদের চিকিৎসা করতেন।' 'সবাই মুলাদী গেসিল, নালিশ করতে, থানাবাবু কইলেন,'সব অসুখে মরসে। যান পুড়াইবার ইন্তেজাম করেন গিয়া।'

মা চোখ মুছছে, বিড়বিড় করছে, 'ঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

তারপর একটা ভিডিয়ো। সারা সকাল ধরে চারিদিকে আওয়াজ, দুম দাম, চীৎকার, আল্লাহু আকবর। বেলা বাড়লে সব চুপ। আমাদের দরজা জানালা বন্ধ। আমি দু'টো পুতুল নিয়ে বসে আছি।। খেলছি না। মা বাবাকে বলে, 'কামকাজে গেলা না?'

'খ্যাপসো? আর কামকাইজ কিসু হইব? পরিস্থিতি খুব খারাপ। যাদের বাড়িঘর ভাঙচুর হইসে, টাকাকড়ি সোনা দানা সব লইয়া গেসে, তারা থানায় গেসিল, পরানটা বাঁচাইতে, শেল্টার লওনের লাইগ্যা। ওদের ভিতরে ঢুকাইয়া ওসি গুন্ডার দলকে ডাক দিসে। সেখানেই সব কচুকাটা।'

মা কেঁদে ফেলে 'আর কইও না, শুনুম না। ভগবান, তুমি কি নাই!' মা খালি কাঁদে। এই 'কচুকাটা' কথাটার মানে কী। ওখানে কি কচু ছিল। আর কচু কাটলে কান্নার কী আছে।

খেতে বসে দেখি শুধু ভাতে ভাত। অন্যদিন মা তো কত পদ রাঁধে। 'খামু না।' মা চড় মারতে হাত উঠায়, বাবা হাতটা ধরে ফেলে। ঠাকুর্দা বলে, 'পোলাপান, কী বোঝে।' ঠাকমা হাঁটুতে ব্যথা নিয়েই সারা দিন লক্ষ্মীনারায়ণের সামনে বসে কী যে কান্না কাঁদছে। ভারি বিরক্ত লাগে। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে। শুনি বাবা মা ফিসফিস করে সমানে বলে চলেছে, কোথায় হামলা হলো, কত দোকান ভাঙচুর, কে কে মরল, কত বাড়ি জ্বলল।

আবার ছবি, ভিডিয়ো। সকালে খেতে বসেছি, বাটিতে খালি দু'টো মুড়ি। গোয়ালা আসেনি, দুধ নেই। বেশ রোদ উঠেছে। এমন সময় শোনা গেল বাইরে হাঁক দিয়ে যাচ্ছে, 'সব হিন্দু আর খ্রিস্টানরা মুলাদী বন্দরে পাঁচ তহবিল, মাধব লাল কুণ্ডু , সুখময় কুণ্ডুর গুদাম ঘরগুলায় চইল্যা আসেন। আপনাগো লাইগ্যা রিলিফ ক্যাম্প খুলা হইসে। টাকা কড়ি সোনাদানা সব লইয়া আসেন। বাড়িতে কিসু ফেলাইয়া গেলে আমরা দায়িত্ব নিমু না। আসেন হক্কলে বাইর হইয়া আসেন, বুড়াবুড়ি পোলামাইয়া হক্কলরে লইয়া সোজা মুলাদী বন্দর গুদামগুলায় চইলা আসেন।'

তারপরের ছবি। রাস্তায় কী ভিড় কী ভিড়। তার মধ্যে আমি বাবার কোলে, বাবা অন্য হাতে ঠাকুমাকে অর্ধেক জড়িয়ে ধরে হাঁটাচ্ছে, মা পাশে হাঁটছে, তার এক হাত ঠাকুরদার ওপর হাতে শক্ত করে ধরা।

ঠাকুর্দা বিড়বিড় করে বলে, 'যাইতাসি পরানটা হাতে লইয়া। এ গুলারে বিশ্বাস নাই।'

মা অন্য হাত বাবার গায়ে রাখে, 'শুনতাস, আমার বড় ডর লাগতাসে। চল, বাড়ি ফিরা্যা যাই। কপালে যা আছে নিজের

জায়গায় হইব।' বাবা চাপা গলায় বলে,' আমাগো হিন্দুদের অ্যাই দ্যাশে নিজের জায়গা নাই। দাদা ঠিক কইসিল, তাই আগেই ভারত অপশান দিয়া দ্যাশ ছাড়সে। আমরা শুনি নাই। ভুল করসি। অ্যাখুন সরকারি হুকুম মানা ছাড়া উপায় নাই। যাইতেই হইব। চল,আমরা তো একসঙ্গে আসি।' আমার কানে কানে বলে, 'তুই ডরাইবি না, কেমন? সুনা মা আমার, একদম ডরাইবি না।' 'না। ডরাইমু না।' বাবার কাঁধে মাথা রাখি।'

তারপর কোন ছবি? একটা মস্ত ঘেরা ঢাকা জায়গা, ঘরের মতো তবে অনেক অনেক বড়। কাঠের সব তাকে মস্ত মস্ত বস্তা রাখা। একটার পর একটা আবার সেগুলোর ওপরে আরও বস্তা। চারিদিকে আরও কত কী রাখা, ভেজা গন্ধ, ঝুড়িতে চটচাপা সব কী। ঢুকতে ঢুকতে ভিড়ের মধ্যে বাবা হঠাৎ ঝট করে আমাকে একটা তাকের ওপর বস্তার সারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'চুপচাপ লুকাইয়া বইস্যা থাক, রা কাড়বি না, নট নড়নচড়ন, ক্যামন। আমি আইস্যা তরে লইয়া যামু। লক্ষ্মী মা আমার।' হাঁ, আমি মাথা হেলাই। বস্তার ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকি। ওই যে মাঝখানে খোলা জায়গায় সবাই জড়ো হচ্ছে। কতগুলো পুলিশ এসে ঠাকুরদা-ঠাকুমার মতো সব বুড়োবুড়িদের জোর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আলাদা করে একটা কোণে নিয়ে গেল। বাচ্চাদেরও। সবাই চ্যাঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। বাবা মা কোথায়। ওই যে। তাদের সব সামনে সারি দিয়ে ইস্কুলের মতো দাঁড় করানো হলো। একটা পুলিশ হুইস্‌ল্ দিল। অমনি শোনা গেল 'আল্লা হু আকবর'। গুদামের দরজা দিয়ে হুড়হুড় করে সব লুঙ্গি পরা লোক দৌড়ে ঢুকে এলো। হাতে সব কী রুপোর মতো চকচক করছে। হ্যাঁ, কত তলোয়ার, বড় বড় ছুরি। সোজা বাবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তলোয়ার ছুরির রুপালি ঝলক। ঝকঝক ঝকঝক। সবাই কী রকম দু'খানা তিনখানা চারখানা হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। ঝকঝক ঝকঝক ঝকঝক। না, এখন সব তলোয়ার ছুরি লালে লাল। টপটপ করে লাল পড়ছে। ওইযে ঠাকুর্দা লাঠি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে, আরো দু'তিন জন বুড়ো যাচ্ছে। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ। ঝকঝক তরোয়াল চলল, একে একে প্রত্যেক ঠাকুর্দা তিন চার খানা হয়ে গেল।

মা, অন্য মাসি-পিসিরা সবাই চীৎকার করে ছুটে বাবাদের কাছে যাচ্ছে। অমনি সেই ছুরি তলোয়ার হাতে লোকগুলো বাঁ-হাতে মায়েদের চুলের মুঠি বা শাড়ির আঁচল ধরে টেনে হিঁচড়ে আর একটা পুলিশের সামনে দাঁড় করাচ্ছে। এটা বড় পুলিশ। লোকটা কাছে এগিয়ে এসে মায়ের হাতের শাঁখা দু'টো ভাঙছে। কে যেন একটা গামছা এগিয়ে দিয়েছে। সেটা দিয়ে মায়ের কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথির সিঁদুর সব ঘস ঘস করে মুছছে, মুছছে। তারপর একটা ছোটো বন্দুক কোমর থেকে বের করে মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে বলছে, 'বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহু।'

মায়ের চোখ বন্ধ ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে, শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটচ্ছে, খোঁপা খুলে গেছে চুল এলো। মা কি কিছু বলছে? কে জানে।

লোকটা এবারে চীৎকার করে, 'আমরা মুলাদী ফতে করসি। আখুন গনিমতের মাল বাইট্যা দিমু। মহম্মদ্যা, আয়।'

তরোয়াল হাতে একটা বিশাল রাক্ষস সামনে এল, তরোয়াল থেকে টপটপ করে লাল পড়তে পড়তে আসছে।

'এই নে, এটা তর গনিমতের মাল।'

রাক্ষসটা সেলাম ঠুকে মাকে টেনে হেঁচড়ে এক কোণে নিয়ে মেঝেতে ঠাস করে ফেলে দিল। মায়ের মাথায় নিশ্চয় লেগেছে। মা, ওমা, মা রে-এ-এ। মা যে পড়ে আছে। রাক্ষসটা লুঙ্গি তুলে মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অইতো মা হাত ছুঁড়ছে, চীৎকার করছে পা ছুড়ছে। রাক্ষসটা মায়ের মাথাটা তুলে ঠাস ঠাস করে মেঝেতে মারছে। মায়ের মাথাটা এক দিকে হেলে পড়ে রইল। মা, ওমা, মা-আ-আ-আ। কোনো সাড়া নেই।

এদিকে এক-এক করে অন্য মায়েদের বড় পুলিশ সামনে আনছে, শাঁখা ভাঙছে, সিঁদুর মুছছে। লা ইলাহা বলছে তারপর একটা নাম ডাকছে, আর একটা রাক্ষস তাকে টেনে নিয়ে মাটিতে ফেলছে আর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কী চীৎকার হাতপা ছোড়া, কান্না। গালাগালি চড়চাপড় দুমদাম মার। কয়েকটা রাক্ষস তরোয়াল লম্বা করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সব ছেলে-মেয়ে বুড়া-বুড়িকে এক ধারে আটকে রেখেছে। বাচ্চারা গলা ছেড়ে কাঁদছে, বুড়ো-বুড়িরা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখে চীৎকার করছে, 'হে মধুসূদন, রক্ষা করো রক্ষা করো।'

আমি খালি বাবাকে খুঁজছি। তরোয়াল দিয়ে যে কী করল বাবাকে। আমার কেমন ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চোখের সামনে অন্ধকার। সব অন্ধকার। তারপর কিছু মনে নেই। আমি যেন ঘুমিয়ে পড়ি।

চোখ মেলেছি। সামনে তাকাই। কই তরোয়াল ছুরির ঝকঝকানি কই, রাক্ষসগুলোই-বা কই। কিছুই নেই। ও, আবার খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। আমিতো প্রায় দেখি। এক্ষুনি মা আমার মাথা তুলে ধরে জল খাওয়াবে, বাবা বলবে, 'অপু সোনা এইতো আমি আছি, কীসের স্বপ্ন, কোনো ডর নাই।' চারিদিকে তাকাই। অনেক লোক, এরা অন্য, সব শার্টপ্যান্ট পরা। বুড়োবুড়িরা তাদের সামনে, কয়েকটা বাচ্চা ছেলে-মেয়েও। কিন্তু বাবা তো এলো না আমাকে নিতে। 'বাবা, বাবা।' কখন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে যায়। সবাই চারদিকে তাকায়। আরে ওইযে ঠাকমা। 'ঠাকমা-আ-আ-আ।' এবারে সবাই ঠিক আমাকে দেখতে পায়।

'অপু অপুরে', ওই হাঁটু নিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রায় ছুটে আসছে। পিছনে দু'জন শার্টপ্যান্ট পরা লোক। আমাকে ওরা কোলে করে নামায়, ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরে। 'আপনার নাতনি? বালো বালো, এখন আসেন আসেন, অনেক কাম আসে, ঘটনা কী , স্বামী ছেলে সকলের নাম ধাম লাগব—'

পরের ছবি। একটা ঘর, সামনে টেবিলে একটা শার্ট-প্যান্ট পরা বয়স্ক লোক। লম্বা খাতার মতো কী খুলে বসে আছে। সামনে আমাকে কোলে নিয়ে বসে ঠাকমা সমানে কাঁদছে। পিছনে অনেক



বুড়োবুড়ি, সকলে কাঁদছে, কেউ কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কারও কারও কোলে আমার মতো বাচ্চা।

'অ্যাক্টু চুপ করেন, শান্ত হন। কাম করতে দ্যান। স্বামীর নাম তো বলবেন না, তা ছেলেদের নাম বলেন।

'ঠাকুমা জ্যাঠামশাইয়ের নাম বলতেই শার্ট-প্যান্ট পরা বলে ওঠেন, 'সুদীপ ঘোষ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট? আমি তো স্যারের আন্ডারে কাম করসি। পার্টিশানের পর ইন্ডিয়া অপ্ট করসেন। আপনেরা তাঁর ফেমিলি? দেখেন দিকি কী কাণ্ড। সি সি সি। বড়ই দুঃখের কথা। কী করবেন। দিনকাল এমন হইসে সরকারের হাতে আর কন্ট্রোল নাই।'

'ক্যান সরকারই তো নাটের গুরু। ওই মুলাদী থানার সব ক'টা পুলিশ, বড়বাবু জোট কইরা তো গুন্ডাদের আনসে, খুন জখম, কুকাজ সব করসে। আমি নিজের চক্ষে দ্যাখসি আমার পোলাটারে, তার বাপ রে—'

'থাক থাক। যা হইবার তো হইয়া গেসে। সরকার দ্যাখতাসে। এখন আপনি বলেন সুদীপ স্যার কোথায় পোস্টেড, জায়গার নাম জানেন? ব্যস্, আর চিন্তা নাই।'

'এই মাইয়াটার যে বাপ-মা, ঠাকুরদা গেল, আমার যে স্বামী ছেলে সব গেল, তাদের মুখে আগুন পর্যন্ত পড়ল না, তার বিচার—'

'যা ঘটসে সে ঘটনা তো আর ফিরাইতে পারুম না। এখন আপনাগো সেফ্‌টির বন্দোবস্ত করি।'

'কিন্তু আমার বউমা? তারে উদ্ধার করবেন না?' 'খোঁজ পাওনই মুশকিল।'

'ক্যান মুশকিল হইব। আপনাগো থানাবাবু নিজে তারে গুন্ডার হাতে তুইল্যা দিল, আমি স্বচক্ষে দ্যাখসি।'

'সে হয়তো ঘরে লইয়া গেসে গিয়া। হেইটা হইলে তো মন্দের ভাল। নইলে যদি বেইচ্যা দ্যায়---'

'না না না। বলবেন না বলবেন না। বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী। তারে এমন শাস্তি—

'—দেখেন যদিই-বা খোঁজ পাওয়া যায়, উদ্ধার কইরা কী হইব। আপনারা হিন্দু হাইকাস্ট। যে বউরে মুসলমান নষ্ট করসে, তারে তো আর ঘরে লইবেন না।'

ঠাকুমার মুখ পাথর, 'শোনেন, গুয়ে পড়লেও শালগ্রাম শিলা অপবিত্র হয় না। জলে ধুইলেই শুদ্ধ।'

ছবি। নদীয়া সদর। ফিটফাট পোশাক পরা এসডিও সাহেবের মেয়ে স্কুলে যায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খেলা করে। বাড়িতে দুই দাদার সঙ্গে ভাব, খুনসুটি। কে এই মেয়ে ? আমি অপর্ণা।

না, মায়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। সেই ভদ্রলোকটি জ্যাঠামশাইয়ের আন্ডারে যিনি কাজ করেছিলেন, আমাদের ভারতের বর্ডারে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন বোধহয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমরাও। ঠিক কী করে পৌঁছলাম সে সব কিছুই মনে নেই। সব অন্ধকার।

শুধু আবছা একটাই ছবি, প্রথম জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা। ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমা তাঁর হাত ধরে বলছে, 'ওরে অনাথ মাইয়াটারে অ্যাক্টু দেখিস।' জ্যাঠামশাই বলছেন, 'মা, আমি থাকতে অপু অনাথ কেন হবে ? আজ থেকে আমি ওর বাবা,' জ্যাঠাইমাকে দেখিয়ে বললেন, 'কল্যাণী ওর মা।'

ঠাকুমা তো অল্পদিন পরেই গত হলেন। যে ক'দিন বেঁচেছিলেন , খালি চোখের জল ফেলতেন আর একটাই কথা বার বার আউড়ে যেতেন, 'ঠাকুর, ঠাকুর, আমার লক্ষ্মী বউমার লগে তুমি ক্যান অ্যামুন অন্যায় করলা, আমি আর তোমারে পূজা করুম না, না না।'

করেনওনি। মৃত্যুশয্যায়ও ঠাকুরের নাম নেননি। জ্যাঠামশাই-জেঠিমা দু'জনেই কথা রাখলেন। বাবা-মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। স্কুলে কলেজে ভরতির সময় বাবার নামের কলামে ওঁর নাম থাকল। জেঠিমাকে প্রথম প্রথম মা বলতে পারতাম না। একদিন অন্ধকারে পড়ে গিয়ে খুব চোট লাগল, চেঁচিয়ে উঠেছি, 'মা,মা।' জেঠিমা দৌড়ে এসে আমাকে কোলে তুলে নিলেন, 'এইতো আমি, অপু সোনা।' দাদারা দু'জন একেবারে নিজের হয়ে গেল। তবে আমার বি.এ. পাশের আগেই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে চলে গেলেন জ্যাঠামশাই যাকে আমি বাবা ডাকতাম।

তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হলো। ব্যবসায়ী পরিবারে, দাদাদের একটু কিন্তুকিন্তু ছিল। যাই হোক, কোনো অসুবিধা হয়নি। ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করেছে, দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু মুলাদীর বাবা মা? তারা কোথায় হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো? ঘুমের মধ্যে দেখি বাবার কোলে আমি তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে আছি, তুই ডরাইবি না, সুনা মা আমার। জাগা অবস্থায় অন্যমনস্ক হলে যেন এখনো মায়ের হাতের ছোঁয়া পাই, আমার চুল কে আঁচড়ায়।

'মাসিমাদের দিব্যি একটা ঘুম হয়ে গেল, তাই না? মায়ার কথায় অপর্ণা যেন ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে ওঠেন।'

'তুই বেশ আছিস, তোর কোনো কেস নেই।' অনি মায়ার পিছনে লাগে।

'কেস মানে?'

'মানে এই যে মা-মাইমাদের মতো ওপারে আগেকার কষ্টের কথা।'

মিলি বলে, 'ওর আবার কেস কী করে হবে । পিসিমণি, মা, এরা সব আদতে সেই '৪৭ সালে পার্টিশানের পরের দশ-পনেরো বছরের হাঙ্গামার ভুক্তভোগী। তখন তো পাকিস্তান ছিল। তার পর কত লড়াই করে বাংলাদেশ হলো। আর সমস্যা নেই।'

'কী করে জানলেন সমস্যা নেই ? আমার কেস জানেন?'

'সে কী রে। তুই তো একেবারে আমাদের বাংলা বলিস! তোর আবার ওপারে দেশ হলো কী করে?' অনি বিনি দুজনেই তাজ্জব।

'আরে ভাষা শিখতে ক'দিন লাগে। আমি তো এ দেশের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই বাংলাটা শিখেছি। ওপারের কোনো কিছু আমি মনে রাখতে চাই না। সবচেয়ে আগে ওই বরিশাইল্যা ঢঙ্গের বুলি।'

'বাপ রে নিজের দেশের ওপরে তোর এত রাগ কেন? এখন তো পাকিস্তান নেই, বাংলাদেশই নাকি বাঙ্গালিদের আসল জায়গা।'

'হুঁ! ভারি আমার বাঙ্গালিরে! কার আসল জায়গা? বাংলাদেশকে আমি লাথি মারি। থুতু দিই। কেন? ওদেশে 'ভোলা' নামে একটা দ্বীপ আছে, মস্ত দ্বীপ, জানেন?'

'ভোলা? কই না তো! কী অদ্ভুত নাম। জায়গার নাম ভোলা! 'বরিশাল জেলায়। মেঘনা নদীর মুখে। মস্ত দ্বীপ। ভোলাতে কী ঘটেছিল জানেন বছর বিশেক আগে? না, আপনারা পশ্চিমবঙ্গে তো বাংলাদেশের আসল কোনো খবরই রাখেন না। খালি গঙ্গাপদ্মা বাওয়াল করেন! আওয়ামি লিগ বিএনপি-জামাতিকে নির্বাচনে হারাল, মনে আছে? ব্যস্ অমনি হিন্দুদের কপাল পুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মারকাট, লুটপাট, হামলা, রেপ। হিন্দুরা সব নাকি আওয়ামিদের ভোট দিয়েছে। ভোলার চর ফ্যাসন আর লালমোহন উপজিলায় হাজার হাজার মুসলমান কয়েকশো হিন্দু মেয়েলোককে ধর্ষণ করল। আমাদের গ্রাম ছিল লালমোহনে। কোনো স্ত্রীজাতীয় বাদ পড়েনি, আট থেকে আশি। আমার বয়স তখন নয়, মায়ের তিরিশ। কত জন মাকে আর আমাকে ধর্ষণ করল হিসেব নেই। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি রক্তে ভেসে যাচ্ছি, মা রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।

'মায়া, তুই রেপ সার্ভাইভার!' বিনি স্তম্ভিত।

'কী সাঙ্ঘাতিক! এগুলো কি মানুষ?' একযোগে রুমকি অনি।

'হাসপাতালে সকলের সময়মতো চিকিৎসা হলো তো?' মিলির তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন।

'বাংলাদেশের হাসপাতাল, তাও আবার হিন্দু মেয়ে গণধর্ষণ

কেসের চিকিৎসা! ২০০১ সালে ভোলা দ্বীপে! আপনারা ভাবেন কী? সকলের প্রথম কাজ হলো চেপে যাওয়া, ধর্ষণ তো মেয়েদের দোষ। চিকিৎসার কোনো প্রশ্নই নেই। ওই গাঁয়ের হাতুড়ে, দাইটাইরা টোটকা মোটকা দিয়ে ব্লিডিং বন্ধ করে। আর খারাপ রোগটোগের ইনফেকশান হলো তো কপাল মন্দ। আমার মা-টা যেমন , সেই কাণ্ডের পর কী সব রোগ হলো, দু'মাসের মধ্যেই খতম। খুব কষ্ট পেয়েছিল।'

'কী ভয়ংকর। আর পুলিশ কী করল?'

'ভোলা দ্বীপের গ্রামে পুলিশ ডাকবে হিন্দু মেয়ের ধর্ষণে! খেপেছেন। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা?'



'বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানিতে ইহুদিদের চেয়েও খারাপ। এতো নাৎসিদের হার মানায়।

আচ্ছা, বাঙ্গালি রিফিউজিদের নিয়ে 'নতুন ইহুদি' নামে একটা সিনেমা হয়েছিল না?'

রুমকির আঁতেল মার্কা প্রতিক্রিয়া। 'রাখ তোর সিনেমা। ও দেশে হিন্দু মরছে, রেপ হচ্ছে, আর পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি সিনেমা বানাচ্ছে। যত্ত সব!

মায়া, তোমাদের জন্য সরকার কিছুই করল না? আওয়ামি লিগ তো ক্ষমতায় এলো।' অনির বাস্তববাদী প্রশ্ন।

'ওই সব কি মানবতাবাদীটাদীরা এসে চেঁচামেচি করার পরই তো লোক জানাজানি, হইচই হয়েছিল। কী কমিশন টন বসল। হ্যাঁ, প্রমাণ হলো বিএনপি-জামাত মিলে গণধর্ষণ কাণ্ড করেছিল, অনেক এমপি টেমপিও ছিল। হিন্দুদের মতো মুসলমান সমাজ নয়, ভদ্রলোক- ছোটলোক, উঁচু জাত-নীচু জাতফাত নেই। সকলে মসজিদে পাশাপাশি নামাজ পড়ে, এক সঙ্গে খায়, এক সঙ্গে ধর্ষণ করে। এমপি আর গুন্ডায় কোনো তফাত নেই, ভারি সাম্যবাদী।'

অনি মিলি রুমকি একসঙ্গে সবিস্ময়ে মাথা নাড়ে, 'ভাবা যায় না।'

'এরা নাকি আবার আমাদের সঙ্গে এক, বাঙ্গালি। মিথ্যার আর শেষ নেই।' বিনির মন্তব্য।

'তুমি এখানে এলে কী করে?' অপর্ণা জানতে চান।

'মা মরল, বাপটা এই কাণ্ডের পরে যেন থেকেও নেই, তারপর বিবাগী হয়ে গেল, ছোটো ভাই-বোনগুলো সব আমার ঘাড়ে। ধুত্তেরি ছাই, বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। তখন আমার বয়স এই বারো-তেরো হবে।'

'সে কী ! অতটুকু মেয়ে, কোথায়, কেমন করে, কার সঙ্গে বেরিয়ে গেলে?' প্রতিভা অবাক! 'অতটুকু কী বলছেন মাসিমা? আমি তো ন' বছরেই সাবালিকা হয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, সেসব ভালো-মন্দ অনেক কথা। মোটমাট যারা লুকিয়েচুরিয়ে বর্ডার পেরয়, মেয়েটেয়ে পাচার করে, আমি তাদের সঙ্গে জুটে গেলাম। তাদের সঙ্গেই এ দেশের মাটিতে পা রাখলাম। রেখেই দল থেকে পালালাম, আমি তো আর গেরস্ত ঘরের গায়ে হাত না লাগা ভীতুর ডিম ন্যাকাবোকা মেয়ে নই। আমার শুধু নিজের পেটের চিন্তা। এ মাটিতে পা দিয়েই আমি কাজ খুঁজলাম। লোকের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর মোছার কাজ পেলাম। শরীরে খুব কষ্ট ছিল। ওই বাড়ির গিন্নির কথায় মেয়ে ডাক্তার দেখালাম, তাঁকেই প্রথম সব কথা বললাম। উনি খুব ভালো চিকিৎসা করলেন, টাকা নেননি, সেরে গেলাম। তবে বলে দিলেন, আমার নাড়ি জখম হয়ে গেছে, আমি কোনোদিন মা হতে পারব না। বয়েই গেল, পুরুষ মানুষের বিছানা, সংসার ভাবলেই বমি আসে। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। ব্যস্, ঝাড়া হাতপা। রোগীর কাজ শিখলাম। রোজগার বাড়ল।'

'তা এদেশে এখন তুমি খুশি তো?' অপর্ণা জিগ্যেস করেন।

'খুশি অখুশি জানি না। তবে এখানে মুক্ত। কাজ করি, খাইদাই, ভোলার নাম কেউ এখানে জানে না। আজ প্রথম নাম করলাম।'

'ভোলারে ভুইল্যা যাও।' হঠাৎ নিভাননী দ্যাশের ভাষায় ইতি টানেন।

ইশ্ দেখেছ, বেলা পড়ে গেছে। আরে এক্ষুণি অন্ধকার হয়ে যাবে যে। শীতের বেলা। চল চল, একটু ঘুরে নিই।' 'চা? চা খাওয়া হবে না?'

'না না। বেড়িয়ে এসে ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে একদম রওনা দেব। দুপুরে যা হেভি খাওয়া হয়েছে।'

'বিকেলে সব রেসর্টের মতো এখানেও চায়ের সঙ্গে চিকেন পাকোড়া দিলে খাওয়া যাবে?'

'বলিস না,ভাবলেও গা কেমন করছে।'

আড়মোড়া ভেঙে একে একে সবাই উঠে বসে। শাড়ি ঠিক করে কার্ডিগান শাল জড়িয়ে দাঁড়ায়।

'দিদি ইখানে দেখবেন আসুন' দূরে যেন উঁচু ঢালের মতো জমি আর তার মাথায় দাঁড়িয়ে ছোটু ডাকছে।

ছোটে মিলি অনি বিনি রুমকি। ঢালের মাথায় পৌঁছে সমস্বরে সহর্ষ চীৎকার। 'দেখবে এসো, দেখবে এসো।' যথাসাধ্য জোরে পা চালিয়ে যান নিভাননী, প্রতিভা, অপর্ণা এবং পিছন পিছন মায়া। ঢালের ওপরে সাবধানে ওঠেন, এমন কিছু উঁচু নয়, তবুও। তলা দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তার তরঙ্গের ঝিকিমিকি।

'বাঃ' কী অপূর্ব!' 'দারুণ।' 'এদের এরিয়ার মধ্যে একটা আস্ত নদী কী করে এল।'

'এটা খাল নয় তো।'

'যাঃ খালে এমন পরিষ্কার জল, এমন ঢেউ খেলে নাকি। দিব্যি স্রোত আছে।'

'কোথায় যাচ্ছে রে নদীটা, কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই পড়ছে, কোনো বড় নদীতে।'

'ইখানে এরকম অনেক নদী আছে। স-ব গঙ্গামাঈয়ার থেকে এসেছে, এক সাথ মিলছে, সমুন্দরে।'

'ও হ্যাঁ তাই তো, আমরা তো কলকাতা থেকে কত নীচের দিকে এসেছি। ম্যাপটা মনে করো। গঙ্গা শতধা হয়ে সাগরে পড়েছে।' বিনি অনি মিলি রুমকির আলোচনা।

নদীর পাড় ধরে ঘোরাঘুরি করে। নদী না খাল না খাঁড়ি সেই নিয়ে তর্ক করতে করতে মধ্যমার আগমন।

'মাসিমারা দিদিরা, চলুন চা খেয়ে নেবেন। এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

'আবার সেই মেঠো বাংলোর লম্বা বারান্দা। একটা টেবিলে সার দিয়ে রাখা ক'টা বয়মে বিস্কুট দু'তিন রকমের, চিঁড়ে ভাজা, মুড়ি, কৌটোয় বাদাম ছোলা, যে যা ইচ্ছে নেবে। চা। অভিনব আয়োজন। গ্রামের ছোঁওয়া। সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। যাক চিকেন পাকোড়া থেকে রেহাই। সানন্দ চা পান চলে। 'মাসিমারা, দিদিরা কিছু আনাজ নিতে চেয়েছিলেন। দেখুন।'

বড় একটা ঝুড়িতে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, সিম, ওলকপি, যে যা অর্ডার করেছিল। এখানেই ভাগ করে ফেলা হলো। গাড়ি থেকে নামাবার সময় আর এনার্জি থাকবে না। পেমেন্ট করে ঘরে ফ্রেশ হতে গিয়ে অনি বিনি মিলি সবাই আলোচনা করে, মোটেই কলকাতার বাজার দরের চেয়ে সস্তা নয়। যাই হোক একেবারে টাটকা, মাঠ থেকে তোলা। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে কী অন্ধকার, এর মধ্যে ঝুপ করে রাত হয়ে গেছে। বিদায় পর্ব সেরে সকলের হাতে কিছু কিছু বখশিস দিয়ে গাড়িতে ওঠে।



ফেরার পথে কারও মুখে কথা নেই। শুধু মিলি যথারীতি সামনের আসনে বসে, জিপিএস খুলে। 'ছোটু সাবধানে চালা, ছোটু টার্ন আছে বাঁদিকে,' করে যায়। এখন দু'দিকে কিছু দেখার নেই। শুধু অন্ধকার। মাঝে মাঝে লোকালয়। সেই ছোট ছোট ঝুপড়ি দোকান,কটকটে সাদা, বড়ো বড়ো আলোর বাল্ব ঝুলছে। সাজানো সব সস্তার পণ্যের পশরা। কোথাও চায়ের দোকান কোথাও-বা শিঙাড়া কচুরি বা বেগুনি আলুর চপ হচ্ছে। ভাজাভুজির গন্ধ। হঠাৎ এক একটা পাকা বাড়িতে কলকাতার কোনো নামি ব্র্যান্ডের গয়নার বা খাবার দোকানের সাইনবোর্ড। প্রচুর লোকজন। মেয়েরাও। ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে বা একা, সব দিব্যি কলকল করে এক সঙ্গে হাঁটছে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শিঙাড়া বা আলুর চপ আর চা খাচ্ছে বা জিনিসপত্র কিনছে। তারস্বরে কোথাও মাইকে গান বাজছে, 'বন্ধু রে-এ-এ,' পাশের গলি থেকে। কী যেন ফাংশান চলছে। সব অপরিকল্পিত, শ্রীহীন বিকাশ। কিন্তু কী জীবন্ত,কী প্রাণচঞ্চল। এখানে কোনো ভয় নেই। অপর্ণা, প্রতিভা, নিভাননী নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত মায়াও।

বিনি আর অনিকে বাড়িতে নামাবার সময় মিলির মন্তব্য, 'কী দারুণ কাটল বলোতো বাঙ্গলার গ্রামে একটি দিন।'

'শুধু দারুণ নয়, চিরস্মরণীয়,' শেষ কথা বলে অনি।


S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

# HINDUSTAN TYRE CO.

**Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED**

***Regd. Office :***
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

***Works :***
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

# কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড




ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ◆ পাঁপড়

AUTHENTIC INDIAN SPICES

207 Maharshi Debendra Road, Kolkata 700007 Email: dutaspice@gmail.com Website: www.dutaspices.com

www.facebook.com/duta.rannaghar www.youtube.com/c/duta rannagharbengalirecipe

+91 98366 72200 | 033 2259 4112 | +91 98363 74300

পৌরাণিক উপন্যাস

# মহাবীর শ্রীহনুমান

**গোপাল চক্রবর্তী**

বীর হনুমান, ভক্ত হনুমান, কর্তব্যে সদা অবিচল হনুমান। তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মলীলা যেমন বিচিত্র, তেমন বিচিত্র তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত। অপ্সরা পুঞ্জকস্থলী ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে ভূতলে বানরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বানররাজ কুঞ্জর তার পিতা। পুঞ্জকস্থলী হলেন কুঞ্জরের অসামান্যা রূপবতী কন্যা অঞ্জনা। সুমেরু পর্বতের বানরাধিপতি কেশরীর সঙ্গে অঞ্জনার বিবাহ হয়। বানর দম্পতির সুখের সংসার। একদিন অঞ্জনা আভরণে সুশোভিত হয়ে সুমেরু পর্বতে ভ্রমণ করছিলেন। এই সময়ে তিনি হঠাৎ পবন দেবের দৃষ্টিগোচর হলেন। দর্শন মাত্র পবনদেব তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন। অঞ্জনার রূপে বিমোহিত পবনদেব তাঁর সামনে প্রকট হয়ে তাঁকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করলেন। পবনদেবের এই আচরণে সতী-সাধ্বী অঞ্জনা রুষ্ট হয়ে পবনদেবকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। পবনদেব অঞ্জনাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

—হে বরাননে! তুমি শান্ত হও, ভয় পেয়ো না। আমার দ্বারা তোমার কোনো অহিত হবে না। আমি মনে মনে তোমাতে সংগত হয়েছি। তারফলে তুমি এক মহাতেজী, বীর্যবান, বুদ্ধিমান, মহাপরাক্রমশালী, আমারই সমান বেগবান সুপুত্র লাভ করবে। পবনদেব অঞ্জনার সতীত্ব নষ্ট না করে শুধুমাত্র স্পর্শ করেই এক মহাবলশালী পুত্রের আশীর্বাদ দিলেন। শুভলগ্ন সমাগত হলে পর্বতগুহা আলোকিত করে মাতা অঞ্জনার কোলে এলেন রুদ্রাবতার হনুমান। রামায়ণ ও সমগ্র পুরাণ সাহিত্যে এই নবজাতক পবন নন্দন, হনুমান, মরুতাত্মজ নামে ভূষিত হয়েছেন। জনক বায়ুর মতো হনুমানও 'যথাবশংচরতি' অর্থাৎ স্বেচ্ছা বিহারী। পবননন্দন হলেও হনুমান বানররাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ সন্তান।

শিবপুরাণে শিব স্বয়ং বলেছেন— লক্ষ্মণ শেষনাগের অংশাবতার, শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণাবতার এবং হনুমান রুদ্রাবতার। স্কন্ধ পুরাণে শিবের স্বয়ং হনুমান রূপে আবির্ভাব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কূর্মপুরাণে শিবের অংশরূপে হনুমানের আবির্ভাব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও শিবের হনুমানরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়।

দৈবীশক্তিতে জাত এই দেবশিশু শৈশবেই একদিন প্রভাতসূর্যকে উজ্জ্বল রঙের ফল মনে করে ধরবার জন্য আকাশে উড্ডীন হয়েছিল। পবনদেব অপত্যস্নেহে শিশুটিকে সূর্যের প্রখর তেজ থেকে রক্ষা করার জন্য হিমশীতল ছায়া প্রদান করছিলেন। সহস্র যোজন আকাশ অতিক্রম করার পর শিশুটি সূর্যের অতি নিকটে উপস্থিত হলে রাহুকে সূর্যের খুব কাছে দেখে শিশু হনুমান রাহুকে আক্রমণ করে বসল। এই বীর বালকের কাণ্ড দেখে ইন্দ্র রাহুকে সাহায্য করার জন্য ঐরাবতকে প্রেরণ করেন। বিচিত্র ঐরাবতকে দেখে বানর বালক রাহুকে ছেড়ে ঐরাবতের দিকে ধেয়ে গেল। বানর শিশুর উৎপীড়ন থেকে ঐরাবতকে বাঁচাবার জন্য ইন্দ্র মৃদু বজ্রপ্রহারে বানর শিশুটিকে সরিয়ে দেন। বজ্রাহত হয়ে শিশুটি এক পর্বতে পতিত হয়। পাথরের আঘাতে তার হনু (চোয়াল) ভেঙে যায়। পুত্রের প্রতি ইন্দ্রদেবের এহেন আচরণে পবনদেব ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। পবনদেবের ক্রোধ প্রশমন এবং শিশুটির শ্রুশ্রূষা করার জন্য অকুস্থলে পিতামহ ব্রহ্মা আগমন করেন। ব্রহ্মার করস্পর্শে বানরশিশু দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। ক্রমে ওই স্থানে অনেক দেবতার আগমন ঘটে। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন— ''আমার হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রের দ্বারা এই শিশুর হনুভঙ্গ হয়েছে। আমার বরে এই বানর ভবিষ্যতে হনুমান নামে খ্যাত হবে এবং অসাধারণ কীর্তিমান হবে।"

''মৎকরোৎসৃষ্ট বজ্রেন হনুরক্ষ যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দূলোভবিতা হনুমানিতি।।"

সূর্য বরদিলেন—''আমার তেজের শতভাগের এক ভাগ একে দিলাম। যথা সময়ে আমি একে শাস্ত্রজ্ঞান দেব, তার প্রভাবে এই শিশু পরবর্তীকালে মহান বাগ্মী হবে।"

বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দেবতারাও হনুমানকে নানা রূপ বর দিলেন। ব্রহ্মাও হনুমানকে বর দিয়ে পবনদেবকে বললেন—''পবন! তোমার এই পুত্র দুষ্কৃতীদের শত্রু, সাধুজনদের অভয়প্রদ মিত্র হবে। অজেয় কালরূপী, অব্যাহতগতি ও কীর্তিমান হবে।"

এইভাবে বিভিন্ন দেবতাদের বরপুষ্ট হনুমান অজেয় শস্ত্র অবধ্য হন। এইভাবে দেবতাদের বলে বলীয়ান বালক হনুমান পিতা কেশরী ও বায়ুর নিষেধ সত্ত্বেও ঋষিদের তপোবনে ও আশ্রমে নানা উপদ্রব করে বেড়াতে লাগল। তার উপদ্রবে অতিষ্ঠ মুনিগণ তাকে অভিসম্পাত দেন—''হে বানর, তুমি যে শক্তিতে মত্ত হয়ে আমাদের পীড়া দিচ্ছ, আমাদের অভিশাপে মোহিত হয়ে তুমি দীর্ঘকাল এই শক্তি বিস্মৃত হবে। কোনো মহাপুরুষ তোমার কীর্তির কথা স্মরণ করালে তোমার বলবীর্য পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।" সকল বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হনুমান অদ্বিতীয়। তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের কঠিন সিদ্ধান্তগুলি সূর্যদেবের কাছ থেকে জানার উদ্দেশ্যে মহান গ্রন্থ ধারণ করে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত সূর্যের পাশে পাশে গমন করেছিলেন। শব্দশাস্ত্রে হনুমানের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। অন্যান্য শাস্ত্রেও তার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। শুধু বিদ্যা নয় তপস্যায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

বানররাজ কেশরী ও রানি অঞ্জনার চোখের মণি হনুমান। কপিরাজ কেশরীও মুনিদের আশীর্বাদে এই মহাবল পুত্র লাভ করেছেন। প্রভাসতীর্থে বহুমুনির আশ্রম। মুনিরা তীর্থের পুণ্য সলিলে স্নান করে সন্ধ্যা বন্দনা ও তপস্যা করেন। কিন্তু এক দুষ্ট হিংস্র মহাবল মাতঙ্গের উৎপাতে মুনিদের তপস্যা বারবার বিঘ্নিত হতো। একদিন এই দুষ্ট মাতঙ্গ ঋষিদের প্রধান ভরদ্বাজকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে, দূরে দণ্ডায়মান বানররাজ কেশরী দ্রুত সেই মত্ত মাতঙ্গকে ধরে তার দুই বিশাল দন্ত উৎপাটিত করে সেই দন্তদ্বারা মাতঙ্গের উদর বিদীর্ণ করে তাকে হত্যা করে। এই তপস্যা বিঘ্নকারী দুষ্ট মাতঙ্গ নিহত হলে মুনিগণ সমস্বরে কপিরাজ কেশরীর জয়ধ্বনি দেন এবং তাঁকে প্রভাস তীর্থে স্বাগত জানান। ঋষি ভরদ্বাজ কেশরীকে ইপ্সিত বর প্রার্থনা করতে বলেন। কেশরী তখন এক মহাবল পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করেন। ভরদ্বাজের বরে কেশরী পবনদেবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত সন্তান মহাবীর হনুমানকে লাভ করেন।



বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে চোদ্দ বছরের বনবাস কালের শেষপর্যায়ে শ্রীরামচন্দ্র পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণ-সহ পঞ্চবটি বনে কুটির নির্মাণ করে বাস করছিলেন। সেই কুটির থেকেই রাক্ষসরাজ রাবণ ছলনা করে সীতাদেবীকে হরণ করে। রাম-লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে বেরিয়েছেন। অনেক পথ অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছেছিলেন ঋষ্যমূক পর্বতের সানুদেশে। এই অঞ্চল বানররাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যসীমার মধ্যে। কিষ্কিন্ধ্যার রাজপরিবারে তখন চলছে এক ভয়ঙ্কর অন্তর্কলহ। এই বানররাজ্যের শাসক অমিত বিক্রম বালি। ভাই সুগ্রীবও অনুরূপ। দুই ভাইয়ের বিক্রমে ও সুশাসনে কিষ্কিন্ধ্যার সর্বত্র শান্তি বিরাজমান। বালির পত্নী তারা, যুবরাজ অঙ্গদ, সুগ্রীবের পত্নী রুমা। এই দুইভাই অপরাজেয় হলেও মতাদর্শের দিক থেকে আলাদা। বালি বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ ভাগে প্রচলিত অনার্য সংস্কৃতির ধারক বাহক। সুগ্রীব আর্যাবর্তের আর্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট। মতাদর্শ ভিন্ন হলেও দুই ভাইয়ের মিল ছিল এক জায়গায়, দুইভাই কিষ্কিন্ধ্যাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করত। বালি রাজা, রাজ্য রক্ষার ভার সুগ্রীবের উপর। সুগ্রীবের সহযোগী মহাবলী মিত্র হনুমান। মহাপ্রাজ্ঞ জাম্বমান বালীর মন্ত্রণাদাতা। রাজ্যের সর্বত্র সুখ-শান্তি বিরাজমান। হঠাৎ একদিন এক মহাশক্তিধর মায়াবী রাক্ষস কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করে উৎপাত শুরু করে। এই সংবাদ অবগত হয়ে বালি সুগ্রীব দুইভাই রাক্ষসের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হলো। প্রথমে বালি রাক্ষসকে আক্রমণ করে, বালির আক্রমণে পর্যুদস্ত রাক্ষস পশ্চাদপসরণ করে এক সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। বালি সুগ্রীবকে সুড়ঙ্গের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে নিজে রাক্ষসকে অনুসরণ করে সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। দীর্ঘসময় কেটে যায়, বালি আর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে না। এক সময়ে গুহার ভিতরে রাক্ষসের ভয়ানক গর্জন এবং সুরঙ্গের মুখ দিয়ে রক্তধারা বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সুগ্রীব ভাবল ওই রাক্ষসের হাতে নিশ্চয় বালি নিহত হয়েছে। আরও অনেক সময় অপেক্ষার পরও যখন বালি ফিরে এলো না তখন বালির মৃত্যু সম্বন্ধে সুগ্রীব নিশ্চিত হয়ে গেল। বালির মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেও সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে রয়েছে, সে যেকোনো সময় বেরিয়ে এসে রাজ্যে উৎপাত করতে পারে। এরূপ বিবেচনা করে এক বিশাল প্রস্তর খণ্ড দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে কিষ্কিন্ধার রাজপ্রসাদে ফিরে গেল এবং বালির নিহত হওয়ার ঘটনা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করল। বালির পারলৌকিক শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার শূন্য সিংহাসনে রাজা হয়ে বসল এবং বালির পত্নী তারাকে পুনরায় বিবাহ করল। হনুমান ও জাম্বমান তার সহায়ক হয়। হঠাৎ একদিন বালি ফিরে আসে কিষ্কিন্ধায় এবং এই সব ঘটানয় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবকে আক্রমণ করে। আসলে সেই সুড়ঙ্গে বালি রাক্ষসের হাতে নিহত হয়নি, সেই রাক্ষসই নিহত হয়েছিল, তার আর্তচিৎকার সুগ্রীব শুনেছিল। যে রক্তধারা সুরঙ্গের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তা রাক্ষসের রক্ত। সুগ্রীব সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল তাই বালি রাক্ষস বধ করার পর সহজে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এবার ক্রোধান্ধ বালির ভীম আক্রমণের সামনে সুগ্রীব দাঁড়াতে না পেরে পলায়ন করল। বালিও তার পশ্চাৎধাবন করে, সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নেয় কারণ মতঙ্গ মুনির অভিশাপে বালি এই পর্বতে আসতে পারবে না। জাম্বামান ও হনুমান সুগ্রীবের অনুগামী হয়। সুগ্রীবের অনুগত বানর সেনারাও ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের আশ্রয়ে চলে আসে। নিরাপদ আশ্রয়ে আছে ঠিকই কিন্তু বালির ভয় সর্বদা সুগ্রীবকে গ্রাস করে আছে।

এই সময়ে অযোধ্যার নির্বাসিত রাজকুমার শ্রীরাম চন্দ্র পত্নী সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে পঞ্চবটী পর্বতে কুটির নির্মাণ করে বাস করছিলেন। ভগ্নী শূর্পনখার প্ররোচনায় রাক্ষসরাজ রাবণ ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করে। সীতার অন্বেষণে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাম-লক্ষ্মণ একসময়ে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে প্রবেশ করে, উদ্দেশ্য বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে তার সাহায্য নিয়ে রাবণের লঙ্কা রাজ্য আক্রমণ করে সীতা উদ্ধার। ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে তাঁরা একদিন ঋষ্যমূক পর্বতের সানুদেশে পৌঁছে গেলেন। পর্বতের শিখরদেশ থেকে অনুচর বেষ্টিত সুগ্রীব শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে উঠল। অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বলল—"মিত্রগণ, পর্বতের সানুদেশে চেয়ে দেখ, তপস্বীর বেশে অস্ত্রধারী দুই যুবাপুরুষ এগিয়ে আসছে। ওরা হয়তো বালির প্রেরিত কোনো যোদ্ধা, আমাকে বধ করতে আসছে।"

সুগ্রীব ভয় পেয়েছে দেখে হনুমান এগিয়ে এসে বলল—

—তুমি বিচলিত হচ্ছ কেন? মতঙ্গমুনির অভিশাপে এই ঋষ্যমূক পর্বতে বালি কখনো আসতে পারবে না। তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ।

সুগ্রীবের ভয় কিছুতেই কাটছে না, হনুমানকে বলল—

—বালি তো তার কোনো অনুচরকেও তো পাঠাতে পারে। তুমি বরং ছদ্মবেশে গিয়ে ওই আগন্তুকদের পরিচয় জেনে এসো। ওদের কথাবার্তা হাবভাব ভালো করে লক্ষ্য করবে।

হনুমান তখন সন্ন্যাসীর বেশে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল—

—হে অপরিচিত অতিথি! আপনাদের দেবতা বলে মনে হচ্ছে। আপনাদের অঙ্গে রাজকীয় গরিমা প্রকাশ পাচ্ছে। আকৃতি

রাজার মতো হলেও আপনাদের বেশভুষা সন্ন্যাসীর ন্যায়। আপনারা কি ব্রহ্মচারী? এই নির্জন অরণ্যে বিচরণ করছেন কেন? আপনাদের দৃষ্টি ও গতি সিংহের ন্যায় কিন্তু নিঃশ্বাসে যেন শোকের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আপনারা যোদ্ধার ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আপনাদের দেখে অরণ্যের প্রাণীরা ভয় পাচ্ছে। আপনারা দেবতা না মানুষ তা বোঝা যাচ্ছে না, আপনাদের আগমনের কারণও আমাদের কাছে অজানা। বানরদের রাজা সুগ্রীব এই পর্বতে বাস করেন, তিনি ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। অগ্রজ কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বড়ো দুঃখে এই অরণ্যে বিচরণ করছেন। আমি কেশরীপুত্র হনুমান, সুগ্রীবের আদেশে আমি আপনাদের কাছে এসেছি।

হনুমানের এহেন বিনীত বচনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। লক্ষ্মণকে বললেন—

—যে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে আমরা মিত্রতা স্থাপন করতে চাই ইনি তারই মন্ত্রী। এঁর বাক্য শুনে মনে হয়, ইনি বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্বরাক্ষর নিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বাক্‌পটু। ইনি নিশ্চয় বিশেষভাবে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছেন। কথার মধ্যে একটিও অপশব্দ নেই। নির্ভুল সুললিত উচ্চারণ। সুমিষ্ট কণ্ঠ। মিতভাষী। এঁর বাক্য দ্রুত নয়, আবার বিলম্বিতও নয়। শান্ত মধ্যমস্বরে কথা বলেন। কথা বলার সময় চোখে মুখে ললাটে ও অবয়বে কোনো বিকার দেখলাম না। এঁর কথা শুনলে মনে আনন্দ হয়। লক্ষ্মণ তুমি এঁর সঙ্গে কথা বল।

তখন লক্ষ্মণ এগিয়ে গিয়ে বললেন—হে ভদ্র! আমরা অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র। পুণ্যে-দানে-বীরত্বে-যশে যিনি কীর্তিমান ইনি আমার অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র, আর আমি তাঁর সেবক অনুজ লক্ষণ। ইতিপূর্বে আমরা বানররাজ সুগ্রীবের গুণাবলী শ্রুত হয়েছি। এখন আমরা তারই অন্বেষণ করছি। সম্পদে বিপদে যিনি সকল প্রাণীর আশ্রয়, সেই রামচন্দ্র আজ সুগ্রীবের সাহায্যপ্রার্থী।

হনুমান বললেন—

এ সুগ্রীবের পরম সৌভাগ্য। বালি তাঁকে রাজ্য থেকে বিতারিত করেছে, তাঁর পত্নীকেও হরণ করেছে। বর্তমানে তিনি দুঃখিত, ভীত ও অসহায়। আপনাদের মতো বলবান সহায় হলে তাঁর মঙ্গল হবে।

সবকথা শুনে লক্ষণ শ্রীরামকে বললেন—

হনুমানের কথায় মনে হচ্ছে, আমাদের এখানে আসার ফলে


# LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com, Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.
SHYAMGURI T.E.
MONMOHINIPUR T.E.
MANOBAG T.E.
BHUYANKHAT T.E.
MANU VALLEY T.E.
GOLOKPUR T.E.
PEARACHERRA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.
SAROJINI T.E.
FULBARI T.E.
URRUNABUND T.E.
MAKAIBARI T.E.
KENDUGURI T.E.
MORAN T.E.
SEPON T.E.
ATTABARIE T.E.
LEPTKATTA T.E.
ADDABARI T.E.
DIRAI T.E.
MAHAKALI T.E.

আমাদের ও সুগ্রীবের উভয় পক্ষেরই হিত হবে।

হনুমানের কথা এবং তাঁর মুখের প্রসন্নভাব দেখে মনে হচ্ছে তিনি মিথ্যা কথা বলছেন না।

হনুমান তখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে গেল। হনুমানের উদ্যোগে অগ্নিসাক্ষী করে, মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শ্রীরাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপন করলেন। এই মিলনে সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত ও আশ্বস্ত হলো। বলল—

হে আর্য! আপনাকে মিত্ররূপে পেলাম। এবার দেবতারা নিশ্চয় আমাকে কৃপা করবেন। আমি আপন রাজ্য থেকে বিনাদোষে বিতাড়িত। আমার পত্নীও অপহৃতা। আমি সহোদর বালির ভয়ে ভীত। আমাকে অভয় দান করুন।

শ্রীরাম তখন স্মিতহাস্যে সুগ্রীবের হস্তধারণ করে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন এবং অভয় দিলেন। তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে তাঁকে পুনরায় সিংহাসনে বসাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অপহৃতা পত্নীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনের আশ্বাসও দিলেন।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে কিষ্কিন্ধ্যার রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেললেন। আর্যাবর্ত থেকে অনেক দূরে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য। আর্যাবর্তের সঙ্গে তার ভাষা সংস্কৃতির কোনো কিছুরই মিল নেই। তবুও তারা আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত। তারা সংস্কৃত শিক্ষা করে। বেদ অধ্যয়ন ও বৈদিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে। বালি অনার্য সভ্যতার ধারক হলেও অনার্য সভ্যতার মুখপাত্র রাবণের সঙ্গে তার বিরোধ। সুগ্রীব, হনুমান আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুরাগী।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের আগ্রহে সেই ঋষ্যমূক পর্বতেই সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক হলো বৈদিক শাস্ত্র বিধি অনুসারে, পুরোহিতের মন্ত্রে, পবিত্র বারি সিঞ্চনে।

সুগ্রীব এবার এমন এক কাহিনি শ্রীরামকে শোনালেন যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন। সুগ্রীব-সহ পঞ্চবানর একদিন ঋষ্যমূক পর্বতের শীর্ষদেশে আলাপচারিতায় রত। এমন সময় আকাশ পথে রাক্ষসরাজ রাবণের বিমান উড়ে যাচ্ছিল। আর সেই বিমানে ক্রন্দনরতা এক কন্যাকে দেখা গেল। এই পঞ্চ বানরকে দেখে সেই ক্রন্দসী তার উত্তরীয় ও ভূষণ ছুড়ে ফেলছিল। সুগ্রীব বলল—হে রঘুনাথ! আমি সেই উত্তরীয় ও ভূষণ যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আপনি আদেশ করলে সেই সব সামগ্রী আপনার সমক্ষে নিয়ে আসতে পারি।

শ্রীরাম সম্মতি জানালে সুগ্রীব সেই রক্ষিত দ্রব্যসমূহ রামের সামনে এনে রাখল। সীতার উত্তরীয় ও ভূষণসমূহ দেখে শ্রীরাম চিনতে পারলেন এবং রোদন করতে লাগলেন। এবার সবাই নিশ্চিত হলেন রাক্ষসরাজ রাবণই সীতাকে অপহরণ করেছে। কিন্তু সীতাকে কোথায় রাখা হয়েছে তা জানা দরকার। এরমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রেরও একটা বিশেষ কাজ রয়ে গেছে। প্রতিজ্ঞামতো সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা।

'ঋষ্যমূক থেকে শ্রীরাম সুগ্রীবকে পাঠালেন বালির মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। শ্রীরামের আশ্বাসে সুগ্রীব বীরদর্পে বালির সম্মুখীন হলো। সুগ্রীবকে দেখে বালির ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠল। বীরবিক্রমে বালি আক্রমণ করল সুগ্রীবকে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা সুগ্রীবের ছিল না। এই অবস্থায় শ্রীরামও সুগ্রীবকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। যদিও শ্রীরাম লক্ষণ সশস্ত্র হয়ে বৃক্ষান্তরালে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো বালি ও সুগ্রীব দেখতে প্রায় একই রকম। দূর থেকে চেনা দায় কে বালি আর কে সুগ্রীব? শ্রীরামের ভয় বালিকে মারতে গিয়ে যদি সেই তীর সুগ্রীবকে আঘাত করে। এদিকে বালী পুনঃপুনঃ আঘাতে রক্তাক্ত সুগ্রীব কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে ফিরে গেল। শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনুমান ও সুগ্রীবের হিতৈষী অন্যান্য বানর বীররাও ফিরে গেল ঋষ্যমূক পর্বতে। যন্ত্রণায়, হতাশায়, অপমানে অধোমুখ সুগ্রীব। অন্যান্য বানর বীররাও নীরব। প্রথম কথা বললেন শ্রীরামচন্দ্র।

—মিত্র নিরাশ হয়ো না। ভরসা রাখো। তোমরা দুই ভাইয়ের আকৃতি একইরকম। আমি দূর থেকে বুঝতে পারিনি কে বালি কে সুগ্রীব। কাল তুমি আবার বালির মুখোমুখি হবে এবং শরীরের কোনো একটি বিশেষ চিহ্ন ধারণ করবে। আমি যেন দূর থেকে দেখে নিশ্চিত হতে পারি কে বালি, কে সুগ্রীব। আগামীকাল বালির মৃত্যু অনিবার্য।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ বন থেকে অনেক ফুল তুলে আনলেন। নিজ হাতে মালা গাঁথলেন এবং মালা সুগ্রীবের গলায় পরিয়ে তাঁকে বালির কাছে পাঠালেন। অঙ্গনে সুগ্রীবকে দেখে বালি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো এবং তৎক্ষণাৎ এসে সুগ্রীবকে আক্রমণ করল, ভর্ৎসনা করল—

—নির্লজ্জ পামর। কাল দয়াপরবশ হয়ে তোকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে ছিলাম। তুই আজ আবার এসেছিস আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবি বলে। তোর যুদ্ধের সাধ আমি এখনই মিটাচ্ছি।

দুই বীরের মধ্যে তখন ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। শ্রীরাম- লক্ষ্মণ তখন বৃক্ষের অন্তরালে এসে দাঁড়িয়েছেন। বালি ও সুগ্রীব কেউ কারও থেকে কম যায় না। সুগ্রীবের গলায় মালা থাকাতে আজ তাঁকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। দুই যোদ্ধার প্রচণ্ড গর্জনে সমগ্র কিস্কিন্ধ্যা থরহরি কম্পবান। পশুপাখিরা দূরে পালাচ্ছে। এক সময়ে বালি সুগ্রীবকে কাবু করে ফেলে আর ঠিক সেই সময়ে অন্তরাল থেকে শ্রীরাম বালিকে লক্ষ্য করে ঐষিকবাণ নিক্ষেপ করেন। দশদিক আলোকিত করে সেই বাণ বালির বুকে বিদ্ধ হলো। আর্তনাদ করে বালি ভূমিতে পতিত হলো। শ্রীরাম তখন অন্তরাল থেকে ধীর গতিতে বালির দিকে

এগিয়ে আসছে। সুগ্রীবের চোখে কৃতজ্ঞতা আর শ্রীরামকে দেখে বালির চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। বালির বিদুষী স্ত্রী তারা অযোধ্যার রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের কিস্কিন্ধ্যায় আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্ধিহান হয়ে বালিকে সুগ্রীবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বালি তারার কথা অমান্য করে সুগ্রীবের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিরবিদ্ধ হবার পর শ্রীরামচন্দ্রকে অকুস্থলে দেখে সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের ষড়যন্ত্রের কথা বালির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। বালি বলল—

রামচন্দ্র। শুনেছি অযোধ্যার বিখ্যাত সূর্যবংশে তোমার জন্ম দশরথের পুত্র তুমি! কিন্তু এহেন হীনকাজ তুমি কেন করলে? আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ, মাঝখানে তুমি কেন এসে আমাকে আঘাত করলে? যদি বানরের দ্বারা তোমার কার্যোদ্ধার হবে, তবে আমাকে সেই দায়িত্ব দিলে না কেন? একদিনে সীতাকে উদ্ধার করে রাবণকে তোমার চরণে এনে ফেলতাম। রাবণ আমার সঙ্গে একবার লড়তে এসেছিল। লেজে বেঁধে তাকে চার সমুদ্রে ডুবিয়েছি, অবশেষে পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে সে পরিত্রাণ পায়।

শ্রীরামের বাণে বালির পতন হয়েছে এই সংবাদ শুনে অন্তপুর থেকে পুত্র অঙ্গদকে নিয়ে তারাদেবী বালির কাছে ছুটে আসে। বালির অনুচররা তখন সবাই পালিয়েছে শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ ছেড়ে আহত বালির পাশে বসে আছেন। পাশে ভাই লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব। তারাদেবী সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকে বলেন—

শ্রীরাম তোমাকে নাকি সবাই দয়াবান বলে? তবে তুমি আমার পতিকে কেন ছলনা করে হত্যা করলে? আমার সর্বনাশ করে তুমি সুগ্রীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করলে। হে রামচন্দ্র, বিচ্ছেদ যন্ত্রণাতো তুমি অবগত আছ। তবে সেই যন্ত্রণা তুমি কেন আমাকে দিলে? আমার স্বামী তোমাকে অভিশাপ দেননি কিন্তু আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তা নিশ্চয়ই ফলবে। আপন বিক্রমে আর বানরসেনার সহায়তায় তুমি সীতাকে উদ্ধার করবে। কিন্তু সীতাকে তুমি কাছে রাখতে পারবে না। আমাকে তুমি যেমন কাঁদিয়েছ তেমনি সীতাদেবীও তোমাকে কাঁদিয়ে অন্তর্ধান করবে। তখন শ্রীরামচন্দ্র বললেন—

তোমার অভিশাপ আমি মস্তকে ধারণ করলাম। বালির এটি নিয়তি, আমি নিমিত্ত মাত্র।

বালির তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। শ্রীরামচন্দ্র তখন সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বালির পাশে বসলেন, বিনীতভাবে বললেন—

হে বীরশ্রেষ্ঠ আমায় ক্ষমা কর। তোমার মৃত্যু দৈবের লিখন। তুমি ইন্দ্রপুত্র, মহেন্দ্রের বেশ ধারণ করে তুমি অমরাবতীতে প্রস্থান করো।

বালির অন্তিম সময়ে তারাদেবী আবার রোদন শুরু করলেন। রামের প্রতি ক্রোধ তিনি সম্বরণ করতে পারছেন না। তারাদেবী আবার শ্রীরামচন্দ্রকে অভিসম্পাত করলেন—

দশরথ নন্দন! বিনা দোষে তুমি কপীশ্বরকে মেরেছ। আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি জন্মান্তরে বালির হাতে তোমার মৃত্যু ঘটবে।

বালির মস্তক কোলে নিয়ে তারা অনবরত কেঁদে চলেছে। মুমূর্ষু বালি তখন ক্ষীণকণ্ঠে তারাকে বললেন—

শ্রীরামকে আমি অনেক কটুকথা বলেছি। আমি লজ্জিত। আমার মৃত্যু বিধির নির্বন্ধ। শ্রীরামকে দোষারোপ করো না।

এইকথা বলতে বলতে বালি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তারার আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হলো। সুগ্রীব বালির বুক থেকে সেই বাণ তুলে নিল। বালির রক্তে মেদিনী সিক্ত হলো। হনুমান তারাদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—

রানি, তুমি ক্রন্দন সম্বরণ কর। শোক পরিহার কর। পরম ধার্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান। রামের প্রসাদে পিতৃস্থান অমরাবতীতে চলেছেন।

কিস্কিন্ধ্যার বানর সমাজ তখন পম্পানদীর তীরে চিতা তৈরি করে রাজকীয় সমারোহে বালির দাহকার্য সম্পন্ন করে। বালির অমাত্যরা যুবরাজ অঙ্গদকে রাজা করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শোকে কাতর হয়েও তারাদেবী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তারাদেবী বলে—

অঙ্গদ যদি রাজা হয় তাহলে সুগ্রীব শ্রীরামের সাহায্য করবে কি করে? শ্রীরামের সাহায্যের জন্য সুগ্রীবের রাজা হওয়া প্রয়োজন।

অতঃপর তারাদেবীর ইচ্ছায় এবং বানর সমাজের উদ্যোগে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে মহা সমারোহে সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক হলো। ঋষ্যমূক পর্বত ছেড়ে সুগ্রীব এল কিস্কিন্ধ্যার রাজ প্রাসাদে। পত্নী রুমা ফিরে এল সুগ্রীবের কাছে। বর্ষীয়ান আমত্যদের অনুরোধে আবার তারাদেবীকেও বিবাহ করল সুগ্রীব। শত অনুরোধেও শ্রীরাম লক্ষণ রাজপুরীতে থাকলেন না। কারণ তিনি চোদ্দ বৎসর বনবাস জীবন যাপন করবেন বলে পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিস্কিন্ধ্যা থেকে দুই ক্রোশ অন্তরে মাল্যবান পর্বতে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন।

শ্রীরামের নির্দেশে সুগ্রীব তারার পরামর্শে রাজ্যশাসন করবেন বলে অঙ্গীকার করল। যুবরাজ রূপে অঙ্গদের অভিষেক হলো। বর্ষার আগমনে কিস্কিন্ধ্যার আকাশে মেঘের ঘনঘটা, মুহুর্মুহু বজ্রপাত, প্রচণ্ড বর্ষণে নিম্নভূমি প্লাবিত। শ্রীরামচন্দ্র বর্ষার শেষ পর্যন্ত বানর সেনাদের আপন আপন গৃহে বাস করার পরামর্শ দিলেন। বর্ষাশেষে শুরু হবে লঙ্কা অভিযান, সীতা উদ্ধার। হনুমান কিস্কিন্ধ্যা নগরী, বিলাসবৈভব পরিত্যাগ করে মাল্যবান পর্বতে শ্রীরামের সঙ্গে কুটিরবাসী হলো। পরবর্তীকালে শ্রীরামের নির্দেশে সুগ্রীবের নিরাপত্তার জন্য হনুমান কিস্কিন্ধ্যায় ফিরে গেল।



ক্রমে বর্ষা বিদায় নিল। ভেকের নিনাদ আর মেঘের গর্জন শেষ। শরতের নির্মল আকাশে পূর্ণ চন্দ্রমার প্রকাশ। শ্রীরামের বিরহী চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। বর্ষার অবসানেও সুগ্রীবের কাছ থেকে কোনওরূপ আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে না। রাজা হয়ে সুগ্রীব দুই স্ত্রীকে নিয়ে বিলাস ব্যসনে মত্ত হয়ে আছে। অকৃতজ্ঞ সুগ্রীবের এহেন আচরণে শ্রীরামচন্দ্র নিরাশ ও ক্রুদ্ধ হলেন। লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য ধনুর্বাণ হাতে কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে সশস্ত্র অবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যার রাজপ্রসাদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত দেখে হনুমান প্রমাদ গুনল। যুবরাজ অঙ্গদকে বললেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে মহার্ঘ আসনে বসাতে। অঙ্গদকে সামনে দেখে লক্ষ্মণ বললেন—

বালীপুত্র অঙ্গদ! তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমন সংবাদ দাও। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বানর সেনাদের বর্ষাবকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ষাবসানে শরৎ আগত, কিন্তু পাষণ্ড সুগ্রীব রাজ্যলাভ করে শ্রীরামের কার্যোদ্ধার করার কথা ভুলেই গেছে। ডাকো সেই অকৃতজ্ঞ সুগ্রীবকে আমি আজ তাকে সমুচিত দণ্ড দেবার জন্য এখানে এসেছি।

লক্ষ্মণের ক্রোধ দেখে ভীত হয়ে অন্তপুরে সুগ্রীবের কাছে চলে যায় অঙ্গদ। লক্ষ্মণের আগমন সংবাদ সুগ্রীবকে দিয়ে তার প্রতি লক্ষ্মণের ক্রোধের কথাও জানায়। লক্ষ্মণের আগমন এবং সুগ্রীবের প্রতি তার ক্রোধের কথা শুনে সুগ্রীব বলে—

—শ্রীরামের সঙ্গে মিত্রতা করেছি সত্য কিন্তু সীতা উদ্ধারের জন্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের প্রাণ হারাতে পারবো না। এখন লক্ষ্মণকে ফিরে যেতে বলো। যা করার পরে করব।

তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রী হনুমান তথায় উপস্থিত হয়ে সুগ্রীবকে হিতোপদেশ দিয়ে বলে—

—শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু। তাঁর প্রতি তোমার এহেন আচরণ মোটেই শোভনীয় নয়। যাঁর কৃপায় তুমি রাজ্য পেলে, সম্মান পেলে, হৃতপত্নীকে ফিরে পেলে তাঁর প্রতি তোমার এই বাক্য ও আচরণ অনুচিত। তাছাড়া মাতা সীতার উদ্ধারকল্পে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করতে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন সবকিছু ফিরে পেয়ে তুমি সেই প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছ। নিজে পত্নীর সঙ্গে দিবারাত্র বিহার করছ। শ্রীরামের বিরহের কথা তার অসহায়ত্বের কথা তুমি বিস্মৃত হয়েছ। এই দুর্দিনে শ্রীরামের পাশে একবারের জন্য দাঁড়িয়ে একটি সান্ত্বনাবাক্যও তুমি তাঁকে বলোনি। আজ লক্ষ্মণ তোমার দ্বারে এসে ক্রোধ প্রকাশ করছে বলে তুমি বিরূপ মন্তব্য করছ। রাবণের ভয়ে তুমি ভীত কিন্তু দাশরথি শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হলে তোমার সবংশে বিনাশ হবে। অগ্নিসাক্ষী করে তুমি শ্রীরামকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর। যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বাণে চোদ্দ হাজার রাক্ষসের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা কুপিত হলে তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব কালবিলম্ব না করে শ্রীরামের শরণ নিয়ে তাঁর কার্যে প্রবৃত্ত হও।

হনুমানের হিতবাক্যে সুগ্রীবের বোধোদয় হলো। লক্ষ্মণকে আপ্যায়ন করে পুরীর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য অঙ্গদকে নির্দেশ দিল। অঙ্গদের মাধ্যমে সুগ্রীবের আহ্বানে লক্ষ্মণ পুরীতে প্রবেশ করেন। তখনও লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রশমিত হয়নি। সুগ্রীবকে সম্মুখে পেয়ে লক্ষ্মণ বললেন—

—দুরাচারী সুগ্রীব, পৃথিবীতে এমন কাজ কে করেছে যে আগে ভরসা দিয়ে কার্যোদ্ধার করে পরে দূরে লুকিয়ে থাকে? তোমার জন্মান্তরের পুণ্যে শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে মিত্র বলে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, বালিকে মেরে তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যার অধীশ্বর করলেন। শ্রীরামের কৃপায় তুমি স্ত্রীকে ফিরে পেলে। অথচ একবারও খোঁজ নাওনা যে আমরা দুই ভাই কোথায় আছি, কেমন আছি। তোমার মতো বিশ্বাসহন্তাকে শমনভবনে পাঠান উচিত।

লক্ষ্মণের ক্রোধ দেখে তারা, রুমা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সুগ্রীব অঙ্গীকার করল যত দ্রুত সম্ভব সে বানর সৈন্যদের একত্রিত করে শ্রীরামচন্দ্রের কাজ শুরু করবে। বানরসেনা সমাবেশ করার জন্য হনুমানকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। মিত্র শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করার জন্য লক্ষ্মণের সঙ্গে সমুদ্রতীরে গমন করল। এদিকে হনুমানের চেষ্টায় কয়েক দিনের মধ্যে বিশাল বানর সেনার সমাবেশ হলো। সীতার অন্বেষণে দিকে দিকে বানর সেনাদের পাঠানো হলো। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনো দিক বাদ গেল না। কিন্তু সবদিক থেকে বানরসেনারা বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এল। কোথাও সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না।

সমস্ত বানরসেনা আবার মিলিত হলো সাগর তীরে। সঙ্গে জাম্ববান, অঙ্গদ, নল, নীল প্রমুখ। সবাই চিন্তিত সীতার খোঁজ না পেলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে সমস্ত বানর সমাজকে ধ্বংস করবে। বানররা যখন কথোপকথনে রত তখন এক বানরের নজরে এল পর্বতের শৃঙ্গোপরি এক অদ্ভুত প্রাণী। দেখতে এক বিশাল পক্ষীর মতো কিন্তু দেহ পালকহীন। প্রবীণ বানরেরা বলল এ নিশ্চয় কোনো মায়াবী রাক্ষস আমাদের ভক্ষণ করতে এসেছে, আমাদের কালবিলম্ব না করে এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। অঙ্গদ বলল—

—আমাদের এখন চারদিকেই বিপদ। সীতার সন্ধান না

পেলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আমাদের শত্রু হবে। আবার সীতার সন্ধান করতে গিয়ে রাবণের সঙ্গে আমাদের সংঘাত অনিবার্য। সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে জটায়ুকে রাবণের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। জটায়ু গরুড়ের সন্তান মহাশক্তিধর।

গরুড়ের নাম শুনে পর্বতশৃঙ্গে প্রাণীটি যেন নড়েচড়ে বসলো। সেখান থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলল—

—হে কপীগণ! তোমাদের আলোচনায় জটায়ূর নিধন সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। জটায়ু আমার ভ্রাতা, আমি সম্পাতি, আমরা গরুড়ের সন্তান। বিধির বিপাকে আমার পাখা পুড়ে গেছে, তোমাদের কাছে উড়ে যাওয়ার শক্তি আমার নেই, যদি আমার কাছে এসে জটায়ূর বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর তবে কৃতার্থ হবো।

সেই প্রাজ্ঞ বানর বলল,এ হচ্ছে ওই মায়াবীর ছলনা। আমরা ওর কাছে গেলে গিলে খাবে।

হনুমান বলল, তোমরা ভয় পেয়ো না আমি ওই মায়াবীর কাছে যাচ্ছি। যদি সত্যি কোনো ভয়ের কারণ না থাকে তবে ওকে এখানে নিয়ে আসব।

হনুমান অতি দ্রুত সেই বিকট মূর্তির কাছে গেল। সত্যি সেই অতি বৃদ্ধ বিহঙ্গের দেহের পালকের একটিও অবশিষ্ট নেই। চোখ দুটিও ঘোলাটে। হনুমানকে দেখে বিহঙ্গ বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমাকে আমার সহোদর জটায়ূর বৃত্তান্ত বলো। জটায়ূর সঙ্গে আমার বহুকাল সাক্ষাৎ হয়নি। আমরা দুই ভাই একদিন এক প্রতিযোগিতা করলাম যে আগে সূর্যকে ছুঁয়ে আসতে পারবে সে বড়ো বীর। যৌবনের চাপল্যবশত একদিন সকালে উদীয়মান সূর্যকে লক্ষ্য করে দুই ভাই উড়তে শুরু করলাম। দীর্ঘ সময় ওড়ার পর আমরা মধ্যাহ্ন সূর্যের কাছাকাছি এসে গেছি, সূর্যের তীব্র দহনে দুই ভাই দগ্ধ হচ্ছি অসহ্য সেই দহন আমি আমার পাখা বিস্তার করে জটায়ূকে সূর্যের দহন থেকে রক্ষা করলাম আর তাতে আমার সব পালক পুড়ে গেল, আমি এই পর্বতে পতিত হলাম। সাতদিন অনাহারে থাকার পর এক মহাত্মা এসে আহার্য ও পানীয় দান করে আমার জীবন রক্ষা করেন। হিমালয়ে আমার পরিবার ও পুত্র সুপার্শ্ব থাকে, তাদের কাছে সেই মহাত্মা আমার অবস্থা জানিয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন। সুপার্শ্ব প্রতিদিন আমার আহার দিয়ে যায়। সেই মহাত্মা আমাকে বলেছিলেন ত্রেতাযুগে অযোধ্যা নৃপতি দশরথের পুত্ররূপে স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হবেন তাঁর নাম হবে শ্রীরাম। তিনি স্বয়ং বনবাস গ্রহণ করে এই পার্বত্য প্রদেশে আসবেন। তাঁকে দর্শন করলে কিংবা কোনো ভক্তজনের মুখে শ্রীরামকথা শ্রবণ করলে আমার দেহে আবার নতুন পালক সৃষ্টি হবে। আমি এই জরা থেকে মুক্তি পাব। তোমাকে দেখে ভক্তজন বলে বোধ হচ্ছে। তুমি কি শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে কিছু অবগত আছ? আমাকে তা শোনাতে পার?

—হ্যাঁ, আমি তাঁর দর্শন পেয়েছি। তিনি তাঁর কার্য সাধনের জন্য আমাদের এখানে আগমন। হে পূজ্য বিহঙ্গ, শ্রবণ করুন দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য অনুজ লক্ষ্মণ এবং পত্নী সীতাদেবী-সহ চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে আসেন। পঞ্চবটী বনের কুটির থেকে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করেন। সীতার অন্বেষণে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন ঋষ্যমূক পর্বতে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সুগ্রীব শ্রীরামকে সীতা উদ্ধারের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। আমি হনুমান এবং অন্যান্য বানরসেনারা এখন সীতাদেবীর অন্বেষণে বেরিয়েছি।

হনুমানের মুখে শ্রীরামকথা শুনতে শুনতে সম্পাতির দেহে নতুন পালক গজাতে শুরু করল। হনুমান তখন সম্পাতিকে কাঁধে তুলে বানর সেনাদের কাছে নিয়ে গেল। এই সময় অতিকায় বিহঙ্গ সম্পাতি জানাল দক্ষিণ দিকে মাথা তুললে সে লঙ্কার এক কাননে রাক্ষসী বেষ্টিত এক দেবীকে দেখতে পায় সম্ভবত ইনি সীতা দেবী। এই সময় সূর্যকে আচ্ছাদিত করে এক বিশাল ছায়াস্থানটিকে অন্ধকার করে দিল। বানরসেনারা তখন ভীত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। সম্পাতি তাদের অভয় দিয়ে বলল—

—তোমরা ভয় পেয়ো না। আমার পুত্র সুপার্শ্ব আমার আহার্য নিয়ে হিমালয় থেকে আসছে তার বিশাল পাখার ছায়া পড়ছে। এই সময়ে এক বিশাল বিহঙ্গ পক্ষ গুটিয়ে সম্পাতির সামনে এসে দাঁড়াল। বানররা তার বিশাল অবয়ব এবং ভয়ঙ্কর চঞ্চু দেখে সম্পাতির পেছনে আশ্রয় নিল।

বিস্মিত সুপার্শ্ব পিতাকে জিজ্ঞাসা করল। তার দেহে নতুন পালক হলো কীভাবে? উত্তরে সম্পাতি বলল।

—বহুকাল আগে এক মহাত্মা আমাকে বলেছিলেন যে কোন ভক্তজনের মুখে শ্রীরামকথা শ্রবণ করলে আমার দেহে নতুন পালকের সৃষ্টি হবে। আজ আমি এই রামভক্ত হনুমানের কাছে রামকথা শ্রবণ করেছি। তাই আমার দেহে নতুন পালক গজাচ্ছে। সেই মহাত্মা আমাকে বলেছিলেন, বনবাসকালে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করবে দেবী সীতার অন্বেষণে শ্রীরাম ও অনুজ লক্ষ্মণ এই পার্বত্যভূমিতে আসবেন। তিনি এসেছেন এবং হনুমান ও এই বানর-কটক শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থে সীতার অন্বেষণে বেরিয়েছে।

সুপার্শ্ব হনুমানকে জিজ্ঞাসা করল—

—তোমরা কি শ্রীরামের পত্নী সীতাদেবীর সন্ধান পেয়েছ?

হনুমান জানাল না এখনো পাইনি।

সুপার্শ্ব বলল তবে শোন, আমি একদিন পিতার আহার্যদ্রব্য নিয়ে আসছিলাম। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ এক রমণীকে জোর করে রথে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্যুদ্‌বর্ণা ওই রমণী শ্রীরাম, লক্ষ্মণ বলে আর্তনাদ করছিল, ওই নারীই সম্ভবত সীতা।



রাবণের সর্বাঙ্গ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই রমণীর দেহে কোন আঘাত ছিল না। আমি নিশ্চিত রাবণ সীতাকে সাগর পেরিয়ে লঙ্কাতেই নিয়ে গেছে। আমি রাবণকে সাগরে ডুবিয়ে দিতে পারতাম তবে নারীবধের ভয়ে তা করিনি।

হনুমান বলল—

—হে সম্পাতি-পুত্র সুপার্শ্ব। এই সংবাদ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। হে মান্য বিহঙ্গ সম্পাতি আপনাকে আর একটি সংবাদ দেওয়ার আছে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মুখে শুনেছি যখন পঞ্চবটীর কুটির থেকে রাবণ সীতামাতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এক মহান বিহঙ্গ সর্বশক্তি দিয়ে তার পথ রোধ করে। রাবণ অস্ত্রাঘাতে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে পালিয়ে যায়। সেই বিহঙ্গের রক্ত রাবণের দেহে লেগে থাকতে পারে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে এই দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য সেই বিহঙ্গ প্রাণধারণ করেছিল। অনেক বিলম্বে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তথায় এলে বিহঙ্গ সব বৃত্তান্ত জানিয়ে দেহ ত্যাগ করে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তার যথোপযুক্ত সৎকার করেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মুখে শুনেছি সেই মহান বিহঙ্গের নাম জটায়ু।

বৃত্তান্ত শুনে সম্পাতি সহোদরের জন্য বিলাপ করতে লাগল। ততক্ষণে তার সর্বাঙ্গে নতুন পালক সৃষ্টি হয়েছে। সুপার্শ্ব তখন পিতাকে অনেক যত্নে শান্ত করে। সম্পাতি বলল—

—শ্রীরামচন্দ্রের কোনো সেবা করতে পারলে আমরা ধন্য হবো। যদি প্রয়োজন থাকে জানাবে।

সুপার্শ্ব বলল—

—যদি তোমরা লঙ্কায় যেতে চাও তবে আমি পিঠে চাপিয়ে তোমাদের লঙ্কায় পৌঁছে দিতে পারি।

হনুমান বলল—

—তার প্রয়োজন হবে না। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় আমি এই কাজ অনায়াসে করতে পারব।

সম্পাতি তখন উড়তে সক্ষম। পিতা-পুত্র উড়ে গেল উত্তরে। আর হনুমান-সহ বানরেরা সীতার সংবাদ নিয়ে ফিরে গেল শ্রীরাম, লক্ষ্মণ আর সুগ্রীবের কাছে।



প্রায় দুই পক্ষ অতিক্রান্ত হতে চলল, সীতাদেবীর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। আর হনুমান সহ বানর সেনারাও ফিরে এলো না। শ্রীরামের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। সুগ্রীবও চিন্তান্বিত আর লক্ষ্মণ কিছুতেই ক্রোধ প্রশমিত করতে পারছেন না। এই সময় হনুমান, অঙ্গদ-সহ বানরসেনারা ফিরে এল। রাবণ যে সীতা দেবীকে লঙ্কায় নিয়ে গেছে এবিষয়ে নিশ্চিত সংবাদ তারা নিয়ে এসেছে। আবার দক্ষিণসাগর তীরে শুরু হলো মহা সম্মেলন। কে নেই সেখানে? আছেন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, অঙ্গদ, নল, নীল প্রমুখ। আছে লক্ষ লক্ষ বানরসেনা। সম্পাতি ও সুপার্শ্বের উল্লেখ করে হনুমান সীতার সম্ভাব্য লঙ্কায় অবস্থিতির কথা জানাল। বানরসেনা সমুদ্রের এই পারে সর্বত্র অনুসন্ধান করেছে কোথাও সীতাদেবীকে পাওয়া যায়নি। সম্পাতি পুত্র সুপার্শ্বের বর্ণনা অনুসারে রাবণ সীতাদেবীকে লঙ্কায় নিয়ে গেছেন। অতিকায় সম্পাতিও লঙ্কার কোনো কাননে রাক্ষসী বেষ্টিত অবস্থায় এক দেবীকে দর্শন করেছে। ইনি সম্ভবত সীতামাতা।

প্রাজ্ঞ জাম্ববান বলল—এইবার সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় মাতা সীতার অন্বেষণ করতে হবে। বানর বীরদের মধ্যে কে কে সাগর লঙ্ঘনে সক্ষম?

জাম্ববানের প্রশ্নে সব বানরবীররা মাথা হেট করে। এবার অঙ্গদ বলল—

—মাতা সীতার অন্বেষণে সাগর লঙ্ঘন করে অমর কীর্তি স্থাপনে কোন বীর আগ্রহী?

অঙ্গদের বচনে গয় নামে এক বানরবীর মাথা তুলে বলল—

—শতেক যোজন সমুদ্রের আমি দশ যোজন পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারি।

তারই সহোদর গবাক্ষ নামে এক বানর বীর বলল—

—আমি বিশ যোজন লঙ্ঘন করতে সক্ষম।

শরভ নামে এক সেনাপতি বলল—

—আমি চল্লিশ যোজন পর্যন্ত যেতে পারি।

আর এক বানর বীর গন্ধমাদন বলল—

—আমি পঞ্চাশ যোজন অতিক্রম করতে পারি—

সুষেণ-পুত্র মহেন্দ্র বলল—

—ষাট যোজন পর্যন্ত যাবার ক্ষমতা আমার আছে।

তার সহোদর দেবেন্দ্র বলল—

—আমি সত্তর যোজন পর্যন্ত যেতে পারি।

বিশ্বকর্মার পুত্র নল বললো।

—সমুদ্রের আশি যোজন পর্যন্ত অতিক্রমের ক্ষমতা আমার আছে।

এবার অগ্নির পুত্র নীল বলল—

—আমি নব্বই যোজন পর্যন্ত লঙ্ঘন করতে পারি।

বানর বীরদের উত্তর শুনে প্রাজ্ঞ জাম্ববান বলল—

—আমি বৃদ্ধ হয়েছি, যৌবনের সেই তেজ আর নেই। এক সময়ে খেলাচ্ছলে সমুদ্র পেরোতাম। আজ আমি অপরাগ।

অঙ্গদ এতক্ষণ চুপ ছিলেন এবার বললেন—

—আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারি কিন্তু ফিরে আসতে পারব কিনা সন্দেহ।

হনুমান বানরদের আড়ালে থেকে বানর বীরদের কথা শুনছিল। জাম্ববান বলল—

—সবার কথা শোনা হলো, নিজের কথাও বললাম। প্রকৃতপক্ষে যে সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কায় গিয়ে মাতাসীতার সংবাদ নিয়ে আসতে পারে সে এখনও কিছু বলেনি। আমি হনুমানের কথা বলছিলাম। এখানে উপস্থিত থাকলেও সে এখনও নিশ্চুপ। অথচ তার অলৌকিক শক্তির কথা আমরা জানি। জন্ম থেকে পবননন্দন মহাবলশালী এবং অকুতো ভয়। শৈশবে ফল ভেবে বালসূর্যকে ধরতে যায়। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে হনু (চোয়াল) ভেঙে যায় বলে নাম হয় হনুমান। শৈশবেই দেবতাদের আশীর্বাদে পুষ্ট। জগতে হেন কোনো কঠিন কাজ নেই যা হনুমানের দ্বারা সম্ভব নয়। হনুমান অবলীলায় সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কা থেকে সীতা মাতার সন্ধান নিয়ে আসতে পারে। আমি হনুমানকে এই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছি।

উঠে দাঁড়াল হনুমান যেন এক সতেজ পর্বত। শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি দিয়ে বলল—

—আমার রাজা সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ এবং বানরকুলের সম্মান রক্ষার্থে আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের এই কাজ অবশ্যই করবো। মহা বিহঙ্গ সম্পাতি এবং তার পুত্র সুপার্শ্বের বিবরণ অনুযায়ী আমারও দৃঢ় বিশ্বাস মাতা সীতাকে দুরাত্মা রাবণ লঙ্কার কোনো সুরক্ষিত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। আমি সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় গিয়ে দেবী সীতার অন্বেষণ অবশ্যই করব। সাগর

লঙ্ঘনের জন্য আমি যখন লাফ দেবো তখন ধরণী আমার ভার সহ্য করতে পারবে না। তাই আমি মহেন্দ্র পর্বত থেকে লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হব।

শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবানকে আলিঙ্গন এবং অন্যান্য বানর বীরদের সম্ভাষণ করে হনুমান চলল মহেন্দ্র পর্বতের উদ্দেশ্যে, তাকে অনুসরণ করল লক্ষ লক্ষ বানর সেনা। বানরেরা উদ্যান থেকে পুষ্প চয়ন করে এক সুবৃহৎ মালা তৈরি করে হনুমানের গলায় পরিয়ে দিল। এইবার সকলের অনুমতি নিয়ে হনুমান গণেশাদি নানা দেবতার পূজা সম্পন্ন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করল। স্মরণ মাত্র শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের হৃদয়ে প্রকাশিত হলো। হনুমান রঘুপতি রাঘবের কাছে প্রার্থনা করল—

—হে প্রভু ! তুমি কৃপামৃত পারাবার। তোমার কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। তোমার কৃপাকণাকে পাথেয় করে আমি সমুদ্র লঙ্ঘনের সাহস করেছি। যদি এই কর্মে আমি সফল হতে না পারি তবে তোমার কল্পতরু নামে কলঙ্ক হবে। হে কৃপাময় তুমি আমায় কৃপা কর।

হনুমানের এই প্রার্থনা শুনে ভগবান কটাক্ষে অনুমতি দিয়ে অন্তর থেকে অন্তর্ধান করলেন। হনুমান এখন নির্ভয়, তার মনে অদম্য সাহস। সমুদ্রকে তখন সে গোষ্পদের মতো দেখছে। প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে বলল—

—প্রভুর কৃপায় এই সমুদ্রকে আমি কোটিবার লঙ্ঘন করতে পারি। রাবণের লঙ্কাকে তুলে এনে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারি।

হনুমানের বাক্যশুনে বানরকুল হনুমানের জয়ধ্বনি দিল। হনুমান পুনরায় প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ জাম্বমানকে প্রণাম করে এবং অঙ্গদকে আলিঙ্গন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম অন্তরে স্মরণ করে সাগর লঙ্ঘনের জন্য দক্ষিণমুখে দাঁড়াল। আপন লীলায় দেহকে দশ যোজন বিস্তৃত করে এক পর্বতাকার ধারণ করল। পুচ্ছ হলো তার দ্বিগুণ। মনে হলো এক পর্বতের উপর আরেক পর্বত স্থাপিত হয়েছে। তার ভারে পর্বত থরহরি কম্পিত হলো। পশুপাখিরা সব ভয়ে চীৎকার করে ছুটাছুটি করতে লাগল। গগনবিদারী শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে নিমেষের মধ্যে আকাশে উঠল হনুমান। মারুতির বীরত্ব দেখে তুষ্ট হয়ে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

হনুমানের এহেন বীরত্ব দেখেও তার সাফল্য সম্পর্কে দেবতারা সন্ধিহান ছিলেন তাই তাকে পরীক্ষা করে তার বলবীর্য ও চাতুর্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নাগমাতা সুরসার শরণাপন্ন হন। সুরসা দেবতাদের অনুরোধে রাক্ষসীর রূপ ধরে হনুমানের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সুরসা মুখ বিস্তার করে হনুমানকে গিলতে যায়। হনুমান তখন যুক্তকরে সুরসাকে অনুরোধ করে সে দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণী সীতামাতার সন্ধানে লঙ্কায় যাচ্ছে। যাকে রাবণ পঞ্চবটীর কুটির থেকে অপহরণ করে এনেছে। রাক্ষসী যেন তার গমন পথে বাধার সৃষ্টি না করে। শ্রীরাম জগতের হিতকারী তার কাজে বাধা দেওয়া অনুচিত। তখন সুরসা বলল—

—তোমার কথা আমি মানছি কিন্তু আমার কাছে এসে কোন প্রাণী ফিরে যেতে পারে না। তুমিও ফিরতে পারবে না।

রাক্ষসীর এহেন বাক্যে হনুমান কুপিত হয়ে বলল—

—রে দুষ্টা, তুই কোন মুখে তুই আমাকে ভক্ষণ করবি সেই মুখ দেখা আমি প্রবেশ করি। আমার দেহ দশ যোজন বিস্তৃত।

হনুমানের কথা শুনে সুরসা তার মুখ বিশ যোজন বিস্তৃত করে।

হনুমান তখন তার দেহকে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত করে। সুরসা মুখ বিস্তার করে চল্লিশ যোজন। এইভাবে হনুমান দেহ যত বৃদ্ধি করে সুরসাও মুখ ততোধিক বিস্তার করে। হনুমান যখন নব্বই যোজন দেহ বিস্তার করে তখন সুরসাও শত যোজন মুখ বিস্তার করে। তা দেখে হনুমান বিস্মিত হলো, ভাবল এ কোনো সাধারণ রাক্ষসী নয়। হনুমান তখন দেহ আরও বিস্তৃত করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে রাক্ষসীর মুখে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসী মুখ বন্ধ করে। হনুমান তখন এক ক্ষুদ্র মক্ষিকার রূপ ধারণ করে রাক্ষসীর কর্ণরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার নিজমূর্তি ধারণ করে। হনুমান বলে—

—তুমি নাগমাতা সুরসা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তোমার বচন রক্ষা করে আমি তোমার মুখে প্রবেশ করেছি। এখন আমাকে দয়া করে যেতে দাও আমি রামের কার্যে সীতার সন্ধানে চলেছি। তুমি যদি নিতান্তই আমাকে খেতে চাও তবে একটু বিলম্ব করো আমি শ্রীরামের কার্য সম্পন্ন করে স্বেচ্ছায় তোমার মুখে এসে প্রবেশ করব।

তখন সুরসা নিজ মুর্তি ধারণ করে বলল।

—আমি নাগমাতা সুরসা, এতক্ষণ দেবতাদের অনুরোধে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। সত্যি তুমি এই কাজের যোগ্যতম। তোমার বিকল্প নেই। তুমি রাম-সীতার মিলন ঘটাতে পারবে। অমরমণ্ডলী তোমায় আশীর্বাদ করুন। আপন কার্যে তুমি সফল হও।

মারুতির বল-বীর্য-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে দেবতারা প্রশংসা করলেন। হনুমান চলল আপন পথে, এখনো অনেকটা পথ বাকি। হনুমান ক্লান্ত, সমুদ্র চিন্তিত হলেন। যে সগর বংশ থেকে সমুদ্রের উৎপত্তি সেই সগর কুলোদ্ভূত শ্রীরামচন্দ্রের কার্যোদ্ধারে চলেছে পবননন্দন। ক্লান্ত পবন নন্দনের বিশ্রামের ব্যবস্থা সমুদ্রের কর্তব্য। বারিধির মনে পড়লো তার আশ্রিত মৈনাক পর্বতের কথা। ইন্দ্রের ভয়ে হিমালয় পুত্র মৈনাক সমুদ্রে লুকিয়ে আছে। এক সময়ে সব পর্বতের পাখা ছিল। ইন্দ্র সকল পর্বতের পাখা ছিন্ন করতে শুরু করলেন বজ্রের দ্বারা। সব পর্বত পক্ষহীন হলো, একমাত্র মৈনাক সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিয়ে পক্ষ রক্ষা করতে

পেরেছিল। মৈনাক কৃতজ্ঞ সমুদ্রের কাছে। সমুদ্র মৈনাককে ডেকে বলল এই সময়ে বিপুল অবয়বে সমুদ্রের উপর অবস্থান করে পথশ্রান্ত পবন নন্দনকে কিছু সময় বিশ্রমের অবকাশ দেওয়ার জন্য। মৈনাক শ্রীরামের কর্মে রত পবনতনয় হনুমানকে সাহায্য করতে সানন্দে সম্মত হলো। পূর্ণাঙ্গ মৈনাক পর্বত সমুদ্রবক্ষে অবস্থান করতে লাগল। দূর আকাশে হনুমানকে দেখা যাচ্ছে, ক্রমে কাছে আরও কাছে। হনুমান হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে এক বিশাল পর্বত দেখে চিন্তিত হলো। তখন পর্বত মৈনাক মানুষের রূপ ধারণ করে আপন শৃঙ্গ থেকে হনুমানের উদ্দেশ্যে বলল।

—হে বায়ুপুত্র। আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি সগর-বংশীয় দাশরথী শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন করতে চলেছ। তাই কৃতজ্ঞ সাগরের নির্দেশ মেনে আমি তোমাকে বিশ্রাম দেবার জন্য সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছি। আমার শৃঙ্গে তুমি বিশ্রাম করো দিব্য ফলমূল আহার কর, সুপেয় জল পান কর। বিশ্রামের পর তুমি হৃষ্ট মনে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করবে। আমি তোমার পরম সুহৃদ, তুমি আমার বাসনা সফল কর।

মৈনাকের বাক্য ও ব্যবহারে খুব হৃষ্ট হলো হনুমান। আকাশ থেকে বলল—

—হে গিরিবর! তোমার দর্শনে দিন সফল আমার। তোমার মধুর বাক্যে মন জুড়িয়ে গেল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, শ্রম নিবৃত্ত হলো। তোমার আগ্রহে বিশ্রাম নেওয়া আমার উচিত, কিন্তু আমার সময় সাগর পারে সুহৃদ বন্ধুদের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি নিরবচ্ছিন্নভাবে সমুদ্র পার হয়ে আমি লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করব। অতএব আমি বিশ্রাম করে সত্যভঙ্গ করতে পারব না। তবে তোমার ইচ্ছাও আমি অপূর্ণ রাখবো না এই আমি তোমাকে স্পর্শ করলাম।

এইকথা বলে দ্রুত নীচে নেমে হস্তদ্বারা মৈনাকের অঙ্গ স্পর্শ করে আবার আকাশে উড্ডীন হলো। ইন্দ্রাদি দেবগণ মৈনাকের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তার প্রশংসা করলেন। স্বয়ং ইন্দ্র মৈনাককে অভয় দিলেন সেই থেকে মৈনাক সমুদ্রের অতল থেকে উঠে সমুদ্রের উপরে স্থিত হলো। অনেক দূরে তখন সুশোভিত লঙ্কানগরী হনুমানের চোখে দৃশ্যমান হচ্ছে। এই সময় সিংহিকা নামে এক রাক্ষসীর চোখে পড়ে হনুমান। সেই রাক্ষসীর অলৌকিক ক্ষমতা, কোনো প্রাণীর ছায়া থেকে সে সেই প্রাণীকে আকর্ষণ করতে পারে। বলিষ্ঠ হনুমানকে দেখে উদরপূর্তি করার লোভে সমুদ্রে পতিত ছায়া থেকে হনুমানকে আকর্ষণ করতে থাকে রাক্ষসী। প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে হনুমান নীচের দিকে তাকাতে সেই ভীষণা রাক্ষসীকে দেখতে পায়। রাক্ষসী মুখ বিস্তার করে হনুমানকে গিলতে প্রস্তুত। রাক্ষসীকে দেখে হনুমান মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। সে নিজের দেহকে অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরে রাক্ষসীর বিস্তারিত মুখবিবরে প্রবেশ করে। শিকার ধরা পড়েছে ভেবে রাক্ষসী তার বিস্তৃত মুখ সংকুচিত করে শিকার গলাধকরণের চেষ্টা করে। হনুমান তখন রাক্ষসীর উদরে প্রবেশ করে নখের আঘাতে তার দেহাভ্যন্তর ক্ষতবিক্ষত করে বিদীর্ণ করে। সেই আঘাতে রাক্ষসীর মৃত্যু হয়। জলচর প্রাণীরা আনন্দিত হয়ে তার দেহ ভক্ষণ করতে থাকে। যে সকল দেবতা গন্ধর্ব এই নিশাচরীর আকর্ষণের ভয়ে এই আকাশমার্গ পরিত্যাগ করেছিল তারা বায়ুপুত্রের জয়ধ্বনি দিল। অন্তরীক্ষ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো। এরপর হনুমান লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত। কিন্তু এই বিশাল কলেবর নিয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলে সকলে ভীত হবে এবং উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন হবে। তাই হনুমান ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করে লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করল।

লঙ্কাপুরী দর্শন করে হনুমান অবাক হয়ে গেল। কাঞ্চন আর রজতে নির্মিত হর্ম্যসমূহ মণি মানিক্য খচিত। বিশ্বকর্মা নির্মিত লঙ্কার তুল্য নগরী ত্রিভুবনে নেই। হনুমান যত এগুচ্ছে বিস্ময় ততই বাড়ছে। পুষ্পিত তরুলতা, ফলভারে অবনত বৃক্ষরাজি, স্ফটিক নির্মিত জলাধার, সুরম্য কৃত্রিম শৈলমালা। এ যেন এক স্বপ্নপুরী। হঠাৎ হনুমানের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান এক ভীষণ দর্শনা মূর্তি। ইনি কি দেবী, দানবী, রাক্ষসী না মানবী? হনুমান স্থির করতে পারল না। তাঁর ডান হাতে খড়্গ, বাঁ হাতে ত্রিশূল। ত্রিনয়ন যেন তিনটি সূর্য। লোলজিহ্বা, বিকট দশনা। গাত্রবর্ণ মেঘের ন্যায়, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানা, গলায় মুণ্ডমালা। কর্ণ যুগলে মানিক কুণ্ডল। এই মূর্তিকে দেখে হনুমান চিন্তিত হলো। জোড়হাতে দেবীর সম্মুখে গিয়ে বলল—

—শাস্ত্রে দেবী চামুণ্ডার কথা শুনেছি। যিনি শিবের প্রেয়সী। তুমি কি সেই মাতা চামুণ্ডা? তুমি এই লঙ্কাপুরীতে কেন? তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছি?

চামুণ্ডা বললেন—

—আমি শঙ্করপত্নী চামুণ্ডা। স্বামীর আজ্ঞায় আমার লঙ্কায় বসতি। যখন স্বয়ং ব্রহ্মা এই লঙ্কাপুরী সৃজন করেছেন তখন থেকে আমি লঙ্কাপুরী রক্ষা করে আসছি। শিবকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমাকে কতকাল লঙ্কায় থাকতে হবে? উত্তরে শঙ্কর বলেছিলেন, অযোধ্যার দশরথের পুত্র রূপে শ্রীরামের জন্ম হবে। তাঁর পত্নী সীতা সতীকে রাবণ হরণ করে লঙ্কায় আনবে। শ্রীরামচন্দ্র সীতার সন্ধানে চর হনুমানকে লঙ্কায় পাঠাবে। তুমি যখন হনুমানকে লঙ্কায় দেখবে সেই মুহূর্তে লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে চলে আসবে। যতদিন হনুমান না আসে ততদিন আমি লঙ্কা ত্যাগ করে যেতে পারছি না। এইবার বল তুমি কে? কেন লঙ্কায় এলে? আর এই দুস্তর সমুদ্রই বা তুমি পার হলে কিভাবে?

এইবার হনুমান বলল—

—মাতঃ! আমিই প্রভু শ্রীরামের দূত হনুমান। মাতা সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় এসেছি। আর প্রভুর কৃপায় সমুদ্র লঙ্ঘন

করেছি।

শিবের নির্দেশ অনুযায়ী হনুমানকে লঙ্কায় দেখে চামুণ্ডা লঙ্কা পরিত্যাগ করে স্বস্থানে চলে গেলেন।

চামুণ্ডার প্রস্থানের পর হনুমান এবার নির্ভয়ে ঘুরতে লাগল লঙ্কাপুরীতে। কত উদ্যান, সরোবর, দিঘি, প্রাসাদ কিন্তু কোথায় মাতা সীতা! সীতাকে হনুমান কখনো দেখেনি। হনুমান ভাবছে যেখানে নারীদের হাস্য পরিহাস থাকবে সেখানে সীতা থাকবেন না। সীতার চোখে সব সময় জল থাকবে, মলিন বসনা, কৃশাঙ্গী হবে সীতা। সূর্যদেব তখন অস্তাচলে, হনুমান এক উঁচু প্রাচীরের উপর উঠে সবদিক পর্যবেক্ষণ করছে। লঙ্কার প্রাসাদসমূহ গগন চুম্বি, রাক্ষস সেনারা সর্বদা রণসাজে সুসজ্জিত। লঙ্কাপুরে রাবণের দুর্জয় প্রতাপ। তাকে পরাজিত করা বানর সেনাদের পক্ষে অসম্ভব। বানরদের মধ্যে শুধুমাত্র চারজন সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কায় আসতে পারে স্বয়ং হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল। বাকি বানর সেনাদের পক্ষে সাগর লঙ্ঘন অসম্ভব। রজনী সমাগত হলে হনুমান ক্ষুদ্র নেউলের রূপ ধারণ করে রাক্ষস বীরদের প্রাসাদ সমূহ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। অতি সুশোভন রাজভ্রাতা বিভীষণের প্রাসাদ। উল্কাজিহ্ব, বিদ্যুৎজিহ্ব, বিদ্যুম্মালী, শুক সারনের আবাস দেখে হনুমান। একে একে দেখে নেয় লঙ্কার সব আবাস। কিন্তু কোথাও মাতা সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন হনুমান সাবধানে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। শত শত অস্ত্রধারী দুর্জয় রাক্ষসেরা প্রাসাদ রক্ষা করছে। অতি সংগোপনে হনুমান রাবণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। রাবণ শুয়ে আছে রত্নখাটে পাশে এক পরমা সুন্দরী। হনুমান ভাবল এই বুঝি সীতা। শ্রীরামের ন্যায় রূপবান ও গুণবান পুরুষ জগতে দ্বিতীয়টি নেই। সেই শ্রীরামের ঘরনি সীতা রাবণকে ভজনা করবে এ অবিশ্বাস্য। এ নিশ্চয় ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী। এই কক্ষের চারদিকে দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, দানব এবং সুন্দরী রাক্ষস কন্যাগণ নিদ্রায় অচেতন হয়ে ভূমিতে লোটাচ্ছে। হনুমান একে একে সকলকে নিরীক্ষণ করে দেখল সীতার লক্ষণযুক্ত একজনও নেই। নারীরা সব উলঙ্গ, উন্মত্ত, কুৎসিত আকার। সম্পাতি ও তার পুত্র সুপার্শ্বের কথায় বিশ্বাস করে হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কায় এসেছে। সারা লঙ্কা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কোথাও সীতার সন্ধান পায়নি। সীতার সন্ধান না নিয়ে হনুমান লঙ্কা থেকে ফিরবে না। লঙ্কায় সে আত্মহত্যা করবে। বীর হনুমান এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। সত্তর যোজন দীর্ঘ লঙ্কার প্রাচীর, সেই প্রাচীরের উপর বসে হনুমান সম্পূর্ণ লঙ্কা অবলোকন করছে। মাতাসীতা এই লঙ্কায় নেই সম্পাতি সুপার্শ্ব এরা ভুল তথ্য দিয়েছে। হতাশ হনুমান সেই প্রাচীরের উপর বসে ক্রন্দন করছে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সর্বত্র খুঁজে এসেছে হনুমান। কোথাও সীতামায়ের সন্ধান পায়নি। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে কী বলে প্রবোধ দেবে সেই চিন্তায় ক্লিষ্ট হনুমান। সে ভাবছে ফিরে গিয়ে সে আগে সুগ্রীবকে বধ করবে পরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে নিজে আত্মাহুতি দেবে। হনুমান সীতামাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন যেন একবার দর্শন দেন। এইবার হঠাৎ হনুমানের দৃষ্টি গোচর হয় অশোক বন। নানা ফুলে ফলে সুশোভিত এই বন। কোকিলের কুহুতান আর ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত। অশোকবন দেখে হনুমানের মনে আশার সঞ্চার হলো যে এখানে হয়তো সীতামাতা থাকতে পারেন। ওখানে গেলে সীতামাতার দর্শন পাওয়া যাবে। চোখের জল মুছে হনুমান আপন দেহকে অতি ক্ষুদ্র আকৃতির করে অশোক বনে প্রবেশ করল। কাননের এক অতি উচ্চ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করে হনুমান কাননের চারদিকে অবলোকন করতে লাগল। এই বনে রাবণের চেড়িরা সব ইতস্তত বিচরণ করছে। সব বিকট দর্শনা হাতে অস্ত্র কিংবা গাছের ডাল সবাই সদা সতর্ক। তারা যে কিছু পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ হনুমানের নজরে এল এক বিশাল বৃক্ষের নীচে এক নারী বসে আছে। তার অবিন্যস্ত কেশ, মলিন মুখ, মলিন বসন। তবে তার অঙ্গ থেকে যেন এক স্নিগ্ধ জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। হনুমান ভাবল ইনি হয়তো সীতামাতা। আরও নিশ্চিত হবার জন্য হনুমান দ্রুত নীচে নেমে এই নারীর কাছাকাছি চলে এল। হনুমান স্পষ্ট শুনল নারী 'শ্রীরাম' বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। 'কোথায় প্রভু শ্রীরাম' বলে রোদন করছেন। ইনি যে সীতামাতা এ বিষয়ে হনুমানের আর সন্দেহ রইল না। তবে সীতামাতার দুঃখে হনুমান বিচলিত। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রও বিরহ যন্ত্রণায় কাতর। হনুমান ভাবছে কী করে প্রভু শ্রীরাম ও মাতা সীতার মিলন ঘটানো যায়। মুহূর্তের মধ্যে রাক্ষসীদের মেরে সীতাকে উদ্ধার করে সমুদ্র লঙ্ঘন করে বানরশিবিরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পৌঁছানো যায়। কিন্তু সেটা কি সমীচীন হবে? এমন সময় হনুমান লক্ষ্য করল অনেকগুলি মশাল অশোক বনের দিকে এগিয়ে আসছে। হনুমান সচকিত হয়ে নিজেকে শিংশপার শাখাপ্রশাখা আর পত্রের আড়ালে রেখে মশালের দিকে দৃষ্টি রাখল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে রাবণের নিদ্রাভঙ্গ হলো। অতিরিক্ত মধুপানে কামার্ত রাবণের মনে হলো সীতার কথা। সেই রাতেই অনুচরদের নিয়ে রাবণ এল অশোক কাননে। এই সেই অনুচরদের মশালের আলো। সীতার কাছাকাছি আসতে অনুচররা থেমে গেল। রাবণ এগিয়ে এল সীতার দিকে। শিংশপা গাছের উপর থেকে হনুমান দেখছে রাবণ কী করে। আর মাতাসীতাই-বা কী করেন। যদি রাবণ সীতামাতাকে অপমান করতে উদ্যত হয় তবে হনুমান মুষ্টাঘাতে রাবণের মস্তক বিদীর্ণ করে দেবে। এদিকে রাবণকে দেখতে পেয়ে মাতাসীতা মলিন বসন দিয়ে নিজের অঙ্গ ঢেকে অধোবদনে বসে রইলেন আর বলতে লাগলেন—

—রক্ষা করো শ্রীরাম।

আলুলায়িতা কেশী, মলিনবসনা সীতার রূপের আলোয় অশোক কানন উদ্ভাসিত। কামার্ত রাবণ সীতার দিকে তাকিয়ে বলল—

—মাথা নীচু করে রইলে কেন জনক নন্দিনী। অভিমান ত্যাগ করে আমার দিকে তাকাও। দশ হাজার দেব এবং গন্ধর্ব কন্যাকে আমি বিবাহ করেছি। তুমি আমার পাটরানি হয়ে সিংহাসনে বসো। এই মলিন বসন ছেড়ে সর্বাঙ্গে রাজ আভরণ পরিধান কর। আমি রাজা দশানন তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকব। লঙ্কাপুরীতে দেবতারাও আসতে পারে না। তবে কাকে তোমার ভয়? তোমাকে বলপ্রয়োগ করে তুলে এনেছি, এটাই বলবান রাক্ষসের ধর্ম। হে সুবদনী, তোমার উপমা ত্রিভুবনে নেই। রামের সেবা করে তোমার জীবন গেল দুঃখে। আমার রাণি হয়ে তুমি যথেচ্ছ সুখ ভোগ করো। ওই রাজ্যহারা বনবাসী দুর্বল রামের কথা ভুলে যাও। রাম এতদিনে নিশ্চয় নিশাচরের পেটে গেছে। রতিশাস্ত্রে আমি সুপণ্ডিত, রতি সুখে আমিই তোমার জীবন ভরিয়ে দিতে পারি। আমি তোমার সেবক, তুমি আমার ঈশ্বরী। আজ্ঞা করো তোমাকে অন্তপুরে নিয়ে যাই।

রাবণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হনুমান ভাবছে আর কালবিলম্ব না করে এইবার স্বমূর্তি ধারণ করে বজ্রমুষ্টিতে রাবণের মস্তক বিচূর্ণ করে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করা উচিত। তবে একবার দেখা দরকার সীতামাতা রাবণের কথার প্রত্যুত্তরে কিছু বলেন কিনা?

রাবণের বাক্যশুনে সীতা রাবণের দিকে পেছন ফিরে বসে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।

—আমি রাজর্ষি জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, শ্রীরামের বনিতা। আমি বিলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি তোমার কাল উপস্থিত তাই শৃগাল হয়ে সিংহের সঙ্গে বিবাদ করছ। তোমার সবংশে বিনাশ অনিবার্য, অমৃত পান করলেও তুমি শ্রীরামের বাণ থেকে পরিত্রাণ পাবে না। আর আমার অভিশাপে এই স্বর্ণলঙ্কা শ্মশানে পরিণত হবে।

সতীসাধ্বী সীতামাতার তেজোদীপ্ত বচন শুনে হনুমান শিংশপার পত্রপল্লবের আড়াল থেকে ভক্তিভরে সীতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। রাবণ এতক্ষণ নিঃশব্দে সীতার কথা শুনেছে, এবার ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে এক চেরীর হাত থেকে এক বিশাল খড়্গ নিয়ে সীতার দিকে তেড়ে গেল। বলল—

—তোর এত অহঙ্কার আজ আমার হাত থেকে তোর নিস্তার নেই। এই খড়্গ দিয়ে আজ তোকে দ্বিখণ্ডিত করব, দেখি রাম তোকে রক্ষা করতে পারে কিনা?

সম্মুখে খড়্গ হাতে কালান্তক যমের ন্যায় রাবণকে দেখে সীতা দুই হাত তুলে বলল—

—হে শ্রীরাম, তুমি তোমার সীতাকে রক্ষা কর। মৃত্যুভয়ে আমি ভীতা নই, তবে একমাত্র দুঃখ মৃত্যুকালে তোমার দর্শন পেলাম না। এবার রাবণের দিকে তাকিয়ে বলল—

—লঙ্কেশ্বর, তুমি আমার প্রাণ নাও, শুধু আমার শেষ মিনতিটুকু রাখ। শ্রীরামের রাতুল চরণ ধ্যান করার জন্য আমাকে ক্ষণিক সময় দাও। মৃত্যুকালে তাঁর চরণ ধ্যান করলে পরজন্মেও তিনি আমার পতি হবেন।

সীতাদেবী হাত জোড় করে অধোমুখে বসলেন। রাবণের অনুসরণ করে রানি মন্দোদরী সখী পরিবেষ্টিত হয়ে ততক্ষণে অশোককাননে উপস্থিত হয়েছেন। দূরে দাঁড়িয়ে তিনি সব দৃশ্য দেখছেন। এদিকে হনুমানও প্রস্তুত যদি রাবণ সীতামাতার প্রাণ সংহারের জন্য খড়্গ উত্তোলন করে তবে সেই খড়্গ কেড়ে নিয়ে রাবণকেই যমালয়ে পাঠাবে।

রাবণ কিন্তু খড়্গ উত্তোলন করল না। সীতাকে আবার বলল—

—সীতা, তুমি এবার রাম নাম ছেড়ে আমার ভজনা কর। নচেত এই মুহূর্তেই তোমার জীবন অবসান হবে।

মাতাসীতা বললেন—

—তোমার ওই খড়গকে আমি ভয় করি না। আমার জীবনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ আসার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।

মন্দোদরী এবার এগিয়ে এসে রাবণকে বলল—

—দেখ, সীতা দেবতাও নয়, গন্ধর্বও নয়। সীতা মানবী, সতী সাধ্বী, মহীয়সী। সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দাও। শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী। এদের সঙ্গে বিরোধ করে নিজের এবং রাক্ষসকুলের সর্বনাশ ডেকে এনো না।

মন্দোদরীর কোন কথা রাবণের কানে গেল না। সীতাকে দেখে কামে অচেতন রাবণ তখন খড়্গ ফেলে সীতাকে ধরতে গেল। মন্দোদরী সর্বশক্তি দিয়ে রাবণকে বাধা দিয়ে বলল—

—লঙ্কেশ্বর, তুমি কুবেরের সেই শাপের কথা ভুলে গেলে? বলপূর্বক শৃঙ্গার করলে তোমার মৃত্যু হবে। আমার বলছি লক্ষ্মী অংশে জন্ম সীতাদেবীর। তাঁকে অপমান করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না।

মন্দোদরীর বাক্য আর সীতার ক্রন্দনে রাবণের চৈতন্য ফিরে এল। খড়্গ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাবণ সীতার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দিল চেরীদের। তারপর ধীরে ধীরে প্রাসাদে ফিরে গেল। মন্দোদরী সখীদের নিয়ে রাবণকে অনুসরণ করল। রাবণ মন্দোদরী চলে গেলে সব চেরীরা সীতাকে ঘিরে ধরে বোঝাতে শুরু করে। রামের তুলনায় রাবণ সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। রামের অল্প ধন, স্বল্প জীবন। আর রাবণ চৌদ্দ যুগ রাজ্য ভোগ করবে। সীতা চেরীদের কথা গ্রাহ্য করছে না দেখে প্রভাসা নামে এক রাক্ষসী বলল—

—সীতা, যদি আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়, তবে সীতাকে কেটে আমরা তার মাংস খাব। তবে এই কথা যেন ছোট রানি



সরমা জানতে না পারে, সে সীতার সখী আগে জানলে সে এই কথা রাজার কানে তুলে দেবে।

এইরকম আলোচনা হতে হতে একে একে চেরীরা ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের নাসিকা গর্জনে অশোক কানন কম্পিত হচ্ছে। আর সীতাদেবী শ্রীরাম শ্রীরাম বলে ক্রন্দন করছেন। হনুমান তখন ভাবল আত্মপ্রকাশ করার এই উপযুক্ত সময়। সেই বৃক্ষের উপরে বসে রাম নাম জপতে লাগল হনুমান যাতে সেই ধ্বনি সীতা মায়ের কানে পৌঁছায়। এই রাক্ষসপুরীতে রাম নাম শুনে সীতা হতচকিত হয়ে গেলেন। বললেন—

—এই নিষ্ঠুর লঙ্কাপুরীতে কে শোনালে মধুর রাম নাম? হৃদয় জুড়িয়ে গেল। হে রামভক্ত, একবার দেখা দাও।

এইবার হনুমান করজোড়ে সীতার সামনে এসে দাঁড়াল। হনুমানকে দেখে সীতা ভাবল এ নিশ্চয় রাবণের চর। ছদ্মবেশ ধারণ করে তাকে ভুলাতে এসেছে। হনুমান বলল—

—মাতা, ভয় পেয়ো না। আমি পবন নন্দন হনুমান। শ্রীরামের দাস। তোমার সন্ধানে সমুদ্র পেরিয়ে এই লঙ্কায় এসেছি। সমুদ্রের ওপারে শ্রীরাম লক্ষ্মণের সঙ্গে অসংখ্য বানরসেনা অপেক্ষা করছে।

সীতা বললেন—এই রাক্ষসপুরীতে অহোরাত্র ছলনার মধ্যে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে তোমাকে দেখে আমার আপনজন বলে মনে হচ্ছে। যদি তুমি সত্যি শ্রীরামের দূত হও তবে আমাকে কোনো অভিজ্ঞান দেখাও।

হনুমান তখন কটিবন্ধের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত শ্রীরামের অঙ্গুরীয়টি বের করে সীতার সামনে রাখল। সীতা তাদের বিবাহের সময় পিতা জনকের দেওয়া অঙ্গুরীয়টি দেখেই চিনতে পারলেন। অঙ্গুরীয়টি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে হৃদয়ে স্থাপন করলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

হনুমান সীতা মাতাকে প্রবোধ দিয়ে বলল—

—মা, তুমি কোনো চিন্তা করো না, প্রভু শ্রীরামের হাতে রাবণ আর রাক্ষসকুলের ধ্বংস অনিবার্য। বানররাজ সুগ্রীব প্রভুর সহায়, সঙ্গে অসংখ্য বানরসেনা। আর তোমার আদেশ পেলে তোমার এই ভক্তসন্তান একাই এই স্বর্ণলঙ্কাকে নরকে পরিণত করতে পারে।

হনুমানের বাক্যে সীতা খানিকটা আশ্বস্ত হলেন কিন্তু ভয় তার গেল না। বললেন—

বৎস হনুমান, এই অশোককানন আমার কাছে শোকের কানন। এখানে সামান্য খাদ্যও আমার ভাগ্যে জোটেনি। একমাত্র রামনামই আমার পানীয়-আহার। এই নির্বান্ধবপুরীতে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভিষণের স্ত্রী আমার সখী। সে আসে আমার জন্য মাঝে মাঝে আহার্য বস্তুও নিয়ে আসে। চেরীরা সব কেড়ে খেয়ে নেয়। আজ সরমা আমার জন্য পাঁচটি ফল নিয়ে এসেছিল আমি লুকিয়ে রেখেছি। এই পাঁচটি ফল আমি তোমায় দিচ্ছি।

সীতা উদ্যানের এক গোপনস্থান থেকে পাঁচটি আম এনে হনুমানকে দিলেন। হনুমান বলল—

—মা, এখানেতো তোমার নিজের খাবার কিছু নেই। নিজে না খেয়ে এই ফলগুলি আমাকে কেন দিচ্ছ?

সীতা বললেন—এই পাঁচটি ফল তুমি নিয়ে যাবে। একটি ফল শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলে দেবে, একটি ফল দেবর লক্ষ্মণকে দেবে, সকল বানরদের দুটি ফল দেবে আর একটি ফলের অর্ধেক রাজা সুগ্রীবকে দেবে, বাকি অর্ধেক তুমি খাবে।

হনুমান কৌতুক করে বলল—

—মাতা, এই অর্ধেক ফলে কি আমার উদরপূর্তি হবে? তুমি আদেশ করলে আমি সমুদ্রের সব জল নিমেষে শুষে নিতে পারি।

সীতা বললেন—

—তোমার মায়ের অবস্থাটা একবার বোঝ, এর থেকে বেশি কিছু দেবার ক্ষমতা যে আমার নেই। তবে আমি বলছি এই অর্ধেক আমেই তোমার উদরপূর্তি হবে। আর যদি কোনদিন অযোধ্যায় যেতে পারি তবে তুমি যে খাদ্য যত খেতে পার তোমাকে খাওয়াব। হনুমান তুমি আমার দ্বিতীয় পিতা। রাজর্ষি জনক আমাকে প্রাণ দিয়েছিলেন। আজ শ্রীরামের বার্তা এনে তুমি আমাকে দ্বিতীয়বার প্রাণ দান করলে। তুমি আজ আমার প্রাণদান করলে, আমিও তোমাকে কিছু দিতে চাই। আমার বরে তুমি চার যুগ অমর হবে। শস্ত্রের দ্বারা বধ্য হবে না, অগ্নির দ্বারা দাহ্য হবে না। কায়মনোবাক্যে যদি আমি সতী হই আমার বাক্য লঙ্ঘন হবে না।

হনুমান সীতাকে প্রণাম করে সেই পঞ্চফল পরম যত্নে কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে নেয়। হনুমান ভাবে সীতার জন্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে এক অভিজ্ঞান নিয়ে এসেছিল এবার মাতা সীতার নিকট থেকেও প্রভুর জন্য একটি অভিজ্ঞান নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাতে প্রভুর প্রত্যয় হবে। সীতাদেবী বললেন—

—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্মিক বিভীষণ আমাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য রাবণকে অনেক বুঝিয়েছে। লঙ্কার এক সদাশয় প্রবীণ রাক্ষস অরবিন্দ আমাকে শ্রীরামের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয় করেছে কিন্তু রাবণ কারও কথায় কর্ণপাত করেনি। বিভীষণের এক কন্যা তার নাম সানন্দা। সরমা তাকে আমার কাছে পাঠায় তার কাছ থেকে আমি এই বিবরণ শুনেছি। যুদ্ধ বিনা আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তোমাদের সেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

হনুমান বলল—

—যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। তুমি আমার পিঠে আরোহণ কর আমি তোমাকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বলো আমি মৃগ হবো না, পক্ষী, তুমি কীসে অরোহণ করবে?

সীতাদেবী বললেন—

—তুমিতো এক ক্ষুদ্রাকৃতি বানর। কী করে আমাকে বহন করে শ্রীরামের কাছে নিয়ে যাবে? বলেছ এতেই আমার শান্তি।

সীতা এই বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান নিজের দেহকে আশি যোজন পরিমাণ বৃদ্ধি করল। মাথা গিয়ে ঠেকল আকাশে। হনুমানের বীরত্ব ও সততা সম্পর্কে সীতার আর কোনো সন্দেহ রইল না। হয়তো দীর্ঘ আট মাস পর প্রথম মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। অশোকবনে আসার পর এই প্রথম সীতার মুখে হাসি দেখা গেল। স্মিত হেসে বললেন—

—আমার পুত্রের বীরত্ব সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমার পুত্র দুরাত্মা রাবণের মতো মাতাকে চুরি করে নিয়ে যাবে কেন? যুদ্ধ করে মাতাকে উদ্ধার করবে। তবে যা করার দু'মাসের মধ্যে করবে। রাবণ আমাকে বৎসর কাল সময় দিয়েছে, দশ মাস অতিক্রান্ত, দু'মাস পরে তার কথায় রাজি না হলে সে আমাকে হত্যা করবে। স্মিত হাসি মিলিয়ে গিয়ে অশ্রুমুখী হয়ে উঠলেন সীতা। সীতাকে অশ্রুমুখী দেখে হনুমান বলল—

—মাতা, নিজেকে সম্বরণ কর, মুক্তি তোমার দুয়ারে। তুমি এখন আমাকে কোনো অভিজ্ঞান দাও যা আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাতে পারি যাতে তাঁর প্রত্যয় হয় যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

সীতাদেবী তাঁর মাথা থেকে একটি মণি খুলে হনুমানের

হাতে দিলেন। আর একটি সুরক্ষিত উদ্যান দেখিয়ে বললেন।

—ওইযে দেখছো ওইটি লঙ্কার বিখ্যাত অমৃত ফলের উদ্যান। তুমি ওই উদ্যানে প্রবেশ করে যথেচ্ছ ফল ভক্ষণ করে তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর করো। বিলম্ব করো না, সূর্যোদয়ের পূর্বে এই পাপপুরী ত্যাগ কর।

হনুমান সীতাকে প্রণাম করে বলল—

—বিদায় মা, আমি যাচ্ছি তবে এই মুহূর্তে আমি লঙ্কা ত্যাগ করছি না। এখানে আমার আরও কিছু কাজ আছে। তুমি ভয় পেয়ো না, নীরবে দেখতে থাকো।

হনুমানের কথা শুনে সীতা বললেন—বৎস, তুমি এই পুরীতে একা, অন্যদিকে অসংখ্য রাক্ষস। যা করার সাবধানে করবে।

হনুমান সম্মতি জানিয়ে আবার অতি ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই সুরক্ষিত অমৃত কাননে প্রবেশ করল। প্রথমে চুপিসারে একটি ফলবান বৃক্ষে আরোহণ করে ফল খেতে শুরু করল। ক্রমে একগাছ থেকে অন্য গাছে। তার উদর পুর্তি হলো, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ হলো। এবার গাছের ডাল ভেঙে, গাছ উপড়ে উৎপাত শুরু করল। দেখতে পেয়ে সশস্ত্র রক্ষীরা ছুটে এসে হনুমানকে যথেচ্ছ অস্ত্রাঘাত করতে লাগল। ইত্যবসরে হনুমান এক দীর্ঘ বৃক্ষ উৎপাটিত করে সেই রক্ষীদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করল। সেই আঘাতে অনেক রক্ষীর প্রাণ গেল, জীবিত কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে রাবণকে এই সংবাদ দিল। কোথাকার এক বানর এসে অমৃতবন ধ্বংস করেছে, বৃক্ষলতা উপড়ে ফেলেছে, রক্ষীদের প্রাণে মেরেছে, এখনও সে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাবণের প্রিয় অমৃতকানন ধ্বংস হয়েছে শুনে রাবণ ক্ষিপ্ত হলেন। তারপর ঘরবাড়ি ও বৃক্ষলতা ধ্বংস করছে এক বানর, ক্রুদ্ধ রাবণ সেই বাণরকে বন্দি অথবা হত্যা করার জন্য তৎক্ষণাৎ মূঢ় নামে এক রাক্ষস যোদ্ধাকে পাঠাল। হনুমান তখন প্রচুর অমৃত ফল খেয়ে হৃষ্টমনে প্রাচীরের উপর বসে আছে। মূঢ় হনুমানকে দেখে গদা হাতে হনুমানকে আঘাত করতে যায়। হনুমান সেই গদা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মূঢ় আবার এক বিশাল শূল দিয়ে হনুমানকে আঘাত করে অনুমান সেই শূলও কেড়ে নিয়ে এক গৃহের থাম উপড়ে মূঢ়কে আঘাত করে সেই আঘাতে মূঢ় অচৈতন্য হয়ে যায়। হনুমান মূঢ়ের পা দুটি ধরে তাকে লঙ্কার প্রাসাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। মূঢ়ের অনুচরেরা তখন সমবেতভাবে হনুমানকে আক্রমণ করে। হনুমান তাদের এক একজনকে ধরে আছড়ে মারতে থাকে। কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে রাবণকে সংবাদ দেয়। হনুমান ততক্ষণে অশোক কাননের আশেপাশে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। রাবণ তখন অত্যন্ত বিশ্বস্ত যোদ্ধা প্রহস্তের পুত্র জাম্বুমালীকে পাঠাল হনুমানকে বন্দি করে আনতে। জাম্বুমালী কটক-সহ হনুমানকে আক্রমণ করে। নিরস্ত্র হনুমানের উপর জাম্বুমালী ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ বর্ষণ করতে থাকে। হনুমানের দেহ রক্তাক্ত হয়। হনুমান তখন এক বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটিত করে জাম্বুমালীকে আক্রমণ করে। জাম্বুমালীর বাণের আঘাতে সেই শালবৃক্ষ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। হনুমান তখন এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড জাম্বুমালীর রথের উপর নিক্ষেপ করে সেই বিশাল পাথরের প্রচণ্ড আঘাতে জাম্বুমালীর ভবলীলা সাঙ্গ হয়। ভগ্নদূত গিয়ে রাবণকে জাম্বুমালীর মৃত্যুসংবাদ প্রদান করলে রাবণ তখন বিড়ালাক্ষ, ধ্রম্রলোচন প্রমুখ সাত বীরকে পাঠাল হনুমানকে জীবন্ত অথবা মৃত ধরে আনতে। সাত মহারথী অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য সামন্ত রথ, অশ্ব, হস্তী নিয়ে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হলো। জাম্বুমালীকে বধ করার পর হনুমান আবার সেই প্রাচীরের উপর বসে। অপেক্ষ এবার কে বা কারা আসে। হনুমান দেখতে পায় দূরে সাত মহারথী সৈন্যসামন্ত-সহ এগিয়ে আসছে। সহসা তাদের দৃষ্টিগোচর না হয়ে হনুমান পুনরায় সেই ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করল। কটক-সহ বিড়ালক্ষ প্রমুখ সেই সাত মহারথী অকুস্থলে এল জাম্বুমালী সহ সব মৃত রাক্ষস সেনাদের দেখে সনাক্ত করল, কিন্তু সেই বানরকে কোথাও দেখা গেল না। তারা নিশ্চিত হলো সেই বানর অনেক সেনা দেখে ভয়ে পালিয়েছে। তথাপি তারা অনেক তল্লাশি করল কিন্তু বানরকে পাওয়া গেল না। বানর ভয়ে পালিয়েছে এই সংবাদ রাবণকে দেবার জন্য তারা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন অন্তরালে থাকা ক্ষুদ্র হনুমান স্বমূর্তি ধারণ করে বিশাল শালবৃক্ষ সব উৎপাটিত করে রাক্ষস কটকের সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করল। বিড়ালাক্ষ, ধূম্রলোচনরা যখন বানর ফিরে এসেছে ভেবে ফিরে দাঁড়াল তখন অবিশ্রান্ত বিশাল বিশাল পাথর বৃষ্টি করে রাক্ষস সেনাদের ধ্বংস করল। এবারও যুদ্ধ জয় করে হনুমান প্রাচীরের উপর বসে অমৃত ফল খেতে লাগল। আবার ভগ্নদূত রাবণের কাছে গিয়ে এই সাত বীরের পরাজয়, মৃত্যুর সংবাদ জানাল।

রাবণ তখন বীরপুত্র অক্ষয় কুমারকে বানর হত্যার ভার দিয়ে সেনাধ্যক্ষ করে পাঠাল। বিশাল সেনাদল নিয়ে অক্ষয় কুমার হনুমানকে মারার জন্য অগ্রসর হলো। হনুমান তখনও সেই প্রাচীরের উপর বসে আছে। অক্ষয় হনুমানকে দেখে চিৎকার করে বলে। —আমি রাবণ আত্মজ, ইন্দ্রজিতের সহোদর অক্ষয় কুমার, আমার হাতে আজ তোর মৃত্যু নিশ্চিত। পারিস তো আত্মরক্ষা কর।

এই বলে অক্ষয় হনুমানকে লক্ষ্য করে এক সঙ্গে সহস্রবাণ নিক্ষেপ করে। হনুমান এক লাফে আকাশে উঠে যায়। বাণগুলি তার পায়ের নীচ দিয়ে চলে যায়। ক্রুদ্ধ অক্ষয় এবার তার মস্তক লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করে। কয়েকটি বাণ হনুমানের অঙ্গে বিদ্ধ হয়। এতে হনুমানের ক্রোধ বেড়ে যায়।

ক্রুদ্ধ হনুমান একলাফে অক্ষয় কুমারের রথের উপর চড়ে

বসে আর মুষ্টাঘাতে রথ চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় রথের অশ্ব ও সারথিকেও পিণ্ডাকৃতি করে। অক্ষয়কুমার অন্তরীক্ষে পলায়ন করে। হনুমান অক্ষয়ের দু'পা ধরে টেনে নামিয়ে ভূমিতে প্রচণ্ডভাবে আছাড় মারে। সেই আঘাতে অক্ষয়ের মস্তক ও হাড় চূর্ণ হয়ে যায়। হনুমান আবার প্রাচীরের উপর বসে অন্যকারও আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে। প্রিয় পুত্র অক্ষয় কুমারের মৃত্যু সংবাদ রাবণের কাছে পৌঁছে যায়।

অক্ষয়ের মৃত্যু সংবাদে চিন্তান্বিত রাবণ এবার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বানর বধে যাওয়ার আদেশ করলেন। পিতার আদেশ শুনে ইন্দ্রজিৎ ভাবছে এই বানরকে চক্ষুর নিমেষে বন্দি করে পিতার কাছে নিয়ে আসব। সুসজ্জিত রথে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার নিয়ে ইন্দ্রজিৎ বানরকে বন্দি করতে চলেছে সঙ্গে অসংখ্য রাক্ষসসেনা। হনুমান মুখোমুখি হলো ইন্দ্রজিতের। বলল—

—নির্লজ্জ রাক্ষস! তোর পিতা দশসহস্র দেবকন্যাকে জোরপূর্বক বিবাহ করেছে তোর মাতা গন্ধর্ব কন্যা মন্দোদরী থাকা সত্ত্বেও আবার বনবাসী রামচন্দ্রের সতীসাধ্বী স্ত্রীকেও হরণ করে এনেছে। তোর পিতার পাপে এই রাক্ষস বংশ ধ্বংস হবে। পিতাকে বুঝিয়ে শ্রীরামের স্ত্রীকে শীঘ্র ফিরিয়ে দিতে বল। তবে হয়তো তোদের বংশ রক্ষা পাবে।

ইন্দ্রজিৎ বলল—

—রে দুষ্ট বানর, তোর কাছ থেকে আমি কোনো নীতিকথা শুনতে চাই না। তুই লঙ্কার অনেক ক্ষতি করেছিস, আমার ভাই অক্ষয় কুমারকে মেরেছিস। এবার তোর শেষ পরিণতি দেখ।

এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ হনুমানের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকে। হনুমান সব অস্ত্র অবলীলায় লুফে নিচ্ছে। সামনে বড়ো বড়ো গাছ, বিশাল আকৃতির পাথর কিছুই ব্যবহার করছে না। হনুমান শুধু আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে। ইন্দ্রজিৎ এবার পাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করে হনুমানকে বন্দি করে ফেলে। হনুমান ভূতলে পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসসেনারা এসে হনুমানকে ঘিরে ধরে আরও রজ্জু শিকলের দ্বারা বাঁধতে থাকে। হনুমান চাইলে মুহূর্তে এই পাশ ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু তাহলে রাবণের কাছে যাওয়া সহজ হবে না। বন্দি অবস্থায় ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই হনুমানকে রাবণের কাছে নিয়ে যাবে। এবার সত্যিই ইন্দ্রজিৎ সেনাদের আদেশ দিল এই বন্দি বানরকে পিতার সকাশে নিয়ে যেতে। ইন্দ্রজিৎ প্রাসাদের পথ ধরল। হনুমানও নিজের দেহকে সত্তর যোজন করে পথের উপর বসে রইল। রাক্ষসেরা আর তাকে নাড়াতে পারে না। হনুমান বলল রাজ সম্ভাষণে যাব আমাকে কাঁধে করে নিয়ে চল। রাক্ষসেরা হনুমানকে কাঁধে নিয়ে বাদ্য সহকারে রাবণের প্রাসাদে নিয়ে চলল। হনুমানের তখন জোর প্রস্রাব পেয়েছে সে রাক্ষসদের কাঁধের উপর প্রস্রাব করে দিল। রাক্ষসরা বলল—

—একি অকালে বিনা মেঘে বর্ষণ।

এক বুদ্ধিমান রাক্ষস বলল—বর্ষণ কোথায় এই বানর বেটা প্রস্রাব করে দিয়েছে।

রাক্ষসেরা হনুমানকে সেখানে ফেলে দেয়। হনুমান বলে—

—এখানে ফেললে কেন, আমাকে তোমাদের রাজা রাবণের কাছে নিয়ে চল। তোমাদের সেনাপতির তাই আদেশ।

তখন রাক্ষসেরা হনুমানকে টেনে নিয়ে প্রাসাদের সামনে হাজির করে। হনুমান তখন দেহকে এত বিস্তৃত করল যে প্রাসাদ দ্বারে দেহ আটকে গেল। অনুচরেরা গিয়ে রাবণকে বার্তা দিল। অনেক কষ্টে সেই দুষ্ট বানরকে বন্দি করে আনা হয়েছে কিন্তু তার দেহ প্রাসাদ দ্বারে আটকে যাচ্ছে।

রাবণ বলল—প্রাসাদ দ্বার ভেঙে তাকে নিয়ে এসো।

আদেশ পেয়ে রক্ষীরা প্রাসাদদ্বার ভেঙে হনুমানকে রাবণের সামনে উপস্থিত করলো। হনুমান রাবণের দিকে পেছন ফেরে বসল। প্রহস্ত তাকে রাবণের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—

—মুর্খ বানর, দেখ আমাদের রাজা দশানকে।

হনুমান রাবণের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল—

—ও তুই সেই রাবণ রাজা, সেই কোন্ কালে দেখেছি। যবে আমার রাজা বালি তোকে লেজ দিয়ে জড়িয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে ছিল আর তুই তখন কাতর স্বরে প্রাণভিক্ষা করেছিলি।

প্রহস্ত বলল—

—ওইসব প্রলাপ এখন বন্ধ কর। বল্ তুই কার চর হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেছিস?

হনুমান বলল কেন বলব?

এবার বজ্রগম্ভীর স্বরে রাবণ বলল।

—কার কথায় তুই এই রাক্ষসের দেশে এসেছিস বল্। দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, কারা তোকে পাঠিয়েছে? সত্য কথা বললে তোকে মুক্তি দেব, অন্যথায় তোর মৃত্যুদণ্ড।

হনুমান বলল—

—আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত। যার ধর্মপত্নী জনক নন্দিনী সীতাকে তুই হরণ করেছিস। যে বালীর কাছে তুমি পরাজিত হয়েছ সেই বালীকে শ্রীরাম বধ করেছেন। বর্তমানে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব। আমি তারই প্রতিনিধি হয়ে সীতামায়ের সন্ধানে এসেছি। তার সন্ধানও পেয়েছি। তাঁকে আমি একাই উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতে প্রভু শ্রীরামের বদনাম হবে। তিনি বানর সেনা নিয়ে আসবেন। তোকে এবং সব দুরাচার রাক্ষসদের বধ করবেন। তোকে আমি এই মুহূর্তে বধ করতে পারতাম। কিন্তু তুই শ্রীরামের বধ্য তাই ছেড়ে দিলাম।

হনুমানের এহেন দুর্বিনীত বাক্যে দশানন রাবণ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তার শিরশ্ছেদের আদেশ দিল। রক্ষীরা যখন রাবণের আদেশ কার্যকর করতে তৎপর হলো তখন রাজভ্রাতা বিভীষণ করজোড়ে অগ্রজের প্রতি বলল—

—হে রাজন, দূত অবধ্য। এই বানর দূতের প্রাণ সংহার

করলে ত্রিভুবনে আপনার অকীর্তি থেকে যাবে। এই দুর্বল, মন্দবুদ্ধি বানরকে অন্য শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিন।

কথাটি রাবণের মনপুত হলো। রাবণ তখন আদেশ দিল—

—এই বানরকে মাথা মুড়িয়ে ছেড়ে দাও।

প্রহস্ত বলল—

—মহারাজ বানরের সর্বাঙ্গে লোম। তার মাথায় তো চুল নেই।

রাবণ বলল—

তবে ওর লেজে আগুন লাগিয়ে দাও।

রাজাদেশ পেয়ে সেবক রাক্ষসেরা রাশি রাশি বস্ত্র আর কলসী কলসী তেল ঘৃত নিয়ে এল। হনুমান নিজের লেজ আরও প্রসারিত করল। সেবকরা মহাসুখে হনুমানের লেজে কাপড় জড়িয়ে ঘি তেল দিয়ে ভিজিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। ইন্ধন পেয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে লেলিহান রূপ ধারণ করল। কিন্তু জানকীর বরে এই অগ্নির তাপ হনুমানের দেহে লাগল না। সর্বাঙ্গ পাশবদ্ধ, হস্তপদ শৃঙ্খলিত হনুমানের কী হয়, কী করে হনুমান তার জন্য সমগ্র লঙ্কাবাসী উদগ্রীব। কয়েক জন চেরী গিয়ে সীতার কাছে সংবাদ দিল যে বানর তার কাছে এসেছিল তাকে কুমার ইন্দ্রজিৎ নাগপাশে বদ্ধ করেছে। রাজার আদেশে তার লেজে আগুন লাগান হয়েছে। সব শুনে সীতা অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন। তার বরে, অগ্নিদেবের কৃপায় হনুমানের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

এদিকে হনুমানের লেজ জ্বলছে দাউ দাউ করে। দেহে নাগপাশ, কোমড়ে রজ্জু, হস্তপদ শৃঙ্খলিত। হনুমান বন্ধনমুক্ত হবার কোনো চেষ্টা করল না। শুধু বিশাল দেহটাকে সঙ্কুচিত করে নেউল প্রমাণ করল। খসে গেল সব বন্ধন, এবার হনুমান পূর্বরূপ ধারণ করে সামনে যা কিছু পাচ্ছে তা দিয়ে রাক্ষসদের আঘাত করছে। হনুমানের এই কাণ্ড দেখে রাক্ষসরা সব পালিয়ে গেল। এবার হনুমান এক প্রাসাদের উপর উঠে লেজ দিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। জ্বলে উঠল সেই প্রাসাদ, ক্রমে একের পর এক গৃহে অগ্নি সংযোগ করতে লাগল, জ্বলছে লঙ্কাপুরী, চারদিকে রাক্ষসদের হাহাকার। হঠাৎ এক প্রাসাদে উঠে থমকে দাঁড়াল হনুমান। প্রাসাদ অভ্যন্তর থেকে শোনা যাচ্ছে 'জয় রাম', 'জয় রাম' ধ্বনি। এই প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করতে পারল না হনুমান। আসলে এই প্রাসাদটি ছিল বিভীষণের এবং রামনাম জপ করছিল বিভীষণের পুত্র তরণী সেন।

এই প্রাসাদ ছেড়ে হনুমান অন্যান্য গৃহে অগ্নি সংযোগ করতে লাগল। পুত্রের সাহায্যের জন্য এসে যোগ দিল পিতা পবন দেব। প্রবল বায়ুপ্রবাহে অগ্নি দ্রুত ছড়াতে থাকে প্রাসাদ, অস্ত্রাগার, শস্যাগার কিছুই বাদ গেল না। ঘরে ঘরে পুড়ে মরলো অসংখ্য রাক্ষস রাক্ষসী। লঙ্কাপুরীতে শুধু রক্ষা পেল দুটি গৃহ— একটি ধর্মাত্মা বিভীষণের, অন্যটি ব্রহ্মার বরে বলীয়ান কুম্ভকর্ণের। গৃহমধ্যে ছমাসের নিদ্রায় নিদ্রিত রাক্ষস যুদ্ধে মৃত্যু তার ভবিতব্য, তাই সেই গৃহে আগুন লাগল না। লঙ্কাদহন যখন শেষপর্যায়ে তখন হনুমানের স্মরণ হলো এই দহনে মাতাসীতার কোনো ক্ষতি হয়েনি তো? যার জন্য এত কাণ্ড তিনি যদি না থাকেন..... হঠাৎ দৈববাণী হলো।

—হে পবননন্দন, সীতাদেবীর কোনো ক্ষতি হবে না তুমি নিশ্চিন্তে লঙ্কা দগ্ধ কর। দেবতার আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে আছে।

হনুমান হৃষ্টমনে লঙ্কা দহনকার্য সম্পন্ন করে সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াল। পিতা পবনের স্পর্শে তার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। হনুমান দেখল কোমরবন্ধে মা সীতার দেওয়া সেই অভিজ্ঞানমণি আর পাঁচটি ফল আছে কিনা? সব ঠিকই আছে। কিন্তু তার লেজের আগুন তখনো নেভেনি। আগুন নেভানোর অনেক চেষ্টা করেও হনুমান ব্যর্থ হয়েছে। এবার সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, তার আগে একবার সীতামাতার সঙ্গে দেখা করে যাবে। সেই জ্বলন্ত পুচ্ছ নিয়ে হনুমান চলল অশোক কাননের দিকে। হনুমানকে ফিরে আসতে দেখে রাক্ষসরা আবার বিপদের আশঙ্কায় দিগ্‌বিদিগ্‌ ছুটতে শুরু করল। ততক্ষণে সরমা এসে সীতার কাছে সমস্ত ঘটে যাওয়া ঘটনা বলেছে। হনুমান যে কুশলে আছে তাও জানিয়েছে। এই সময়ে স্বয়ং হনুমান এসে উপস্থিত। সীতা সরমা দুজনকে প্রণাম করে হনুমান। বলে—

—মা, আমার এখানকার কাজ শেষ, এবার ওপারে বানর শিবিরে প্রভুর কাছে যেতে হবে। কিন্তু আমার লেজের আগুন কিছুতেই নিভছে না তুমি কি এর বৃত্তান্ত জান?

সীতা বললেন—

—তুমি মুখামৃত দাও তাতে অগ্নি নির্বাপিত হবে।

হনুমান তখন জ্বলন্ত লাঙ্গুল মুখে পুড়ে দিল। তাতে আগুন নিভল বটে কিন্তু হনুমানের মুখ পুড়ে গেল।

অশোক কাননে রাখা এক জলভর্তি হাঁড়িতে পোড়া মুখ দেখে হনুমান বলল—

—মাগো, তোমার কাজে এসে আমার মুখ পুড়ে গেল। আমাকে দেখে এখন জ্ঞাতিবর্গ হাসবে, বিদ্রূপ করবে।

সীতা হেসে বললেন—

—আক্ষেপ করো না পুত্র, তোমার জ্ঞাতিবর্গরাও আমার বাক্যে মুখ পোড়া হবে। তোমাকে আর কেউ বিদ্রূপ করতে পারবে না।

হনুমান বলল—

—মা, আমাকে এবার অনুমতি দাও আমি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে প্রভুর কাছে সব নিবেদন করি।

সীতা বললেন—

—আমার কথা শোন। ইনি আমার সখী সরমা, এঁর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এখন তুমি ক্লান্ত, তাছাড়া অগ্নিতে তোমার দেহ কাতর। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন তুমি এই

অশোক কাননে আমার দৃষ্টির সামনে কদিন আত্মগোপন করে থাক।

হনুমান বলল—

—মা! তা সম্ভব নয় কারণ আমি ফিরে গেলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বানরসেনা নিয়ে লঙ্কায় আসবেন। আমি যত তাড়াতাড়ি ফিরব তোমার উদ্ধারও তত তরান্বিত হবে। এখন আমায় বিদায় দাও মা। মাতা সরমা, আপনি মহিয়সী নারী। আপনি আমার মাকে দেখবেন। আপনি আছেন বলে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারছি। আপনারা দু'জনে সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। বিদায় মায়েরা। মায়েদের চোখ অশ্রুসিক্ত।



হনুমান সীতা ও সরমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার সমুদ্র তীরে গিয়ে দাঁড়াল। সমুদ্রের দিকে একবার তাকিয়ে উঠল এক উঁচু পাহাড় চূড়ায়। সেখান থেকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে এক লাফে উঠল আকাশমার্গে। হনুমানের ঘন ঘন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি পৌঁছে গেল উত্তর কূলে। জাম্ববান সেই ধ্বনি শুনতে পেয়ে সবাইকে ডেকে বলল।

—আমাদের হনুমান নিশ্চয় সব কাজ সমাধা করে ফিরে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হনুমান এক পর্বতশৃঙ্গে এসে নামল। হনুমানকে দেখতে পেয়ে সব বানরেরা ছুটে গেল তার কাছে। প্রথমে অঙ্গদ তাকে প্রণাম করল। জাম্ববান এবং অন্যান্য প্রবীণ বানরেরা হনুমানের সঙ্গে কোলাকুলি করে কুশল জিজ্ঞাসা করল। হনুমান বলল—

—সব শুভ, সব কথা বলছি। আগে চল যেখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব আছেন তাঁদের কাছে।

মনের আনন্দে সব বানরেরা মধুবনে ঢুকে প্রাণভরে মধুপান করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের কাছে উপস্থিত হলো। রামচন্দ্রকে প্রণাম করে সীতার দেওয়া অভিজ্ঞান মণিটি শ্রীরামচন্দ্রকে দিল। সেই পাঁচটি আম সীতার নির্দেশ মতো বণ্টন করা হলো।

—সেই মণিটি হাতে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের দুচোখে অশ্রুধারা বইতে শুরু করল।

লক্ষ্মণ বলল—

—হে পবনপুত্র, সীতাদেবী কেমন আছেন, কেমন দেখলে তাকে?

হনুমান বলল

—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণ স্মরণ করে মা কোনোরকমে বেঁচে আছেন। অনাহারী, মলিন বসনা, মুক্তকেশী সীতামাতার উপর চেড়ীরা প্রচণ্ড অত্যাচার করছে। রাবণ এক বছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এক বছর পরে রাবণের কথায় রাজি না হলে সেই রাক্ষস সীতামাতাকে হত্যা করবে। সীতামাতাকে লঙ্কার অশোক কাননে রাখা হয়েছে রাক্ষসী চেড়ীদের প্রহরায়। সেখানে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের স্ত্রী সরমা ও কন্যা সানন্দা একমাত্র সীতামাতার সহায়। রাবণের দেওয়া এক বৎসরের মধ্যে দশমাস অতিক্রান্ত আর দু'মাসের মধ্যেই মাতাকে উদ্ধার করতে হবে। এই কথাটি মাতা সীতা আমাকে বারবার স্মরণ করিয়েছেন।

জাম্ববান হনুমানের দিকে তাকিয়ে বলল।

—হনুমান তোমার মুখে কী হয়েছে? মুখটা কালো হয়ে গেছে কেন? এখানেও দেখছি তোমার প্রজাতির যারা ছিল সবার মুখ কাল হয়ে গেছে। এর কারণ কি তোমার জানা আছে?

হনুমান বলল—

—আমি সীতামাতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাবণের কাছে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় রাক্ষসদের হাতে ধরা দিই। ইতিমধ্যে অনেক রাক্ষসকে মেরেছি বলে রাবণ আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। বিভীষণের অনুরোধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করলে আমার লেজে অগ্নিসংযোগের শাস্তি প্রদান করে। প্রচুর বস্ত্র ও ঘি তেল দিয়ে আমার লেজে অগ্নি সংযোগ করা হয়। সেই জ্বলন্ত লেজ দিয়ে আমি পিতা পবনদেবের সহায়তায় মাত্র দুটি গৃহ ছাড়া সমস্ত লঙ্কাপুরী দহন করি। দহনের পরও আমার লেজের আগুন নিভছে না দেখে আমি সীতামাতার কাছে এই অগ্নি নির্বাপণের উপায় জিজ্ঞাসা করি। তিনি এই অগ্নিতে মুখামৃত প্রদানের পরামর্শ দেন আমি বুঝতে না পেরে পুরো লেজটাই মুখের মধ্যে পুরে দিই। তাতে আগুন নিভল কিন্তু আমার মুখ পুড়ে গেল। এনিয়ে আমার স্বজাতির কাছে মুখপোড়া রূপে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ শুনতে হবে বলাতে মা বললেন তোমার স্বজাতির সবারই মুখ পোড়া হবে।

শ্রীরাম হনুমানকে বললেন।

—তুমি ধন্য হনুমান, ত্রিভুবনে তোমার তুল্য বীর আর নেই। আজ অমি তোমাকে কী দেব আমার তো কিছুই নেই। আমি নিজেকেই তোমার কাছে সমর্পণ করলাম।

এই কথা বলে শ্রীরাম হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন। হনুমান শ্রীরামের পদযুগল জড়িয়ে ধরে বলল—

—দুর্বল হনুমানের তুমি একমাত্র বল। তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই আমার সব কিছু। আমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে চরণে আশ্রয় দিয়েছ। আমার মনের বড়ো সাধ রামসীতা দুজনে মিলে আমার হৃদয়াসনে বসবে।

এইবার যাত্রা শুরু, শুভক্ষণ দেখে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান বানর সেনা নিয়ে যাত্রা শুরু করল। অসংখ্য বানর সেনা উৎসাহভরে কলরব করতে করতে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছাল। সেখানেই তারা লতাপাতা দিয়ে ছাউনি তৈরি করল। চরমুখে রাবণ এই সংবাদ পেয়ে গেল।



সীতা হরণ, রাবণের অনাচার, হনুমানের লঙ্কায় আগমন, লঙ্কাদহন প্রভৃতি ঘটনায় বিচলিত হয়ে রাবণের মাতা বৃদ্ধা নিকষা চিন্তান্বিতা এবং রাবণের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণের প্রাসাদ ত্যাগ করে বিভীষণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। বিভীষণও সীতা হরণ ও সীতার অপমান মেনে নিতে পারেনি। সমুদ্রের ওপারে শ্রীরামের শিবির স্থাপন এবং লঙ্কা আক্রমণের প্রস্তুতির সংবাদে বিচলিত বিভীষণ রাবণের রাজসভায় গেল। রাবণ তখন প্রহস্ত, ত্রিশিরা, অকম্পন, কুম্ভ, নিকুম্ভ প্রমুখ সেনানায়কদের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। সেনাপতিদের এক-এক জন রাম-সহ বানর সেনাদের ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার মতো আস্ফালন করছে। বিভীষণ যথারীতি অগ্রজকে প্রণাম করে বলল—

—আমার একটি নিবেদন আছে অনুমতি করেন তো বলি।

বিভীষণ বিনয়ের সঙ্গে বলল—

—হে রাজন! আমি আপনার এবং লঙ্কার রাক্ষসকুলের হিতার্থে বলছি। এই সর্বনাশা যুদ্ধের পরিকল্পনা আপনি ত্যাগ করুন। জানকীকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে তার সঙ্গে মিত্রতা করুন। অন্যথায় স্বর্ণলঙ্কা এবং রাক্ষসকূল ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিভীষণের হিতকারী বাক্য শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে যথেচ্ছ তিরস্কার করল এবং বক্ষদেশে পদাঘাত করে তাকে লঙ্কা ত্যাগের আদেশ করল। ক্ষুব্ধ ব্যথিত বিভীষণ পরিজনদের কাছে বিদায় নিয়ে গেলেন কৈলাসে। সেখানে দেবাদিদেব শঙ্কর এবং ভ্রাতা কুবেরের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। তখন শঙ্করের আদেশে এবং ভ্রাতা কুবেরের পরামর্শে বিভীষণ চলে এলেন সমুদ্র তীরে শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরে।

অন্তরীক্ষ পথে বিভীষণ আসছে। শ্রীরামের শিবিরের কাছাকাছি আসতে বানরসেনাদের নজরে আসে বিভীষণ। অন্তরীক্ষে এই মহাবল-পরাক্রমশালী বীরপুরুষকে দেখে রাবণ ভ্রমে বানরসেনা বড়ো বড়ো পাথর আর বৃক্ষ নিয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। সবাই চীৎকার করছে—

—রাবণ এসেছে, মার মার।

অন্তরীক্ষ থেকে বিভীষণ বলছে আমি রাবণ নই। রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ। শ্রীরামের চরণে শরণ নেওয়ার জন্য এসেছি।

মুখ্য বানরেরা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বিভীষণের আগমন সংবাদ দিলে শ্রীরাম সুগ্রীব, জাম্বুবান, অঙ্গদ প্রমুখদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন। সুগ্রীব বলল, রাক্ষসজাতিকে বিশ্বাস নেই। ছল করে আমাদের সঙ্গে মিশে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

প্রবীণ, জ্ঞানী জাম্ববান বলল।

—যুদ্ধের সময় শত্রুকে কাছে রাখা বিপদকে ডেকে আনা।

এই সময়ে বীর হনুমান এসে বলল—এই বিভীষণ আমার প্রাণদান করেছে। এঁর স্ত্রী, কন্যা অশোকবনে মাতা সীতার সহায়। এঁর পুত্র তরণী সেন সর্বদা রামনাম জপ করে। লঙ্কা দহনের সময় এর গৃহ থেকে আমি সেই ধ্বনি শুনেছি। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যদি বিভীষণের মিত্রতা হয় তবে বিভীষণের সাহায্যেই রাবণ বধ সম্ভব হবে।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হনুমানের কথায় আমি বিভীষণকে আশ্রয় দেব। হনুমান যা প্রত্যক্ষ করেছে তার উপর ভিত্তি করে বিভীষণকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। আর শাস্ত্রে আছে শরণাগতকে আশ্রয় না দিলে পরলোক নষ্ট হয়। তোমরা বিভীষণকে এখানে নিয়ে এস।

জোড় হাতে বিভীষণ এলে শ্রীরাম তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। বিভীষণ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীরামের কাছে ব্যক্ত করে। শ্রীরাম সেনাদের সমুদ্র থেকে জল নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলেন। সমুদ্রের জলে সেই মুহূর্তে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। আর অগ্নি সাক্ষী করে বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হলেন।



হনুমানের দৌত্যে মিত্র বিভীষণ এখন শ্রীরামের অন্যতম পরামর্শদাতা। এখন সমুদ্র লঙ্ঘন করে যেতে হবে লঙ্কায়। হনুমান এক লাফে সাগর পেড়িয়ে লঙ্কায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিশাল বানরসেনা সমুদ্র পেরুবে কী করে? বিভীষণের পরামর্শে সগরবংশীয় শ্রীরাম সাগরকে আহ্বান করলে সাগর এসে একটি সহজ উপায় বলে দেয়। বানরকটকে বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামে এক বানর আছে। জহ্নুমুনির বরে তার হাতের স্পর্শ লাগলে সে পদার্থ জলে ভাসে। তাকে সেতুবন্ধনের দায়িত্ব দাও

তার স্পর্শে পাষাণ আবার জলে ভাসবে।

নলকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সমুদ্র বন্ধনের। সব বানর পাথর জোগাচ্ছে, হনুমানও এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড নিয়ে এল, নল বাঁহাতে সেই প্রস্তরখণ্ড ধরে নিল। নলের এই ব্যবহারে হনুমান কুপিত হয়ে এক বিশাল পাহাড় তুলে নিয়ে এল। নল সেই বিশাল পাহাড় দেখে ভয় পেয়ে গেল, বাঁ হাত দূরে থাক দু'হাত এমন কী মস্তকেও সেই পাথর ধারণ অসম্ভব। সেই পাহাড় ধরতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। ক্রুদ্ধ হনুমানের অভিপ্রায় বুঝে নল ছুটে গিয়ে শ্রীরামের কাছে আশ্রয় নিল। শ্রীরাম হনুমানকে বুঝিয়ে শান্ত করে নলকে বাঁচালো। সেতু বন্ধনের কাজ সমাপ্ত হলো কিন্তু পাথরের ফাঁকগুলো থেকে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো দলে দলে কাঠবিড়ালী। তারা ধুলোবালিতে গড়াগড়ি দিয়ে সেতুর উপর গা ঝাড়তে লাগল তাতে তাদের গা থেকে ধুলোবালি পড়ে পাথরের ফাঁকগুলি বুজে গেল। সেতু বন্ধনে কাঠবিড়ালিরও অবদান থাকল।

ভারতবর্ষ থেকে লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত এক প্রশস্ত সেতু নির্মাণ হলো। নল পরীক্ষা করে দেখেছিল তার স্পর্শ ছাড়াও 'রাম' নাম লেখা শিলাখণ্ড জলে ভাসছে। নল নির্দেশ দিয়েছিল প্রত্যেক বানরকে শিলাখণ্ড জলে ফেলার আগে তাতে রামনাম লিখতে হবে। সেইমত সব শিলাখণ্ডে রামনাম লেখা ছিল। জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু করল। ছোটো বড়ো অসংখ্য বানর সবার মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। চরমুখে সংবাদ পেয়ে রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকাল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। রাবণ লঙ্কা থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এক বিশাল প্রস্তর নির্মিত সেতু দেখল। অসংখ্য বানর এগিয়ে আসছে লঙ্কার দিকে। দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছে যাবে লঙ্কায়। রাবণ তখন বিশ্বস্ত শুক ও সারণকে পাঠাল রামের বানর সেনাদের অবস্থান, গতিবিধি ও শক্তি জানার জন্য। বানরসেনারা ততক্ষণে লঙ্কাপুরী অবরোধ করে ফেলেছে। শুক সারণ তখন বানরের রূপ ধারণ করে বানরসেনাদের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু সতর্ক বিভীষণের হাতে ধরা পড়ে গেল তারা। বিভীষণ এবং অন্যান্য বানর সেনাপতিরা তাদের মৃত্যু দণ্ড দিতে চাইলেও শ্রীরামের কৃপায় তারা মুক্তি পেয়ে লঙ্কায় রাবণের কাছে ফিরে গেল। রাবণ এবার পাঠাল আর এক চর শার্দূলকে। শার্দূলও বিভীষণের হাতে ধরা পড়ে, শ্রীরামের কাছে নিয়ে গেলে শ্রীরাম তাকেও মুক্তি দেন। এবার রাবণ মায়াবী রাক্ষস বিদ্যুৎজ্জিহ্বকে দিয়ে অবিকল শ্রীরামের মায়া মুণ্ড নির্মাণ করিয়ে সীতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। সীতা জানেন শ্রীরামচন্দ্র অবধ্য তাই তিনি ভয় পেলেন না।

বানর কর্তৃক লঙ্কা অবরোধের পাঁচ দিন হয়ে গেল কিন্তু রাবণ নিরুত্তাপ। এর কারণ জানার জন্য এবং সীতাকে ফিরিয়ে শ্রীরামের কাছে আত্মসমর্পণের বার্তা নিয়ে দূত রূপে অঙ্গদ রাবণের কাছে যায়। অঙ্গদকে অপমানিত করার চেষ্টা করলে অঙ্গদও রাবণকে ব্যতিব্যস্ত করে রাবণের মস্তকের মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে বানর শিবিরে ফিরে আসে। এবার রাবণ রাক্ষস বীরদের আদেশ দেন রামচন্দ্রকে আক্রমণ করার জন্য। প্রথমে রণক্ষেত্রে আসে রাবণের বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ। রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করে। শ্রীরামচন্দ্র গরুড় পক্ষীকে স্মরণ করলে গরুড় এসে তাঁদের নাগপাশমুক্ত করে। তারপর শুরু হয় প্রচণ্ড সংগ্রাম। এরপর একে একে রাক্ষস সেনাপতি ধূম্রলোচণ, অকম্পন, বজ্রদংস্ট্র, প্রভৃতির বানর সেনাদের হাতে পরাজয় ও পতন ঘটে। এবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসে স্বয়ং রাবণ। প্রথমে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো সুগ্রীব। কিন্তু রাবণের বাণে কাতর হয়ে সুগ্রীবকে রণে ভঙ্গ দিতে হলো। এবার এগিয়ে এল পবননন্দন হনুমান। এক লাফে রথে উঠে রাবণের বুকে এক বজ্রসম মুষ্টাঘাত করে। সেই আঘাতে মুর্ছিত হয়ে পড়ে রাবণ। মুর্চ্ছা ভঙ্গ হলে রাবণ হনুমানকে ডেকে বলে—

—তুই বীর বটে, তোর আঘাতে আমার শরীর কেঁপে উঠেছে। এবার তুই আমার আঘাত সামলা।

এই কথা বলে রাবণ হনুমানকে এক প্রচণ্ড চাপড় মারে, আর সেই আঘাতে হনুমান মূর্ছিত হয়ে পড়ে। এইবার রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে বানরবীর নীল। বিশালদেহী নীল দেহের রূপান্তর ঘটিয়ে রাবণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। রাবণ সুযোগ বুঝে বাণের আঘাতে নীলকে আহত করে। এবার এগিয়ে আসে লক্ষ্মণ। উভয়ের বাণ বর্ষণে সূর্যদেব আচ্ছাদিত হন। রাবণ পরিশেষে এক মন্ত্রপুত বাণের দ্বারা লক্ষ্মণকে আহত করে। তীব্র আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। মুর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে রাবণ রথে তুলে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ্মণ এত ভারী হয়ে যায় যে রাবণ কুড়ি হাত দিয়েও লক্ষ্মণকে নাড়াতে পারে না। যে রাবণ বাঁ-হাত দিয়ে কৈলাস পর্বত অনায়াসে তুলেছে সে রাবণ এক তপস্বীর শরীর নাড়াতে পারল না। দূর থেকে হনুমান এই দৃশ্য দেখছিল। এবার কাছে এসে এক প্রচণ্ড চড় মারল রাবণের গালে। সেই এক চড়ে রাবণ ঘুরতে ঘুরতে রথের উপর গিয়ে পড়ল। চোখ মেলে হনুমানকে দেখে রাবণ রথ নিয়ে পালিয়ে গেল। এবার মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে হনুমান অনায়াসে কোলে তুলে শ্রীরামের কাছে নিয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র ধ্যানস্ত হয়ে স্পর্শ দ্বারা লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করেন।

পরের দিনের যুদ্ধে রাবণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আর শ্রীরাম পদব্রজে চলেছেন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। হনুমান এসে করজোড়ে বলল—প্রভু, রাবণ রথে বসে যুদ্ধ করবে। আর তুমি ভূমি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে লড়বে কী করে? তুমি আমার পিঠে আরোহণ করে রাবণকে বধ কর। হনুমানের পৃষ্ঠে শ্রীরাম যেন ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্র। রাবণের সামনে গিয়ে শ্রীরাম বলতে

লাগলেন—

—রে পাপিষ্ঠ, দশমুখ নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেছ। এই দশ মুণ্ড কেটে আজ তোকে বধ করব।

রাবণ কিন্তু শ্রীরামের কোনো কথা শুনছে না। তার দৃষ্টি হনুমানের দিকে। এই সেই বানর সে অক্ষয় কুমারকে মেরেছে, অমৃত বন তছনচ করেছে, স্বর্ণলঙ্কা ভস্মীভূত করেছে। আজ সুযোগ পাওয়া গেছে। পিঠে শ্রীরাম বানর নড়তে পারবে না, এইবেলা প্রতিশোধ। রাবণ বেছে বেছে চোখা চোখা বাণে হনুমানের শরীর জর্জরিত করে ফেলছে। পৃষ্ঠদেশে শ্রীরামচন্দ্র থাকায় হনুমান নড়তে পারছে না। তখন হনুমান তার দেহ বিস্তৃত করতে লাগল। দৈর্ঘে প্রস্থে তার দেহ হলো ত্রিশ যোজন। লেজ করল দীর্ঘ পঞ্চাশ যোজন, সেই লেজ আকাশে গিয়ে ঠেকছে। হনুমানের লেজ দেখে রাবণ ভয় পেল, যদি বালীর মতো আবার লেজ দিয়ে বেঁধে নেয়। শ্রীরামচন্দ্র যত বাণ ছুঁড়ছে রাবণ সব কেটে নিচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্র এবার ঐষিক বাণ সন্ধান করে রাবণের বুকে বিঁধলেন। সেই শরাঘাতে রাবণ অচৈতন্য হয়ে গেল। ক্ষণিক পরে চৈতন্য লাভ করলে শ্রীরাম বললেন—

আজ তোকে বধ করব না। আগে তোকে নির্বংশ করব



তারপর তোর মৃত্যু। তোকে মেরে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাব। শ্রীরামচন্দ্র এক তীক্ষ্ণ বাণে রাবণের দশমাথার মুকুট কেটে নিলেন। ভীত রাবণ কোনো রকমে রথে উঠে সারথিকে লঙ্কার দিকে রথ চালাতে নির্দেশ দিল।

পরের দিন বানরসেনারা আরও আগ্রসী হয়ে উঠল। প্রচণ্ড যুদ্ধে ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহাপাশ ও সহোদর যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করল। এবার এল অতিকায়, রাবণের এই পুত্র অপরাজেয় লক্ষ্মণের বাণে সেও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলো। ভগ্নদূতের মুখে পুত্রের নিধন সংবাদ শুনে হতাশ রাবণ বিলাপ করতে লাগলেন। পিতার বিলাপ শুনে এগিয়ে এল বীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজে আবার যুদ্ধে যাবার অভিপ্রায় জানাল। আশ্বাস দিল এবার নির্ঘাত বানরসেনা ধ্বংস করে রাম-লক্ষ্মণকে রাবণের সামনে এনে উপস্থিত করবে। রাক্ষস বাহিনী সুসজ্জিত হলো। যজ্ঞাগারে গিয়ে ইষ্টদেবতাকে তুষ্ট করে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করল ইন্দ্রজিৎ। দৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে একে একে সমস্ত বানরবীর-সহ রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও আহত করে দিবাবসানে ইন্দ্রজিৎ কটক-সহ লঙ্কায় ফিরল। দূত মুখে ইন্দ্রজিতের বিজয় সংবাদ শুনে রাবণ আশ্বস্ত হলো, পুত্রকে আশীর্বাদ করল।

বানর শিবিরে তখন শোকের ছায়া। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সহ সমস্ত বানর বীর ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে আহত মূর্চ্ছিত। বিভীষণও হতাশ, এই সময় প্রাজ্ঞ জাম্ববান হনুমানকে বলল হিমালয় থেকে সুবর্ণকরণী, অস্থিসঞ্চারিণী, মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি ঔষধি নিয়ে আসার জন্য। হনুমান এক লাফে আকাশমার্গে উঠে হিমালয়ে পৌঁছে গেল। কিন্তু হনুমান এই ঔষধি চেনে না। রাগে ক্ষোভে হনুমান বনের বৃক্ষলতাদি উপড়ে ফেলে দিচ্ছে। তখন পর্বতরাজ এক ঋষির রূপ ধরে হনুমানের সামনে এসে তার আগমন ও ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হনুমান ঋষির কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে, রাম লক্ষ্মণ সহ বানর বীরদের আহত ও মূর্চ্ছিত হওয়ার কথা জানাল। ঋষি নিজে তখন পর্বতের এক স্থানে সেই ঔষধি গুল্মগুলি চিনিয়ে দিলেন। হনুমান সেই গুল্মগুলি উৎপাটিত করে ঋষিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লঙ্কার উদ্দেশে যাত্রা করল। পবন বেগে হনুমান বানর শিবিরে উপস্থিত হলো। জাম্বমান তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রয়োগ করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহ বানর সেনাদের সুস্থ করে তুলল। সুস্থ হয়ে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন—তুমি ভক্ত, বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার আমার অভিন্ন শরীর।

রজনীর তৃতীয় প্রহরে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে সমুদ্র তীর মুখরিত হলো। বিনিদ্র রাবণের কর্ণে পৌঁছাল সেই ধ্বনি।

পরদিন প্রাতে শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রণাসভা ডাকলেন। প্রাজ্ঞ জাম্ববান বানরসেনাদের আবার লঙ্কা দহন করার প্রস্তাব দিলে সবাই উৎফুল্ল হয়ে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে। শুরু হয় দ্বিতীয়বার লঙ্কা দহন। চারদিকে শুধু আগুন আর আগুন রাক্ষসদের মধ্যে হাহাকার পরে যায়। এইবার রাবণ আবার বানরসেনাদের আক্রমণ এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের পুত্র বীর কুম্ভ ও নিকুম্ভ যুদ্ধে অগ্রসর হয়। কিন্তু যুদ্ধে অচিরেই তারা বীরগতি প্রাপ্ত হয়। এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো বীর মকরাক্ষ, তারও একই গতি হলো। এবার যুদ্ধে এল বিভীষণের পুত্র বিষ্ণুভক্ত তরণী সেন। শ্রীরামের হাতে মৃত্যু হলে মুক্ত হয়ে গোলকে বসতি হবে এই প্রত্যয়ে তরণী সেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। অশ্রু সম্বরণ করে বিভীষণ শ্রীরামের কাছে পুত্র পরিচয় দিল না। যুদ্ধে শ্রীরামের বাণে বীর তরণীর বীরগতি প্রাপ্ত হলো। এইবার যুদ্ধে এল রাবণ চিত্রাঙ্গদার পুত্র বিষ্ণুভক্ত বীরবাহু। প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও শ্রীরামের বাণে নিহত হয়ে বিষ্ণুপদে লীন হয়ে গেল। এইবার মহাবীর ভস্মলোচনও যুদ্ধে প্রাণ হারাল।

লঙ্কা যখন বীরশূন্য তখন এক বীর কিন্তু ঘুমিয়ে আছে। সে রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। ব্রহ্মার বরে সে ছ'মাস ঘুমোবে ছমাস জাগবে। জাগ্রত অবস্থায় সে অপরাজেয়। কিন্তু অসময়ে ঘুম ভাঙালে যুদ্ধে তার মৃত্যু অনিবার্য। লঙ্কা যখন বীরশূন্য তখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রার সময়। কিন্তু দেশরক্ষার জন্য অনেক কৌশল করে তাকে জাগান হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেও মৃত্যুবরণ করল। এভাবে লঙ্কা যখন বীর শূন্য, হাহাকার করছে রাবণ, তখন আবার এল ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। রাবণ বলল—

—যত রাক্ষসবীর যুদ্ধে যাচ্ছে কেউ আর ফিরছে না। একমাত্র তুমি যুদ্ধ জয় করে ফিরেছ। বাসব বিজয়ী পুত্র আমার! তুমি আবার যুদ্ধে যাও রাম লক্ষ্মণ-সহ বানরকূল ধ্বংস কর।

ইন্দ্রজিৎ বলল—কতবার রাম-লক্ষ্মণকে মেরেছি কিন্তু তারাতো মরেও মরে না। এই শত্রু কী করে সংহার করব?

রাবণ বলল—

—তুমি আগে ওই হনুমানকে মারো। সেই সবাইকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে ঔষধ এনে।

ইন্দ্রজিৎ আবার রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করল। এবার আর সামনা সামনি নয় মেঘের আড়াল থেকে। দলে দলে বানর সেনার প্রাণ যাচ্ছে। বানরেরা তখন ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ তখন শ্রীরামকে বললেন—

—মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিৎ তার মাথার মণিমানিক্যের মুকুট জ্বলজ্বল করছে। তুমি এবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাকে বধ কর।

মেঘের আড়াল থেকে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ এবার রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল।

শ্রীরামচন্দ্র তখন মিত্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু কীভাবে হবে?

লঙ্কার মধ্যে ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার আছে। সেখানে আহুতি দিয়ে যুদ্ধে এলে সে দেব দানব মানুষ্যের কাছে অপরাজেয়। ব্রহ্মার বিধান আছে, যে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ভঙ্গ করবে তার হাতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হবে। ইন্দ্রজিৎ এখন নিশ্চয় সেই যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করছে। লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে যাক, যজ্ঞ ভঙ্গ করে ইন্দ্রজিৎকে বধ করুক। শ্রীরামের আদেশে বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে অদৃশ্যভাবে পৌঁছান সেই যজ্ঞাগার। তখন ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করছে, লক্ষ্মণ অতর্কিতে যজ্ঞ ভঙ্গ করে যজ্ঞস্থলেই ইন্দ্রজিতকে বধ করল। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণ আনন্দিত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলো।

লঙ্কার ঘরে ঘরে তখন পতিহারা, পুত্রহারা নারীদের ক্রন্দনের রোল। সবাই রাবণকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। রাবণ এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছে না। একবার সীতাকে বধ করার জন্য উদ্যত হলো। মন্দোদরী নিবারণ করল। এবার রণসাজে সজ্জিত হয়ে রাবণ চলল রণক্ষেত্রে, ডাক দিল রাক্ষসদের। সুসজ্জিত রথে রাবণ পুরী থেকে বেরিয়ে এলো। একে একে সব বানর বীরেরা আক্রমণ করল রাবণকে। রাবণের বাণে জর্জরিত হয়ে সব পালিয়ে গেল। রাবণের নির্দেশে সারথি রথ নিয়ে গেল শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে। শ্রীরাম- লক্ষ্মণ বিভীষণকে একসঙ্গে দেখে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে বিভীষণের দিকে শেল নিক্ষেপ করল। লক্ষ্মণের তিন বাণে সেই শেল চার টুকরো হয়ে গেল। এইবার রাবণ পুত্র হন্থা লক্ষ্মণের দিকে ময়দানব প্রদত্ত শক্তিশেল নিক্ষেপ করল। অগ্নির তেজে ছুটে আসছে শেল। শ্রীরাম করজোড়ে প্রার্থনা করলেন শেলকে ফিরে যেতে। শেলের মুখে বসা যমরাজ বললেন, এই শেল যখন যার হাতে তার আদেশ পালন করে। লক্ষ্মণকে এই শেল বিদ্ধ করবেই। শেল বিদ্ধ হলো লক্ষ্মণের বুকে। ভূতলে পতিত হলো লক্ষ্মণ। বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান, নল, নীল সবাই চেষ্টা করেও লক্ষ্মণের বুক থেকে শেল বের করতে পারল না। শ্রীরাম তখন প্রচণ্ড ক্রোধে রাবণকে আক্রমন করলো। বৃষ্টির মতো বাণ বর্ষণে রক্তাক্ত হয়ে রাবণ লঙ্কাপুরীতে পালিয়ে গেল। পেছনে ছুটল বানরসেনা।

শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণ ভূমিতে পড়ে আছে, চারদিক ঘিরে আছে হনুমান, জাম্ববান, সুগ্রীব, নল, নীল প্রমুখ বানর। রাবণকে বিতাড়িত করে শ্রীরামচন্দ্র ফিরে এলেন লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে শ্রীরাম বিলাপ করতে লাগলেন। জাম্ববান বলল, বৈদ্যরাজ সুষেণ থাকে লঙ্কায়, তাকে নিয়ে এলে তার চিকিৎসায় লক্ষ্মণ বেঁচে যাবেন। হনুমান তৎক্ষণাৎ গিয়ে বৈদ্যরাজ সুষেণকে নিয়ে এল। সুষেণ লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করে দেখল, বলল—

—এখনও প্রাণের লক্ষণ আছে। রাতের মধ্যে একটা ঔষধি প্রয়োগ করতে পারলে লক্ষ্মণ বেঁচে যাবে। সুর্যোদয় হয়ে গেলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। সেই ঔষধি পাওয়া যায় গন্ধমাদন পর্বতে। তবে তা এখান থেকে আঠারো মাসের পথ।

শ্রীরামচন্দ্র-সহ সবাই তখন হনুমানের দিকে তাকাল। হনুমান বলল—

প্রভু শ্রীরামের কৃপা থাকলে এই আঠারো মাসের পথ একরাতে যাওয়া আসা সম্ভব। তোমরা লক্ষ্মণকে রক্ষা করো, আমি দ্রুত ঔষধি নিয়ে আসছি।

এই বলে হনুমান দ্রুত লম্ফ দিয়ে আকাশে উঠে গন্ধমাদন পর্বতের দিকে চলল। হনুমানকে আকাশমার্গে দেখে রাবণ আগেই মায়াবী কালনেমিকে গন্ধমাদন পর্বতে পাঠিয়ে দিল। অনতি বিলম্বে হনুমান পৌঁছাল গন্ধমাদনে। সেখানে এক সরোবরে থাকে কুম্ভীর রূপে এক শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। কালনেমি তপস্বীর বেশ ধরে ছলনা করে হনুমানকে সেই সরোবরে স্নান করতে পাঠাল। হনুমানের স্পর্শে মুক্ত হলো সেই অপ্সরা। মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে যাবার সময় অপ্সরা হনুমানকে এই ভণ্ড তপস্বী সম্পর্কে সতর্ক করে যায়। হনুমান সেই কালনেমিকে হত্যা করে লঙ্কায় রাবণের সামনে ফেলে দেয়। এইবার গন্ধমাদনে ঔষধি সংগ্রহের পালা। হনুমান সেই ঔষধি চেনে না, অগত্যা পুরো পর্বতটাই উপড়ে নিয়ে চলল হনুমান। উত্তর থেকে দক্ষিণ যেতে যেতে মাঝখানে অযোধ্যা, নন্দীগ্রামে ভরত শত্রুঘ্ন সেখানে সিংহাসনে শ্রীরামের পাদুকা রেখে চামর ব্যজন করছে। হনুমান সেই পাদুকা অতিক্রম করে যাচ্ছে তাই ক্রুদ্ধ ভরত এক লোহার বাটুল ছুড়ে মারে হনুমানের দিকে। বাটুলের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে পর্বত সমেত ভূমিতে পড়ে হনুমান। জ্ঞান এলে সে 'শ্রীরাম' নাম করতে থাকে। ভরত শত্রুঘ্ন তাকে শ্রীরাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। গুরু বশিষ্ঠ এসে ভরতের কাছে হনুমানের পরিচয় দেয়। হনুমান জানায় রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ আহত হয়ে মৃত্যুমুখে। বৈদ্যরাজ সুষেণের নির্দেশে সে ঔষধি নিতে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিল। ঔষধি চিনতে না পেরে হনুমান পর্বতশুদ্ধ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ভরত শত্রুঘ্নের হটকারিতায় এই বিপত্তি। হনুমান বলল ঔষধি রাতের মধ্যে প্রয়োগ করতে না পারলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের মৃত্যু অনিবার্য। লক্ষ্মণের মৃত্যু হলে লঙ্কার রাবণের কবল থেকে সীতা মাতাকে উদ্ধার করা যাবে না। আর শ্রীরাম আবার বনে প্রবেশ করবেন। ভরত নিঃসপত্ন হয়ে রাজ্যভোগ করতে পারবেন। কৃতকর্মের জন্য ভরতের অনুশোচনা হলো। তিনি হনুমানের সঙ্গে লঙ্কায় শ্রীরামের কাছে যেতে চাইলেন। শ্রীরামের অনুমতি ছাড়া হনুমান ভরতকে সঙ্গে নিতে রাজি হলো না। ভরতের শক্তি পরীক্ষার জন্য বলল—

—আমি এখন এই পর্বত ভূমি থেকে তুলতে অক্ষম। যদি এক যোজন উঁচুতে তুলে দিতে পার তবে আমি নিয়ে যেতে পারব। শত্রুঘ্ন তির-ধনুক এনে দিলে ভরত ধনুকে তির যোজনা করে তার উপর পর্বত রেখে একশত যোজন উপরে তুলে

দিলেন। হনুমান তড়িৎ গতিতে লঙ্কায় পৌঁছে পর্বত রাখল। সুষেণ পর্বত থেকে বিষল্যকরণী সংগ্রহ করে লক্ষ্মণের শেল তুলে, ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরল। উঠে বসলেন লক্ষ্মণ। বানরসেনারা উল্লাসে জয়ধ্বনি দিল।

লক্ষ্মণের প্রাণ সঞ্চার এবং সুস্থ হওয়ার পর জাম্ববান শ্রীরামকে বলল।

আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে এবার হনুমান গন্ধমাদনকে স্বস্থানে রেখে আসুক।

শ্রীরাম সম্মতি জানালে হনুমান আবার সেই গন্ধমাদনকে তুলে নিয়ে স্বস্থানে রাখার জন্য চলল। লঙ্কার প্রাসাদ থেকে রাবণ তা দেখে তার সেনাদলের বাদবাকি সাত প্রধান, বক্রমুখ, ওষ্ঠবক্র, প্রচণ্ডলোচন, তালভঙ্গ, সিংহমুখ, ঘোরদর্শন প্রমুখকে নির্দেশ দিল হনুমানকে বধ করার জন্য। এই সাত মায়াবী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আকাশ মার্গে হনুমানকে আক্রমণ করল। হনুমান হাতে নাড়াল না, পর্বত ফেলে দিল না শুধুমাত্র লেজকে প্রসারিত করে সাতজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আছাড় মারল। সেই প্রচণ্ড আছাড়ে কারও মস্তক চূর্ণ হলো, কারও হাত ভাঙ্গল, কারও পা, কারও বা সাড়া শরীরের হাড় গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল। এবার নির্বিঘ্নে পর্বত যথাস্থানে রেখে হনুমান ফিরে এল।



বানরসেনাদের মধ্যে তখন উল্লাস। শ্রীরাম লক্ষ্মণও এইবার জয় সম্পর্কে নিশ্চিত। এই সময় মিত্র বিভীষণের স্মরণ হলো। রাবণের এক মহাবলী পুত্র এখনও জীবিত। সেই মহীরাবণ বীরত্বে পিতার সমতুল্য, মায়াবী। রাবণ তাকে পাতালপুরীর অধিকার দিয়েছে। ইচ্ছামতো রূপ পরিবর্তন করে সে যেকোনো অঘটন ঘটাতে পারে। এমনকী মায়াজাল রচনা করে সে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে হত্যা কিংবা অপহরণও করতে পারে। মহীরাবণের গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভীষণ পক্ষীরূপ ধারণ করে রাবণের প্রাসাদে গিয়ে পিতা-পুত্রের গোপন মন্ত্রণা শুনে এসেছে। শিবিরে ফিরে শ্রীরাম-লূক্ষ্মণ সহ সকল বানর-বীরদের সঙ্গে আলোচনা করে চরম সতর্কতা অবলম্বন করল। বানর সেনাদের বলল—

—এই মায়াবী মহীরাবণের পাতাল প্রাসাদে মহামায়া বন্দি আছেন। সে যা ভাবে তাই করতে পারে। এই মহীরাবণের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান। এই মায়াবী দুষ্ট রাক্ষস এখন লঙ্কায়, তাই আজকের রাত সবাইকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

সকল বানরবীর বিভীষণের সঙ্গে সহমত হয়ে শ্রীরাম - লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। বীর হনুমান আপন পুচ্ছের বিস্তার ঘটিয়ে এক বিচিত্র গড় নির্মাণ করল। নিজ দ্বার রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে অভ্যন্তরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে রাখা হলো। বাইরে সদা সতর্ক বানরবীরগণ প্রহরায়। সদা সতর্ক বিভীষণ শ্রীহনুমানকে সতর্ক করল যে মহীরাবণ বিভিন্ন রূপ ধরে গড়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে, এমনকী সে হনুমানের পিতা পবনদেবের রূপ ধরেও আসতে পারে। কোনও অবস্থাতেই যেন তাকে গড়ে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া না হয়। সতর্ক হনুমান, আর বিভীষণ হনুমান রচিত সেই কৃত্রিম দুর্গের চারপাশে অনবরত সতর্ক দৃষ্টিতে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। হনুমানের অনুরোধে শ্রীরাম হনুমান রচিত দুর্গের উপরিভাগে সুদর্শন চক্রকে স্থাপন করেছেন। মায়াবী মহীরাবণ তখন সকলের অলক্ষ্যে বানর শিবিরে উপস্থিত হয়েছে। শিবিরের সুরক্ষা ব্যবস্থা দেখে সহজে কার্যসিদ্ধি হবে না অনুমান করে মায়ার আশ্রয় নিয়ে শ্রীরামের পিতা দশরথের রূপ ধারণ করে হনুমান রচিত দুর্গদ্বারে এল এবং পিতার পরিচয় দিয়ে পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। সতর্ক হনুমান তাকে বিভীষণ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। বিভীষণের নাম শুনে মায়াবী তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল।

বিভীষণ এসে এই কথা শুনে হনুমানকে আবার সতর্ক করে গড়ের চারপাশ দেখতে গেল। বিভীষণ চলে যেতেই মহীরাবণ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের রূপ ধরে এসে গড়ে প্রবেশ করতে চাইল। এবারও হনুমান তাকে বিভীষণ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললে সে পালিয়ে যায়। এরপর মহীরাবণ শ্রীরামের মাতা কৌশল্যা ও শ্বশুর জনকের বেশ ধরে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং বিভীষণ এসে পড়ায় পালিয়ে যায়। এইভাবে বার বার ব্যর্থ হয়ে মহীরাবণ এবার বিভীষণের রূপ ধরে হনুমানের সামনে আসে এবং গড়ের ভিতরের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রবেশ করে। অনতিবিলম্বে বিভীষণ বাইরে থেকে দুর্গদ্বারে এলে হনুমান বিস্মিত হয়। বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করে—

—তুমি এইমাত্র প্রভুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ভিতরে প্রবেশ করলে। এখন দেখছি তুমি বাইরে থেকে এলে। আসল বিভীষণ কে?

বিভীষণ বুঝতে পারল যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাঁরই রূপ ধরে মহীরাবণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। হনুমানকে এই ইঙ্গিত দিয়ে বিভীষণ অতি দ্রুত গড়ে প্রবেশ করল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। মায়াবলে সকলকে অচৈতন্য করে মহীরাবণ সুড়ঙ্গ তৈরি করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে

গেছে।

এবারে হনুমান বিভীষণকে সন্দেহ করতে লাগল। ভাবল এ হয়তো বিভীষণের ষড়যন্ত্র। কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পর হনুমানের ভুল ভাঙে। তখন দুজনে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে দেখে সব বানর সেনারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। শ্রীরাম- লক্ষ্মণ যথাস্থানে নেই। পাশে এক বিরাট সুড়ঙ্গ। তখন তাঁদের বুঝতে বাকি রইল না যে মহীরাবণ রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করেছে। হনুমান আর বিভিষণের যত্নে একে একে বানরবীরেরা চৈতন্য লাভ করে। সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বমান, নল, নীল প্রমুখ যোদ্ধা চৈতন্য লাভ করে সম্যক অবগত হয়ে রোদন করতে শুরু করে। প্রাজ্ঞ জাম্ববান সকলের উদ্দেশ্যে বলে—

—এই ঘোর বিপদে রোদন উচিত নয়। এই বিপত্তির সময়ে কেউ অস্থির হয়ো না। প্রভু শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করতে পারে এমন শক্তি ত্রিভুবনে কারও নেই। রাজা সুগ্রীব, তুমি আমার মন্ত্রণা শোনো। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণে তুমি মারুতিকে প্রেরণ কর। ত্রিজগতে মারুতির অগম্য কোনো স্থান নেই। শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন মারুতি অবশই তাঁদের সন্ধান পাবে।

জাম্ববানের বাক্য সমস্ত বা নরবীর একবাক্যে সমর্থন করলো। রাজা সুগ্রীব বলল—

—হে পবননন্দন! হনুমান হেলায় সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতামাতার সন্ধান করেছ। তুমি শ্রীরামের প্রধান ভক্ত একথা সর্বজনবিদিত। তোমার বুদ্ধিভ্রমে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অপহৃত হয়েছেন। তুমিই তাঁদের অন্বেষণ কর।

সুগ্রীবের বচনে লজ্জায় অভিমানে মারুতির চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—

—প্রভুর অন্বেষণে আমি অবশ্যই যাব।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন খুঁজে আমি তাঁদের নিয়ে আসব। আর যদি খুঁজে না পাই তবে এই জলধিতে আত্মবিসর্জন দেব। যতক্ষণ আমি তাঁদের সন্ধান নিয়ে ফিরে না আসি ততক্ষণ তোমরা এখানে একত্রিত হয়ে থাক।

সুগ্রীব ও জাম্ববানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হনুমান যে সুড়ঙ্গ পথে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে অপহরণ করা হয়েছে বলে সন্দেহ, সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে। দীর্ঘ সময়ে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে এক সময়ে অনুমান পাতালপুরীতে প্রবেশ করে। পাতাল পুরীর মধ্যাকাশে তখন সূর্যের প্রকাশ। দৃষ্টিনন্দন বিচিত্র হর্ম্যরাজি। প্রথমেই বলীরাজার প্রাসাদ। তার পাশ দিয়ে পাতাল গঙ্গা ভোগবতী প্রবাহিতা। স্থানে স্থানে মুনিঋষিদের সমাবেশ। বিস্তৃত রাজপথে চলেছে যক্ষ-যক্ষিণী, নাগ-নাগিনীর দল। এই পুরীতে জরা-মৃত্যু নেই, নেই রোগ শোক। হনুমান ছদ্মবেশে ঘুরছে কত তপোবন, কত তীর্থস্থান, অতিথি নিবাস কোথাও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সন্ধান পেল না। অবশেষে হনুমান পৌঁছে গেল পাতাল লঙ্কায় মহীরাবণের পুরীতে। এই পুরী অমরাবতী তুল্য। অতিক্ষুদ্র বানরের রূপ ধারণ করে হনুমান এই পুরীতে প্রবেশ করল। সুবর্ণ নির্মিত বিচিত্র প্রাসাদ, পাষাণবেষ্টিত কত দীঘি সরোবর। পুণ্যার্থী, বিদ্যার্থী, স্নানার্থীর মেলা, কিন্তু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কোথায়? হনুমান তখন সেই ক্ষুদ্র বানরের রূপে এক বৃক্ষে আরোহণ করে বসে রইল। সেখান থেকে হনুমান সব দেখছে সব শুনছে। আর হনুমানকেও সবাই দেখছে, কারণ ইতিপূর্বে পাতালপুরীতে এহেন বানর কেউ দেখেনি। সবাই দেখছে আর ভাবছে এই মর্কট কোথা থেকে এল? এইবার এক অতিবৃদ্ধার নজরে এল হনুমান। তার শনের মতো চুল, কুঁচকে যাওয়া চামড়া। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রখর, আর স্মৃতি অম্লান। এই মর্কটকে দেখে বৃদ্ধা চমৎকৃত হলো, তার এক পূর্বকথা স্মরণ হলো। বৃদ্ধা তখন এক প্রতিবেশিনীকে ডেকে সেই গোপন কথা বলতে শুরু করল। —''ওলো শোন, আমি আজ আমাদের এই পাতাল লঙ্কায় এক মহাবিপদের আভাস পাচ্ছি। সে অনেকদিন আগের কথা। আমাদের রাজা মহীরাবণ অমর হওয়ার জন্য বহুদিন মহামায়ার কঠোর তপস্যা করল। অবশেষে তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবী মহামায়া জাগ্রত হয়ে মহীকে বর দিতে চাইলেন। রাজা মহীরাবণ তখন মহামায়ার কাছে অমরত্বের বর প্রার্থনা করলেন। দেবী বললেন—অমরত্ব ছাড়া অন্য কোনো বর চাও।

তখন চতুর মহীরাবণ দেবীকে বলল—

—দেবী আমাকে এই বর দাও যেন দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ, শ্বাপদ কিংবা সর্পের হাতে যেন আমার মৃত্যু না হয়।

দেবী তাকে সেই বর দিলেন। বর দিয়ে দেবী অন্তর্ধান করলেন। মহীরাবণ ভাবল বাকি রইল নর আর বানর। এই দুই আমার ভক্ষ্য, ওরা আমার কী করবে? দেবী কিন্তু অন্তর্ধানের আগে দৈববাণীতে বলে গিয়েছিলেন যে এই নর-বানরের হাতে মহারাজা সবংশে সংহার হবে।" ক্রমে বেলা বাড়ছে পুরনারীরা দলে দলে কলসী কাঁখে দীঘি সরোবরে জল নিতে আসছে। সবার চোখে মুখে কৌতূহল। এক পুরবাসিনী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল—

—দাইমা! রাজপ্রসাদে আজ কীসের উৎসব? বাদ্য বাজছে, মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, বহুলোকের আনাগোনা।

বৃদ্ধা বলল—

—শোন্, কথাটা পাঁচকান করিস না। আজ রাজার মন্দিরে মহামায়ার কাছে নরবলি হবে। রাজা কোথা থেকে অনিন্দ্যসুন্দর দুই যুবাকে ধরে এনেছে। আর দু'চার দণ্ড তারপর তাদের বলি হবে। রাজবাড়ির গোপন কথা তোদের বলে ফেললাম কথাটা। গোপন রাখিস কথাটা। রাজা দুই নরকে ধরে এনেছে, আবার এক বানর কোথা থেকে এসে জুটেছে। পূর্বকথা স্মরণ করে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।

বৃক্ষের উপর বসে হনুমান সব কথা শুনল। শ্রীরাম-লক্ষণ

যে রাজপ্রাসাদের কোনও গোপন কক্ষে বন্দি আছেন তাতে তার আর কোনও সন্দেহ রইল না। কালবিলম্ব না করে সকলের অলক্ষ্যে হনুমান প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরল হনুমান। কিন্তু কোথাও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সন্ধান পেল না। হঠাৎ তার নজর এল এক প্রাসাদ ঘিরে অস্ত্রধারী নিশাচরদের সমাবেশ। হনুমানের কৌতূহল হলো। এই ক্ষুদ্র প্রাসাদ ঘিরে এত নিরাপত্তা কেন? মক্ষিকার রূপ ধারণ করে হনুমান প্রবেশ করল সেই প্রাসাদে। এই কক্ষ, সেই কপক্ষ ঘুরে এক সুরক্ষিত কক্ষে দেখতে পেল নিদ্রিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে। মায়ার প্রভাবে এখনো তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। মক্ষিকারূপে শ্রীহনুমান অলিন্দপথে কক্ষে প্রবেশ করে আপন শরীর ধারণ করে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে জাগ্রত করল। নিদ্রাভঙ্গ হলে শ্রীরাম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলেন—মিত্র সুগ্রীব ও বিভীষণ কোথায়?

হনুমান বলল—

—প্রভু! মহাবিপদ ঘটে গেছে, আমার পুচ্ছনির্মিত গড় থেকে কৌশলে মহীরাবণ আপনাদের হরণ করে পাতালে নিয়ে এসেছে। আমি তারই নির্মিত সুড়ঙ্গপথে পাতালপুরীতে এসে অনেক অনুসন্ধানের পর আপনাদের সন্ধান পেয়েছি।

এই সময় বাইরে দামামা বাজিয়ে ঘোষণা হলো—

আজ মহামায়ার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। প্রচুর ছাগ ও মহিষ বলি হবে সেই সঙ্গে দু'টি যুবা নর।

এই ঘোষণা শুনে সন্ত্রস্ত শ্রীরাম হনুমানকে বললেন—

পবননন্দন! আমরা মহাবিপদে আছি। সৈন্য নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই, পাতালের বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো কীভাবে?

হনুমান তখন করজোড়ে বললেন—

প্রভু, আপনার শ্রীচরণের দাস আছে। অস্ত্রের প্রয়োজন নেই বৃক্ষ ও প্রস্তর দিয়ে আজ শত্রু নিপাত করবো। রাবণ রাজার বংশের যে যেখানে আছে আপনার কৃপায় একে একে সবাইকে শমন ভবনে পাঠাবো। রাক্ষস বধের জন্য এবার আপনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার মহিমার কথা এই দুষ্ট জানে না। মৃত্যুকে আহ্বান করার জন্য দুষ্ট মহীরাবণ আপনাদের এখানে এনেছে। এই প্রাসাদের মন্দিরে দেবী মহামায়া প্রতিষ্ঠিতা, আমি গোপনে সেই দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। যদি মহামায়া এই দুষ্ট রাক্ষসের হিত করতে চায় তবে মন্দির সহ তাঁকে সমুদ্রে ডোবাব। আমি মহামায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসছি। আমার কাল বিলম্ব হবে না। আপনারা ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারুতি মক্ষিকার রূপ ধারণ করে মহামায়ার মন্দিরে পৌঁছে গেল। মক্ষিকারূপে মন্দিরে প্রবেশ করে হনুমান মহামায়ার কানে কানে বলতে থাকে—

—হে জগৎজননী, তোমার কাছে বলি দেবার জন্য মহীরাবণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে হরণ করে এনেছে। আজ দ্বিপ্রহরে তাদের বলি হবে। তুমি কি মহীরাবণকে এই আজ্ঞা দিয়েছ? যদি দিয়ে থাক তবে তোমার সামনে আমি মহীরাবণকে সবংশে বধ করব। আর তোমাকে মন্দির-সহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করব।

হনুমানের বচন শুনে স্মিতহাস্যে দেবী বললেন—

শ্রীরামের আগমনে এই পাতালপুরী পবিত্র হয়েছে। মহীরাবণ মহাপাপী, সর্বদা দেব, দ্বিজ, ধর্ম হিংসা করে এই মায়াবী রাক্ষসের উৎপীড়নে ত্রিভুবন অতিষ্ঠ। এই দুরাত্মা রাক্ষসদের সংহারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতার রূপে এসেছেন। নির্বোধ মহারাবণ নিজের বিনাশের জন্য সাক্ষাৎ শমনকে আহ্বান করেছে। শুদ্ধাত্মা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে বলির নিমিত্ত এই মন্দিরে আনায়ন করা হবে। তুমি শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে গোপনে এই কটি কথা বলবে। আমার সম্মুখে বলির আগে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে এনে প্রণাম করতে বলবে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেন বলে যে তারা রাজপুত্র প্রণাম করতে জানে না। শ্রীরাম মহীরাবণকে বলবে যে কী করে প্রণাম করতে হয় দেখিয়ে দেবার জন্য। মহীরাবণ অষ্টাঙ্গে হেঁট মুণ্ডে প্রণাম করবে। তখন তুমি এই খড়্গ নিয়ে মহীরাবণের ধর-মুণ্ড আলাদা করবে। মহামায়ার এই বাক্য শোনার পর হনুমান আবার গোপনে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে দেবীর এই বার্তা জ্ঞাপন করে।

যথাসময়ে অনুচরগণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে স্নান করিয়ে মহামায়ার মন্দিরে নিয়ে আসে। মহীরাবণ পূজা শেষ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে প্রণাম করতে বলে। উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলেন—

আমরা রাজপুত্র। প্রণাম করতে জানি না। তুমি দেখিয়ে দিলে করতে পারি।

তখন মহীরাবণ অষ্টাঙ্গে হেঁটমুণ্ডে মহামার সামনে প্রণাম করে। সঙ্গে সঙ্গে হনুমান নিজমূর্তি ধারণ করে খড়্গ দ্বারা মহীরাবণের শিরশ্ছেদ করে। দেবলোকে জয়ধ্বনি ওঠে। মহীর অনুচররা ত্রাসে পলায়ন করে অন্তঃপুরে এই দুঃসংবাদ দেয়। সংবাদ গেল মহীরাবণের স্ত্রীর কাছে। অসুরনন্দিনী মহাতেজবতী দিব্য তির-ধনুক নিয়ে নর বানরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলল। দেবী মহামায়ার প্রতিও রানি ক্ষুব্ধ। যে মহীরাবণ এতদিন ভক্তিভরে দেবীপূজা করে এসেছে আজ দেবী সেই ভক্ত মহীরাবণকে বলিরূপে গ্রহণ করলেন। সেই দেবীরও আজ বিসর্জন দেবে অসুরনন্দিনী মহীরাবণের রানি। মন্দিরে হনুমানকে দেখে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে থাকে রানি। হনুমান তখন এক বৃক্ষ উৎপাটিত করে সেই বাণ প্রতিহত করে। ততক্ষণে পাতালপুরীর রাক্ষস বাহিনী এসে রানির সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়। হনুমান বৃক্ষ ও পাথর নিক্ষেপ করে সেই সেনাদের বিধ্বস্ত করে। রানি দশমাসের অন্তঃসত্ত্বা তথাপি হনুমান রাম-লক্ষ্মণের

উপর অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করে চলেছে। হনুমান বৃক্ষদ্বারা সেই তির প্রতিহত করতে করতে এক সময়ে রানির উদরে প্রচণ্ড পদাঘাত করে। সেই পদাঘাতে রানির পেট থেকে বেরিয়ে মহীরাবণের পুত্র হনুমানের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করে। হনুমান কৌশলে তার পা দুটি ধরে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ডে ছুঁড়ে মারে আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। রানিকেও হনুমান যমালয়ে পাঠায়। এবার দেবী মহামায়াকে মুক্ত করে শ্রীরাম- লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে হনুমান সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আবার বানর শিবিরে ফিরে আসে। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্ববান, নল, নীল প্রমুখ বীরের সঙ্গে মিলিত হন। বানর শিবিরে শ্রীরামের সঙ্গে সঙ্গে হনুমানের জয়ধ্বনিতে লঙ্কা প্রকম্পিত হয়। মহীরাবণের পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদে রাবণের শেষ আশাও নিভে গেল।

রাবণ কিন্তু দমার পাত্র নয়। আবার নতুন করে সৈন্যসজ্জা করল দশানন। এবার মন্দোদরী রাবণকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু রাবণ অনড়। শ্রীরামচন্দ্রও তার অজেয় ধনুহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে। আট অশ্বে টানা বিচিত্র রথে আরোহণ করে রাবণ রাম-লক্ষ্মণ ও বানর সেনাদের উপর অবিরাম বাণবর্ষণ করে চলেছে। শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন ভূমিতে দাঁড়িয়ে। ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেবতাদের অনুরোধে ইন্দ্র সারথি মাতলী-সহ তাঁর দিব্য রথ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রেরণ করলেন। আর পাঠালেন এক দিব্য মুকুট। বার্তা পাঠালেন রাবণকে মেরে দেবতাদের হিতসাধন করার জন্য। রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের রথ দেখে রাবণ দেবতাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে। ক্ষিপ্ত হয়ে রাবণ রামের উপর নাগপাশ বাণ নিক্ষেপ করে গরুড় বাণে শ্রীরাম রাবণের বাণ নিবৃত্ত করে। রাবণের আক্রমণ দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। শ্রীরামচন্দ্র সেই আক্রমণ প্রতিহত করে প্রতি আক্রমণে রাবণকে জর্জরিত করে।

শ্রীরামচন্দ্র এবার উপলব্ধি করলেন দৈবী সহায়তা ছাড়া রাবণকে বধ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি দেবী চণ্ডীকার শরণ নিয়ে তার পূজা করলেন কিন্তু দেবী তাকে দর্শন দিলেন না। এবার মিত্র বিভীষণের পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র একশত আট নীলপদ্ম দিয়ে দেবীপূজার সংকল্প করলেন। পৃথিবীর মধ্যে নীলপদ্ম পাওয়া যায় একমাত্র দেবীদহে যা লঙ্কা থেকে দশ বছরের পথ। সংকটমোচন হনুমান একদিনের মধ্যে সেই দশবছরের পথ অতিক্রম করে একশত আট পদ্ম নিয়ে এল। এবার সমুদ্রতীরে ঘট স্থাপন করে শুদ্ধচিত্তে শ্রীরামচন্দ্র একশ আট শত সংখ্যক নীলপদ্ম দানের সংকল্প করে দেবীর পূজা আরম্ভ করেন।

কিন্তু পদ্ম প্রদানের সময় একটি পদ্ম কম পড়ে। কোথাও পদ্ম খুঁজে না পেয়ে শ্রীরামচন্দ্র আপন চক্ষু উৎপাটিত করে একশত আট পদ্ম পূরণ করার উদ্দেশ্যে ধনুর্বাণ নিয়ে চক্ষু উৎপাটিত করার জন্য উদ্যত হলে দেবী স্বমূর্তিতে আবির্ভূতা হন এবং পূজা গ্রহণ করেন।

শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনিই গোলকাধিপতি নারায়ণ এবং সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। রাক্ষসকুল নিধনের জন্য রাবণ সীতা হরণ করেছে। রাবণ বধ শুধু সময়ের অপেক্ষা এই কথা বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন।

এদিকে রাবণের হিত কামনায় তার আদেশে স্বয়ং বৃহস্পতি চণ্ডীপাঠে রত। চণ্ডীপাঠে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য হনুমান চণ্ডীর দুটি অক্ষর তুলে নেয় মক্ষিকার বেশে। অভ্যাসবশত বৃহস্পতির চণ্ডীপাঠে বিঘ্ন ঘটে না। তখন হনুমান স্বমূর্তি ধারণ করে চণ্ডী গ্রন্থ কেড়ে নেয়। বৃহস্পতির পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। দেবী চণ্ডী তখন রাবণকে পরিত্যাগ করে কৈলাশে স্বস্থানে চলে যান। রাবণ কিন্তু তখনও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিভীষণ তখন শ্রীরামকে বলল, রাবণকে বধ করা অসম্ভব। তার দেহ যদি খণ্ড খণ্ডও করা হয় তা আবার জুড়ে যাবে এমনই ব্রহ্মার বর। তার মৃত্যু সম্ভব একমাত্র ব্রহ্মা প্রদত্ত মৃত্যুবাণ দ্বারা। যে বাণ রানি মন্দোদরীর কাছে গোপনে সযত্নে রক্ষিত আছে। রাবণ তখন রণক্ষেত্রে। হনুমান সেই সময়ে বৃদ্ধ জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত হন রাবণের প্রাসাদের অন্দর মহলে মন্দোদরীর কক্ষে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে মন্দোদরী ভক্তিভরে আসন পেতে দিয়ে বসাল। হনুমান বলল—

—মাত! আমি বৃদ্ধ জ্যোতিষী। রাবণের চির হিতৈষী। রাবণের এখন খুব বিপদ। কিন্তু তার মৃত্যু ভয় নেই।

মন্দোদরী আশ্বস্ত হয়ে বলল। আপনি সঠিক বলছেন তো ব্রাহ্মণ?

আমার স্বামীর জীবনহানি ঘটবে না তো? হনুমান বলল—

—কী করে ঘটবে মা? একমাত্র ব্রহ্মাপ্রদত্ত সেই মৃত্যুবাণ ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রে রাবণের মৃত্যু হবে না।

অবাক হয়ে গেল রানি মন্দোদরী। যে মৃত্যুবাণের কথা রাবণ ও রানি ছাড়া অন্য কেউ জানে না এই জ্যোতিষী জানল কী করে। এর গণনা নিশ্চয় অব্যর্থ। জ্যোতিষীর প্রতি রানি মন্দোদরীর ভক্তি বিশ্বাস শতগুণে বেড়ে গেল। বলল—হে বিপ্র, আমার স্বামীর অন্য কোনো বিপদ ঘটবে নাতো?

হনুমান বলল—

—বিপদ আসবে, তবে লঙ্কেশ্বর তা অনায়াসে কাটিয়ে উঠতে পারবে। তুমি শুধু সেই মৃত্যুবাণটা সুরক্ষিত রাখবে। আচ্ছা, সেই বাণটা কোথায় রেখেছ বলো আমি সেখানে একটা রক্ষাকবচ দিয়ে যাই। যাতে সেই বাণ আরও সুরক্ষিত থাকে

সরল বিশ্বাসে মন্দোদরী বলল—

ব্রাহ্মণ তুমি লঙ্কেশ্বরের হিতৈষী তাই বলছি, যে কথা অন্য কেউ জানে না। সেই মৃত্যুবাণ ওই স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর সুরক্ষিত আছে।

তৎক্ষণাৎ হনুমান স্বমূর্তি ধারণ করে এক প্রচণ্ড পদাঘাতে সেই স্ফটিক স্তম্ভ ভেঙে বাণটি হস্তগত করল। তারপর নিমেষের মধ্যে প্রাসাদ ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল।

মন্দোদরী আর্তনাদ করছে। ছুটে এল সেবিকা সহচরীর দল। সেই মৃত্যুবাণ ততক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে, শ্রীরামচন্দ্রের হাতে পৌঁছে গেছে। রাবণ তখন মহাকোপে বাণবৃষ্টি করে চলেছে। সারথি মাতলি বাণে বাণে অস্থির। বাণে বাণ নিবারণ করছেন শ্রীরামচন্দ্র। এইবার শ্রীরাম সেই মৃত্যুবাণ ধনুকে জুড়লেন। সুবর্ণরচিত এই বাণ, বাণের মুখ গুপ্তভাবে অগ্নির অধিষ্ঠান, মধ্যভাগে শিব, অলক্ষিতে বাণের উপর যমের অধিষ্ঠান। এই বাণকে চালনা করে ঊনপঞ্চাশ বায়ু। বাণের গর্জনে ত্রিভুবন কম্পমান। বাণের মুখ থেকে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে, মন্ত্রপাঠ করে গুরু বিশ্বামিত্রকে স্মরণ করে শ্রীরামচন্দ্র রাবণের নাভিদেশ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন। প্রচণ্ড শব্দে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিন হয়ে সেই বাণ রাবণের নাভিদেশ বিদ্ধ করে। রাবণ ছটফট করে রথ থেকে ভূমিতলে পড়ে যায়। কিন্তু রাবণের মৃত্যু সম্পর্কে সবাই এমনকী দেবতারাও সন্দিহান। রাবণ বহুবার মৃতুমুখে পতিত হয়ে আবার পুনর্জীবন লাভ করেছে। যমদূত, বিষ্ণুদূত সবাই এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এগোচ্ছে না কেউ। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পাঠালেন সুদক্ষরাজা রাবণের কাছ থেকে কিছু রাজনীতি শিক্ষার জন্য। কারণ দুই ভাই চোদ্দ বছর বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। রাজনীতি শিক্ষা হয়নি। দেশে ফিরে সিংহাসনে বসতে হবে রাজ্যশাসন করতে হবে। লক্ষ্মণকে দেখে মুমূর্ষু রাবণের পূর্বস্মৃতি ফিরে এল। ভক্তিভাব জাগল মনে। নিজে অপারগ তাই শ্রীরামকে আহ্বান করল শেষ সময়ে তার পদধূলি নেওয়ার জন্য। লক্ষ্মণের মুখে সংবাদ পেয়ে শ্রীরাম এসে দাঁড়ালেন রাবণের সামনে। রাবণ বলল—

—প্রভু, তোমার সঙ্গে বৈরিতা, যুদ্ধ ও মৃত্যু আমার ভবিতব্য, আমার মুক্তি।

রাবণ তখন হাত বাড়িয়ে শ্রীরামের পদধূলি নিয়ে মাথায় দিল। বলল—প্রভু, তুমি রাজপুত্র, দেশে ফিরে রাজা হবে। প্রজা শাসন করবে। মনে রাখবে কোনো শুভকর্ম পরে করবে বলে ফেলে রাখবে না। শুভ কাজ শীঘ্রই করবে—শুভস্য শীঘ্রম্।

বলতে বলতে রাবণের কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। শ্রীরামের শ্রীচরণের দিকে তাকিয়ে ত্রিভুবনজয়ী দশানন রাবণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। দেবতারা অন্তরীক্ষে জয়ধ্বনি করল। বিভীষণ, মন্দোদরীসহ রাক্ষসকুলের রোদনধ্বনিতে আকাশ বাতাস বিষাদিত হলো।

রাবণের মৃত্যুর পর শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ। যার জন্য এত কাণ্ড সেই সীতা কিন্তু এই সংবাদ এখনো জানে না। তাই সীতাকে এই সংবাদ দিতে হনুমানকে পাঠান হলো। লঙ্কার রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে হনুমান। আজ ভয় নেই, হিংসা নেই, উৎকণ্ঠা নেয়। হনুমানকে দেখে আজ রাক্ষসরা প্রণাম করছে। কেউ আবার ভয়ে পালাচ্ছে। অশোককাননে সীতার সামনে উপস্থিত হলো হনুমান। সীতাকে প্রণাম করে রাবণের মৃত্যু সংবাদ শোনাল। জানাল প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এই সংবাদ সীতাকে দেবার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন। রাবণের মৃত্যুসংবাদ শুনে সীতা আনন্দ সাগরে ভাসলেন। বললেন—

পবন নন্দন, তুমি আজ যে সংবাদ আমাকে দিলে তার বিনিময়ে তোমাকে পরিতুষ্ট করতে পারি এমন সম্পদ আমার কাছে নেই। তোমার কাছে আমি যে পরিমাণ ঋণী তোমাকে এক অখণ্ড রাজ্যের অধিকারী করলেও সেই ঋণ শোধ হবে না।

হনুমান বলল—রাজ্য ধনে আমার প্রবৃত্তি নেই। তোমার শ্রীচরণ আমার সব থেকে বড়ো সম্পদ। তবে তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাবণের যে চেড়ীরা এতদিন তোমার উপর অত্যাচার করেছে, দুর্ব্যবহার করেছে তাদের আমি যন্ত্রণা দিয়ে মারব।

হনুমানের কথা শুনে সব চেড়ীরা ভীত হয়ে সীতার চরণে পতিত হলো। বলল—

সীতাঠাকুরানি, হনুমান আমাদের প্রাণ নেবে। তুমি আমাদের রক্ষা কর।

সীতা তখন হনুমানকে বললেন—বৎস হনুমান। তুমি বিচারে পণ্ডিত, ভেবে দেখ আমি যে দুঃখ কষ্ট অপমান সহ্য করেছি তা আমার অদৃষ্টের লিখন। তুমি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হয়েও কেন ওদের মেরে স্ত্রীবধের ভাগী হবে? এই চেড়ীরা যতদিন রাবণের অধীন ছিল রাবণের আদেশে তারা আমার উপর নির্যাতন করত। রাবণ সবংশে মরার পর এরা এখন আমার সেবা করছে।

সীতার আদেশে হনুমান চেড়ীদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকল। সীতা আবার বলল।

—হনুমান, তুমি শ্রীরামকে বলবে এগার মাস এই অশোক বনে চেড়ীদের নির্যাতন সহ অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছি শুধু এই দিনটির অপেক্ষায়। আমার দুঃখের কি অবসান হয়েছে? কবে আমি আবার শ্রীরামের চরণে ঠাঁই পাব?

হনুমান সীতাকে প্রণাম করে শিবিরে গিয়ে শ্রীরামের কাছে সব কথা জানাল। শ্রীরাম তৎক্ষণাৎ বিভীষণকে পাঠাল সীতাকে নিয়ে আসার জন্য। বিভীষণ সরমা সুবর্ণ দোলা নিয়ে অশোকবনে গিয়ে সসম্মানে সীতাকে শ্রীরামের কাছে নিয়ে এল। লক্ষ্মণ বললেন—

হে অগ্রজ, শত্রু নিপাত হয়েছে। চলো আমরা মিত্র বিভীষণের সঙ্গে লঙ্কায় থেকে যাই। লঙ্কায় বিভীষণ কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীব, হনুমান। সুখে থাক অযোধ্যবাসী।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—তা হয় না লক্ষ্মণ ''জননী জন্মভূমিশ্চ



স্বর্গাদপী গরীয়সী।”

শুরু হলো অযোধ্যায় ফেরার প্রস্তুতি। বিভীষণকে লঙ্কার রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হলো বৈদিক নিয়ম মেনে আর্যরীতি অনুসারে। সুগ্রীব বানরসেনাদের আদেশ দিল সেতু পেরিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যেতে। দেবলোক থেকে এল বিচিত্র পুষ্পক বিমান। সেই বিমানে আরোহণ করলেন শ্রীরাম সীতা আর লক্ষ্মণ। সরমা চোখের জলে বিদায় দিল সীতাকে। সমুদ্র লঙ্ঘন করে সবাই উপস্থিত সেতুমূলে। সেতু পেরিয়ে এসেছে লক্ষ লক্ষ বানর সেনা। বিভীষণ, সুগ্রীব, নল, নীল প্রাজ্ঞ জাম্বমান। সর্বাগ্রে হনুমান।

সীতা বললেন—

—প্রভু, কার্য সাধনের জন্য  সমুদ্র বন্ধন করেছ। এখন কার্য শেষ সমুদ্রকে বন্ধনমুক্ত কর। আর এই সেতু থাকলে রাক্ষসরা ভারতভূমিতে এসে উৎপাত করবে। পাতাল থেকে সমুদ্র দেবতা উঠে এসে করজোড়ে শ্রীরামের কাছে বন্ধন মুক্তি প্রার্থনা জানাল। লক্ষ্মণ তখন শ্রীরামের অনুমতি নিয়ে বাণাঘাতে সেতু ভেঙে দিলেন।

শ্রীরামের বাসনা এখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পূজা দিয়ে দেশে ফিরবেন। হনুমানকে পাঠান হলো কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে আসার জন্য। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে হনুমান শিবলিঙ্গ নিয়ে আসছে না। পূজার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে শ্রীরাম সহস্তে এক শিবলিঙ্গ তৈরি করলেন বালি দিয়ে, পূজা করলেন সেই লিঙ্গের। এই সময় হনুমান কৈলাশ থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হলো। হনুমানের সম্মানার্থে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের আনা সেই লিঙ্গ ও প্রতিষ্ঠিত এবং পূজা করেন। সেতুবন্ধে শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত সেই শিবের নাম

হলো রামেশ্বর।

দেবগণ প্রেরিত সেই পুষ্পকরথে বহুজন আরোহণ করতে পারে। শ্রীরাম-সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব, জাম্ববান, নল, নীল সহ অনেক বানরবীর সেই রথের আরোহী। পথে যেতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছা মুনিকে সম্ভাষণ করা। শ্রীরামের ইচ্ছা অনুযায়ী রথ সেখানে নামল। শ্রীরামচন্দ্র মুনির পাদপদ্ম বন্দনা করলেন। মুনি আশীর্বাদ করে বসার জন্য উত্তম আসন দিলেন। শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ উপবেশন করলেন। বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব, নল, নীল, জাম্ববান তপোবনের শোভা দর্শন করতে লাগলেন। শ্রীরাম মুনির কাছ থেকে অযোধ্যার সংবাদ জানলেন। ভরতের সংবাদ নিতে গিয়ে জানলেন ভরত নন্দীগ্রামে অবস্থান করছেন এবং রাজ্যভোগ না করে ঋষির মতো জীবন যাপন করছেন। সিংহাসনের উপর রেশমের বস্ত্র পেতে শ্রীরামের পাদুকা স্থাপন করে নীচে কৃষ্ণসার চর্মের উপর বসে বশিষ্ঠ নারদের পরামর্শে রাজকর্ম পরিচালনা করছেন। ভরত গৃহে ফেরার সময় সেই পাদুকার কাছে অনুমতি নিয়ে তবে গৃহে ফেরেন। মুনির মুখে ভরতের এহেন ভ্রাতৃভক্তির কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র আনন্দিত হলেন, দ্রুত ভরতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাঁর মন আকুলিত হল।

ভরদ্বাজের অনুরোধে শ্রীরাম একরাত্রি সপার্শ্বদ তাঁর আশ্রমে অবস্থান করলেন। ভরদ্বাজ বললেন—

—মুনিগণ কঠোর তপস্যায়ও যাঁর দর্শন পান না সেই মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র আজ তাঁর আশ্রমের অতিথি। তাঁর সঙ্গী স্বয়ং লক্ষ্মী ও শেষনাগ। রুদ্রাবতার হনুমান।

তপোবনে মুনিবর শ্রীরামচন্দ্র পার্ষদবর্গ এবং বানর সেনাদের জন্য যথোপযুক্ত আহার্য ও পানীয়ের আয়োজন করলেন। রজনী প্রভাত হলে শ্রীরাম হনুমানকে বললেন—

—পবননন্দন! তোমাকে এখন দুটি কাজ করতে হবে।

হনুমান বলল—

—আদেশ করেন প্রভু।

—আমার অনুজ ভরত বর্তমানে নন্দীগ্রামে অবস্থান করছে। তাকে আমার আগমন সংবাদ জানিয়ে বলবে অনতিবিলম্বে অযোধ্যায় ফিরে যেতে। আর নন্দীগ্রামে যাওয়ার পথে শৃঙ্গবেরপুরে চণ্ডালরাজ্যে গিয়ে আমার পরম মিত্র গুহককে জানাবে আমি তার দর্শন প্রার্থী।

আজ্ঞা পেয়ে হনুমান তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল। চক্ষুর নিমেষে পৌঁছে গেল শৃঙ্গবেরপুরে চণ্ডাল রাজ্যে। মনুষ্য রূপ ধরে রাজা গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন সংবাদ এবং শ্রীরাম যে তার দর্শনাভিলাষী সেই সংবাদও জানাল। সংবাদ পাওয়া মাত্র গুহক মিত্র সম্ভাষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাচার সংগ্রহ করে চণ্ডাল কটক সহ মিত্র সম্ভাষণে অগ্রসর হলো। নৃত্য করতে করতে চলেছে চণ্ডালের দল। পথে সাক্ষাৎ হলো শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে। অনেক দূর থেকে গুহককে দেখে শ্রীরাম রথ থেকে নেমে গুহককে আলিঙ্গন করলেন। চারদিকে শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি।

বীর হনুমান তখন চলেছে নন্দীগ্রামে ভরতের উদ্দেশে। অনেক গ্রাম-নগর নদ-নদী পেরিয়ে অবশেষে ভরতের আবাস। অন্তরীক্ষ থেকে হনুমান দেখছে মঠ, মন্দির, পান্থশালা, দীঘি সরোবরে সুসজ্জিত, চারপাশে প্রাচীরবেষ্টিত এই নগর যেন দেবভূমি। মধ্যখানে প্রাসাদ, ন্যায়ালয়। সেখানে সিংহাসনে বিচিত্র রেশমের বস্ত্রের উপর শ্রীরামের পাদুকা স্থাপন করে নীচে কৃষ্ণাজিনে বসে আছেন এক দীপ্ত যুবা। অনুমানে ভরতকে চিনতে পারল মারুতি। তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে ভরতের সামনে গিয়ে আত্মপরিচয় দিল হনুমান।

আমি পবননন্দন হনুমান। পূর্বেও আমাদের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের দাস আমি। বহুপুণ্যফলে আজ তোমার দর্শন পেলাম। সমস্ত বিত্ত বৈভব ছেড়ে তোমার যোগীর আচরণ, তপস্বীর বেশ। রাজা হয়েও তুমি রাজ্যভোগী নও। যার প্রতীক্ষায় তুমি এই সুকঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করছ, সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বার্তা দিয়ে তোমার কাছে পাঠালেন। তিনি মাতা সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গতকাল রাত্রিবাস করে অদ্য অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন। প্রভুর ইচ্ছা এই যাত্রায় তুমিও প্রভুর সঙ্গে থাক।

এই বার্তা শুনে ভরত আনন্দে হনুমানকে আলিঙ্গন করে এবং অনেক মহার্ঘ উপহারে ভূষিত করতে থাকে। তখন হনুমান বলল—

ভরত! দান কিংবা উপহারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। প্রভু শ্রীরামের মঙ্গলই আমার একমাত্র কামনা।

হনুমানের এহেন বাক্যে ভরত অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাকে আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে আহ্বান করে সমস্ত বার্তা জানিয়ে যাত্রার আয়োজন করার নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ করে শত্রুঘ্ন ও হনুমান সহ শ্রীরামের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হলেন। কিছু সময় অতিবাহিত হতেই আকাশ মার্গে দেখা গেল সেই হংসচালিত শ্রীরামচন্দ্রের বিমান। ভরত, শত্রুঘ্ন হনুনাকে দেখে শ্রীরামের আদেশে বিমান নেমে এল তাদের সামনে। দীর্ঘদিন কৃচ্ছসাধনের ফলে ভরতের শক্তি নেই রথে আরোহণ করার। হনুমান তাকে কোলে করে রথে তুলেন। দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর চার ভ্রাতার মিলন হলো। সবাই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আনন্দ সাগরে ভাসলেন।

আবার রথ চলল আকাশমার্গে। নীচে বানরসেনাদের

আনন্দোল্লাস কোলাহল। অদূরে অযোধ্যার দেবালয় আর প্রাসাদের চূড়া দেখা যাচ্ছে। বানরদের মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। রথ এসে অবতরণ করল অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে। রথ থেকে একে একে নেমে এলেন শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, বিভীষণ, সুগ্রীব। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমে জননী জন্মভূমির পদধূলি নিয়ে মস্তকে ধারণ করলেন। উচ্চারণ করলেন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' তারপর সবাই একে একে প্রণাম করলেন গুরু, মাতৃমণ্ডলী এবং অন্যান্য গুরুজনদের। বহুদিন পরে অযোধ্যানগরী আনন্দের জোয়ারে ভাসল।

রাজ প্রতিনিধি ভরত, শত্রুঘ্ন, রাজমাতা কৌশল্যা বিশেষ করে কৈকেয়ী আর বিলম্ব করতে রাজি নন। রাজগুরু বশিষ্ঠদেবকে বললেন অতি দ্রুত শ্রীরামকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে। পরদিন শুভক্ষণ পাওয়া গেল। তাই পরদিনই অভিষেক। সাতশত নদীর জল আনার দায়িত্ব নিল সুগ্রীব। সাতশত সুবর্ণ কলসী নিয়ে বানরকটক নিয়ে চলল সাতশত নদীর জল আনার জন্য। আর একা হনুমান চলল সমুদ্রের জল আনতে। যথা সময়ে সমুদ্র আর সাত শত নদীর জল নিয়ে উপস্থিত বানর কটকেরা। মধুমাসে শুক্লপক্ষে পূনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হলো।

কিন্নর-কিন্নরী, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীদের মধুর নৃত্যগীতে মুখরিত হল অযোধ্যাপুরী। প্রজারা আনন্দের জোয়ারে ভাসল। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষণা করলেন আজ থেকে অযোধ্যা নগরী রক্ষার ভার থাকবে হনুমানের উপর। নগরীর মধ্যে নির্মিত হবে হনুমানের পুরী 'হনুমানগড়ি'। নর-বানর এক সঙ্গে হনুমানের জয়ধ্বনি দিল।

একই সঙ্গে অভিষেক হলো লঙ্কেশ্বর বিভীষণ এবং কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারা শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকে যোগ দিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে এলেন মুনি ঋষিরা। দেবতারা নানা অলঙ্কারে শ্রীরামচন্দ্রকে ভূষিত করলেন। ব্রাহ্মণদের ভূমি গ্রাম দিয়ে তুষ্ট করলেন। অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে বসলেন শ্রীরামচন্দ্র কোনো প্রার্থী বিমুখ হলো না। শ্রীরামের গলার স্বর্ণপদ্ম মালা খুলে পরানো হলো সুগ্রীবের গলায়। অঙ্গদকেও অপূর্ব ভূষণে ভূষিত করলেন। সমস্ত বানরসেনা উপহারে ভূষিত হলো। একমাত্র কোনো উপহার না পেয়ে অভিমানে নীরব হল হনুমান। বাক্‌রুদ্ধ হনুমান ভাবছে প্রভু সবাইকে তুষ্ট করলেন কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করলেন কেন? সীতামাতা এতক্ষণ কাউকে কোনো উপহার দেননি, এবার নিজের কণ্ঠহার খুলে হাতে নিলেন। শ্রীরামের মুখে এবার স্নিগ্ধ হাসি। হনুমানকে ইশারায় ডাকলেন সীতা দেবী। ছুটে এল হনুমান, সেই অমূল্য রত্নহার সীতা হনুমানের গলায় পরিয়ে দিলেন। হার পেয়ে হনুমান সীতার চরণে প্রণাম করে। সীতা বললেন—

—হে সংকটমোচন। যতকাল পৃথিবী থাকবে ততকাল তুমিও রোগ শোকহীন হয়ে জীবিত থাকবে। যতকাল শ্রীরামনাম পৃথিবীতে ঘোষিত হবে, ততকাল তুমিও অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে, এই বর তোমায় দিলাম।

হনুমান রত্নহারটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখল তারপর হারটি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দিল। সভার লোকজন অবাক হয়ে গেল হনুমানের কাণ্ড দেখে। লক্ষ্মণ কূপিত হয়ে বললেন—

—মারুতির গলায় এই রত্নহার দেওয়াই ভুল হয়েছে। বানরজাতি এই রত্নহারের মূল্য কী বুঝবে?

শ্রীরাম ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন। এর বৃত্তান্ত হনুমানই ভালো জানে তাকে জিজ্ঞাসা কর?

হনুমান বলল—

—বহুমূল্য ভেবে এই হার আমি গ্রহণ করেছিলাম। বিচার করে দেখলাম এই হারে শ্রীরাম নাম নেই। শ্রীরামনাম হীন ধন পরিত্যাগ করাই ভালো।

লক্ষ্মণ বললেন—

—হে পবননন্দন হনুমান। তোমার দেহেওতো রামনাম কোথাও দেখছি না। তবে কেন মিথ্য এই দেহ ধারণ করে আছ? এই কলেবর ত্যাগ কর।

এই কথা শুনে ক্ষুব্ধ হনুমান আপন নখের দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ করল। সবাই অবাক হয়ে দেখল অস্থিময় লক্ষ লক্ষ রামনাম লেখা।



Shree Cement

SHREE
जंग रोधक
CEMENT

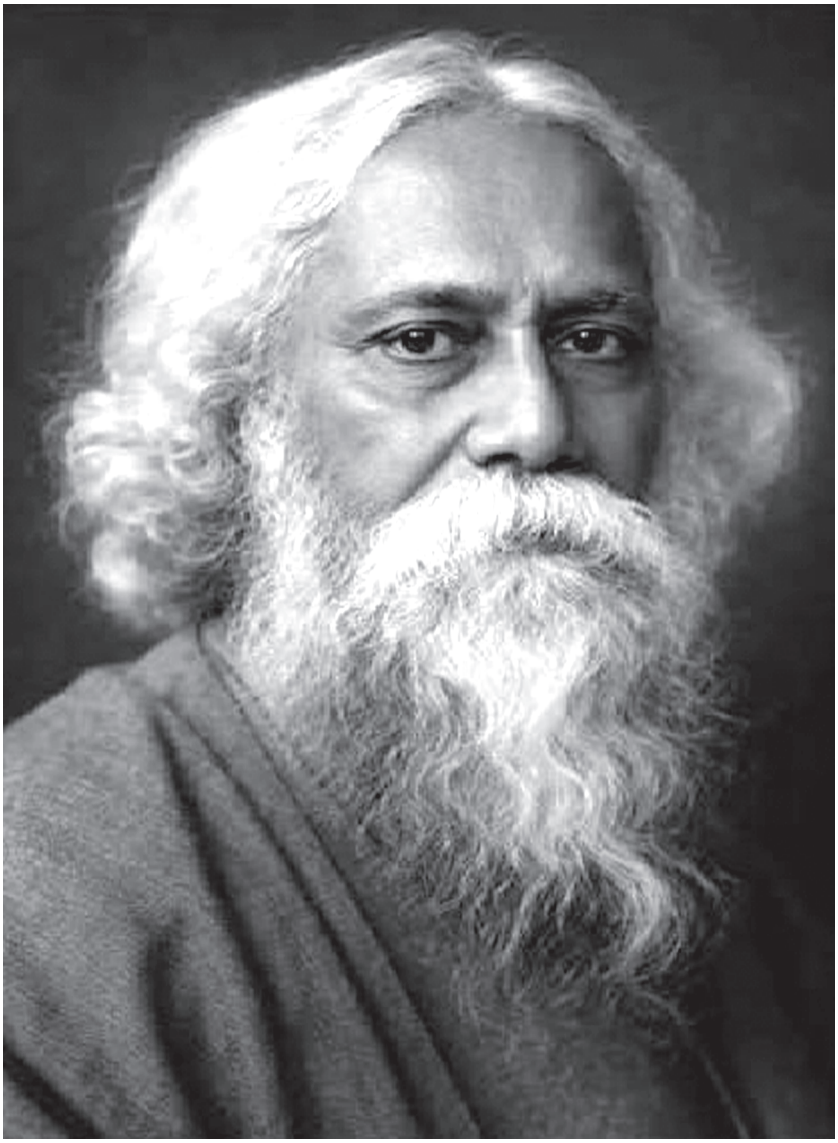
घर की ढाल,
सालों साल




**Delhi Corporate & Marketing Office:** Epitome, Building 5, 9th Floor, DLF Cyber City, Block-B, Gurugram - 122002.
Tel: +91-124-4699200

**Kolkata Corporate Office:** 21, Strand Road, Kolkata - 700001. | Tel: +91-33-2230 9601-04

**www.shreecement.com**



# রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা

## মানবমুক্তির এক মহাকাব্য

আশিস গিরি

ভারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁদের জীবন ও কর্ম কেবল তাঁদের সময়কে নয়, পরবর্তী বহু প্রজন্মকেও প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে। তিনি শুধু কবি নন, শুধু সাহিত্যিক নন, শুধু শিক্ষাবিদ বা দার্শনিকও নন; তিনি ছিলেন ভারতীয় আত্মার এক আধুনিক চিন্তাবিদ। তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষাচিন্তা, সমাজভাবনা ও বিশ্বমানবতা, সবকিছুর গভীরে প্রবাহিত হয়েছে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক চেতনা, যার উৎস ভারতীয় উপনিষদ।

রবীন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদ কোনো ধর্মীয় শাস্ত্রের নামমাত্র ছিল না; এটি ছিল মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের পথ, জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাখ্যা এবং স্বাধীনতার এক গভীর দর্শন। তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মের মধ্যে উপনিষদের ‘একত্ব’, ‘আনন্দ’, ‘মুক্তি’ এবং ‘বিশ্বচেতনা’-র ধারণা নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই কারণেই শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ইতিহাস কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাস নয়; এটি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদপ্রসূত মানবমুক্তির দর্শনের বাস্তব রূপ।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে উপনিষদের স্থান অনন্য। বেদসংহিতার আচারভিত্তিক ধর্মচিন্তার পর উপনিষদ মানুষের মনকে বহির্জগত থেকে অন্তর্জগতের দিকে নিয়ে যায়। উপনিষদের মূল প্রশ্ন— আমি কে? বিশ্ব কী? মানুষ ও বিশ্বজগতের সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে উপনিষদ আবিষ্কার করে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য।

‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই সেই।

‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম।

এই ঘোষণাগুলি শুধু ধর্মীয় বাক্য নয়—এগুলি মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা

ও অসীম সম্ভাবনার ঘোষণা।

উপনিষদ মানুষকে ভয় থেকে মুক্ত করে। সেখানে কোনো সংকীর্ণতা নেই, কোনো লিঙ্গগত অহংকার নেই, কোনো সংকীর্ণ গোঁড়ামি নেই। আছে মুক্ত বুদ্ধি, জিজ্ঞাসা এবং আত্ম-উপলব্ধির সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ এই উপনিষদীয় চেতনাকে আধুনিক যুগে নতুন ভাষা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনার উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মমতের অন্যতম প্রধান নেতা এবং উপনিষদের নিবেদিত পাঠক। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র ছিল উপনিষদ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করতে হবে।

ছোটোবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছে উপনিষদের মন্ত্র শুনেছেন। হিমালয় ভ্রমণে পিতার সঙ্গে কাটানো সময় তাঁর মানসগঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন যে উপনিষদের মন্ত্র তাঁর কাছে কেবল ধর্মীয় বাণী নয়—এগুলি হলো বিশ্বজগৎকে নতুনভাবে দেখার জানালা।

উপনিষদ তাঁকে শিখিয়েছিল, মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষ মানুষের থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়। এই উপলব্ধিই পরবর্তীকালে তাঁর মানবতার ভিত্তি হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা মূলত প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য গড়ে উঠেছিল। সেখানে জ্ঞানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ছিল পরীক্ষার।

রবীন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, এই শিক্ষা মানুষের কল্পনাশক্তিকে হত্যা করে। শিশুর মনকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যান্ত্রিক করে তোলে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, ''বিদ্যালয় যেন খাঁচা, আর ছাত্র যেন খাঁচার পাখি।''

এই তীব্র অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর বিকল্প শিক্ষাচিন্তার জন্ম। তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছিলেন যেখানে, জ্ঞান আনন্দময় হবে, প্রকৃতি শিক্ষার অংশ হবে, শিল্প ও সাহিত্য পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রে থাকবে, শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক হবে মানবিক, শিক্ষা মানুষের আত্মবিকাশের উপায় হবে।

এই স্বপ্ন থেকেই জন্ম নেয় শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী হলো প্রকৃতির কোলে এক শিক্ষাতীর্থ। ১৯০১ সালে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রহ্মচার্যশ্রম। এই বিদ্যালয়ের মূল ধারণা ছিল প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমশিক্ষার আধুনিক রূপ। গাছতলায় ক্লাস, খোলা আকাশের নীচে পাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত, শরীরচর্চা, শ্রমের মর্যাদা, সব মিলিয়ে এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আজকের শিক্ষাবিজ্ঞানে 'Experiential Learning' বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার যে ধারণা গুরুত্ব পেয়েছে, শান্তিনিকেতন তার অগ্রদূত।

উপনিষদের অন্যতম মূল শিক্ষা হলো ঐক্য। বিশ্বজগতের সবকিছু এক মহাসত্তার অংশ। রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কাছে গাছ, নদী, আকাশ, পাখি, সবই ছিল জীবন্ত। এই কারণেই তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কখনও পটভূমি না হয়ে থেকে চরিত্র হয়ে উঠেছে।

তিনি প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেছেন, আবার মানুষের আত্মীয়তাও খুঁজে পেয়েছেন। আজকের পরিবেশ সংকটের যুগে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ তিনি মানুষকে কখনোই প্রকৃতির প্রভু হিসেবে দেখেননি বরং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছেন।

উপনিষদে বলা হয়েছে, ''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'' আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছুর জন্ম।

রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কাছে আনন্দ মানে কেবলমাত্র ভোগ নয়। আনন্দ মানে বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলন। তাই তিনি লিখেছেন, ''আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।''

এই আনন্দ ব্যক্তিগত সুখের সীমা ছাড়িয়ে এক মহাজাগতিক অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতবিতান সবখানেই এই আনন্দতত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ছিল বেদনায় পূর্ণ। স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, কন্যা রেণুকা, পুত্র শমীন্দ্রনাথ, একাধিক প্রিয়জনকে তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই শোক তাঁকে ধ্বংস করেনি। উপনিষদীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে শিখিয়েছিল যে মৃত্যু সমাপ্তি নয়, জীবন বৃহত্তর এক সত্তার অংশ।

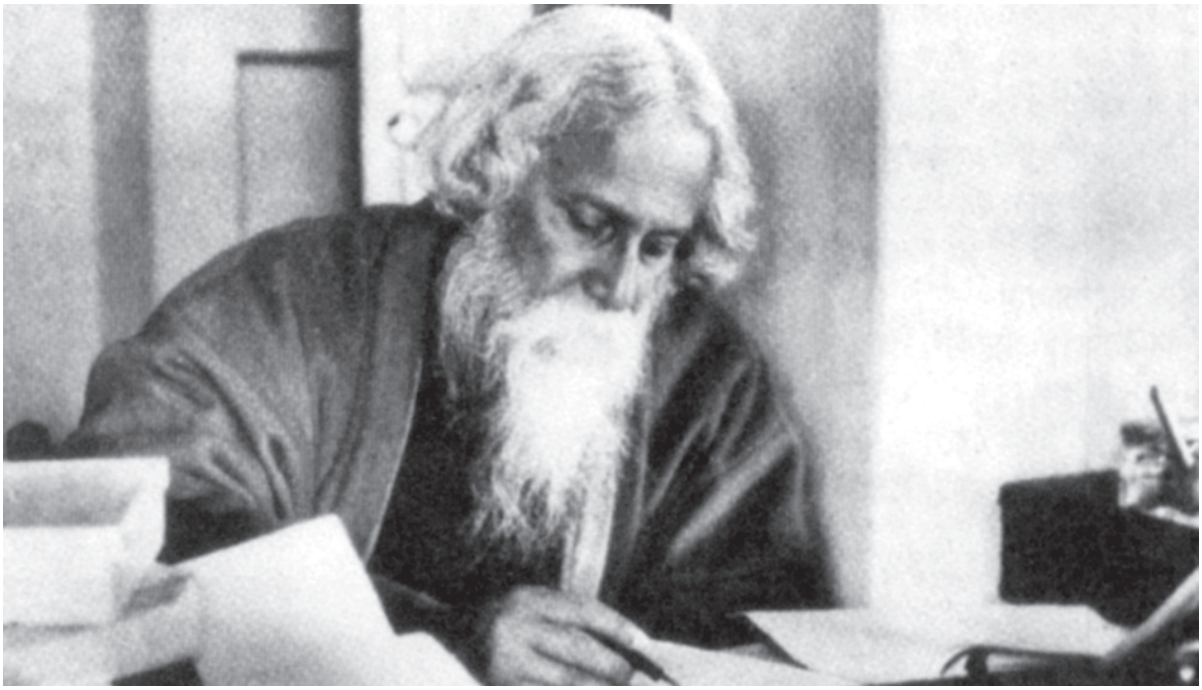
এই কারণেই তাঁর শোক কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে, আর কাব্য মানবজাতির সম্পদে পরিণত হয়েছে। গীতাঞ্জলির গভীর আধ্যাত্মিকতা এই অভিজ্ঞতারই ফসল।

শিল্প, সঙ্গীত ও মুক্তির সাধনা রবীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প বিলাসিতা ছিল না। এটি ছিল আত্মবিকাশের পথ। উপনিষদে সত্য, শিব ও সুন্দরকে একই সত্তার ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে তিনি দেখেছেন। এই কারণেই শান্তিনিকেতনে শিল্পকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, নাটক সবকিছুই মানুষের সংবেদনশীলতা গড়ে তোলার মাধ্যম। ভারতীয় আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসে শান্তিনিকেতনের অবদান তাই অনন্য।

**বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা :** দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার সন্ধান শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে আরও বৃহত্তর স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবল একটি বিদ্যালয় গড়ে তুললেই তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ হবে না। তিনি এমন একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যেখানে পৃথিবীর নানা সংস্কৃতি, ভাষা, দর্শন ও জ্ঞানধারা মিলিত হবে। এই স্বপ্ন থেকেই ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর মূলমন্ত্র ছিল, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'।

অর্থাৎ, 'যেখানে সমগ্র বিশ্ব এক নীড়ে পরিণত হয়।' এই মন্ত্রের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপনিষদীয় চেতনার গভীরতম প্রকাশ নিহিত।



উপনিষদ মানুষকে বিভাজনের বদলে ঐক্যের শিক্ষা দেয়। সেখানে মানুষকে কোনো বিশেষ সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ করা হয় না। বরং মানুষকে দেখা হয় বিশ্বসত্তার অংশ হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আধুনিক সভ্যতার অন্যতম সংকট হলো বিচ্ছিন্নতা। মানুষ লিঙ্গভেদে বিভক্ত, ধর্মে বিভক্ত, অর্থনৈতিক স্বার্থে বিভক্ত। এই বিভাজন মানবসভ্যতাকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি বিশ্বভারতীর মাধ্যমে এমন একটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে সংস্কৃতির সংঘর্ষের পরিবর্তে, সংলাপ হবে; আধিপত্যের বদলে, আদান-প্রদান থাকবে। এই ভাবনা ছিল তাঁর সময়ের তুলনায় অনন্য প্রগতিশীল।

'সাধনা' গ্রন্থে উপনিষদীয় দর্শনের ব্যাখ্যা অসাধারণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা বোঝার জন্য তাঁর ইংরেজি বক্তৃতাসংকলন Sadhana- The Realisation of Life বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি হিসেবে উপনিষদের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধানত প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভারতীয় দর্শন প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

তিনি লিখেছিলেন যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার স্বার্থপর সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; তার প্রকৃত পরিচয় বৃহত্তর বিশ্বমানবতার মধ্যে নিহিত। এই চিন্তা উপনিষদের সেই বাণীরই আধুনিক ব্যাখ্যা যেখানে বলা হয়েছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্ম।

রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বাণীর অর্থ ছিল, মানুষে মানুষে বিভেদ শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম। মানবজাতির গভীরে রয়েছে এক অভিন্ন চেতনা। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কেবল কাব্যগ্রন্থ নয়; এটি এক আধ্যাত্মিক যাত্রার দলিল।

এখানে কবি বারবার সীমিত সত্তা থেকে অসীমের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মের মিলনের যে সাধনার কথা বলা হয়েছে, গীতাঞ্জলিতে তা কাব্যের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কবির ঈশ্বর কোনো অলৌকিক সিংহাসনে আসীন নন।

তিনি মানুষের শ্রমে, দুঃখে, প্রেমে, আনন্দে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে উপস্থিত। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ।" এখানে ঈশ্বর মন্দিরের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানবজীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এটি উপনিষদের সর্বব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্বের এক আধুনিক মানবতার রূপ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার প্রধান বিষয় ছিল, শুধুমাত্র আচার পালনে কিছু হবে না, উপলব্ধি করতে হবে। উপনিষদও একই শিক্ষা দেয়। সত্যকে উপলব্ধি করতে হয় অন্তরের মাধ্যমে; কেবল আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়। এই কারণেই শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহে কোনো মূর্তি ছিল না। সেখানে আলো, নীরবতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এক সর্বজনীন আধ্যাত্মিকতার চর্চা করা হতো।

জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেশপ্রেমিক, কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তার সমর্থক ছিলেন না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁকে দেখিয়েছিল যে উগ্র ন্যাশনালিজম মানবসভ্যতার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতামালা Nationalism-এ তিনি এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানবতার ঊর্ধ্বে নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনেও উপনিষদের বিশ্বমানবতার আদর্শ কাজ

করেছে। উপনিষদ মানুষকে সীমিত পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠতে শেখায়। রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষাকে আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় প্রয়োগ করেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের সৃজনশীল সংলাপের মাধ্যমে তিনি বিশেষত্ব স্থাপন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি বড়ো অবদান হলো তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি কখনো অন্ধ জাতীয়তার সমর্থক হননি। আবার পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণও করেননি।

তিনি বিশ্বাস করতেন, সভ্যতার বিকাশ ঘটে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে। এই কারণে বিশ্বভারতীতে চীনা, জাপানি, পারস্য, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জ্ঞানধারার সমন্বিত অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

চীনা ভবন, হিন্দি ভবন, বিদ্যা ভবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আদর্শের বাস্তব রূপ। এটি ছিল এক ধরনের বৌদ্ধিক বিশ্বায়ন, যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সম্মান। শ্রীনিকেতন স্থাপনা ছিল মানবমুক্তির এক সামাজিক প্রকল্প। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উন্নতি দিয়ে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভারতের প্রাণ গ্রামে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য ছিল—কৃষির উন্নয়ন, গ্রামীণ শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতা। স্বাস্থ্যসেবা ও কারুশিল্পের প্রসার এবং সমবায় আন্দোলন। এখানে উপনিষদের মানবমুক্তির ধারণা সামাজিক রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মুক্তি কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি ছিল না; অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির উপায় হিসেবে ছিল।

রবীন্দ্রনাথের উৎসব পালনের দর্শন মহামিলনের তত্ত্ব। জীবন ও প্রকৃতির মিলন। শান্তিনিকেতনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল উৎসব।

পৌষমেলা, বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বৃক্ষরোপণ উৎসব। এসব কেবল অনুষ্ঠান ছিল না। এসব ছিল শিক্ষার অংশ।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, উৎসব মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করে। উপনিষদের আনন্দতত্ত্ব এখানে জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে।

মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে এবং শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করে। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক পরিবেশচেতনা আজকের প্রধান আলোচ্য। আজ পৃথিবী পরিবেশ সংকটে আক্রান্ত। জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, এসব মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু আগে এই বিপদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতিকে কেবল সম্পদ হিসেবে দেখেননি। তিনি প্রকৃতিকে আত্মীয় হিসেবে দেখেছিলেন।

বৃক্ষরোপণ উৎসবের মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই অর্থে তিনি আধুনিক পরিবেশদর্শনের একজন অগ্রদূত।

রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও নন্দনতত্ত্বও ছিল অনন্য চিন্তার ফসল। সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মুক্তি দেখেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্য কোনো বিলাসিতার বস্তু নয়। এটি মানুষের আত্মবিকাশের অপরিহার্য্য উপাদান।

উপনিষদের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' ধারণা তাঁর শিল্পচিন্তার ভিত্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন, সৌন্দর্য মানুষের আত্মাকে প্রসারিত করে। সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে। এই কারণেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকলাকে কেন্দ্রীয় স্থান দেওয়া হয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শান্তিনিকেতনের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষ তাৎপর্যবাহী। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের আনন্দের চেয়ে সাফল্যের চাপে বেশি আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছে। আজ বিশ্বজুড়ে যে ধারণাগুলি গুরুত্ব পাচ্ছে সেগুলি হলো, Holistic Education– Experiential Learning– Environmental Education– Liberal Arts Interdisciplinary Studies.

এসবের বীজ রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই রোপণ করেছিলেন। উপনিষদীয় মুক্তির ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথের গভীরে। উপনিষদে মুক্তি মানে কেবল মৃত্যুর পরের অবস্থা নয়। মুক্তি মানে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া। সংকীর্ণতা থেকে অসীমের দিকে যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে মানবিক ও সামাজিক অর্থ দিয়েছেন। তাঁর কাছে মুক্তি মানে, 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে' ভয় থেকে মুক্তি, অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্তি, অজ্ঞতা থেকে মুক্তি, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি, বিভাজন থেকে মুক্তি।

এই কারণেই তাঁর বিখ্যাত প্রার্থনা, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' ছিল, উপনিষদীয় মুক্তিরই আধুনিক কাব্যিক রূপ।

রবীন্দ্রনাথ কেন আজও প্রাসঙ্গিক তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা কোনো অতীতমুখী দর্শন নয়। এটি ভবিষ্যতের দর্শন। তিনি এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, শিক্ষা হবে মুক্তির পথ, সংস্কৃতি হবে সংলাপের মাধ্যম এবং মানবতা হবে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ।

আজকের পৃথিবীতে যখন যুদ্ধ, বিভাজন, পরিবেশ সংকট ও সাংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।

তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মানুষ কেবল অর্থনৈতিক সত্তা নয়; সে সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাও। শান্তিনিকেতন তাই কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়; এটি এক জীবন্ত দর্শন। বিশ্বভারতী কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়; এটি বিশ্বমানবতার এক অনন্ত আহ্বান।

আর রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন কবি নন; তিনি ভারতীয় উপনিষদীয় চেতনার আধুনিকতম ব্যাখ্যাকারী ক্রান্তদর্শী, যিনি মানুষের মধ্যে অসীমের সন্ধান করেছিলেন এবং সেই সন্ধানকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানবমুক্তির এক মহাকাব্যে রূপ দিয়েছিলেন।

তাঁর এই উত্তরাধিকার যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে, ততদিন প্রাসঙ্গিক থাকবে। কারণ উপনিষদের মতোই রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখান, মানবতাই মানুষের চূড়ান্ত পরিচয়। □



# শকুন্তলা

মৌ চৌধুরী

ঘুমের ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে জেগে উঠল পূর্বা। বুকের মাঝে চাপচাপ ভাব একটু যেন শ্বাসকষ্ট আর বাঁ দিকের কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের দিকটাতে ব্যথা ভাব। কান মাথা গরম হয়ে উঠছে। মাথাটা একটু টলোমলো করছে। আধো ঘুম চোখে ও বুঝতে পারছে না রাত কত হবে। পুরো ঘরজুড়ে তার একক জীবনের মতোই অন্ধকার।

হঠাৎ করে এভাবে ঘুম ভাঙার কারণে প্রথম দিকে কিছুটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল পূর্বা। তারপর মানসিক জড়তা কিছুটা কাটিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে ঘরের অল্প আলোতে শরীরে অস্বস্তি নিয়েই বাথরুমে গেল। নিজের মনেই একবার ভাবল অনেকটা জীবন তো একাই কাটিয়ে দিল। এখন ভয় পেলে চলবে কেন। চোখে মুখে জল দিতে দিতে ভাবল গতরাতে শুতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল কয়েকটা তেলেভাজা খেয়েছিল। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত ছাড়িয়ে যাওয়ার বয়েসে এসে এখন অনেক ঘটনা, অনেক কথা, পুরনো দিনের কত বিষয়, কত স্মৃতি ভাবলে মনের ভেতর গভীর প্রভাব ফেলে। খুবই অস্বস্তিকর মনে হয়। বেশ কিছুদিন থেকে এই অনুভূতিটা হচ্ছে, পুরনো দিনের কথা মনে পড়া। সেই ছোট্টবেলার হারিয়ে আসা দিন থেকে জীবন মরণ লড়াই করে ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছে ওকে। একে একে সব কিছুই জীবন্ত জলছবি হয়ে হয়ে বুকে জমা হয়ে আছে। সেইগুলোই যেন ফুটে উঠছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় বসল পূর্বা। হঠাৎই মনে পড়ল একবার এক সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন,যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে বা ক্ষতি করার চেষ্টা করে তার নিজের ক্ষতি একশোগুণ বেশি হয়। কাজেই কখনই কারও ক্ষতি করতে নেই। বরং অন্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করলে নিজের সুখ বাড়ে। কথাগুলো খুব মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে ওর।

পূর্বা তো জেনেবুঝে সুযোগ পেলেই অকারণে অন্যের ক্ষতি করে এসেছে। অন্যের অনিষ্টতে নিজের প্রাপ্তি শূন্য হলেও তার অসুখী জীবন, না পাওয়া জীবনের প্রতিশোধ যেন এভাবেই নিতে চেয়েছে। যেন নিজে সুখ পায়নি তাই অন্যের সুখ তার কাছে অসহনীয়। পূর্বা এখন এই নির্জন রাত গভীরে একাকী কিছুটা অসুস্থ শরীর নিয়ে আবারও ভাবতে থাকে এ কেমন মানসিক দ্বন্দ্ব, মানসিক যন্ত্রণা তার।

কত বন্ধু আত্মীয় স্বজনের প্রতিবেশীর সহকর্মীর অনিষ্ট করেছে তার হিসাব নিজের কাছে নেই। খুব পরিকল্পনা করে নিষ্ঠুর মন নিয়ে অপরের ক্ষতি করেছে। অথচ যাদের ক্ষতি ও করেছে তারা প্রায় সবাই ওকে বিশ্বাস করেছিল, আস্থা রেখেছিল। কেউ ভাবতেই পারত না মিষ্টি ও আন্তরিক আচরণের এই মেয়েটির কাছ থেকে এত বড় আঘাত আসতে পারে। তবে ও সেভাবে কাউকে আর্থিক প্রতারণা করে নিজের ব্যাগ ভর্তি করেছে এমনটা নয়। মিথ্যে অভিনয় করে অনেকের সংসার ভেঙেছে, প্রেমের সম্পর্ক নষ্ট করেছে, প্রতিবেশী, আত্মীয়, বন্ধুদের ভেতর বিরোধ বাঁধিয়ে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করছে। অথচ প্রায় কেউ ওর ভূমিকা বুঝতেই পারেনি। মাঝেমাঝে কখনও পূর্বার মনে হয় কেন ও এমন করে। কখনও ভাবে আস্ত একটা শয়তান ওকে বশ করেছে। সেই শয়তানটা ও নিজে। সেই কারণেই হয়ত ওর ভেতর কোনও অনুশোচনা নেই। নিজেই ভাবে এ কেমন মানসিকতা ওর। নিজেকে শুধরে ফিরিয়ে আনে না বরং এরপর কার কীভাবে অকল্যাণ করবে সেই কথাই ভাবে। হয়তো পরিকল্পনাও করে।

পূর্বার চেহারা একটা সময় বেশ সুন্দর ছিল। বয়েসের ছাপ এলেও সেই সৌন্দর্য এখনও অনেকটাই আছে। চোখে মুখে কোমলতার ছাপ, খুব গুছিয়ে ধীরে ধীরে বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে। পরকে ভালোবাসার অভিনয়টা ভালোই করে। প্রায় সবাই তাড়াতাড়ি ওকে বিশ্বাস করে ফেলে, আস্থা রাখে।

পূর্বা যৌবনের প্রারম্ভে একবার নিজেও ঠকে গিয়েছিল প্রতারণার ফাঁদে পড়েছিল। তারপর থেকে যেন সে আরও বেশি নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছিল। সত্যিকারের ভালোবাসাগুলোকে বুঝতেই পারেনি। স্বর্গের মাতৃস্নেহহীন অপ্সরা যেমন তাদের সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পর দায়হীন হয়ে ফেলে রাখত। সন্তানদের প্রতি কোনও স্নেহবন্ধন কাজ করে না। অনেকটা যেন পূর্বার জীবনের সঙ্গে তার মিল আছে। অপ্সরা মেনকা তার সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে গাছের তলায় ফেলে রেখেছিল। আকাশে উড়ন্ত পাখিরা সেই শিশুকে দেখে নেমে এসে পাখা বিস্তার করে রক্ষা করেছিল। পরে ঋষি কন্ব ও ঋষিপত্নী গৌতমী তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের সন্তান হিসেবে পালন করেছিল। নাম রেখেছিল শকুন্তলা। ঠিক একই ভাবে মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা পূর্বা অনাদরে মামারবাড়িতে বেড়ে উঠেছিল। পূর্বা ওর দিদার কাছে শকুন্তলার গল্প শুনতে শুনতে নিজের মনেই প্রশ্ন করত, নিজের মা বাবা ছাড়া সে কীভাবে বড় হলো।

মা বাবার আদর স্নেহ মমতা কী পূর্বার জানা তো দূরের কথা, সারা জীবনে কতবার তাদের দেখেছে বলে দিতে পারে। ওর মা ছোটখাট একটা সরকারি চাকরি করত। আর বাবার ছিল মাঝারি মাপের ব্যবসা। তাদের দু'জনকেই কাজের পেছনেই সময় অনেক দিতে হতো। সারাদিনের ক্লান্তিতে শিশু পূর্বাকে দেখার সময়ই ছিল না। শিশু পূর্বার যত্ন হবে তাই ভেবে ওকে মামারবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিদা খুশি মনেই ওকে বুকে নিয়েছিল। দুই মামাই স্নেহপূর্ণ আদর দিয়েছিল। কিন্তু দুই মামি প্রথম



থেকেই তাকে অবাঞ্ছিত করে রেখেছিল।

পূর্বাকে বোঝানো হয়েছিল একটু বড় হলেই ওকে মা বাবা কাছে নিয়ে যাবে। মা বাবার জন্য মন হাহাকারের ভেতরেই জানল ওর একটা ভাই হয়েছে। দুই ছেলে-মেয়েকে দেখাশোনা করা সম্ভব নয় তাই পূর্বাকে মামার বাড়িতেই থাকতে হবে। একটু বড় হতেই বুঝতে পারল অনাদর অবহেলার মধ্যেই ওকে দিন কাটাতে হবে। মামার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ওর তফাত মামিরা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। বাড়ির সব কাজ সেরে স্কুলে যেতে হয়েছে। অনেকদিন ঠিক মতো খাবার জোটেনি। সারাদিনের কাজের পরিশ্রমে সন্ধ্যার পর ঘুমিয়ে পড়লে রাতের খাবার জুটত না। কেবল রাতে কেন, বহু দিন না খেয়েই কাটাতে হয়েছে।

ওর প্রায় সমবয়সি মামাতো বোন তৃণার সঙ্গে একটা সুক্ষ্ম লড়াই চলেছে জীবনভর। তৃণা কথায় কথায় পূর্বার নামে তার মাকে মিথ্যে নালিশ জানাত। চুলের মুঠি ধরে মারত। পড়ার বই ছিঁড়ে ফেলত। যদিও সবটা না জেনেই মামি পূর্বার নামেই মামার কান ভারী করত। এরজন্য বকা মার জুটেছে ওর কপালে। অনাদরে অবহেলায় মা-বাবার ওপর অভিমানে চোখের জল নিজে থেকেই গড়িয়ে আসত পূর্বার। সব মিলিয়ে না পাওয়ার হতাশা, অনাদর, অর্ধাহার ক্রমেই হিংস্র করে তুলছিল পূর্বাকে। একদিন ফাঁক পেয়ে তৃণাকে মাটিতে ফেলে প্রচণ্ড মেরেছিল। আঁচড়ে খামচে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। জিঘাংসার প্রতিরূপ মনে হয় সেইদিন থেকে শুরু ওর জীবনে। খেলার মাঠে একা পেয়ে প্রথমে তৃণাকে লাথি দেখায়, থাপ্পর দেখায়। তৃণা রেগে গিয়ে পূর্বাকে মারতে থাকে এমনই সুযোগ খুঁজছিল ও। তারপর মাটিতে ফেলে প্রচণ্ড মার মারে তৃণাকে। দূর থেকে অন্য বন্ধুরা ছুটে আসার আগেই তৃণা ইচ্ছা করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। সবাই দেখতে পায় তৃণা পূর্বার বুকের ওপর চেপে বসে কিল চড় ঘুষি মেরেই চলেছে। পূর্বা কোনও প্রতিরোধ করছে না কেবলই কাঁদছে। সকলের চোখে ধরা পড়ে পূর্বা বিনা কারণে মার খাচ্ছে। সেদিন সকলেই তৃণাকে দোষারোপ করেছিল। তবে বড়মামি বিশ্বাস করতে চায়নি। মামিদের প্ররোচনায় পূর্বাকে ওর মায়ের কাছে রেখে আসে মামা। দিদাও আর রোজকার অশান্তি নিয়ে পেরে উঠছিল না।

দোষ করেও মিথ্যে অভিনয় করে কী করে পার পাওয়া যায় সেই ঘটনা থেকেই শিখতে শুরু করেছিল পূর্বা। বাড়িতে এসেও খুব ভালো ছিল তা নয়। এখানে ভাইকে নিয়ে মা-বাবা ব্যস্ত। ভাইয়ের আদর বেশি। ভাইকে দেখাশোনা আর বাড়িতে কাজের জন্য পারিচারিকা রাখা হয়েছিল। রাগে হিংসায় পূর্বা সুযোগ পেলেই ভাইয়ের জন্য রাখা দুধ খেয়ে নিত, রান্নায় লঙ্কা নুন বেশি দিয়ে দিত। ভাইকে চিমটি দেওয়া, মারা তো ছিলই। অফিস থেকে এসে মা সব শুনে পূর্বাকে একচোট মারত, রাগারাগি করত। এরপর

বাবা এলে আরেক প্রস্থ মারধোর চলত। পূর্বাকে নিয়ে অশান্তি চলতই। বাবা প্রায়ই পূর্বাকে শুনিয়ে মাকে বলত এই জঞ্জাল আপদটাকে ঘরে না আনলে এত অশান্তি হতোই না। কোন ঘরে জন্ম কে জানে। মা কাঁদতে কাঁদতে বলত তখন কি আর জানতাম। পূর্বা মনে আঘাত পেয়েছিল এসব শুনে।

কিছুটা বড় হওয়ার পর পূর্বা বুঝতে পারল ওর মা, বাবা, ভাইয়ের সঙ্গে চেহারার মিল যেন খুঁজে পাচ্ছে না। মায়ের কথা শুনে ওর ভাবনা এসেছিল পূর্বা কি তাদের সন্তান নয়? কুড়িয়ে পাওয়া নাকি কোনও জায়গা থেকে আনা? ভাইয়ের প্রতি আক্রোশ বেড়েই চলছিল। সুযোগ বুঝে একদিন ভাইকে খুব মেরেছিল, চোখের নীচে আঁচেড় দিয়েছিল। সেইদিন মা ওকে খুব মেরেছিল। ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। একটিও কথা বলেনি পূর্বা, চোখে জলও আসেনি। সেই ছোট্ট জীবনে এত কঠোর আগে হয়নি পূর্বা।

সব শুনে ছোট মাসি পূর্বাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। মাসির কোনও সন্তান ছিল না। মাসি মেসো দুজনেই চাকরি করত হাসপাতালে। বাড়িতে মেসোর বয়স্ক মা-বাবা ছিলেন। পাশাপাশি ছিলেন মাসির এক কিছুটা বয়স্ক অবিবাহিতা ননদ। তিনি সকালে একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন। বেলায় ফিরে এসে সংসারের অনেক কাজই সামলে দিতেন। পূর্বাকে খুবই ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু পূর্বার মাথায় যে কী খেয়াল চাপল মাসির বাড়িতে এসেও কাউকে শান্তিতে থাকতে দিতে চাইত না। জুতো লুকিয়ে ফেলা, মাসির ননদের পেন বই সরিয়ে ফেলা। মাসির শ্বশুরের ওষুধ লুকিয়ে ফেলা। খাবারে নুন মিশিয়ে দেওয়া। প্রথমে কেউ বুঝতেই পারত না কে এমন কাজ করছে। সবাই বাড়িতে থাকলে পূর্বা নিজের মনে চুপচাপ মলিন মুখ করে বসে থাকত। ক্লাসের বই খুলে পড়ত। ওর নিষ্পাপ সরল মুখ দেখে কেউ ধরতেই পারেনি এসব ওর কাজ।

এই নিষ্পাপ মুখ ছিল পূর্বার অনন্য বৈশিষ্ট্য। ওর প্রতিহিংসায় আসক্ত মন হলেও লেখাপড়ায় কিছুটা মেধা ছিল। আর শ্যামবর্ণা হলেও দিনদিন আকর্ষণীয়া হয়ে উঠছিল। ওর ভুবনমোহিনী হাসি দিয়েই সবাইকে মাত করে রেখেছিল। সব মিলিয়ে সহজেই সকলের মন জয় করে নেওয়ার দক্ষতা ছিল ওর। স্কুলে থাকতেই কত জনের বই খাতা অন্যের ব্যাগে রেখে, মিথ্যে নালিশ করে টিচারদের হাতে মার খাইয়েছে।

বাড়ির শাসনকে না মানা, ইচ্ছে মতো চলাফেরা করা সব মিলিয়ে বাঁধনছাড়া হয়ে উঠেছিল পূর্বা। তাই অনিবার্যভাবেই অল্প বয়েস থেকে বিভিন্ন বয়সি ছেলেদের কাছে ও হয়ে উঠেছিল মোহের টান। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়লেও কোনও প্রেমই সিরিয়াস ছিল না। মাঝখান থেকে কারণে অকারণে পল্লবিত হয়ে ওর বদনাম ছড়িয়ে পড়ছিল।

কিন্তু পাড়ারই ছেলে রগচটা বাপীকে কেন পূর্বা সত্যিকারের ভালোবেসেছিল তার কোনও কারণ জীবনের উপান্তে এসেও বুঝতে পারে না। বয়েসের অনেকটাই ফারাক ছিল দুজনের। ছোটখাট একটা চাকরি করত বাপী। পূর্বার মাধ্যমিক পরীক্ষার পরপরই বাপী একরকম জোর করেই ওকে বিয়ে করে বসল। পূর্বার মা-বাবা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অনেকটা যেন আপদ বিদেয় হওয়ার মতো। বিয়ের পর নিজেকে পূর্বা বদলে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুর্বাশামুনির অভিশাপ যার ওপর পড়ে সে কি চাইলেই বাইরে থেকে ঘরে মন ফেরাতে পারে? পূর্বাকে ওর শ্বশুরবাড়ির কেউ পছন্দ করত না। যে মেয়ে ঘরের কোনও শিষ্টাচার মানেনি, পারিবারিক বন্ধন শেখেনি সে কী করে মাথায় ঘোমটা দেবে, ঘরে শাড়ি পড়বে, রান্নাঘরের কাজ করতে পারবে। এই নিয়ে প্রতিনিয়ত শাশুড়ির মুখ ঝামটা, শ্বশুরের অসন্তোষ লেগেই থাকত। বাপী তার মা বাবার কথা শুনে পূর্বাকে গালাগালি করা গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছে। ওর বিয়ের এক বছরের ভেতর শ্বশুর ক্যানসারে মারা যায়। সবাই সাব্যস্ত করে পূর্বা অলক্ষ্মী, রাক্ষসী তাই বাপী তার বাবাকে হারিয়েছে। বাপীর হুকুম ছিল তার মায়ের কথামতো সব চলতে হবে। ঘরের সব কাজের দায়িত্ব পূর্বার ওপর থাকবে। বাপী কখনও তার মাকে নিয়ে বাইরে গেলে পূর্বাকে ঘরে তালা আটকে রেখে যেত। বারকয়েক বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রথম দিকে ঝগড়া,জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ি, চিৎকার করা শুরু করেছিল পূর্বা। তাতে খুব বেশি লাভ হয়নি। ছোটবেলা থেকেই না পাওয়ার হতাশায় রাগ ক্ষোভ জেদ এবারে তীব্র আকার নিতে শুরু করেছিল। এরপর বাপী ওর মাকে নিয়ে বাইরে গেলে পূর্বা নিজের হাত কোনও ভাবে বেঁধে, গায়ে কালি মেখে জানালা দিয়ে রাস্তার মানুষজন আর প্রতিবেশীদের ডেকে দেখাত ওর ওপর কতটা অত্যাচার চলছে। কারও দুঃখ বেদনা অনেকেই সমব্যথী হয় আবার অনেকেই মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে আনন্দ পায়। পূর্বার ওপর অত্যাচার করা হয় প্রচার পেতেই বাপী আর ওর মায়ের ওপর সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। যাদের সঙ্গে বাপীদের সম্পর্ক ভালো নয় অনেক সময় ইচ্ছে করে পূর্বা তাদের বাড়ি ছুটে যেত। বলত বাপী আর ওর মায়ের হাতে মারের হাত থেকে রক্ষা পেতে ছুটে এসেছে। দু'দিন কিছু খেতে দেয়নি। কথাগুলো আগুনের মতো ছড়িয়েছিল। এই নিয়ে থানা পুলিশ পর্যন্ত হয়। পুলিশ বাপী আর ওর মাকে ধরে নিয়ে যায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগে। এই সময় বাপী লিখিত মুচলেকা দিতে



চেয়েছিল, আর কোনও দিন পূর্বার ওপর অত্যাচার করা হবে না। কিন্তু পূর্বা শোনেনি। অবশেষে অনেক টাকা ও গয়না ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাপী ডিভোর্স দিতে বাধ্য হয়। অনেকদিন জেলে থাকার জন্য বাপীর চাকরিটাও চলে যায়। পূর্বা খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেই টাকা সমেত ডিভোর্সটা পেয়েছিল। ও জানত নইলে খালি হাতেই শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হতো।

হাতে টাকা থাকায় অনেকটাই বল ভরসা ছিল পূর্বার। এই টাকার জন্যই হয়ত বাবা ঘরে জায়গা দিয়েছিল। এই সময় কিছুদিন বিউটি পার্লারে কাজ শিখেছিল। রোজগার ভালোই ছিল। ছোট একটা ঘর ভাড়া করে বাবার বাড়ি থেকে চলে আসে। পূর্বার চটকদার চেহারা, দুঃখী জীবনের গল্প, একা থাকা সব মিলিয়ে নানা বয়সি পুরুষ ওর চারপাশে ভিড় জমাতে থাকে। কিন্তু ফের কাউকে বিয়ে করে নতুন করে সংসার গড়তে চায়নি।

তবে তাদের ভেতর সানিকে কিছুটা ভালো লেগেছিল পূর্বার। যদিও প্রেমের সম্পর্ক গড়তে দেয়নি পূর্বা। কিন্তু সানি ছিল ওর জন্য পাগল। সানি ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। ওর বাবা আর কাকার একসঙ্গে ব্যবসা ছিল। যৌথ পরিবার। সানি আর ওর খুড়তুতো ভাই আনন্দ ছিল বাবা কাকা, মা আর কাকিমার নয়নের মনি। সানি নিজেদের ব্যবসার সঙ্গে কিছুটা যুক্ত ছিল, আবার একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করত। বেশ সচ্ছল পরিবার। পূর্বার সঙ্গে পরিচয়ের পর ওকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সানি। অনেকটাই লুকোছাপা করে নিজের অতীতের কথা সানিকে বলেছিল পূর্বা। সানিদের বাড়িতে পূর্বাকে সাদরে সবাই আপন করে নিয়েছিল। সানিদের যাতায়াতের কারণে পূর্বা বেশ বুঝতে পারছিল আনন্দ ওর প্রতি আকৃষ্ট। সবই ঠিক ছিল কিন্তু নিজের স্বভাব লুকোবে কী করে! পূর্বার নিষ্পাপ সরল চাহনি মিষ্টি কথায় সানিদের বাড়ির সবাই মুগ্ধ। এরই ভেতর ব্যবসায়িক কারণে কাকার পরামর্শে সানিকে ওর বাবা ব্যবসার অংশীদার করে নিল। এমনই একটা কিছু সুযোগ যেন খুঁজছিল পূর্বা। এই বিষয়টি

নিয়ে কান ভারী করে সানির মা আর আর কাকিমার ভেতর সূক্ষ্ম লড়াই বাঁধিয়ে দিল। ক্রমেই পারিবারিক কলহে পরিণত হলো। পূর্বা আবার অন্যদিকে আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। আনন্দ জানিয়ে দিল পূর্বাকে ও বিয়ে করতে চায়। আনন্দর এই ঘোষণা সানির জীবন যেন বিপর্যস্ত করে দিল। সানি কোনও ভাবেই পূর্বার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না। একদিন ঠিক খুঁজে বের করে পূর্বাদের পাড়ায় চলে গেল। পূর্বার অতীত ইতিহাস শুনে অবাক সে। বাড়িতে এসে সবাইকে জানিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর সানির নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ তোলে পূর্বা। পুলিশ নিয়ম অনুসারে সানিকে আটক করে। পারিবারিক সম্মান বজায় রাখতে অনেক টাকা পুলিশ ও পূর্বাকে খেসারত দিয়ে মামলা প্রত্যাহার করায়। ততদিনে সানিদের সামাজিক সম্মান অনেকটাই নষ্ট হয়েছে।

এই ঘটনার পর বাড়ি বদল করে বেশ দূরে চলে যায় পূর্বা। এখানেও পূর্বার ভাগ্য নিয়ে জীবনের অভিশাপ কাজ করেছে। পূর্বা যে বাড়িতে গিয়েছিল সেই বাড়িটি ছিল নিঃসন্তান এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দিপালী সেনের বাড়ি। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। অসংখ্য তাঁর ছাত্র ছাত্রী। পূর্বার ব্যবহার, কথার মায়াজাল আর নিজের জীবনের দুঃখের গল্প শুনে তিনি ওকে কাছে টেনে নেন। অল্পদিনের ভেতর পূর্বার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। বাড়ির যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া, ব্যাংকের লেন-দেন, চিকিৎসা সব কিছুতেই পূর্বার মতামতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিপালীদেবী এক ছাত্রের সংস্থায় পূর্বাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। অল্পদিনের ভেতর সেই সংস্থার মালিককে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে ও হাত করে ফেলে।

পূর্বা এবার শুরু করে এক বিষময় খেলা। দিপালীদেবীর ওষুধের দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেয়। ইচ্ছা করেই ভুল ওষুধ খাওয়াতে থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই বিভিন্ন রকমের খাবার দিতে থাকে। সব মিলিয়ে দিনদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দিপালীদেবীর দীর্ঘদিনের পারিচারিকা মালতীকে ছাড়িয়ে দেয়। এরই ভেতর দিপালীদেবী স্থির করেন বাড়ি বিক্রি করে বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাবেন। পূর্বাকে দায়িত্ব দেন কাগজপত্র তৈরি করার। তিনি পূর্বাকে জানিয়ে দেন বেশ কিছু টাকা পূর্বাকে দেবেন। কিন্তু পূর্বার মনে ছিল অন্য ভাবনা। দিপালীদেবীকে মনভোলানো কথায় প্ররোচিত করে প্রথমে উকিল ও তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে এনে বাড়ি বিক্রি ও টাকা লেন-দেনের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিজের নামে করে নেয়। ওর ভাবখানা ছিল দিপালীদেবী একরকম জোর করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছে। দিপালীদেবী যখন খুব অসুস্থ সেই সময়। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সব টাকা নিজের কাছে রাখে পূর্বা। একদম শেষ সময়ে এক প্রতিবেশীর কাছে পূর্বার এই প্রতারণার কথা শুনেছিলেন দিপালীদেবী। পূর্বাকে তিনি কন্যার সমান ভালোবাসা মর্যাদা দিয়েছিলেন। বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলেন ওর ওপর। এতবড় আঘাত সহ্য করতে পারেন নি। অল্পদিনের ভেতর মারা যান তিনি।

পূর্বার হাতে এখন অনেক টাকা। এই ঘটনার পর শহরের দক্ষিণ প্রান্তে শহরতলীর দিকে বড় একটা আবাসনে ছোট একটা ফ্ল্যাট কিনে বসবাস শুরু করেছিল। কিন্তু এখানেও তাই। আবাসনের কিছুটা বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের নাম করে স্বামী স্ত্রী, বিভিন্ন পরিবারের ভেতর বিবাদ বাধিয়ে দেওয়া চলছিলই। স্বাভাবিক ভাবেই পরের দিকে প্রায় সকলেরই ওকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা বাড়ছিল।

দিন সবসময় একভাবে যায় না। পূর্বারও তাই। একদিকে বয়স বাড়ছিল অপর দিকে একাকিত্ব ঘিরে ধরছিল। মানুষের খারাপ করতে গিয়েও সারাজীবনই মানসিক অস্থিরতার ভেতর কেটেছে। এখন অসুস্থতা ঘিরে ধরছে। পঞ্চাশের আগেই হার্টের অসুখে কাবু করেছে ওকে। এই সময়টা একজন আপনজনের অপেক্ষায় কাটে ওর। টাকার জন্য দু'চারজন আত্মীয়স্বজন আসে ঠিকই কিন্তু তাতে পূর্বার একাকিত্ব কাটে না। ভাইয়ের মেয়েকে নিজের কাছে রেখেছিল কিছুদিন, কিন্তু অল্পকিছুদিনের ভেতরেই সেই ভাইঝি গোপনে আলমারি খুলে প্রচুর টাকা আর গয়না নিয়ে চলে যায়। পূর্বার কিছুই করার ছিল না। তবে সারা জীবন অন্যকে ঠকানোর ফল কিছুটা হলেও পেয়েছিল।

নিজের অসুস্থতা আর একাকিত্ব ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। গভীর রাতে প্রায় অন্ধকার ঘরে দরদর করে ঘামছে পূর্বা। প্রবল শ্বাসকষ্ট আর জীবনী শক্তি হারানোর মুখে দাঁড়িয়ে ওর সারাজীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেই ছোট্ট বয়সের মামাতো বোনকে অকারণে মারধর করা, কত ছেলের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে টাকা নেওয়া, সানি আর ওদের পরিবারের সর্বনাশ করা, মিথ্যে কথা বলে কত পরিবারে অশান্তি বাঁধানো, পরিশেষে দিপালীদেবীকে সর্বস্বান্ত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া— চোখে যেন ঘোর লেগে আসে পূর্বার। চারদিক তার অন্ধকার লাগছে। মনে হলো সানি এসে দাঁড়িয়ে বলছে আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম। দিপালীদেবী বলছেন, তোকে আমি আমার মেয়ের জায়গাটা দিয়েছিলাম। আমার সবই তোরই হতো। কেন এমন করলি? কত মানুষ ওকে যেন ঘিরে আছে। তাদের ভিড়ে বাতাস আটকে যাচ্ছে। সবাই আলো নিভিয়ে দিচ্ছে কেন। বুকে ভীষণ ব্যথা। কেউ ওর কথা কেন শুনতে চাইছে না। বাতাস এত ভারী হয় নাকি। অন্ধকার এমন নিকষ কালো হতে পারে! □

*With Best Compliments From -*

# South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

***Sales & Service***

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

***Authorised Dealers of***

**BOSCH LTD. BOSCH, GMBH-GERMANY,**

**DEUTZ, A. G., GERMANY**

**LOMBARDINI - ITALY, V. M. MOTORI - ITALY**

*With Best Compliments From :*

## Dr. Sawar Dhanania

***Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata***

***PhD IIT, Kharagpur, W. B.***

***Chairman***

***Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry***

***Govt. of India***

**Email : sdhanania@gmail.com**

**Mob. : 9331741971**

# দাশপাড়ার এক সাবিত্রী

গিরিধারী ধর





রাধারানির হাতে আজকাল কাজ ওঠে না। কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। কী হবে! বাড়িঘর, জায়গা-জমি, খেতের ফসল, পুকুরের মাছ কিছুই যেন নিজের নয়। দিনরাত শুধু কাঁদতে ইচ্ছে করে। ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠুকে বারবার বলেন, মৃত্যু দাও ঠাকুর, মৃত্যু দাও। আর তো সইতে পারি না।

মেয়েটার দিকে তাকানো যায় না, সেদিন থেকে একেবারে বোবা হয়ে গেছে। স্কুলে যায় না, পড়ার বই-খাতা ছুঁয়েও দেখে না। প্রায় সারাক্ষণ শুয়ে থাকে, নয়তো খোলা বারান্দায় বসে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গাছপালা, বাড়ি-ঘর, আকাশ কী দেখে কে জানে। মাঝে মাঝে পুকুর ঘাটে গিয়ে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে জলের দিকে। রাধারানির মনে হয়, মেয়েটার চোখ জলে টলমল করে সারাক্ষণ। মেয়েটা কেন, নিজের ভেতরে যেভাবে কান্না গুমরে ওঠে, মাঝে মাঝে বাঁধ ভাঙে তাও কি রোধ করতে পারেন তিনি ! মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবেন, দু'কথা বলবেন, সেটাও পারেন না। মন আর সেভাবে এগোয় না। তবুও কাছে টেনে নেন মেয়েকে, টানলেই মেয়েটা মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'জনেই দু'জনের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজেন।

নিখিলেশ প্রথম প্রথম সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসতেন কাছে থাকলে, এখন চুপ করে থাকেন। নিজের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে গেছে। আগে মেয়েকে মায়ের বুক থেকে নিজের বুকে টেনে নিতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। টপ টপ করে চোখের জল পড়ে ভেসে যেতো সাবিত্রীর মাথা। আদর করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন সাবিত্রী সেই পুরাণের পতিব্রতা সাবিত্রী। রাধারানিকে বলতেন, আমার ঘরে সাবিত্রী এসেছে, সত্যবানের হাতেই সঁপে দিতে চাই। সত্যবানের কথা শুনে আতঁকে উঠতেন রাধারানি। বলতেন, ওকথা বলো না। ভালো লাগে না।

সাবিত্রী বেশি বয়সের একমাত্র সন্তান, দুজনের সব স্বপ্নই তাকে ঘিরে। প্রথম সন্তান সীতার মৃত্যুর প্রায় আট ন'বছর পর সাবিত্রীর জন্ম। বছর পাঁচেকের সীতা চলে গিয়েছিল দুদিনের জ্বরে, চিকিৎসার সুযোগ সেভাবে মেলেনি। গ্রামের ডাক্তার বুঝতে পারেননি যে জ্বর প্রাণ কেড়ে নেবে। সবে স্কুলে যেতে শুরু করেছিল। গান গাইতো। হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন নিখিলেশ। এক গানের শিক্ষক গান শেখাতে আসতেন। স্বপ্ন দেখতেন, সীতা বড়ো গায়িকা হবে, ঢাকায় গিয়ে পড়াশোনা করবে। বলতেন , একদিন এক রামচন্দ্রের হাতে তুলে দেবেন প্রাণের সীতাকে। রাধারানি হাসতেন, তোমার যতো উদ্ভট স্বপ্ন।

নিখিলেশ বলতেন, স্বপ্নই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে রাধা। ওর গানের গলাটা দেখেছো ?

সেই সীতা চলে যাওয়ার পর ভেঙে পড়েছিলেন দুজনেই। কাজে মন বসতো না। সব যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। বাড়িটায় গানই যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শূন্য ঘরে দীর্ঘ সময় পর কোলজুড়ে আসে সাবিত্রী। সেই সাবিত্রীকে ঘিরে আবার নতুন স্বপ্ন। সাবিত্রী গান নয়, টেলিভিশন দেখে নাচতে চায়। পড়াশোনায়ও ভালো। এক সময় ভেবেছিলেন স্কুলের গণ্ডি পার হলে ঢাকায় পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে কলেজে পড়বে, নাচও শিখবে।

কিন্তু হিংস্র পশুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সব ধ্বংস করে দিল। স্তব্ধ হয়ে গেল দাশপাড়া। মূক হয়ে গেছেন নিখিলেশ, মা-মেয়ের সামনে থেকে পালাতে পালেই যেন বাঁচেন। মা-মেয়ে দু'জনেই অভাগিনী, নিজেকেই অপরাধী মনে হয় নিখিলেশের। পশুদের হাত থেকে মা-মেয়ে কাউকেই রক্ষা করতে পারেননি। কেউ কি রক্ষা করতে পেরেছে গোটা পাড়ায়!

আজ সকাল থেকেই সাবিত্রী বিষণ্ণ মনে বসে আছে বারান্দায়। খুঁটিতে হেলান দিয়ে। মাটির ঘর, মাটির বারান্দা। কিন্তু কিছুদিন আগেও সবকিছু যেভাবে ছিমছাম থাকতো এখন তা নেই। সকালে রাধারানি এক বাটি মুড়ি দিয়েছিলেন মেয়েকে, বাটিশুদ্ধ এখনও পড়ে আছে, বোঝা যায় সাবিত্রী ছুঁয়েও দেখেনি। নিখিলেশ দোকানে যাবেন। সকালেই বলছিলেন রাধারানিকে, মালপত্র কিছু নেই, কীভাবে দোকান চালাই বুঝতে পারছি না।

দাশপাড়া থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে রামগঞ্জ বাজার। উপজেলা সদর, তাই বাজার মোটামুটি জমজমাট। শহর থেকে দূরে, তাই গোটা উপজেলার মানুষই এই বাজারের ওপর নির্ভর করে। এলাকায় বিদ্যুৎ আসায় গত কয়েক বছরে চেহারা পাল্টে গেছে, পাল্টে গেছে জীবন-জীবিকাও। নিখিলেশ অনেক কষ্টে কয়েক বছর আগে রামগঞ্জ বাজারে একটা কাপড়ের দোকান করেছিলেন। চাষাবাদের মৌসুমে কিষাণ নিয়ে মাঠে থাকেন, দোকানেও যান। কর্মচারী আছেন দু'জন। মোটামুটি সম্পন্ন পরিবারই বলা যায়। গোটা দাশপাড়ায় এরকম আরও কয়েকটি পরিবার আছে, ইদানিং শহরে চাকরিবাকরিও করে কয়েকজন। মেয়েরাও পড়তে যাচ্ছে ঢাকায়। দুই পরিবারের তিন ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে গেছে চাকরি নিয়ে। নিখিলেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন বাড়িটা পাকা করা দরকার। এক কথায় দাশপাড়া এখন অর্থনৈতিকভাবে আগের তুলনায় সমৃদ্ধ জনপদ। সকালে গরম ভাত খেয়ে নিখিলেশ দোকানে চলে যান। যাওয়ার সময় পান মুখে গুঁজে দেন রাধারানি। 'দুর্গা দুর্গা' বলে একই কথা উচ্চারণ করেন প্রতিদিন— বেশি রাত করো না, তাড়াতাড়ি ফিরো।

এ কথাগুলোই এখন ভুলে গেছেন তিনি। নিখিলেশ সেই হামলার পর থেকে দোকানে যাননি, এখন দু'একদিন ধরে যাচ্ছেন। কিন্তু দোকানে যাওয়াই সার, মালপত্র নেই, তাই বেচা-কেনাও নেই। স্বাভাবিক অবস্থা এখনো ফিরে আসেনি। তবু দোকানে গিয়ে বসে থাকতে হয়। নিখিলেশ শুধু নয় রামগঞ্জ বাজারের সব হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকানপাট লুট হয়ে গেছে। তারা মনে করছেন, দোকান ফেলে রাখলে বেদখলও হয়ে যেতে পারে। সবার মতো নিখিলেশও দোকান খুলে বসে থাকেন, কর্মচারী দুজনও আসেন। কিন্তু দোকান ফের কীভাবে চালু করবেন ভেবে কুলকিনারা পান না।

শুধু দোকান নিয়েই কী দুশ্চিন্তা ? নিখিলেশ ভেবে পান না কী করবেন !

সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। শুধু নিখিলেশের পরিবার নয়, দাশপাড়ার শ'দেড়েক হিন্দু পরিবারের সবাই হামলার শিকার হয়েছেন। তছনছ হয়ে গেছে মোটামুটি সাজানো-গোছানো এই জনপদ। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই নারকীয় হামলার পর আরেকবার পাশবিক নৃশংসতা দেখলো দাশপাড়া। তফাত শুধু হামলাকারী বদল হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে হামলা করেছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আল বদররা। আর এবারে যাদের সঙ্গে নিত্য ওঠাবসা, জীবন-জীবিকায় যারা জড়িয়ে আছে দীর্ঘ সময়। বিভেদের দেয়াল উঠতে শুরু করেছিল আগেই, হিন্দুরা মুসলমান রাজনীতির হাত ধরে মুসলমান হয়ে গেলো।

নিখিলেশ দোকানে রওনা হয়ে ঘর থেকে বেরুতেই সাবিত্রীকে দেখলেন। সকাল থেকেই দেখছেন, কিন্তু এবার থমকে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন, মা রে! এভাবে বসে থাকিস না। ঘরে যা। লেখাপড়াটা আবার শুরু কর মা।

নিখিলেশ জানেন, সাবিত্রী কোনো জবাব দেবে না। জবাব দেবেন না সাবিত্রীর মা-ও। তিনি পেছনে না তাকিয়েই বুঝতে পারলেন, রাধারানি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাইরে যাওয়ার মুখে এখন আর পান তুলে দেন না মুখে, দুর্গা নাম উচ্চারণ করেন না। বলেন না, বেশি রাত করো না। কিংবা বলেন না, ফেরার পথে অমুকটা নিয়ে এসো। নিখিলেশ জানেন, পেছন ফিরলেই তিনি রাধারানির চোখে জল দেখবেন। তাই পালিয়ে বাঁচতেই হুট করে ছাতাটা তুলে নিয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন— যাই, বৃষ্টি নামতে পারে। আকাশে মেঘ নেই, তবুও পালিয়ে বাঁচার জন্যেই যেন একটা অজুহাত খুঁজলেন নিখিলেশ।

****

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তুলসীমঞ্চের পাশ দিয়ে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ান নিখিলেশ, মাথা ঠেকান। মন্দিরের পাশেই ব্রহ্মচারীর সমাধি, কে যেন কিছু ফুল রেখে গেছে সমাধির ওপর। এলোমেলো মাটি, কোনোরকমে সমাধি হয়েছে ব্রহ্মচারীর। মন্দিরে এখনো নরপশুদের হামলার চিহ্ন, রাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। পূজার নানা সামগ্রী, ছেঁড়া ও আগুনে পোড়া গীতা ও অন্যান্য বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। সেদিনের পর থেকে পূজা বন্ধ রয়েছে। মন্দিরে কেউ আসছেন না। আবার নতুন করে পূজা শুরু হবে কিনা কেউ জানেন না।

নিখিলেশ জানেন এখান থেকে পেছন ফিরলে মেয়ে ও মাকে সেভাবেই দেখতে পাবেন। তিনি তাকাতে চান না, প্রণাম সেরেই দ্রুত পা চালান। পুকুরের পাড় ঘুরে রাস্তায় নামেন, এখন গাছপালার আড়ালে চলে গেছে বাড়ি ও মন্দির। এবার গতি শ্লথ হলো, সাবিত্রী ও রাধারানির কাছ থেকে তিনি এভাবেই পালিয়ে আসেন। ক'দিন পালিয়ে বাঁচবেন জানেন না।

উপজেলার ছোট্ট গ্রাম হৃদয়পুর, স্থানীয় ভাষায় হৃদিপুর। তারই শেষ প্রান্তে অনেকটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাশপাড়া। এই পাড়ার পরিবারের সংখ্যা আজ প্রায় দেড়শোতে এসে ঠেকলেও চল্লিশের দশকে এই সংখ্যা ছিল পাঁচশোর ওপরে। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জনপদ না হলেও মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ ছিল, দুর্গাপূজা কালীপূজা হতো, বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকতো ঘরে ঘরে।

কৃষি কাজই ছিল এই পাড়ার মানুষের মূল পেশা। চিড়ে-মুড়ি ভাজা, বেতের কাজ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। কারও কারও মাছের ব্যবসা। চিড়েমুড়ি, শাকসবজি যেতো আশেপাশের গাঁ-গঞ্জে, আর বেতের সামগ্রী যেতো ঢাকা-চট্টগ্রামে। ফরমায়েশ আসতো দূর দূরান্ত থেকে।

সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় প্রথম ছোবল আসে। দাশপাড়া সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে উন্মত্ত রাজনীতি দেখে, সেই প্রথম ভয়াবহ হিংস্রতার মুখোমুখি হয়। দাশপাড়া আক্রান্ত হলো প্রথম বার। অপরাধ কী দাশপাড়ার মানুষ বুঝতে পারেনি। শুধু শুনলো সবাই, মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশ হচ্ছে, হিন্দুদের দেশ আলাদা।

নিখিলেশের তখন জন্ম হয়নি। বাবার মুখে শুনেছে, বাড়িঘর লুট হলো, আগুন লাগানো হলো, মেয়েদের ওপর অত্যাচার হলো, কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। বাবা মুরলী দাশ গিয়েছিলেন কুমিল্লায় কী একটা কাজে, যখন খবর পেয়ে ছুটে এলেন তখন দাশপাড়ার ঘরে ঘরে কান্না, আর্তনাদ। এরই মধ্যে শোনা গেল পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হয়ে গেছে। মুসলিম লিগের নেতারা সদর থেকে এসে দাশপাড়ায়ও পুঁতে দিয়ে গেল সবুজ সাদা চাঁদ-তারা পতাকা।

শুরু হয় ভাঙনের পালা। মুরলীবাবুর জায়গা-জমি ছিল কিছু, ধান ও অন্যান্য ফসল ওঠে, বছর চলে যায়। মাঝে মাঝে বেতের কাজের ফরমায়েশ পান, চালান যায় কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঢাকা। কিছু আয় হয়। সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পাড়ার লোকজন জড়ো হয়। কীর্তন হয়, আড্ডা হয়। কিন্তু চাঁদ-তারা পতাকা ওড়ার পর থেকে মন্দির ফাঁকা, পাড়ার লোকজন এলে মুরলীবাবুর ঘরে বসেন।

নিখিলেশের জন্ম কয়েক বছর পর। বড় হলে, স্কুলে ওপরের দিকে পড়ার সময় বাবার মুখে সেসব দিনের কথা শুনেছে, মন খারাপ হলে বাবা সেসব দিনের ছবি তুলে ধরতো।

মুরলীবাবু বলতেন, সন্ধ্যার পরে পাড়ার অনেকেই আসতেন। এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা পাড়ার সবাইকে ঘিরে ধরেছে। একদিন সুধীরদা বললেন, দেশ ছাড়তে হবে মুরলী, এ ছাড়া উপায় নেই।

নবীনদা বলেন, পাকিস্তান আমাদের জন্যে নয়। মুরলী একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাবা আঁতকে ওঠেন, সিদ্ধান্ত মানে দেশ ছাড়ব ? এই মাটি ?

এই মানুষগুলো এই মাটিরই সন্তান, মাস্টারমশাই সুন্দরভাবে বলেন, ভূমিপুত্র। তাহলে এই মাটি ছাড়তে হবে কেন ? বাবা সবসময় এই কথাই বলতেন।

ঘরে তামাকের ধোঁয়া, কারও মুখে কোনো কথা নেই। বাবার মুখে শুনে নিখিলেশের মনের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে সেদিনের চিত্র কল্পনা করে। বাবাই বলেন, দেশ ছাড়ার কথা শুনে মনে যন্ত্রণা অনুভব করি। এই বাড়ি, মন্দির, পুকুর, ধানখেত, পাহাড়ের পর পাহাড় যে মমতা ছড়িয়ে রেখেছে দাশপাড়াকে কোলে নিয়ে তা ছেড়ে যেতে হবে ? আর দেখা হবে না গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী ইরা'র সঙ্গে। এভাবেই প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যা-রাতে বিষণ্ণ আলোচনা এগিয়ে চলে। ফিসফাস আলোচনা— ভয়, দেয়ালেরও কান আছে।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই শোনা গেল সুধীরদা রাতে কোনো এক সময়ে চলে গেছেন। কেউ টের পায়নি আগের দিন সন্ধেবেলাতেও। এভাবে খালি হয়ে গেল অনেক বাড়ি। চলে গেল বন্ধুদের অনেকে। বাবা কিন্তু অনড় , মা মাঝে মধ্যে কথা তোলেন। বাবা বলেন, এ মাটি ছেড়ে গিয়ে বাঁচবো না শশী। ওরা গেছে, কিন্তু ভালো থাকবে কি ? মা আর কথা বাড়ায় না।

বাবা যেন ইতিহাস তুলে ধরেন মাঝে মধ্যে। দেশভাগের কয়েক বছর পরই খবর আসে, পাকিস্তান বাংলাভাষা তুলে দিতে চায়, দেশের ভাষা হবে উর্দু। ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকায়, মারাও গেছে কয়েকজন। অবশেষে পাকিস্তানিরা মাথা নত করে, বাংলাভাষার জয় হয়। এরপরই আসে চুয়ান্ন সালের নির্বাচন। সাড়া পড়ে যায় গোটা দেশে, বিপুল উৎসাহে ভোটে নামে দাশপাড়ার মানুষ। মুরলীবাবু বিপুল উৎসাহে দৌড়ান বাড়ি বাড়ি, নাওয়া খাওয়া নেই। রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সভার পর সভা। হ্যাজাক জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত চলে সভার কাজ, যুক্তফ্রন্টের নেতারা আসেন। আওয়ামি লিগ যুক্তফ্রন্টের প্রধান দল। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও চুয়ান্নর নির্বাচনে দেশভাগের গ্লানি অনেকটা চাপা পড়ে যায়। হিন্দুরা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। নির্বাচনের ফল বেরোলে সেকি আনন্দ দাশপাড়ায়, গোটা গ্রামে। হিন্দু-মুসলমান সবাই এক সঙ্গে মিছিলে, উল্লাসে। বাবা ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, জানো শশী দেশের মানুষ সেই মুসলিম লিগওয়ালাদের হারিয়ে দিয়েছে, যারা পাকিস্তান এনেছিল।

সে এক বিস্ময়। মুরলী মনে করেন, চোখ খুলে যাচ্ছে, অনেক কিছু পরিষ্কার হচ্ছে। স্ত্রীকে বলেন, এদেশ ছাড়তে হবে না শশী। দেখছ না দেশ বদলে যাচ্ছে। দেশে সবাই মিলে আমরা থাকবো। শশীবালাও অন্যদের মতো নতুন স্বপ্ন দেখেন। তিনি রাজনীতির অতোশতো বোঝেন না, হাত দুটো কপালে ঠেকান রাধাগোবিন্দের উদ্দেশে।

দেশ ছাড়তে হবে না, বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে না, এই কয়েকটি শব্দ স্বপ্ন ছড়িয়ে দেয় গোটা দাশপাড়ায়। সেদিন বাবা এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বলেই আজ এ মাটিতেই জীবন।

মুরলীবাবু নির্বাচনের পর দ্বিগুণ উৎসাহে ঢাকা-চট্টগ্রাম দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। দাশপাড়া উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। বাবা একদিন ঢাকা থেকে ফিরে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, দেশে ফের অশান্তি শুরু হলো। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দিয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারিরা। সেনাপতি আইয়ুব খান ক্ষমতা নিয়েছে।

নিখিলেশকাকা, আপনি কি দোকানে চললেন ?

হঠাৎ ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন নিখিলেশ, ফিরে এলেন অতীত থেকে। সেই কতোদিন আগে বাবার তুলে ধরা ইতিহাস যেন চোখের সামনে ছবির মতো ভাসছে। আজ আরও বেশি করে মনে পড়ছে সেই সময়ের কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, ক'দিন থেকে তিনি সব হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। ধারণা করছেন, একই ঘটনা, একই রাজনীতি ঘুরে ফিরে আসছে।

হ্যাঁ বাবা। তা তুমি কোথায় চললে অভিজিৎ ?

আপনার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম কাকাবাবু, কথা ছিল।

বল, এখানেই বল। আমার তাড়া নেই। দোকানে যাই নিয়মরক্ষার জন্য। মালপত্র নেই, তবু বসে থাকতে হয়। ফিরতে সেই সন্ধ্যা।

অভিজিৎ ঢাকায় থাকে। চাকরি করে একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থায়। গবেষণা আধিকারিক। হামলার আগে এসেছিল, আর ফিরে যেতে পারেনি। ইসলাম অবমাননার কথিত অভিযোগে নির্মম আক্রোশে মজহবি নরপশুরা যেদিন হামলে পড়ে দাশপাড়া ও রামগঞ্জ বাজারে, তাদের হিংস্র বর্বরতায় রক্ত ঝরে, আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ লাল হয়ে ওঠে, ধর্ষিতা নারীদের আর্ত চিৎকারে এক নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় গোটা জনপদে— এই বিভীষিকা থেকে রেহাই পায়নি অভিজিতের বোন প্রিয়াঙ্কাও। ঢাকায় লেখাপড়া করে, কয়েকদিনের জন্য বাড়ি এসেছিল। বাড়িতে লুটপাটের পর প্রিয়াঙ্কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নরপশুরা একের পর এক। ঘটনার একদিন পর আত্মহত্যা করে প্রিয়াঙ্কা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অনার্সের ছাত্রী।

অভিজিৎ এদিক-ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, ঢাকার খবরের কাগজে এখানকার সব ঘটনা ছাপা হওয়ার পর এমপি সাহেব খুব ক্ষেপে গেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, কয়েকটি কাগজ ও টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের

তিনি এখানে নিয়ে আসবেন। তাদের সামনে আমাদের বলতে হবে, এখানে কিছুই হয়নি। কয়েকটি খবরের কাগজে মিথ্যে লেখা হয়েছে, টেলিভিশন চ্যানেলে ঠিক খবর পরিবেশিত হয়নি।

কিন্তু গোটা এলাকায় এখনো ধ্বংসের ছাপ, লণ্ডভণ্ড আগুনে পোড়া বাড়িঘর, মন্দির। এগুলো লুকাবে কী করে ?

শুনেছি কয়েকদিন সময় দেওয়া হবে, এরই মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

নিখিলেশ ম্লান হাসেন, আর কী কী করতে হবে বলেছেন কিছু ? ক্ষোভ আর আক্রোশে আরও কিছু বলতে চাইলেন, পরে নিজেকে সংযত করলেন। অভিজিতের কাঁধে হাত রেখে বললেন, সন্ধ্যার পর বাড়ি এসো, দেখা যাক সবাই কী বলে।

মাস্টারমশাইয়ের অভাব মনে মনে অনুভব করলেন নিখিলেশ, এ সময় তিনি পাশে থাকলে সাহস পাওয়া যেতো। নরপশুরা তাঁকে বাঁচতে দেয়নি।

****

রামগঞ্জ উপজেলা সদরের বাজারের ওপরই গোটা এলাকার মানুষ নির্ভরশীল। ইদ-পূজায় বাইরে যেতে হয় না কেনাকাটার জন্যে, এখানেই কাপড় , জুতো, আসবাবপত্র এমনকী রেডিয়ো, টেলিভিশন, ফ্রিজ সবই মেলে। কিছুদিন আগে ফোটোকপি মেশিন এসেছে, মানিগ্রামের দোকানও চালু হয়েছে। এককথায় রামগঞ্জে শহরের ছোঁয়া লেগেছে। আগে দোকান নিয়েছিলেন বলে সস্তায় পেয়েছিলেন নিখিলেশ। বাবার বেতের কাজের ব্যবসায় তিনি যাননি। যতোই রমরমা বাড়ছে রামগঞ্জের, দোকানপাটের দামও চলে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। নতুন নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে দু'এক বছরের মধ্যে রামগঞ্জ পৌরসভা হবে। রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

নিখিলেশের কাপড়ের দোকান অনেকটা মাঝামাঝি এলাকায়। নিখিলেশ এসেই দেখেন তার দোকান খোলা হয়েছে। লক্ষ্মীবাবু দোকান খুলেছেন, কর্মচারী হলেও বন্ধুর মতো। বাড়ি কাছেই। রামগঞ্জ বাজারের কাছে তার বাড়িও লুট হয়েছে। পাশে অন্যান্য হিন্দু বাড়িও। তবে আশেপাশে মুসলমান বাড়ি থাকায় আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে। কয়েকটি পরিবারে মেয়েদের ওপর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

লক্ষ্মীবাবুই জিজ্ঞেস করেন, কিছু ঠিক করলেন, মালপত্র তুলবেন?

আপনিই বলুন, কী করা যায় ? এখনই মালপত্র তুলবো, নাকি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবো?

এর কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব নেই, লক্ষ্মীবাবু জানেন। কী পরামর্শ তিনি দেবেন ! নিখিলেশ যা হারিয়েছেন তা কোনোভাবে পূরণ হওয়ার মতো নয়। নিখিলেশ শুধু নয়, হিন্দুদের সব দোকানপাটের অবস্থা একই। দোকানে হামলা ভাঙচুর করার পর মালপত্র লুট হয়ে গেছে। দোকানে এখন অনেকে এসে বসছেন, কিন্তু মালপত্র নেই।

নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়। কেউ কোনো কথা খুঁজে পান না। নিখিলেশ দোকানের ভেতরে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তিল তিল করে সাজিয়েছিলেন দোকানটি, সব ধ্বংস করে দিল জেহাদিরা। আবার দোকান সাজাবেন, মালপত্র তুলবেন, সেরকম মনের শক্তি পাচ্ছেন না। বাজারের অন্যান্য হিন্দু দোকানিরা কী ভাবছেন এখনো জানতে পারেননি।

গোটা বাজারে হিন্দু দোকানগুলো এখনো নির্মম হিংস্রতার সাক্ষ্য বহন করছে। দোকানে বসেই নিখিলেশ বাইরে দৃষ্টি রাখলেন। মুসলমানদের দোকানগুলো খোলা থাকলেও খদ্দের কম, দু'চার জন দেখা যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা মনে পড়ছে, তখন অল্প বয়স। হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে নিয়ে রাজাকার, আল-বদরের দল লুটপাট,হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তানপন্থীরা একলা এসে হামলা করতে সাহস করেনি। আজ ভিন্ন চিত্র, কোথায় যেন দেয়াল উঠে গেছে। নরপশুরা দাশপাড়ায় যখন হিংস্র উল্লাসে স্লোগান দিতে দিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কাউকে পাশে পাওয়া যায়নি। কয়েকজন পুলিশ পাঠিয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন, তারাও উন্মত্ত জেহাদিদের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। রামগঞ্জ বাজারেও একই অবস্থা। তফাত দাশপাড়ায় আগুন দেওয়া হয়েছিল লুঠপাট, নির্বিচার ধর্ষণের পর রামগঞ্জবাজারে আগুন দেওয়া হয়নি। কারণ আগুন দিলে হিন্দু-মুসলমান উভয় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন।

এ এক ভিন্ন সময়। বাবা যে চিত্র তুলে ধরতেন, কিশোর বয়সে তারই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছেন ষাটের দশকে। বাঙ্গালির স্বাধিকারের আন্দোলন, এক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়তে মরণপণ লড়াই দেখেছেন। ষাটের দশক, অগ্নিগর্ভ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। সামরিক একনায়ক জেনারেল আইয়ুব খান গুলি চালিয়ে, রাজপথ রক্তাক্ত করে আন্দোলন দমন করতে পারছে না। সারাদেশ জেগে উঠেছে। পাকিস্তানি শাসকরা মনে করতো বাঙ্গালির এভাবে জেগে ওঠার পেছনে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে এক কবি। তাঁর গান নিয়ে, কবিতা নিয়ে এরা পথে নামে। আন্দোলন করে। একষট্টি সালে এই কবির জন্মশতবর্ষ ছিল। জন্মশতবর্ষের কোনো অনুষ্ঠান যেন উদযাপিত না হয় সেজন্যে কঠোর অবস্থান নেয় পাকিস্তানি সামরিক শাসক। কিন্তু কোনোভাবে অনুষ্ঠান বন্ধ করা যায়নি। ঢাকায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয় দুদিনের, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে যেন রবীন্দ্র উৎসব। সরকার খবর পায়, যতো নষ্টের গোঁড়া বাঙ্গালি কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-

শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমাজ। সরকারের ভেতরে পদস্থ কর্মকর্তাদের একটি অংশও নাকি এই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে গোপনে সহযোগিতা করেছে। তাদের চিহ্নিত করতে চেষ্টা করা হয়, পারা যায়নি। মরিয়া সরকার ষাটষট্টি সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা নিষিদ্ধ করে। যুক্তি দেখানো হয়, তিনি ভারতীয় কবি। পাকিস্তানের সংস্কৃতির পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান। রাজপথে নেমে আসে প্রতিবাদী মানুষ। শুধু ঢাকা নয়, গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবাদ। এক সময় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য হয় সরকার। অন্যদিকে স্বাধিকারের আন্দোলন রুখতে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে কারাগারে পোরা হয়েছিল। দেশদ্রোহিতার দায়ে বিচার চলছিল সামরিক আদালতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বলা হয়, শেখ মুজিব ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চান। গণ-অভ্যুত্থান সবকিছু তোলপাড় করে দেয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কারাগার জ্বালিয়ে দিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্ত করার হুঙ্কার দেন। অবশেষে অভিযোগ তুলে নিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই ঘটনা পাকিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল ঘটায়। জেনারেল আইয়ুব খানকে সরিয়ে ক্ষমতার মঞ্চে আসেন সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি এসে গণ-অভ্যুত্থান শান্ত করতে অচিরে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। আশ্বাস দেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেই তিনি সেনানিবাসে ফিরে যাবেন। তারপর অন্য ইতিহাস। নির্বাচন আয়োজন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের অস্বীকৃতি। নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তারপরও ইয়াহিয়া ও সামরিক কর্মকর্তাদের অনমনীয়তার মুখে এই ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের ডাক। তিরিশ লক্ষ প্রাণ, লক্ষ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানি ও ধ্বংসস্তূপের ওপর বিজয়, স্বাধীনতা। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

নিখিলেশ ভাবেন, এই দীর্ঘ মুক্তির লড়াই ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মানুষে মানুষে ভেদরেখা ঘুচে গিয়েছিল তা আজ কি মুছে গেল? পাকিস্তান সরকার কায়েমি স্বার্থে মজহবি অন্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করেছিল। কিন্তু এখন বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দেশের জন্ম। এ মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা ঠাঁই পেতে পারে না। তবু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দুর্গাপূজায় হামলা হয়, পাকিস্তানি আমলে প্রণীত 'শত্রু সম্পত্তি আইন' স্বাধীন দেশের মাটিতে 'অর্পিত সম্পত্তি' নামে অব্যাহত থাকে, এই আইনে জায়গা-জমি হারিয়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারকে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হয়। এক সময় এই আইন বাতিল হলেও যারা বাংলাদেশে এখনো মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তারা নিজের বাড়ি ও জমি ফেরত পাননি। হামলা, নির্যাতন, জায়গাজমি দখল, মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙচুর অব্যাহত গতিতে চললেও কোনো বিচার নেই। বিচারহীনতার বিচার দেখতে দেখতে হিন্দুরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এক নতুন বিপত্তি যুক্ত হয়েছে। ইসলাম ও নবীকে অবমাননার অভিযোগ তুলে কোনো ব্যক্তিকেই শুধু নিশানা করা হচ্ছে না, গোটা পাড়ায়, বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলা, তাণ্ডব চালানো হচ্ছে। লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটছে। এই বিপত্তির সর্বশেষ শিকার দাশপাড়া, রামগঞ্জ বাজার।

মুক্তিযুদ্ধের কথা নিখিলেশের কিছু মনে আছে। দাশপাড়ার মানুষ অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। সবাই বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তান আর থাকছে না, স্বাধীনতা আসছে। ছেলে-বুড়ো সবাই আবেগে ভাসছিল। মিছিল হচ্ছিল। শেখ মুজিবের 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ডাক সবাইকে উজ্জীবিত করেছিল। মাস্টারমশাই দাশপাড়ার তরুণ নেতা, তিনি তখনই বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন। সংগঠিত




**Kedia Fabrics**

**Kamal Kumar Kedia**

**Mfg. & Dealer of Fancy Sarees**

**160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor, Kolkata-700 007**

**(s) 2272-5487 Mob : 9331105467**



করেন তরুণদের। রাজধানী-সহ সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়া ও গণহত্যার খবরের পাশাপাশি ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাও পৌঁছে যায় দাশপাড়ায়। সে এক অবিস্মরণীয় সময়। তারপর মুক্তিযুদ্ধ। মাস্টারমশাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে দাশপাড়ার তরুণদেরই শুধু সংগঠিত করেননি, স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। মুসলমান যুবকরাও সংগঠিত হন তাঁরই নেতৃত্বে। মাস্টারমশাই সবাইকে নিয়েই সীমান্তের ওপারে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নেন, পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধ করেন। বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দেন। বীরগতিপ্রাপ্ত হন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। মাস্টারমশাইও গুরুতর আহত হয়েছিলেন। ভারতে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজি তিরানব্বই হাজার সেনা-সহ আত্মসমর্পণ করেন ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা জানতো, মাস্টারমশাই এলাকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব মানুষের প্রিয় নেতা। তাই প্রচণ্ড হিংস্রতায় শুধু দাশপাড়া নয়, আশেপাশের মুসলমান পল্লীগুলোর ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রক্তাক্ত হয়েছিল গোটা জনপদ। কিন্তু

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে দেখা গেল, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের সে নৈকট্য স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। ধর্মান্ধতার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ক্রমেই হিংস্র রূপ নিতে শুরু করলো। ফিকে হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত রাজনীতি ফিরে এলো প্রচণ্ড দাপটে, সেই পাকিস্তানি শক্তি নিয়ে।

নিখিলেশের সামনে সেই অতীত যেন বারবার এসে কড়া নাড়ছে। মাস্টারমশাই, বীর মুক্তিযোদ্ধা জানকীপ্রসাদ চক্রবর্তী লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে বলছেন, যুদ্ধ করে স্বাধীন দেশ এনেছি। কোনোদিন মাথা নত করিনি। আমরা সবাই মিলে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচবো। যারাই পাকিস্তানের নষ্ট রাজনীতি আবার ফিরিয়ে আনতে চায় আমরা তার বিরুদ্ধে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবো। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার কয়েক বছর পর বাবা মুরলী দাশ চলে গেলেন। তার পরপরই মা। বাবা বলতেন, আমি যেদিন থাকবো না, মাস্টারমশাই অভিভাবক হয়ে থাকবেন। দাশপাড়ার নবীন-প্রবীণ সবার অভিভাবক মাস্টারমশাই। জানকীপ্রসাদ নামটা 'বীর মুক্তিযোদ্ধা'র আড়ালে চলে গেছে।

****

সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা জানকীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্বাধীনতার পর থেকেই 'মুক্তির মানুষ' হিসেবে গোটা জনপদের অভিভাবক হয়ে দাঁড়ান। মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি, গণতান্ত্রিক রাজনীতি, সমান অধিকারের রাজনীতি ধ্বংস করে পরাজিত পাকিস্তানি রাজনীতি ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে, তিনি বুঝতে পারছিলেন এটা ষড়যন্ত্র। এও বুঝতে পারছিলেন, বাংলাদেশের মাটিতে যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা, হিংস্রতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসের রাজনীতি অঙ্কুরিত করে বটবৃক্ষে পরিণত করা হচ্ছে, আবার অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, তার ঝাপটা এই জনপদেও এসে ধাক্কা দিচ্ছে। তিনি বেদনার্ত হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস হারাচ্ছিলেন না।

স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জানকীপ্রসাদ। কয়েক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেন। তারপরও তিনি ক্লাস নিতেন কোনো আর্থিক সুবিধা ছাড়াই। বলতেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছি, ছাত্র পড়িয়েছি। পড়ানো থেকে অবসর নিলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল্?

মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী মনোরমাও শিক্ষিকা, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, তিনিও অবসর নিয়েছেন। এখন অসুস্থ। একমাত্র মেয়ে লাবণ্য, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার সেই লাবণ্য নাম মাস্টারমশাইয়ের প্রিয়। তাই মেয়ের নাম রেখেছেন । লাবণ্যর বিয়ে হয়েছে , ঢাকায় থাকে। স্বামী এক সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা। লাবণ্য কলেজে পড়ায়। পুরনো ঢাকায় থাকে, তাদের একমাত্র সন্তান সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়ে।

মাস্টারমশাই স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারাও গড়ে তুলেছেন এলাকায়। তিনি বিশ্বাস করেন মুক্তমনের মানুষ গড়তে হলে শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি ও ক্রীড়া আন্দোলন চাই। সেভাবেই তিনি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন এবং ফুটবল-ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিয়মিত শরীরচর্চার জন্যে যোগকেন্দ্র হয়েছে। এগুলো নিয়েই তাঁর সময় কাটতো। মাঝে মধ্যে সবাইকে নিয়ে বসতেন, নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতেন। বলতেন, আমরা অনেক ছিলাম, আজ মাত্র কয়েকশো মানুষে নেমে এসেছি। এ সংখ্যা যেন আর কমে না যায়। মাস্টারমশাই তুলে ধরতেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ। আজ সরকারি হিসেবেই এই হার ৮ শতাংশের কমে নেমে এসেছে। আমরা এ মাটির সন্তান, দেশ ত্যাগ করবো কেন? এ মাটিতেই লড়াই করে বাঁচতে হবে।

মাস্টারমশাইয়ের এই কথাগুলো সবাইকে সাহস জোগাতো। একাত্তরের পর থেকে বৈরী পরিস্থিতি বারবার হানা দিয়েছে এই জনপদে। হামলা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ সত্ত্বেও আবার ঘুরে দাঁড়াতে সাহস জুগিয়েছেন মাস্টারমশাই। সেই মানুষটিকেই এবার সরিয়ে দিয়েছে নরপশুরা। পশুদের সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

সেই ভয়ংকর দিনটির কথা মনে হলে এখনো শিউরে ওঠে দাশপাড়ার মানুষ, আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। এখনো হামলার ছাপ দাশপাড়ার সর্বত্র, রামগঞ্জে। সেদিন দুপুরের দিকে রামগঞ্জে হঠাৎ শোনা গেল, মাস্টারমশাই ইসলাম অবমাননা করেছেন। তাঁর মোবাইল থেকে ফেসবুকে এরকম একটি বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। বার্তায় কী ছিল কেউ জানে না, দেখেনি। মাস্টারমশাইয়ের কানে যখন খবরটি পৌঁছালো তখন তিনি দুপুরে খেতে বসেছিলেন। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এরকম কোনো বার্তা তো তিনি দেননি। এটা হতেই পারে না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

তিনি নিশ্চিন্ত মনে ভাত খেয়ে বারান্দায় বসেছিলেন। পাশে ছিলেন মনোরমা। পাড়ার কয়েকজন ছুটে এসেছেন বাড়িতে, একী শুনছি মাস্টারমশাই?

আমিই তো বুঝতে পারছি না, এরকম কথা কেন বলা হচ্ছে। আমার তো কোনো ফেসবুকই নেই। আমি তো ব্যবহার করি না। নিশ্চয়ই কেউ কৌতুক করেছে।

কৌতুক যে নয় একটু পরেই টের পাওয়া গেল। ছুটে এসে একজন খবর দিল, দাশপাড়ার দিকে একটি মিছিল আসছে। মিছিলে মাস্টারমশাইয়ের বিরুদ্ধে স্লোগান হচ্ছে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে স্লোগান হচ্ছে। দাশপাড়ার সবাই বাড়ি

থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে।

তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মাস্টারমশাই। এ কী করে হয় ? নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। ততক্ষণে মিছিল দাশপাড়ায় ঢুকে পড়েছে। এগিয়ে আসছে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দিকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, মিছিল প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। সামনে ব্যানার দেখা যাচ্ছে, 'ইসলাম অবমাননাকারী জানকী মাস্টারের ফাঁসি চাই'। 'হিন্দুরা দেশ ছাড়'। 'আল্লাহ-রসুলের অপমান মানবো না, মানবো না'। মিছিলের সামনে যারা তাদের কাউকে কাউকে তিনি চেনেন। সঙ্গে যে ছেলেরা রয়েছে তাদের স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্র বলে মনে হয়। কয়েকজনের হাতে লাঠি, বড় বড় ছোরা।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির উঠোনে তখন স্লোগান আর স্লোগান, লাফিয়ে উঠে শক্তিমত্তা প্রকাশ করা হচ্ছে। মাস্টারমশাই হাত উঁচিয়ে সবাইকে শান্ত হতে বলছেন, বাবারা আমার কথা শোন। তোমরা ভুল করছো। এসো আমাকে বল, আমি কী করেছি। উত্তেজিত হয়ো না। আমার কথাটা শোন বাবারা। মাস্টারমশাইয়ের পাশে স্ত্রীও এসে দাঁড়ালেন। তিনিও হাত জোড় করে আকুতি জানাতে লাগলেন, বাবারা শোন।

কেউ শুনছে না মাস্টারমশাইয়ের কথা, মনোরমার কথা। হঠাৎ কয়েকজন লাঠি-চাপাতি (বড় আকৃতির ছোরা) হাতে বারান্দায় লাফ দিয়ে উঠে মাস্টারমশাইকে ধরে, টেনে-হিঁচড়ে উঠোনে নামিয়ে কোপাতে লাগলো, লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়লো আকাশে-বাতাসে। সেই আর্তনাদ ছাপিয়ে উল্লাস ও স্লোগান। রক্তাক্ত হয়ে গেল উঠোন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের রক্তাক্ত দেহ নিথর হয়ে গেল। দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন মনোরমা। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে পাড়ার ছুটে আসা সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

মিছিলের এক নেতা হাতমাইকে (হ্যান্ডমাইক) এই হত্যাকাণ্ডকে ইসলামের বিজয় বলে ঘোষণা করে 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি দিলেন। প্রত্যুত্তরে আকাশ-ফাটা গর্জন, 'আল্লাহু আকবর'। অনেকক্ষণ ধরে চলে ইসলামের বিজয় উৎসব। এরপরই ইসলামের সৈনিকরা ছড়িয়ে পড়ে গোটা দাশপাড়ায়। প্রথমে লুটপাট, তারপরই ধর্ষণের আরেক উৎসব। মা-মেয়ে কারও রেহাই নেই। গোটা পাড়াজুড়ে চিৎকার, আর্তনাদ। মাঝেমধ্যে নরক গুলজার করা 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। লুঠপাট, ধর্ষণ শেষ হওয়ার পর বাড়িতে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ। এর মধ্যেই একটি দল মন্দিরে হামলা করে। রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ ভেঙে টুকরো টুকরো করার পর পূজারি মাধব ব্রহ্মচারীকেও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর দেহে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্রহ্মচারীর দেহ যখন পুড়ছিল তখন আনন্দে ফেটে পড়ছিল ইসলামি শান্তিসেনারা।

সূর্য গেছে অস্তাচলে, আঁধার নেমেছে দাশপাড়ায়। বিধ্বস্ত এই জনপদের আকাশ তখন লাল রক্তবর্ণ। বাড়ি, গাছপালা সব ছায়া হয়ে গেছে। যেন এক ভৌতিক পরিবেশ। অধিকাংশ বাড়ি থেকে তখনো লেলিহান শিখা ভীতি ছড়াচ্ছে। পরে জানা গেছে, হামলাকারীরা গান পাউডার ও কেরোসিন ব্যবহার করেছিল, তারা এসেছিল তৈরি হয়েই। দাশপাড়ায় ধ্বংসকাজ শেষ করার পর হামলাকারীদের বেশিরভাগই রামগঞ্জে ছুটে যায়। সেখানে আশেপাশে কয়েকটি হিন্দু বাড়ি ও বাজারের হিন্দু দোকানগুলো বেছে বেছে ভাঙচুর করে, লুটপাট চালায়। তবে এখানে অগ্নিসংযোগ করেনি, কারণ পাশের মুসলমানদের বাড়িঘর ও দোকানপাটও ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

মাস্টারমশাইয়ের মৃতদেহ উঠোনে পড়েছিল, পাশেই সংজ্ঞাহীন মনোরমা। হত্যাকাণ্ডের পর মৃতদেহের পাশে কেউ ঘেঁষতে সাহস করেনি। হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর একজন-দুজন করে এগিয়ে আসেন প্রতিবেশীরা। না, কোনো শব্দ নেই, এক শুনশান নীরবতা যেন নারকীয় ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কাঁদছেন সবাই, কিন্তু নিঃশব্দে, ভয় কান্নার আওয়াজ যেন হামলাকারী পশুরা শুনতে না পায়। এখন আবার কিছু পুলিশ দেখা যাচ্ছে। হামলার সময় কয়েকজনকে দেখা গিয়েছিল। পরে তাদের আর দেখা যায়নি। এখন ছায়ামূর্তির মতো তারা দাঁড়িয়ে আছে। আসেননি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। যাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে জনপদের মানুষ সেই জনপ্রতিনিধিও দেখতে আসেন সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর।

দীর্ঘ সময় পর নিঃশব্দে আলোচনা, মাস্টারমশাইয়ের, মন্দিরের পূজারির শেষকৃত্য কীভাবে হবে। মাস্টারমশাইয়ের মেয়েকে এর মধ্যে খবর দেওয়া হয়েছে। জানা গেল, রাতের মধ্যেই তারা বাড়ি এসে পৌঁছুবে। দু'একজন বয়স্ক মহিলা মনোরমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল, এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কারা যেন কিছু ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে মাস্টারমশাইয়ের মরদেহের ওপর। এক পুলিশ কর্মকর্তা এসে বললেন, তারা আছেন, আর ভয়ের কিছু নেই।

আবছা আলোর মধ্যেই সবাই পুলিশ কর্মকর্তার দিকে তাকালো, কেউ জবাব দিল না। জবাব হতে পারতো, লুট করার মতো আর কিছুই তো অবশিষ্ট নেই। দাশপাড়া কয়েক ঘণ্টায় সব হারিয়েছে। এখান থেকে থানা মিনিট চল্লিশের পথ, পুলিশ এলো সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এখন আমাদের পাহাড়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি? কিন্তু কেউ কিছু বললেন না। নীরবতার মধ্যে যে জবাব আছে, পুলিশের তা বোঝার ক্ষমতা আছে মনে হয় না।

দাশপাড়ায় রাত গভীর হচ্ছে, অনেক বাড়িতেই আলো জ্বলছে না। নিস্তব্ধতাই যেন যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। হামলার সময় অনেক বাড়িতেই পুরুষরা ছিলেন

না, কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিলেন। যখন ছুটে এলেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কে কাকে সান্ত্বনা দেবেন?

প্রায় মাঝরাতের দিকে এলো লাবণ্য স্বামীকে নিয়ে। না কোনো কান্না নয়, বাবার মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন চুপ হয়ে গেল। কাঁদতে ভুলে গেছে লাবণ্য। এক বয়স্ক মহিলা লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, তুই কাঁদ লাবণ্য, একটু কাঁদ। চিৎকার করে কেঁদে হালকা হ'। আমরা সবাই কেঁদেছি, আর জল নেই চোখে। এবার তুই কাঁদ মা।

কিন্তু না, লাবণ্য কাঁদলো না। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর ছুটে গেল মা'র কাছে। বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই নীরবতা। নীরবতাও কখনো কখনো অসহ্য হয়ে যায়। অন্ধকার যেন সেই নীরবতাকে আরও গাঢ় করে তুলেছে। যে মাস্টারমশাই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, দেশত্যাগের বিরুদ্ধে শক্ত দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই মানুষটাই নরপশুদের শিকার হলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, কেন দেশ ছাড়বি, এ মাটি আমাদের পিতৃপুরুষের মাটি। অধিকার আমরা ছাড়বো না। সেই কণ্ঠ আর শোনা যাবে না। যে মানুষটিকে সামনে রেখে গোটা দাশপাড়ার মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন, সন্ধ্যা নামলে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সবাই জড়ো হয়ে কীর্তন কিংবা মাধব ব্রহ্মচারীর সুললিত ধর্মীয় আলোচনা শুনে ঘুমোতে যেতেন সেই দিন যে শেষ হয়ে গেল !

পরের দিন যখন সূর্য উঠলো মাস্টারমশাইয়ের চিতা তখন প্রায় নিভে এসেছে। গোটা দাশপাড়ার মানুষ শ্মশানে জড়ো হয়েছেন। চিতার আগুনের দিকে সবাই তাকিয়ে আছেন, এরকম নীরবতার মধ্যে দাহ চোখে পড়ে না। অন্যদিকে মাধব ব্রহ্মচারীকে মন্দিরের পাশেই সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছেও ছিল তাই, তিনি প্রায়ই বলতেন, মৃত্যুর পর যেন মন্দিরের পাশেই তাঁর সমাধি হয়। তাঁর শেষ ইচ্ছাকে দাশপাড়ার মানুষ সম্মান জানিয়েছে। এ সময় সেখানেও অনেকে ছিলেন। সমাহিত করতে বেশি সময় লাগেনি। দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সমাধি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। মৃতুর পর কীর্তন হয়, কিন্তু মাস্টারমশাই বা মাধব ব্রহ্মচারীর শেষকৃত্যে কীর্তনের আয়োজন করার সাহস হয়নি দাশপাড়ার মানুষের। নীরবে-নিভৃতে শেষযাত্রা সম্পন্ন হলো। শেখ হাসিনা নিয়ম করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনাবসানের পর রাষ্ট্রীয় সম্মাননা জানানো হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা জানকীপ্রসাদ সেই সম্মাননা পাননি। প্রশাসনের কেউ আসেনি।

একটা দিন একটা রাত দাশপাড়াকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। মজহবির প্রচণ্ড সুনামি এসে যেন এই জনপদকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আগুনে পুড়ে দাশপাড়ার বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে, প্রাণ নেই। মানুষগুলো যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছেন। কোনো মা ও মেয়ে নরপশুদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। বয়স নরপশুদের কাছে বিবেচ্য নয়, নারীশরীর পেলেই হয়। এভাবেই ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে তারা। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে কোনো সরকারই এই মজহবি নরপশুদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে নারাজ। কারণ এতে মুসলমানদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয় থাকে। ইসলাম যেখানে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের দল, জাতীয়তাবাদী দল, ইসলামপন্থী দল, বামপন্থী দল সব রাজনৈতিক দলই এক সুরে বাঁধা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ঘটনার দুদিন পর মাস্টারমশাইয়ের মোবাইল পরীক্ষা করে পুলিশ বলেছে, কোনো ইসলামবিরোধী বার্তার কোনো প্রমাণ তারা পায়নি। গত দু'দশক ধরে এ ধরনের ইসলাম অবমাননার নাম করে যেসব ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ও গোটা হিন্দু পাড়া কিংবা হিন্দুপ্রধান গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এ ধরনের ইসলাম বিরোধী বার্তা নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে, হিন্দু সমাজের কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে নিশানা করে এই ধরনের বার্তা দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ এনে 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তিনি জানতেই পারেননি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ষড়যন্ত্রকারীরা সুকৌশলে ব্যবহার করে গল্পটা সাজিয়েছে। কয়েকবছর আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নাসিরনগরে জেলেপাড়ার এক ছেলের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ওঠে। বলা হয়, ইসলাম ও নবিকে অবমাননা করে ফেসবুকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাকে প্রচণ্ড গণপিটুনির পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এক রাতের মধ্যে গোটা জেলেপল্লীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। গণহারে ধর্ষণের শিকার হন মহিলারা। পরে প্রমাণিত হলো, এই ছেলে তেমন শিক্ষিত নয়, ফেসবুকও চালাতে জানে না। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের (র‍্যাব) পরীক্ষায় প্রমাণ পাওয়া যায় এই ছেলে নয়, জাহাঙ্গির নামে এক কম্পিউটার দোকানের মালিক এই বার্তাটি ছড়িয়েছে। সেই জেলে পরিবারের ছেলেটি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও এখনো মামলা থেকে রেহাই মেলেনি। প্রতি মাসেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে আদালতে দাঁড়াতে হচ্ছে। আইনের হাত কত লম্বা হিন্দুরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সর্বশেষ জানা গেছে, ওই জেলেপল্লীর অনেকেই এই ঘটনার পর জায়গাজমি মুসলমানদের কাছে জলের দরে বিক্রি করে দেশত্যাগ করেছেন। গত দুই দশকে ইসলাম অবমাননার অজুহাতে হামলা এবং গোটা হিন্দুপল্লী বা পাড়া লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও মহিলাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কয়েকশো ঘটনা ঘটেছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, সাজা পায়নি।

উদ্দেশ্য সবখানেই এক ও অভিন্ন,

ঘটনার পর হিন্দু সমাজের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে, তারা এলাকা ছাড়ে অথবা দেশত্যাগ করে। জায়গাজমি দখল বা নামমাত্র মূল্যে হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

দাশপাড়ার জমি অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠছে, রামগঞ্জ পৌরসভার দিকে এগুচ্ছে। সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। অদূরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে রিসোর্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজধানীর বড় কিছু ব্যবসায়ী। জেলা সদরের সঙ্গে এই জনপদের দূরত্ব কমে আসছে। কলকারখানা হচ্ছে, শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে। এ অবস্থায় গত কয়েক বছরে জায়গাজমির দাম বেড়েছে।

মাস্টারমশাই কয়েকবারই বলেছেন, তোরা সতর্ক থাকিস, জমির দাম বাড়ছে। অনেকের লোলুপ দৃষ্টি পড়ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধার সতর্কবাণী ও আশঙ্কা সত্যি হলো। এই জনপদের অভিভাবক হয়ে যিনি সবসময় বরাভয় দিতেন, তাঁকেই নিশানা করে হত্যা করা হলো। আর গোটা দাশপাড়া ও রামগঞ্জে হামলা করে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি করা হলো, যাতে এই জনপদ হিন্দু শূন্য হয়ে পড়ে। তিনি বটগাছের মতো ছিলেন, সবাইকে ছায়ার মধ্যে রেখেছিলেন। সেই বটগাছ ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

****

নিখিলেশ দোকান থেকে ফেরার পথে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি গেলেন। উঠোনে এখনো রক্তের দাগ। সেখানে একটি তেলের প্রদীপ জ্বলছে, কিছু ফুল ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। শুধু এ বাড়িতে নয়, দাশপাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই প্রদীপ জ্বলছে, বিপদনাশিনীর উদ্দেশে এভাবে প্রদীপ জ্বালানো হয়। এ জনপদের মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, বিপদনাশিনী দেবী অপশক্তির হাত থেকে সন্তানদের রক্ষা করেন। তাঁর উদ্দেশে প্রদীপ জ্বালালে অন্ধকার দূর হয়, বিপদ কেটে যায়।

নিখিলেশ উঠোনে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইয়ের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। মাস্টারমশাইয়ের চেহারা চোখের সামনে ভাসছে। সদা হাস্যময় মানুষটি নেই, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। যে কোনো বিপদে মানুষ তাঁর কাছেই ছুটে আসতো পরামর্শের জন্য। এখন কার কাছে যাবে?

কাকাবাবু উঠে আসুন, লাবণ্যর ডাকে সম্বিত ফিরে আসে। লাবণ্য ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিখিলেশ তার পিছু পিছু ঘরে ঢোকেন, কেমন আছো মা তোমরা?

কিছু বলতে হয় বলে প্রশ্ন করা। এ সময় কারও কাছ থেকে জবাব মিলবে না তিনি জানেন। লাবণ্যও জবাব দিল না। নিখিলেশ বৈঠকখানায় এসে বসলেন। এই কক্ষকে মাস্টারমশাই ড্রয়িং রুম বলতেন না, বলতেন বৈঠকখানা। দাশপাড়ার মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বিশিষ্ট জনেরা এসে এখানেই বসতেন। এই বৈঠকখানা সবসময় জমজমাট থাকতো। এখন শূন্য ঘর, না একেবারে শূন্য নয়। লাবণ্যর স্বামী অচিন্ত্য বসে পত্রিকা পড়ছে। নিখিলেশকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে। নিখিলেশ বসলেন, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে পাশের ঘরে মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী শুয়ে আছেন। লাবণ্য সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো, মা কোনো কথা বলছে না। খাওয়াদাওয়া নেই। কী যে করি!

সময় লাগবে স্বাভাবিক হতে। চোখের সামনে এরকম নৃশংস ঘটনা কখনো প্রত্যক্ষ করেননি, নিখিলেশ সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাবিত্রী ও তার মায়ের কথা মনে পড়ায় তার কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যায়। দাশপাড়ার ঘরে ঘরে কান্না, থামাবে কে? কে কাকে সান্ত্বনা দেবে?

মনোরমার স্বামী আর্ত চিৎকার করছিলেন, কিন্তু নরপশুরা আরও উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। ওদের হিংস্রতার সামনে কারও কিছু করার ছিল না। কিছু পুলিশকে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তারা বর্বরতা থামানোর কোনো চেষ্টাই করেনি। এক পর্যায়ে তাদের আর দেখাই যায়নি। নিখিলেশ সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি, পরে শুনেছেন। তিনি দোকানে ছিলেন। মিছিল সংগঠিত হয়েছে রামগঞ্জে, তারা দ্রুত দাশপাড়ার দিকে এগিয়ে আসবে ভাবতে পারেননি। যখন শুনতে পান, প্রায় ছুটতে ছুটতে আসেন। ততক্ষণে মাস্টারমশাই ও মাধব ব্রহ্মচারীকে হত্যা করে ইসলামের জয়যাত্রা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নিজের বাড়িতে ঢুকে ইসলামি সেনাদের মুখোমুখি হন। সাবিত্রী ও তার মা'র সর্বনাশ করে তারা বেরিয়ে যাচ্ছিল। বেরোবার সময় পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় বাড়িতে। কিছুক্ষণের জন্য হতবিহ্বল হয়ে যান নিখিলেশ, তারপরই টেনে হিঁচড়ে বের করে আনেন অর্ধনগ্ন মা-মেয়েকে। সাবিত্রীর তখনো জ্ঞান ফেরেনি। সে দৃশ্য তিনি ভুলে যেতে চান, কিন্তু পারছেন না। রাতে ঘুম আসে না। নিজেকেই তার অপরাধী মনে হয়। তিনি ওদের বাঁচাতে পারেননি।

লাবণ্য কিছু যেন বলছিল, কিন্তু বুঝতে পারেননি। লাবণ্য আবার বলে, কাকাবাবু কি কিছু ভাবছেন ?

দুঃস্বপ্ন থেকে ফিরে নিখিলেশ বলেন, না মা, তেমন কিছু না। বল মা, কী যেন বলছিলে।

কাকা বলছিলাম, নমো নমো করে বাবার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করলাম। অপমৃত্যুর জন্য শ্রাদ্ধের দিন কমে গেল। এখন আমাদের কি আর কিছু করণীয় আছে? আমরা তো কিছু জানি না। ঢাকায় আমি ও আপনাদের জামাই দুজনেই চাকরি ফেলে এসেছি। মা এই অবস্থায়, কী করবো বুঝতে পারছি না।

আমি কী পরামর্শ দেবো মা, আমি নিজেই তো অসহায় হয়ে পড়েছি। বাড়ি ফিরতেই ভয় পাই। এতোদিন পরামর্শের জন্যে যার কাছে ছুটে আসতাম, তিনিই

তো নেই। প্রত্যেক ঘরেই এখন কান্না। কী হবে আমাদের বুঝতে পারছি না। আজ এক ভয়ংকর কথা শুনলাম। আমাদের এমপি সাহেব নাকি বলেছেন, তিনি সাংবাদিকদের নিয়ে আসবেন। আমাদেরকে তাদের সামনে বলতে হবে, এখানে সেভাবে কোনো হামলা হয়নি। কোনো কোনো সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত করে খবর ছেপেছে। এ খবর বিদেশের কাগজেও ছাপা হয়েছে। সরকার চায়, পাল্টা কিছু খবর ছাপা হোক।

লাবণ্য শুনে হতবাক। অচিন্ত্য বলে, নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে। ওরা আর কী চায়? আপনারা কি সাংবাদিকদের সামনে বলবেন কিছু হয়নি ?

আমার আর কিছু হারানোর নেই। যাই ঘটুক, আমি সত্যি কথাই বলবো। জানি এমপি সাহেব খুশি হবেন না, কিন্তু আমার আর কী ক্ষতি হবে ? আমি তো সবই হারিয়েছি। ওরা কী চায় তা মাস্টারমশাই আগেই আমাদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি মাথার ওপর বটগাছের মতো ছিলেন বলে সাহস পায়নি। আজ আমাদের মাথার ওপর কোনো ছায়া নেই। কিন্তু মাথা নীচু করে থাকলে বাঁচা যাবে না। আমি অন্তত দাঁড়াবো।

লাবণ্য বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এটাই আশা করেছিলাম কাকাবাবু। আপনাদের মধ্যে বাবা বেঁচে থাকলে আমি সবচেয়ে বেশি গর্ব অনুভব করবো। তবে আপনি একা নন, দাশপাড়ার সব মানুষ যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলেই বাঁচবেন, নয়তো কেউ রেহাই পাবেন না।

কিন্তু এ কাজটি করবে কে? দাশপাড়ায় স্বাভাবিক জীবন এখনো শুরু হয়নি। নিখিলেশের নিজের বাড়িতেও নয়। রাধারানি যন্ত্রচালিতের মতো কোনোরকমে খাবারটুকু তৈরি করেন, নিজে মুখে তোলেন কিনা চোখে পড়েনি। তবে মেয়েকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। নিখিলেশ নিজেও খেতে বসেন বটে, কিন্তু নিয়ম রক্ষার জন্য। মনে করেন, তিনি খেতে না বসলে রাধারানি আরও ভেঙে পড়বে। বাড়ির অনেক সামগ্রী পুড়ে গেছে, তার মধ্যেই সময় গড়াচ্ছে। কখনো স্বামীকে বলেন না, অমুক এনো, তমুক এনো। ঘরে ঠাকুরের আসন পুড়ে গেছে, লক্ষ্মী ও গোপালের মূর্তি কালো হয়ে গেছে। ইতস্তত পড়ে আছে পূজার নানা সামগ্রী। নিখিলেশ বলেছে কয়েকবারই, ঠাকুরের আসনটা গুছিয়ে নাও। কিন্তু না, রাধারানি যেন শুনেও শোনেননি। ঠাকুরের প্রতি অভিমান ? হয়তো-বা বুঝতে পারেন না নিখিলেশ। তবে উঠোনে বিপদনাশিনীর উদ্দেশে প্রদীপ জ্বলছে ঠিকই। পাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই গেছেন নিখিলেশ, একই চিত্র।

বাড়ি ফিরতে ভয় নিখিলেশের, রাধারানি ও সাবিত্রীর মুখ দেখলেই হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন যেন থেমে যায়। মাস্টারমশাইয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে লাবণ্যকে বলেন, তোমরা মাকে এভাবে ফেলে যেও না। আমার মনে হয়, তোমাদের সঙ্গে ঢাকা নিয়ে যাও। সময় সবকিছু স্বাভাবিক করে দেবে।

নিখিলেশ পথে নেমে হরেন দাশ ও রঘুরামের বাড়িতে ঢুকলেন। দুজনেই আহত হয়েছেন পরিবারের মেয়েদের বাঁচাতে গিয়ে। মেয়েরা নরপশুদের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। দুই পরিবারেই রাধারানি ও সাবিত্রীদের দেখলেন আরেকবার। তাদের নতুন করে কিছু বলতে পারলেন না। আরও কয়েকটি বাড়ি গেলেন। নলিনীর ঠাকুমার বয়স সত্তরের ওপরে। তাঁকেও ছাড়েনি নরপশুরা। তিনি মাটির বারান্দায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। নিখিলেশ দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন, ঠাকুমার সামনে পড়তে চান না। নলিনীর ঠাকুমা কাঁদেন না, নীরবে তাকিয়ে থাকেন, চোখ দিয়ে জল পড়ে। এ দৃশ্য সবচেয়ে মর্মান্তিক।

বাড়ি যেতে যেতে মনে পড়লো, তিনি তো লাবণ্যকে বলে এলেন, সময় সবকিছু স্বাভাবিক করে দেবে। কথাটা শুনতে ভালো, এছাড়া বলবেনই-বা কী?

বিকেল নেমেছে। এসময় বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে খেলায় মেতে ওঠে। ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু কী নেই দাশপাড়ায়। কোনো কোনো বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম, গানের সুর ভেসে আসে। কিন্তু সেই হামলার পর বাচ্চারাও যেন খেলতে ভুলে গেছে। গান আসে না। অনেককেই দেখলেন হয় বাড়ির বারান্দায়, কিংবা পুকুরঘাটে চুপচাপ বসে আছে। তারা কি কথা বলতেও ভুলে গেছে ? সেদিনের পর থেকে কেউ স্কুলে যায় না। বাচ্চারাও হয়তো ভাবছে, এসময় খেলাধুলা করতে নেই। গান করতে নেই। বড় গলায় কথাও বলতে নেই।

সন্ধ্যায় শাঁখ বাজে না। কাসর-ঘণ্টা বাজে না। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে না। দুপুরে মহিলারা কয়েকটি বাড়িতে একত্র হয়ে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করেন, গানের সুরে পাঠ হয়। এটা দাশপাড়ার প্রাণ। সেদিনের পর পাঠ দূরে থাক, মহিলারা ঘর থেকে বেরোন না। মন্দিরে পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। কবে শুরু হবে কেউ জানে না। এ বিষয়টি নিয়ে কেউ ভাবছেন বলেও মনে হয় না। সামনে অনেক অনুষ্ঠান। রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী তারপরই দুর্গাপূজা। দিন এগিয়ে আসছে। কী হবে মাথায় আসছে না। ভাবতে ভাবতে নিখিলেশ বাড়ি ঢুকলেন। রাধারানি শুয়ে আছেন। সাবিত্রী জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু অপেক্ষা করলেন, এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে, ডাকলেন, মা, কাছে আয় মা।

সাবিত্রী ফিরে তাকালো। রাধারানি উঠে বসলেন। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিঃশব্দে। সাবিত্রী হঠাৎ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবার বুকে— বাপি, আমি আর পারছি না। কী করবো বলে দাও। বলে দাও আমায়। আমরা কি দেশ ছেড়ে যাবো?

কয়েকদিন নিস্তব্ধতার পর নদীতে যেন জোয়ার এলো। বাঁধভাঙা কান্না। রাধারানি

এগিয়ে এসে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। বললেন, কান্না ভুলে গিয়েছিল মেয়েটা। কাঁদুক, কাঁদতে দাও। আমি তো কাঁদতেও ভুলে গেছি। ও কাঁদুক।

দাশপাড়ার মেয়েরা, মায়েরা এভাবে কেঁদে একটু হালকা হোক। বাবারাও কাঁদুক। নিখিলেশ মেয়ের কান্নার জলে ভেসে যাওয়া বুকে নতুন করে জীবনকে পাওয়ার চেষ্টা করলেন।

****

আমরা কি দেশ ছেড়ে যাবো ?

মেয়ে কথা বলেছে,বাবা-মা দুজনেরই আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু সে কী বলতে চাইছে? এ কথার মানে কী? নিখিলেশ একটা আশঙ্কার কথা ভেবে শিউরে উঠলেন। রাধারানিকে এখনই কিছু বললেন না। শুধু বললেন, প্রায় এক সপ্তাহ পর মেয়ে কথা বলছে। এটাই বড় কথা। সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠাকুরের আসনটা এবার গুছিয়ে নাও।

রাধারানি কোনো জবাব দিলেন না। রান্নাঘরে গিয়ে বাসনপত্র নিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেলেন। নিখিলেশ বুঝতে পারলেন, যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তা সহজে নিরাময় হবে না। অতুলদাও সেকথা বলছিলেন। তার ছেলে বাপ্পা মাকে ধর্ষণের বীভৎস দৃশ্য দেখেছে। এসময় ঘরে আলমারির পেছনে লুকিয়ে পড়ে ভয়ে কাঁপছিল। এক সময় অজ্ঞান হয়ে যায়। এর পর এখনো সে কথা বলেনি। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে। একমাত্র ছেলে অতুলের। ছেলেটা কাঁদে না, বাপ্পার মা কাঁদে না, শুধু নীরবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু অতুল কাঁদে। সারাদিন ঘরের বারান্দা কিংবা পুকুরঘাটে গিয়ে বসে থাকে। এ অবস্থা প্রায় প্রতিটি বাড়িতে।

পাহাড়ের কোলে এই গ্রামটিতে প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে। ছোট্ট জনপদ, কিন্তু গোটা পাঁচেক পুকুর, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী, মূলত এটি একটি খাল, বর্ষায় পাহাড়ি ঢলে স্ফীত হয়ে নদীর আকার ধারণ করে। গ্রীষ্মে হাঁটু জল। গ্রামটিকে অপরূপ করে সাজিয়েছে। সবুজের সমারোহ গ্রামটিকে ঘিরে। প্রতিটি সন্ধ্যা নামে মন্দিরে আরতির মুখর ধ্বনিতে। গোটা দাশপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে কীর্তনের সুর। সেই শব্দে মিশে যায় শাঁখ ও কাসর-ঘণ্টার শব্দ। স্কুল থেকে ফিরে ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলায় মেতে ওঠে। সন্ধ্যায় পড়তে বসে। এটাই দাশপাড়ার জীবনের ছন্দ। সেই দাশপাড়ায় এখন দিনের আলো আতঙ্কের, রাত নামে নিঃশব্দে আরও ভীতি ছড়িয়ে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার যেন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারকে এখন ভয় পেতে শিখেছে দাশপাড়া। কোথায় কে ওত পেতে বসে আছে ! শুনশান নীরবতা রাত-দিনকে এক করে দিয়েছে। অগুনতি পাখপাখালির রাজ্য এই জনপদ, কিন্তু এখন পাখিরাও যেন সতর্ক হয়ে ডাকে।

তাই-ই মনে হয় অভিজিতের। এক-আধটু কবিতা পড়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু বোন প্রিয়াঙ্কা সব কেড়ে নিয়ে গেছে। একমাত্র বোন, অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে নরপশুরা। ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, আত্মঘাতী হয়। বাবা নেই, মা আছেন। একা থাকেন, তবে প্রতিবেশীরা একাকিত্ব অনুভবের সুযোগ দেয় না। এটা দাশপাড়ার রীতি, সবাই মিলে এক পরিবার। বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকদিনের ছুটি থাকায় মাকে দেখতে বাড়ি এসেছিল। আসা-যাওয়ায় কখনো একা ছাড়ে না বোনকে, অভিজিৎকেও আসতে হয়। মায়ের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেনি নরপশুরা। মেয়ের ধর্ষণে বাধা দিতে গিয়েছিল মা। ঘটনার দিন অভিজিৎ রামগঞ্জে গিয়েছিল, পরের দিন ঢাকা ফেরার বাসের টিকিট কাটতে। সেখানে কয়েকজন বাল্যবন্ধুর দেখা, এক রেস্তোরাঁয় আড্ডায় মেতে উঠেছিল। সেখানে বসেই জেহাদিদের মিছিলের খবর পেয়েছিল। কিন্তু সেটা যে দাশপাড়ার দিকে ছুটে যাবে, মাস্টারমশাইকে নিশানা করবে কল্পনাও করতে পারেনি। যখন ছুটে আসে সব শেষ হয়ে গেছে।

সকালে দেখা হয়েছিল নিখিলেশের সঙ্গে। সন্ধ্যার পর অভিজিৎ নিখিলেশের বাড়িতে আসে। তার আগে দাশপাড়ার শ্মশানে গিয়েছে। দাশপাড়ার সর্বজনীন শ্মশান, পূর্বপুরুষরা শুয়ে আছেন এখানে। সদ্য যুক্ত হয়েছেন মাস্টারমশাই, প্রিয়াঙ্কা। শ্মশানের পশ্চিম প্রান্তে একটা কালী মন্দির রয়েছে, শ্মশানকালী নামে তিনি পূজিতা হন। অমাবস্যার রাতে এখানে অনেকে এসে প্রয়াতদের স্মরণে বাতি জ্বালান। দুর্গাপূজার পর বার্ষিক কালীপূজায় সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। গোটা উপজেলা, জেলার হিন্দুরা এখানে ছুটে আসেন। গোটা সপ্তাহজুড়ে রাতে কীর্তন হয়। অভিজিৎ বোনের চিতার কাছে দাঁড়ায়, পাশেই বাবা শুয়ে আছেন। প্রিয়াঙ্কার বছর দশেক যখন বয়েস, তখন বাবা মারা যায়। শেষ শয্যায় শুয়ে তিনি ছেলেকে বলেছিলেন, বোন যতদূর পড়তে চায় তুই নিয়ে যাবি।

সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছে অভিজিৎ। মেধাবী বোন, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে এ-প্লাস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই বোনের পথচলা এভাবে থেমে যাবে ভাবতে পারেনি অভিজিৎ। বোনের উদ্দেশে বলে, যেখানে থাকিস তুই ভালো থাকিস। আমরা তোকে রক্ষা করতে পারলাম না। এ লজ্জা শুধু আমার একার নয়, আমাদের সবার।

অদূরে মাস্টারমশাই। সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায় অভিজিৎ। বলে, আমরা অসহায় হয়ে গেলাম মাস্টারমশাই। জানি না আগামীদিনে আমরা কী করবো! আপনার হাতটা আমাদের ওপরে থাকুক।

অভিজিৎ ঢাকায় থাকে, যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থায় কাজ করে তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি হামলার

পর দাশপাড়া এসেছিলেন। তারা দাশপাড়ার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করেছেন, তাদের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এছাড়া কয়েকটি সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলও যথাযথভাবে হামলার চিত্র তুলে ধরেছে। সরকারের অস্বস্তির কারণ তাই-ই। এমপি সাহেব সে কারণেই উঠে-পড়ে লেগেছেন। তবে অভিজিতের অজানা নেই, দাশপাড়ার জমির প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি আছে, এমপি সাহেব তাদের অন্যতম। এ কথা মানবাধিকার প্রতিনিধিদের জানিয়েছে অভিজিৎ।

শ্মশান কালী মন্দিরের বারান্দায় বসে মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে অভিজিৎ। সন্ধ্যা নামছে, একটু পরেই পূজারি আসবেন। আরতি হবে। সঙ্গে একজন কর্মী আছেন, এই দুজন কালীমন্দিরের কাজ করেন। এই শ্মশান মাস্টারমশাই দেখভাল করতেন, এখন কী হবে কে জানে?

নিখিলেশ বারান্দায় বসেছিলেন, অভিজিৎকে দেখে বলেন, বসো।

কাকাবাবু, চলে এলাম। কী হবে বলুন তো। আমরা কী করবো? দাশপাড়ার মানুষ উঠে দাঁড়ায়নি এখনো। জীবনযাত্রা তো শুরু করতে হবে। আমার অফিসের সহকর্মীরা বলেছেন এই ঘটনায় মামলা হয়নি এখনো। সরকার যুক্তি দেখাচ্ছে, মামলা হোক, পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু মামলা করবে কে? সাহস করে কেউ কি সামনে আসবে?

অভিজিৎ বিস্তারিত জানালো নিখিলেশকে। সাংবাদিকরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। জবাবে তিনি বলেন, মামলা হয়নি। মামলা হোক। সাংবাদিকরা বলেন, কেন পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করতে পারে। জবাব মিলেছে, আইন অনুযায়ী ভুক্তভোগীদের করতে হবে। তাছাড়া ইসলাম অবমাননায় মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছে। মানুষের ক্ষোভটাও দেখতে হবে। সাংবাদিকদের তরফে প্রশ্ন ছিল, মাস্টারমশাই জানকীপ্রসাদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে ইসলামের অবমাননা হয় সে রকমের বার্তা দেওয়ার কোনো প্রমাণ পায়নি পুলিশ। তাছাড়া জানকীবাবু ফেসবুক ব্যবহার করেন না সে প্রমাণও মিলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাব, তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। সাংবাদিকরা বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। এক্ষত্রে আপনি অন্য কথা বলছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একথার জবাব দেননি। সাংবাদিকরা জানতে চায়, মিছিল শুরু হওয়ার পর যখন দাশপাড়ার দিকে এগুতে শুরু করে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। কেন? জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'পুলিশ ছিল, ওরা চেষ্টা করেছে' এটুকু বলে উঠে যান।

অভিজিৎ আরও বলে, সরকারের ভূমিকা এতেই স্পষ্ট হয়, সরকারের নেতারা স্বাধীনতাবিরোধী উগ্রপন্থীদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় টিকে আছে। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা কী করবো। আমরা যদি চুপচাপ থাকি, তাহলে এ মাটি থেকে উৎখাত হয়ে যেতে হবে। আমাদের জায়গাজমির দিকে এবার ওরা তাকাবে কাকাবাবু। এখন তো মাস্টারমশাই নেই। আপনি সবাইকে ডাকুন, কথা বলুন। এক নাগারে অনেকক্ষণ কথা বলে অভিজিৎ নিখিলেশের মুখের দিকে তাকালো।

নিখিলেশ এতো কিছু জানতেন না। পত্রিকা সবদিন পড়াও হয় না। অভিজিতের মুখে সব শুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, সবাইকে ডেকে এ নিয়ে আলোচনা করলেই ভালো। আমার মনে হয়, অত্যন্ত দ্রুত আমাদের বসা উচিত। কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আগে আমরা রাধাগোবিন্দ মন্দির কিংবা মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে বসতাম। এখন আমরা কোথায় বসতে পারি বলতো? আমার তো মনে হয় দেরি করা উচিত হবে না।

অভিজিৎ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, কেন, এখানে আপনার বাড়িতে তো আমরা বসতে পারি। এবং আজই।

কীভাবে আজই সম্ভব ?

অভিজিৎ বলে, কাকাবাবু আমরা অত্যন্ত ভয়াবহ এক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আমরা যা হারিয়েছি তা আর ফিরে পাবো না, কিন্তু আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। আপনি যদি বলেন, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সবাইকে খবর দিচ্ছি। অনেকে হয়তো আসবে না। তবুও যারা আসবেন তাদের সঙ্গে কথা বলুন।

নিখিলেশ বুঝতে পারলেন, অভিজিৎ যা বলছে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত। তিনি শুধু বললেন, আমরা ভেতরেই বসবো অভিজিৎ। বারান্দায় খোলা জায়গায় বসা ঠিক হবে না। তুমি যাও।

রাধারানি ও সাবিত্রী শুয়েছিলেন। ঘরে অন্ধকার, নিখিলেশ আলো জ্বালালেন। রাধারানি তাকালেন, কিছু বললেন না। নিখিলেশই বললেন, পরিস্থিতি তো খুবই খারাপ, পাড়ার অনেকে আসবে। একটু আলোচনা হওয়া দরকার। অভিজিৎ বললো, এখানেই বসবে।

রাধারানি শুধু বললো, তোমরা এঘরেই বসো। আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছি। সাবিত্রী ওঠো মা। মেয়েকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন রাধারানি। অস্বস্তি কাটছে না কিছুতেই। মা-মেয়ের জীবনে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তা কি কোনোদিনই নিরাময় হবে না? এ সংসার কি আবার হাসি-খুশিতে ভরে উঠবে না? নিখিলেশ নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কয়েকজন এসে এলেন। দেখা হলে যেভাবে সবার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা হয়, তা অনুপস্থিত। যেন আসতে হচ্ছে বলে আসা। পাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ হরেনকাকা। তাঁর নাতনি নবম শ্রেণীর ছাত্রী মিতালী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিতে হয়েছে, দু'দিন আগে বাড়ি ফিরেছে। হরেনকাকা এসেই



বললেন, নিখিলেশ তুমি সবাইকে ডেকেছ, অত্যন্ত দরকার ছিল। জানো তো মিতালী এখনো সুস্থ হয়নি। তবু আমি এসেছি, ছেলে আসতে চায় না। আমিও মনে মনে ভাবছিলাম কিছু একটা করা দরকার। এভাবে বসে থাকা যায় না।

নিখিলেশ হরেনকাকাকে হাত ধরে বসালেন। একে একে এলেন নিতাইচাঁদ, অতুল, জ্ঞানেশকাকা, সুরঞ্জিত, তাপস মণ্ডল, অবিনাশ, মোহিনীকাকা। অভিজিৎ বলল, নিশ্চয়ই আরও কেউ কেউ আসবেন। আমি সবাইকে বলেছি। কাকাবাবু আপনি শুরু করুন, আমরা খুব ভয়াবহ সময় অতিক্রম করছি।

ঘরে দুঃসহ নীরবতা। কথা বলতে যেন ভয় হচ্ছে। বিদ্যুৎ চলে গেছে বিকেলে, এখনো আসেনি। টেবিলে একটা মোমবাতি জ্বলছে, অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করছে। মাঝে মাঝে কেঁপে যাচ্ছে আলোকশিখা। এর মধ্যেই নিখিলেশের অনুরোধে অভিজিৎ সবকিছু বিস্তারিত তুলে ধরে। পরিশেষে বলে, আপনারা শুনলেন সবকিছু। জায়গাজমির ওপর থাবা হয়তো এখনই আসবে না। এটা সময় নেবে। যতদূর মনে হয়, এই মোল্লাদের যারা মাঠে নামিয়েছে তারা চাইবে আমরা এই ভয়ংকর হামলার পর দেশত্যাগ করি। এভাবেই সারাদেশে কৌশলে হিন্দুদের দেশছাড়া করা হয়।

সবই বুঝলাম, কিন্তু হামলাকারীদের

বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা কি নেওয়া হবে না? সবার আগে হরেনকাকাই কথা বললেন।

নিখিলেশ বলেন, অভিজিৎ তো বলেছে, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু করবে না। এখন আমরা কী করবো তা নিয়েই আজ আমাদের বসা। হামলাকারীদের অনেকে আমাদের চেনা। আমাদের চারপাশের লোক। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তারা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তো ওইদিন হামলাকারীদের দেখেছে। তাহলে ব্যবস্থা নিতে এতো দ্বিধা কেন ? বলছে, মামলা না হলে তারা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না।

পাড়ার আরও কয়েকজন এসে গেছেন— দেবেশ, শ্রীনাথ ও হৃষীকেশ। তারাও শুনেছেন নিখিলেশের কথা। সবাই চুপচাপ, এর পর কী কথা হতে পারে তা যেন কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। একটা গুঞ্জন, কিছু নীরবতা, সব ছাপিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

এবার নীরবতা ভেঙে কথা বললেন জ্ঞানেশকাকা, এখন আমাদের প্রধান কাজ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আরও সহজ কথায় বলি, আমরা কোনোভাবে দেশ ছাড়বো না। পিতৃপুরুষের বাস। এ মাটি আমরা ছাড়বো না। যাবো কেন?

ঘরে নতুন হাওয়া। আরও কয়েকজন কথা বললেন একই ভাষায়। সেদিনের হামলার পর ভাষা হারিয়ে গিয়েছিল। শুধু কান্নাই ছিল ভাষা। আজ সে কান্না কি প্রতিবাদে রূপ নিচ্ছে?

নিখিলেশই কথাটা তুললেন, দেশ ছাড়বো না, সে তো আমাদের সবারই মনের কথা, মাস্টারমশাই আমাদের সাহসী করেছেন। তিনি নেই, ঘাতকদের, হামলা-ধর্ষণ যারা করেছে সেইসব নরপশুদের কি আমরা ছেড়ে দেব? আমরা কি এমপি সাহেবের সামনে বলবো, সেরকম কিছু এখানে হয়নি?

আবার নীরবতা। বাইরে অন্ধকার, মোমবাতি ছোট হয়ে এসেছে, আর কিছু সময়। এখনো বিদ্যুৎ এলো না। নতুন করে মোমবাতি জ্বালাতে হবে। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিখিলেশকে বলে, কাকাবাবু আরেকটা মোমবাতি লাগবে, এটা তো একটু পরেই নিভবে।

নিখিলেশ মোমবাতি খুঁজতে গেলেন। সবাই নীরব। তাহলে আজ বসার ফল কী দাঁড়াল! সিদ্ধান্ত তো কিছুই হলো না। দাশপাড়া কীভাবে এগুবে! নিখিলেশ নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। পুরনোটা নিভিয়ে দিলেন না। জ্বলুক না, ক্ষতি কী? ঘরে আলো একটু বাড়লো। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরে গাঢ় অন্ধকার।

মোহিনীকাকা এতক্ষণ কথা বলেননি। তাঁর ছেলে নেই, ঘরে বিধবা বৌমা ও বছর দশেকের নাতি। স্ত্রী গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। বৌমা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ছেলের মৃত্যুর পর মোহিনীবাবু সংসার আগলে রেখেছেন, কিছু জায়গাজমি আছে। তিনি কথা বললেন প্রচণ্ড ক্ষোভে, আমরা কি কিছুই করবো না?

নীরবতা গাঢ় হলো, কেউ কোনো জবাব দিলেন না। রাত বাড়ছে, কিন্তু কেউ উঠছেন না। যেন এক নিঃস্তব্ধতা গ্রাস করেছে । হঠাৎ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো সাবিত্রী— বাপি, আমি ভয় করি না। আমার নামে মামলা হবে। কী হবে আর ভয় পেয়ে ? তুমি ব্যবস্থা করো বাপি। কালই, আর দেরি নয়। আর এমপি সাহেব এলে আমিই বলবো, সেদিনের হামলার সবচেয়ে বড় সাক্ষী আমরা, মেয়েরা।

নিখিলেশ উঠে দাঁড়ালেন, এ কোন সাবিত্রী, তাঁর মেয়ে তো! দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটি তাকে তো চিনতে পারছেন না। প্রচণ্ড হাসি-খুশি, প্রায় সারাদিনই হইচই করে বেড়ানো সাবিত্রী এক প্রলয়ংকরী ঝড়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ দাশপাড়ার মানুষের বৈঠকে স্তব্ধতা রুখে দিয়ে যেন এক তপস্বিনী ধ্যান ভেঙে বলে উঠলো— চরৈবেতি, চরৈবেতি। এ এক অপূর্ব জাগরণ।

সবাই উঠে দাঁড়ালেন। সবার আগে জ্ঞানেশবাবু এগিয়ে গিয়ে সাবিত্রীর হাত ধরলেন, তুই আমাদের মাঝে আয় মা। আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলি। সবার মাঝে আয়।

নিখিলেশ বোবা। রাধারানির বিস্ময় কাটেনি। এই সাবিত্রী তাদের মেয়ে! ইতোমধ্যে সাবিত্রীকে সবার মাঝে নিয়ে আসা হয়েছে। মোমবাতির আলোয় ছায়ামূর্তির মধ্যে মানুষগুলো যেন সত্যি সত্যি জেগে উঠেছে, সুর মিলিয়ে বলতে চাইছে, আমরা আর ভয় পাই না। তুই এতো শক্তি কোথায় পেলি মা! দাশপাড়া সত্যি সত্যি এবার গর্জে উঠবে।

এখন নিখিলেশ কাঁদছেন, কাঁদছেন রাধারানিও। কিন্তু সাবিত্রী কাঁদছে না। দাশপাড়ায় এ রাতটা বড় বেশি আনন্দের।



## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

## নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

# মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

## কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

**DRS INVESTMENT** 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond





# স্বাহা

প্রবাল

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি খুব দামি একটা কথা বলেছেন। সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর প্রশ্ন ছিল, আপনি কি অসমকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবেন? হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উত্তর ছিল — না, আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি শুধু ব্যাপারটাকে একটা প্রজন্ম পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারি!

তাহলে? এক প্রজন্ম পরে কি সমগ্র পূর্ব ভারতজুড়ে হারমোনিয়াম আর তানপুরা ভাঙা শুরু হবে? ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া নিষিদ্ধ হবে? বাঙ্গালি মেয়েরা আর উৎসবে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পড়বে না, কালো বোরখার আড়ালে বন্দি হবে? আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি আর নিজেদের সন্তানদের নাম বাংলাভাষায় রাখতে পারবে না? আর মাত্র একটা প্রজন্ম পরেই সব শেষ?

কে এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎকে প্রতিহত করতে পারে? কার সে ক্ষমতা আছে? কে পারে, অসম ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র পূর্ব ভারতকে, আমাদের অপৌরুষেয় সংস্কৃতিকে শুধু এক প্রজন্ম নয়, আগামী দশ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত করতে? উত্তর একটাই — এই সমাজ। পথ — কনটেইনমেন্ট অ্যান্ড রোলব্যাক। যে পথের হদিশ ঋষি বঙ্কিম তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে রেখে গেছেন --'মুই হেঁদু!'

সমগ্র পুর্ব ভারতজুড়ে আজ কনটেইনমেন্ট পর্ব শুরু হয়ে গেছে। আমার ধারণা, এর পরের পর্যায়ে আসবে রোলব্যাক। শুধু ভূমি নয়, হৃত মানুষগুলোরও পুনরুদ্ধার। শত্রুপক্ষ কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। তারাও দৃষ্টি রাখছে ঘটনাবলীর ওপর।

হাজার বছরের আগ্রাসন এবং তার বিপরীতে অপৌরুষেয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের সংকল্প ; আমার আজকের গল্প সেই দুই বিপরীত শক্তির ভবিষ্যৎ সংঘাত নিয়ে। এই গল্প আবর্তিত হয়েছে মূলত একটা ছোটো মেয়েকে ঘিরে। না, খুব ছোটো নয়, বয়ঃসন্ধির। আসলে, বয়স ব্যাপারটাই তো আপেক্ষিক, তাই না? কেউ পঞ্চাশেও দায়িত্ব নেয় না, আর কেউ-বা বয়ঃসন্ধিতেই পৃথিবীর গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়। চট্টগ্রামের পাহাড়ে টেগরা যখন ব্রিটিশ মিলিটারির সঙ্গে অসম যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল, সেও তো বয়ঃসন্ধিরই ছিল। এই কাহিনি বাস্তব-অনুপ্রাণিত হলেও পটভূমিকা, ঘটনাবলী, পরিস্থিতি ও চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ভৌগোলিক নামগুলি চেনা ঠেকলেও কোনো বর্তমান শাসক, রাজশক্তি বা চরিত্রের সঙ্গে মিল একান্তই অনভিপ্রেত। আজ থেকে আনুমানিক দশ বছর ভবিষ্যতে এ গল্পের যবনিকা উত্তোলন হলো বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে।

প্রাচীন কর্ণফুলী নদী বরাবরই চট্টলা নগরীর সব কথা বুকে নিয়ে বয়ে চলে। আজও তার নিরলস কুলুকুলু ছন্দ অনেক কথা বয়ে নিয়ে চলেছে। সে বয়ে নিয়ে চলেছে নারকীয় গত দশ বছরের ইতিহাস। যে দশ বছরে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেছে একটি নতুন রাজনৈতিক পক্ষ — জামাত উল মুসলিমিন। বাংলাদেশ হয়ে গেছে পূর্ব খোরাসান। সরকারি পতাকায় ঘটেছে চাঁদ-তারার প্রবেশ। প্রাচীন ঢাকা নগরীর নাম বদলে হিন্দুহন্তা পীর শাহজালালের নামে রাখা হয়েছে শাহ্জালালাবাদ। আরও কত কী যে বদলে গেছে, তার হিসেব শুধুমাত্র মা কর্ণফুলীই রেখেছেন।



**[চট্টলা, পূর্ব খোরাসান]**

কর্ণফুলী নদীর মোহনায় মূল বন্দরের কর্মব্যস্ততার আড়ালে এমন কিছু নিরিবিলি কোণ আছে, যেখানে সময় যেন মরচে ধরা লোহার শিকলে আটকা পড়ে আছে। বিশেষ করে সীতাকুণ্ডের উপকূল ঘেঁষে গড়ে ওঠা বিশাল জাহাজভাঙার অংশটা, যেখানে পুরনো জেটিগুলো পচে গিয়ে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। লোনা জলের অবিরত ঝাপটায় কংক্রিটের বড়ো বড়ো পিলারগুলোর ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে অসংখ্য জংধরা লোহার রড, দেখতে অনেকটা মৃত ডাইনোসরের পাঁজরের মতো লাগে। বাতাসে এখানে সবসময় একটা ভারী গন্ধ ভাসে— পোড়া ডিজেল, লোনা জল আর বহু বছরের পুরনো স্তূপীকৃত লোহার মিশ্রিত কটু গন্ধ। জোয়ারের সময় যখন ঘোলাটে জল উপকূলে আছড়ে পড়ে, তখন বড়ো বড়ো পরিত্যক্ত জাহাজগুলোর গায়ে এক ভুতুড়ে গুমগুম শব্দ হয়। সেই সময় বিশাল জাহাজগুলোর গায়ের শ্যাওলার আস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে খসে পড়া পুরোনো রঙের ছোপ স্পষ্ট দেখা যায়। লোনা বাতাসের ক্রমাগত কামড় তার একসময়ের উজ্জ্বল রংকে ভুলিয়ে দিয়েছে, সে রং ফিকে হয়ে কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিশালাকার সব নোঙর। এককালে জাহাজের সঙ্গী হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতো তারা। এখন মাটির গভীরে গেঁথে গিয়ে চিরতরে স্থবির হয়ে গেছে। পরিত্যক্ত কন্টেইনারগুলোর দরজা হাঁ করে খোলা, যেন তাদের ভেতরের অন্ধকার ক্ষুধিত শূন্যতা বিশ্বচরাচর গ্রাস করতে চাইছে। আধুনিক বন্দরের ক্রেনের যান্ত্রিক আওয়াজ এখান থেকে অনেক দূরে শোনা যায়, যা এই পরিত্যক্ত অংশটিকে আরও বেশি নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ণ করে তুলেছে। এ যেন এক যান্ত্রিক সমাধিস্থান, যেখানে মানুষের তৈরি বিশালাকার সৃষ্টি নীরবে ধুলো আর লবণের কাছে হার মানছে। কন্টেইনারের ওপর গজিয়ে ওঠা বুনো লতাগুল্ম লোহার খাঁজ বেয়ে ওপরে উঠে গেছে, যান্ত্রিক ধ্বংসস্তূপের মাঝে প্রকৃতির নীরব বিজয়কেতন। বিকেলের তপ্ত সূর্য যখন এই জরাজীর্ণ লোহার পাহাড়ের পেছনে হেলে পড়ে, তখন তাদের লম্বা ছায়াগুলো নদীর কর্দমাক্ত চরে তাদের লোভী হাত বাড়িয়ে দেয়, ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে।

তারপর নামে আঁধার। প্রেতপুরীর আঁধার।

আষাঢ় মাসের প্রথম রাত ছিল সেটা। সে রাতে দশদিক আঁধার করে বৃষ্টি এসেছিল। মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস, কুয়াশার বিভ্রম তৈরি করেছিল। কয়েক হাত দূরের দৃশ্য দেখা যায় না। চট্টলা শহরটাকে দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুয়াশা ঢাকা নিভু নিভু এক শ্মশানের চিতা। পশ্চিম আকাশ জুড়ে জলভরা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মিটিমিটি জ্বলছে অসংখ্য লাল-নীল আলো, তুর্কির দান ব্যারাখতার ড্রোন, এসেছে চট্টলা থেকে কাফেরদের শেষচিহ্ন মুছে ফেলতে।

ব্যারাখতার ড্রোন। যেন যান্ত্রিক শকুন। আকারে ছোটো, খালি চোখকে ফাঁকি দিতে সক্ষম এই ড্রোন কুড়ি ঘণ্টা ধরে আকাশে ওঁত পেতে থাকে, শুধু কেউ একজন খোলা জায়গায় পা রাখার অপেক্ষায়। নিঃশব্দে নিখুঁত লেজার-গাইডেড মিসাইল দিয়ে আঘাত হেনে মুহূর্তে সবকিছু ছাই করে দেয়। মনে হয়, গোটা আকাশটাই যেন জেহাদি জল্লাদদের দখলে। অটোমান সাম্রাজ্যের যুগে তুর্কি খলিফার ইসলামি বিজয়ের ধ্বজাধারী অগ্রগামী সৈন্যদের বলা হতো 'ব্যারাখতার'। আজ ব্যারাখতার নামধারী মেড ইন তুর্কি ড্রোন সেই কাজই করে চলেছে পূর্ব খোরাসান জুড়ে।

প্রতিটি মসজিদের লাউডস্পিকার থেকে একই আওয়াজ ভেসে আসছে বারবার—' সমর্পণই ইসলাম। পবিত্রতাই ইসলাম। আল্লার জমি থেকে কাফের সাফ করো। আল্লাই মহান, আর কেউ নয়।' ভাঙা কন্টেনারের ধাতব দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে প্রহর গুনছিল মায়া। মুখ বিস্বাদ, জংধরা লোহার স্বাদ জিভে। কোমরবন্ধে বাঁধা রেডিয়ো ঘড়ঘড় শব্দে ফিসফিস করে উঠল, ''সামনে দু'টো ট্রাক, তার পেছনে একটা সাঁজোয়া গাড়ি, আর তার পেছনে আরও পাঁচটা ট্রাক!'' ঝড়ের গর্জনের মাঝে সেই ঘড়ঘড় শব্দ প্রায় শোনাই যায় না।

আজও প্রতি রাতে সেই দুঃস্বপ্নটা মায়াকে মাঝরাতে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। একরাশ ফুলের মতো শিশু পাগলের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। গায়ে তাদের জ্বলছে লেলিহান হুতাশন। ওরা পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে, কিন্তু পালানোর কোনো পথ নেই। কারণ, ওরা তো কাফের। ওরা হলো ওয়াজিব-উল-কতল।

মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে দিল মায়া। কোমরবন্ধ থেকে দেশি বন্দুকটা টেনে বের করল, ধাতব শরীরের শীতলতা আঙুল বেয়ে মেরুদণ্ডে উঠে শিহরণ জাগালো। আঙুল ট্রিগারে স্থির হতেই বুকের ভেতর ধুকপুক শব্দটা যেন আরও স্পষ্ট শোনা গেল, ঢাকের মতো বাজতে লাগলো কানের পর্দায়--- ধুকপুক-ধুকপুক-ধুকপুক। এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল ওর বাবার কথা। বাবা, তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে, বাবা! ঝড়ের গর্জনে বোবা চরাচরে মৃদু কম্পন ধরিয়ে মিলিটারি ট্রাকদুটো এগিয়ে এল গুদামের খোলা দরজা দিয়ে।

''ওঁম তারে তুত্তারে তুরে'' ফিসফিস স্বরে বলল মায়া।

''বজ্রজ্বল ফট্ ফট্'' ঘড়ঘড় শব্দে উত্তর দিল রেডিয়ো।

'রক্ষ রক্ষ স্বাহা!' হুঙ্কার দিল মায়া।

সেই উনিশশো তিয়াত্তর সাল থেকে শান্তিবাহিনী লড়াই করছে চট্টলার বৌদ্ধদের অধিকার রক্ষা করতে। সাফল্য আসেনি। কিন্তু এবার হয়তো সেটা বদলাবে।

বাইরে ঝড় মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে। সমুদ্রের লোনা বাতাসে কুয়াশা আর ডিজেলের গন্ধ মিশে একটা ভারী, দমবন্ধ করা আবহ তৈরি করেছে। দূরে মিলিটারি ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে; গভীর, যান্ত্রিক, যেন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কোনো আক্রমণোদ্যত জানোয়ার নিঃশ্বাস ফেলছে।

গুদামের বিশাল খোলা দরজা ঠেলে প্রথম ট্রাকটা ঢুকল। হেডলাইটের সাদা আলো ভাঙা কন্টেইনার আর মরচেধরা ক্রেনের কঙ্কাল ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তার পেছনে দ্বিতীয় ট্রাক। ছাদের ওপর বসানো ভারী মেশিনগানের মুখগুলো এদিক-ওদিক ঘুরছে।

ঠিক তখনই বন্দর শ্রমিকের পোশাক পরা দশটা ছায়ামূর্তি কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

প্রথম বিস্ফোরণটা হলো অস্বাভাবিক নিঃশব্দ। যেন কেউ অন্ধকারের বুকের মধ্যে চাপা একটা ঘুষি মেরেছে। তারপর— দুড়ুম!

প্রথম ট্রাকটা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে গেল। ধাতব শরীরটা মাঝআকাশে পাক খেতে খেতে উলটে গেল, তার ভেতর থেকে আগুন বেরোল; যেন গেরুয়া রঙের কোনো বিশাল ফুল ফুটেছে। আগুনের ঝলক এক মুহূর্তের জন্য পুরো গুদাম আলোকিত করে দিল। ছিটকে বেরিয়ে এল মানুষের হাত, রাইফেল, জ্বলন্ত কাঠের টুকরো।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা হলো আরও ভয়ংকর। চাপা বিস্ফোরণের তরঙ্গে গুদামের কাঁচগুলো একসঙ্গে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপরই অন্ধকারে জ্বলে উঠল লাল আর নীল অসংখ্য বিন্দু। ড্রোন।

কালো কাকের ঝাঁকের মতো সাঁজোয়া গাড়ির ছাদ থেকে উড়ে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল গুদামের ছাদ জুড়ে। ধাতব ডানার গুঞ্জনে গুদামের বাতাস কেঁপে উঠল। প্রতিটা ড্রোনের নীচে লাল লেজার নাচছে— দেওয়াল, কন্টেইনার, ভাঙা সিঁড়ি, মানুষের লুকোনোর সম্ভাব্য প্রতিটা জায়গা স্ক্যান করছে।

'মায়া, পালাও!' রেডিয়োতে বোধিচিত্তর গলা কেঁপে উঠল স্ট্যাটিকের ভেতর।

কথা শেষ হওয়ার আগেই গুলির ঝড় শুরু হলো--- টা-টা-টা-টা-টা!

মেশিনগানের গরম সিসা গুদামের টিনের দেওয়ালে আঘাত করে আগুনের ফুলকি ছড়াতে লাগল। কংক্রিটের টুকরো ভেঙে উড়ে এসে মায়ার গালে গভীর ক্ষত দেগে দিল। ও ঝাঁপিয়ে পড়ল

উলটে যাওয়া ট্রাকটার পেছনে। ঠিক পরের মুহূর্তেই যেখানে ও দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে একঝাঁক গুলি এসে আঘাত করল একসঙ্গে।

ধাতব শব্দ। স্পার্ক। চিৎকার।

একজন সহযোদ্ধা দৌড়ে আশ্রয় বদলাতে গিয়ে বুকের কাছে গুলি খেল। শরীরটা ঝাঁকুনি খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল। গরম রক্ত কংক্রিটের ওপর ছড়িয়ে গেল, মিশে গেল বৃষ্টির কাদাজলের সঙ্গে।

মায়া দাঁত চেপে শুয়ে পড়ল মাটিতে। গরম ধাতুর গন্ধ, বারুদের ধোঁয়া আর পোড়া মাংসের বীভৎস গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ওর মনে পড়ে গেল শান্তিবাহিনীর সেই কমান্ডারের কথা— জামাতের সৈন্যরা প্রতিটা পরাজয় থেকে শিক্ষা নেয়। তাই প্রতিটা বিজয়ই ভবিষ্যতের ফাঁদ।

ঠিক তখনই—খচা-খচা-খচ! ব্লপ-ব্লপ-ব্লপ!

উপরে কোথাও থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের ফায়ারিঙের শব্দ ভেসে এল।

মায়া মাথা তুলে দেখল, ভাঙা ছাদের স্টিল বিমের ওপর কালো চিতাবাঘের মতো নীচু হয়ে একটা ছায়ামূর্তি বসে আছে। বজ্রপাতের আলোয় এক ঝলক দেখা গেল তার চোখ। তার রাইফেল আগুন ছুঁড়ছে। প্রতিটা শট হিসেবি। ঠাণ্ডা। নিখুঁত।

একটা ড্রোন মাঝ-আকাশে বিস্ফোরিত হলো। আরেকটার প্রপেলার ছিটকে বেরিয়ে গেল। তৃতীয়টা দেওয়ালে আঘাত করে আগুনের গোলায় পরিণত হলো। আকাশ থেকে পাকা ফলের মতো ঝরে পড়তে লাগল ড্রোনগুলো।

সুযোগটা নিল মায়া। বুক মাটিতে ঠেকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। মাথার ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে গুলি উড়ে যাচ্ছে। একবার একটা গুলি এত কাছে দিয়ে গেল যে ওর কানের পাশের চুল উড়ে গেল বাতাসে। সাঁজোয়া গাড়িটার নীচে পৌঁছাতেই ও কোমর থেকে বোমাটা বের করল। হাত কাঁপছে। কিন্তু আঙুল স্থির।

লোহার গায়ে চুম্বক লাগার ঠাস শব্দ। ক্লিক! টাইমার অন।

ঠিক তখনই গাড়ির উল্টো পাশ থেকে একটা সৈন্য নীচু হয়ে ওর দিকে তাকাল। চোখাচোখি হয়ে গেল।

সৈন্যটা চিৎকার করে উঠল, ''ওখানে—!''

মায়া আর এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করল না। পাকসাট খেয়ে পাশের কংক্রিটের স্তম্ভের পেছনে গড়িয়ে পড়ল। সৈন্যটা গুলি চালাল। গরম সিসা মাটিতে আঘাত করে কংক্রিটের টুকরো ছিটকে দিল।

মায়া কোমর থেকে দা টেনে বার করে সৈন্যটার হাঁটুর পেছনে বসিয়ে দিল। লোকটা আর্তনাদ করে পড়ে যেতেই তার রাইফেল ছিনিয়ে নিল, খুব কাছ থেকে ট্রিগার টিপল।

ধপ্! লোকটার শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল।

তারপর—- সাদা আলো। কান ফাটানো বিস্ফোরণ।

সাঁজোয়া গাড়িটার ভেতর থেকে আগুন ফুলে উঠল, যেন ধাতুর তৈরি দানবের পেট ফেটে সূর্য বেরিয়েছে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে পুরো গুদাম কেঁপে উঠল। স্টিল বিম ভাঙল। কন্টেইনার উলটে পড়ল। ওপরের ছাদ গর্জন করে ধসে নামতে লাগল।

আলোর বিপরীতে সেই ছায়ামূর্তি ছাদ থেকে লাফ দিল। বিশাল শরীর। হাতে ধোঁয়া ওঠা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। মাঝ-আকাশে ঘুরে পড়ে হাঁটু গেড়ে অবতরণ করল।

ইতিমধ্যে মায়ার সহযোদ্ধারা আক্রমণ করেছে অন্য ট্রাকগুলোকে। বন্দরের অন্ধকার জুড়ে একটার পর একটা বিস্ফোরণ ফুলের মতো ফুটে উঠছে। পাহাড় কেঁপে উঠছে। সমুদ্রের কালো জল থরথর করছে। ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে গুলির শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ মিশে গিয়ে মনে হচ্ছে— পুরো পৃথিবীটাই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

চামড়ার ফিতেয় বাঁধা AK-203 রাইফেলটাকে পিঠের দিকে ঠেলে দিল ছায়ামূর্তি। ''কর্নেল থুরা ওয়াই সান, আরাকান আর্মি!'' স্যালুটের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিল ছায়ামূর্তি। উচ্চারণে রাখাইনের ছোঁয়া। গুদামে তখন দাউদাউ আগুন জ্বলছে। সে আগুন একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে বন্দর জুড়ে।

ভোরের দিকে বৃষ্টি ধরে এল, পেছনে ফেলে রেখে গেল ধোঁয়াশা। দূরে বন্দরের কিনারায় বসে নজর রাখছিল মায়া। ধ্বংসপ্রাপ্ত গুদামের মাঝে সাতটা ট্রাক আর একটা সাঁজোয়া গাড়ি তখনও উলটে পড়ে আছে, সামুদ্রিক পাখি আর শকুনের ভোজ লেগেছে সেখানে। ট্রাকগুলো থেকে মালপত্র উদ্ধার করছিল মায়ার সহযোদ্ধারা— বোধিচিত্ত, অমিতাভ, মৈত্রী আর বাকিরা। আহতদের ব্যান্ডেজ করছিল নীলা। গুদামের দিক থেকে বাতাস বইছে, বয়ে আনছে মৃত্যুর দুর্গন্ধ। পোড়া ডিজেল আর রক্তের গন্ধে বমি উঠে আসে। নাকে রুমাল চেপে ধরে সে গন্ধ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল মায়া। গতরাতের আগন্তুক কিন্তু নির্বিকার চিত্তে নিজের AK-203 পরিষ্কার করে চলেছে। চট্টলা পাহাড়ের মতোই স্থির, দৃঢ়। ক্ষতবিক্ষত তার মুখের গড়ন। দৃষ্টিতে কমলা আভা, সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

'রাজধানী শাহ্জালালাবাদ থেকে সাতটা ট্রাক এসেছে, তার মধ্যে পাঁচ ট্রাক ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র, এর বেশিরভাগটাই যাচ্ছিল পার্বত্য চট্টলার বান্দরবানে, ''বলল মায়া'', 'সেখানকার জামাতের ডেরায় পৌঁছে গেলে পাহাড় জুড়ে গণহত্যা শুরু হতো। বাকি দুটো ট্রাকে রয়েছে ব্যাটল গিয়ার আর ইলেকট্রনিক্স। এগুলো সবই আমাদের কাজে লাগবে।'

''তোমাদের আক্রমণের কায়দাটা ভালোই ছিল'', বলল লোকটা, ''কিন্তু কাজটা শেষ করতে বড্ড সময় লাগিয়ে দিলে। আরও ক্ষিপ্র হতে হবে। পাকতে আরও সময় লাগবে তোমাদের।''

''ভালো করে পাকার মতো সময় আমাদের হাতে নেই,'' মাথা নেড়ে বলল মায়া, ''পূর্ব খোরাসানের মিলিটারির একটা বড়ো অংশ

তুর্কি ও ইজরায়েলের যুদ্ধে তুর্কিকে সাহায্য করতে গেছে। বিদ্রোহের এরকম সুযোগ আর পাবো না, কর্নেল থুরা ওয়াই সান। আপনার নাম আমি লোকমুখে শুনেছি। কোত্থেকে এলেন আপনি? বুঝতেই পারিনি। আপনার পদবিটা কিন্তু অদ্ভুত। বর্মা মুলুকের লোকেদের মধ্যে এরকম পদবি আগে কখনো শুনিনি। শুনেছি, জাপানে লোকের নামের পেছনে 'সান' জুড়ে দেয়, সম্মান দিতে। বর্মায় সেরকম কোনো রীতি আছে কি?"

"আমার ঠাকুর্দা বলতেন," প্রসঙ্গ ঘোরাতে বলল থুরা, "ইংরেজ গেছে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়নি। ঠিকই বলতেন!"

"শেষ হয়নি," বলল মায়া, "তার মানে এই নয় যে যুদ্ধ আর কখনো শেষ হবে না। হয়তো এ যুদ্ধ শেষ করার দায়িত্ব তথাগত আমাদের ওপরই ন্যস্ত করেছেন!"

"আরাকান আর্মি আমাকে পাঠিয়েছে," বলল থুরা, "চট্টলায় যা হচ্ছে, তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া, জামাতের আগামী লক্ষ্য রাখাইন। সেটা আমরা হতে দেব না। চট্টলার এখন দরকার একটা দাবানল। আর পাহাড়ের বিদ্রোহীদের দরকার একজন শিক্ষাগুরুর।"

উত্তর দেবার সুযোগ পেল না মায়া, তার আগেই ওর রেডিয়ো ঘড়ঘড় করে উঠল। ওপার থেকে স্বর ভেসে এল, "দক্ষিণদিক থেকে দুটো আর্মি পেট্রল আসছে।"

চমকে উঠে দাঁড়ালো মায়া। থুরা তখনও নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে উদীয়মান সূর্যের দিকে।

"সেই আদিম কাল থেকেই মানুষ শিখেছে," বলল মায়া, "রাত মানে বিপদ, আর দিন মানে বিপদমুক্তি। আপনার দেশেও বোধহয় সূর্যোদয় মানেই নিরাপত্তা, তাই না? আমাদের এখানে কিন্তু সূর্যোদয় মানে বিপদ। সূর্য উঠলেই তো আর্মি পেট্রলিং জোরদার হয়।"

আগ্নেয়াস্ত্রে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো থুরা। তারপর একটু ভেবে বলল, "গতরাতে কি প্রথমবারের মতো মানুষ মারলে তোমরা?"

চমকে তাকালো মায়া। এরকম প্রশ্ন ও প্রত্যাশা করেনি। থুরা আবার বলল, "আজ রাতে তোমাদের ঘুম হবে না। ক্ষিদে চলে যাবে। বারবার বমি পাবে। দ্বিতীয়বার যখন মানুষ মারবে, তখন প্রতিক্রিয়াটা একটু সহজ হবে। শেষমেশ ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে যাবে। আর এই জিনিসটাই হবে সবচেয়ে বিপজ্জনক। তোমাদের শত্রুদের মতোই তোমরাও খুনি হয়ে যাবে। মানুষ আর থাকবে না। সেই পরিস্থিতিতেও মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখাটাই তোমার দলের আসল লড়াই। দলনেত্রী হিসেবে এটার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।"

"কিন্তু...কীভাবে সেটা..." কথা শেষ করার সুযোগ পেল না মায়া। দূর থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। নাকের ওপর রুমালটাকে কষে বেঁধে নিল মায়া। এক ঝলক দেখে নিল, আর সবাই চলে গেছে ওখান থেকে। বন্দর থেকে একটা ড্রেনপাইপ চলে গেছে পূর্বদিকে, পাহাড়ের দিকে। ওরা যেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে আন্দাজ পঞ্চাশ মিটার হেঁটে গিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনা সরিয়ে মায়া ঝাঁপ দিল তার ভেতরে। অন্ধকার সেই বিবরে পূতিদুর্গন্ধ কাদা, কিন্তু এই ম্যানহোলের অন্য প্রান্ত গেছে পাহাড়ের ঘেরাটোপের মধ্যে, জঙ্গলের মায়াঘেরা নিরাপত্তায়।



**তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে, বাবা?**

বিশাল একটা পাথরের ওপর বসে পা থেকে জোঁক ছাড়াচ্ছিল মায়া। দূর থেকে কোনো মন্দিরের ঘণ্টার সুরেলা শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে জুম চাষের পোড়া গন্ধ। আজ বারবার সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। পাহাড়ের সর্পিল পথ বেয়ে যখন রাঙ্গুনিয়া পাহাড়ের একদম চূড়ায় এসে পৌঁছেছিল, আজকের মতোই তখন ভোরের কুয়াশা সবেমাত্র কাটতে শুরু করেছে। সোনালি কাজকরা ভারী কাঠের ফটকটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে চমকে গেছিল মায়া। প্রথমবারের মতো এত বড়ো কোনো বিহার দেখল ও। সোনালি প্যাগোডার দিকে তাকিয়ে ওর বড়ো বড়ো চোখদুটো বিস্ময়ে আরও ডাগর হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, কোনো এক জাদুকর যেন মহাশূন্য থেকে এই আকাশচুম্বী সোনার প্রাসাদটাকে নামিয়ে এনেছে, বসিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের সবুজ রঙের ওপর। এখান থেকে কি আকাশ ছোঁয়া যায়? মায়া প্রশ্ন করেছিল বাবাকে। উত্তরে বাবা হেসে ওর মাথায় হাত রেখেছিল। সেই আদুরে স্পর্শে মনে হয়েছিল, এটাই দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

বিহারের ভেতর পা রাখতেই স্নিগ্ধ এক নিস্তব্ধতা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। চারদিকে ধূপের মিষ্টি ঘ্রাণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মন্ত্রোচ্চারণের মৃদু গুঞ্জন। মাঝখানে বিশাল বুদ্ধমূর্তি, হলঘর ঘিরে একুশটি তারাদেবীর মূর্তি। সামনে রাখা প্রদীপের শিখাগুলো মৃদু বাতাসে দুলছে। আলতো করে বাবার গায়ের চাদরটা টেনে ধরেছিল মায়া। ভগবান বুদ্ধের বিশাল মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বাবা, আমাদের স্কুলের কয়েকজন ছাত্র আমাকে টিটকিরি করে বলে যে, আমরা কাফের। আমরা মূর্তিপূজা করি, সেটা নাকি মিথ্যে, সেটা বোকামি, পাপ। ওরা বুদ্ধকে বলে বুৎ, ওরা বলে বুৎপরস্তি হলো গুনাহ।"

বাবা হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই কী মনে করিস?"

"আমি জানি না," বলেছিল মায়া, "শুধু এটুকু জানি যে, ভগবান বুদ্ধের মুখের দিকে তাকালে মনে শান্তি আসে।"

"ভেবে নে, সেটাই আসল কথা," বলেছিল বাবা, "মানুষের মনটাই হলো মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, আবার সবচেয়ে বড়ো বন্ধুও বটে। মানবসভ্যতা আগামী ধাপের দিকে এগোবে, মানুষের

বুদ্ধি বোধিতে রূপান্তরিত হবে নাকি মানুষেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু নির্ভর করছে মানুষের নিজের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার ওপর। সেই জন্যই তো আমরা বড়ো বড়ো বুদ্ধমূর্তি বানাই। যাতে সবার চোখে পড়ে, সবার মনে শান্তি আসে। মনটাকে দুঃখ রহিত রাখাটাই আসল সাধনা। ওই দ্যাখ, মা তারার মূর্তি। মায়ের বাঁ-হাতের ভঙ্গিটা খেয়াল কর। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে। এটার মানে জানিস? তর্জনী হলো ধীশক্তির প্রতীক, আর বুড়ো আঙুল আবেগের প্রতীক। মা তারা ওই ভঙ্গির মাধ্যমে আমাদেরকে বলছেন, আমাদের ধীশক্তি আর আবেগ যেন সবসময় একে অপরের সঙ্গে কাজ করে। দু'জনের মাঝে যেন কোনো বিরোধ না থাকে, একজন যেন অন্যজনকে দাবিয়ে না রাখে। এখন থেকে যখনই মা তারার মূর্তি দেখবি, এই কথাটা তোর মনে পড়বে, তাই না?"

''আর বাকি তিনটে আঙুল?" কৌতূহলী মায়া প্রশ্ন করেছিল, ''দেখে মনে হচ্ছে, মা যেন তিন আঙুল দেখিয়ে আমাদেরকে তিন নম্বরটা বলছেন— এক দুই তিন!"

''সত্যিই তাই," বুঝিয়ে বলেছিল বাবা, ''তিন সংখ্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ত্রি-মূল, ত্রি-কায়া, ত্রি-বজ্র, ত্রি-তাপ। ত্রি-নাড়ি অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। ত্রি-শক্তি অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। আবার এই ক্ষেত্রে তিন মানে— বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘ। এখানে বুদ্ধ মানে একটা গুণ, আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে বোধির স্তরে নিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধ হওয়ার সাধনা।"

''ধর্ম আর সঙ্ঘ?"

''পরে বলব, আগে চল, এখানে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করি?"

ধ্যান, তারপর ভিক্ষুদের সঙ্গে মিলে মন্ত্র উচ্চারণ আর শেষে ভিক্ষুদের উপদেশ শোনার পর খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে বসতেই ভিক্ষুরা খাবার এনে দিয়েছিল। কলাপাতায় মোড়া লাল ভাত, ডাল আর পাহাড়ের ঢালে জন্মানো তেতো-মিষ্টি শাকসবজির চচ্চড়ি। অন্নকে সম্মান জানিয়ে ছোট্ট প্রার্থনা সেরেই খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মায়া। মনে হয়েছিল যেন অমৃত।

শেষে বিহার থেকে যখন বেরোনোর সময় হলো, বিকেলের তপ্ত সোনা রোদ তখন বিহারের কারুকাজ করা ছাদের ওপর এলিয়ে পড়েছে। চারপাশটা যেন খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছিল। মায়ার মনে হয়েছিল, এই পাহাড়, এই সোনালি বিহার আর ওর বাবার হাত, সব মিলেমিশে এক রূপকথার জগৎ তৈরি করেছে। শান্তির জগৎ, এখানে ভয় শব্দটাই অর্থহীন।

শান্তির সেই সোনালি স্বর্গ মুহূর্তে এক বীভৎস কসাইখানায় পরিণত হলো। মিলিটারির লোকজন বিহারের একমাত্র প্রবেশদ্বার সেই ভারী কাঠের ফটকটাকে সশব্দে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। তার সঙ্গেই উপত্যকা থেকে বাইরে বেরোনোর সব পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। যে নিস্তব্ধতা একটু আগে পবিত্র মনে হয়েছিল, তা মুহূর্তে হিমশীতল আতঙ্কের রূপ নিল। অবাক মায়া দেখেছিল, ভালোবাসা আর নিরাপত্তায় ভরা বাবার সেই হাত এখন কাঁপছে। রাজধানী শাহ্জালালাবাদ থেকে সদ্যপ্রেরিত জেনারেলের নির্দয় ইশারায় সৈন্যরা চারপাশ থেকে বিস্ফোরক ছুঁড়তে শুরু করল, পাহাড়ের আদিম নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙে গেল গ্রেনেডের বিকট গর্জনে। যে আঙিনায় একটু আগেও ধূপের মিষ্টি গন্ধ ভাসছিল, সেখানে এখন শুধুই পোড়া মাংস আর বারুদের কটু গন্ধে ভারী বাতাস। চোখের সামনে দেখল মায়া, সোনালি প্যাগোডার কারুকাজ করা দেওয়ালগুলো আগুনের লেলিহান শিখায় কালো হয়ে ধসে পড়ছে। যে বুদ্ধমূর্তির শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ও শান্তি খুঁজছিল, সেই মূর্তির ওপর বৃষ্টির মতো আছড়ে পড়ছে কংক্রিটের টুকরো। চারদিকে আর্তনাদ আর বাঁচার আকুতি, কিন্তু বেরোনোর কোনো পথ নেই। ইঁদুরকলে আটকে পড়া নিরপরাধ মানুষগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাবার চওড়া বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে কুঁকড়ে ছিল মায়া। ও ভাবতো, বাবা সব পারে। কোনো বিপদই বাবাকে ডিঙিয়ে ওর কাছে আসতে পারবে না। কিন্তু তা তো হলো না। খুব অবাক হয়েছিল মায়া। বাবার সেই চওড়া বুক বুলেট বা বোমার আঘাত রুখতে পারছে না। যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধীর পদচারণা সময়কে থামিয়ে দিয়েছিল, তাদের রক্তে এখন বিহারের শ্বেতপাথরের মেঝে লাল হয়ে উঠেছে। প্রদীপের সেই পবিত্র শিখাগুলো এক বিশাল সর্বগ্রাসী অগ্নিকুণ্ডের রূপ নিয়েছে। শান্তির মায়াবী সেতু এখন নরকের এক গহ্বর। শেষ যে দৃশ্যটা মনে আছে সেটা হলো, জেনারেল রহমান পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে দেখছে, কীভাবে পৃথিবীর সব ভক্তি আর ভালোবাসা একসঙ্গে মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। মুখমণ্ডলে নির্লিপ্ত ক্রূর এক হাসি। শেষ স্মৃতি হয়ে রইল বাবার সেই শক্ত আলিঙ্গন, আগুনের উত্তাপে সে আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে।

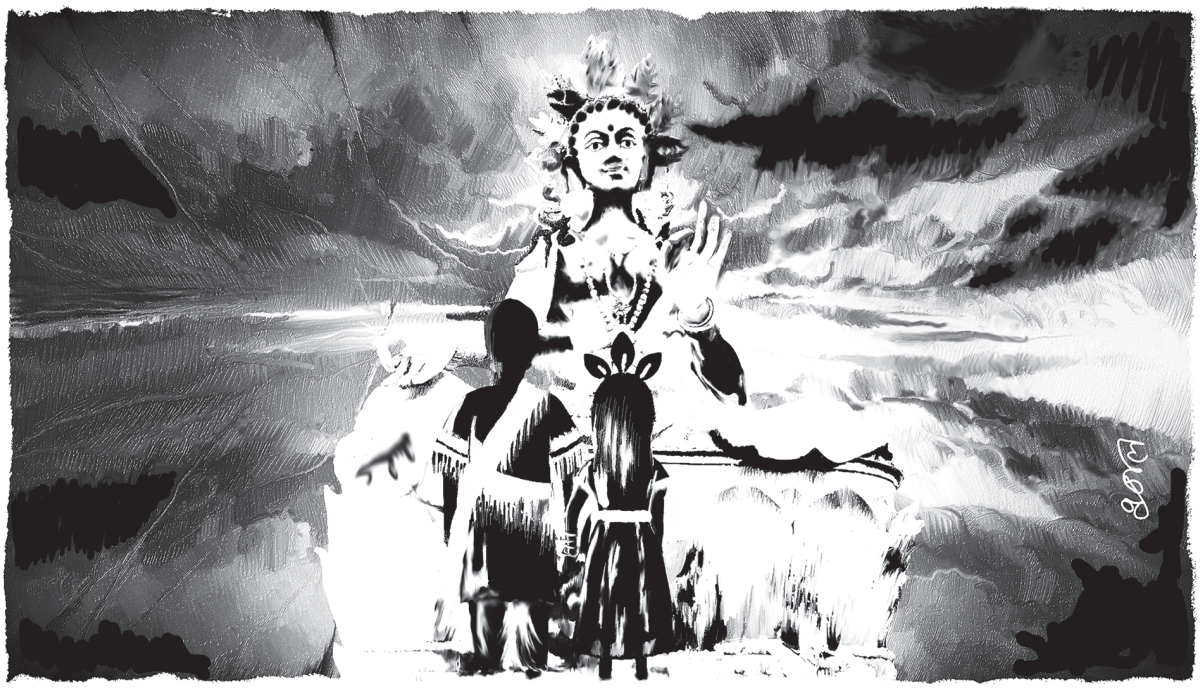
বাবা... বাবা... তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে, বাবা?

পা থেকে জোঁক ছাড়ানো শেষ করে উঠে দাঁড়ালো মায়া। জঙ্গলের গভীরে ওর আজকের আস্তানার দিকে হাঁটতে শুরু করল।



আষাঢ় মাসের সেই প্রথম রাতটার পর প্রায় মাস তিনেক কেটে গেছে।

চট্টলার ভূপ্রকৃতি ও সমাজবিন্যাসকে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়— পার্বত্য ও সমতল বা সমুদ্র উপকূল। আজ থেকে তিনমাস আগে লড়াইটা হচ্ছিল মূলত পার্বত্য চট্টলাতে, যেখানে আজও বৌদ্ধ চাকমারা সংখ্যাগুরু। সামরিক বাহিনীর সাহায্যে



জামাতের সশস্ত্র জেহাদি বাহিনী যখন তখন বৌদ্ধ পরিবারগুলোকে আক্রমণ করতো। ছেলেদের কুপিয়ে বা আগুনে জ্বালিয়ে মারতো, মেয়েদের বেঁধে নিয়ে যেত যৌনদাসী বানাতে। সেসব দৃশ্য মোবাইলে ভিডিয়ো তুলে ছড়িয়ে দিত, মুসলমান যুবকরা যাতে জামাতের বাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহ পায়। চাকমারা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে সেখানে পৌঁছে যেত মিলিটারি আর তাদের ড্রোন। পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিল চাকমারা।

আর সমতলে? সমুদ্রসৈকত জুড়ে শুধুই ছিল জামাতিদের আস্ফালন। অপ্রতিরোধ্য।

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। ওই অস্ত্রই দেশজুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। আষাঢ় মাসের প্রথম রাতে মায়ার উদ্ধার করা পাঁচ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র সেই ভূমিকাই নিল চট্টলার বিদ্রোহে। দিকে দিকে সরকারি আর জামাতের লোকেদের ওপর আক্রমণ শুরু হলো। গত তিনমাসে বোধহয় একটা দিনও যায়নি, যেদিন বড়সড় কোনো আক্রমণ হয়নি। পাওয়ার স্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সরকারি অস্ত্রাগার— কিছুই বাদ যায়নি। শহর আর গ্রামের অলিতে-গলিতে লড়াই হয়েছে জামাতের লোকেদের সঙ্গে। পরনে সাদা টুপির সঙ্গে বড়দার জামা আর ছোটভাইয়ের পাজামা, এই কিম্ভূত জীবগুলো এককালে দাপিয়ে বেড়িয়েছিল সর্বত্র, এদের কথাই ছিল আইন। বিদ্রোহীদের হাতে অস্ত্র আসার সঙ্গেই সময় বদলে গেছে।

পাহাড়ের আকাশে এখনো ড্রোনের দাপট, কিন্তু পাহাড়ের মাটি এখন মুক্তাঞ্চল। শাহ্‌জালালাবাদের মিলিটারি সেখানে ঢোকার সাহস পায় না। কিন্তু সমতলে লড়াই এখনো চলছে সমানে সমানে। ইতিমধ্যে ক্রমাগত আক্রমণে কোণঠাসা জামাতের বাহিনী একে একে পালিয়ে গেল চট্টলা ছেড়ে, নোয়াখালি পার হয়ে কুমিল্লায় গিয়ে জড়ো হয়েছে তারা। লড়াইয়ের ভার তারা রেখে গেছে সরকারি বাহিনী আর তাদের ব্যারাখতার ড্রোনদের ওপর।

ড্রোনবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা খুব কঠিন। তারা সর্বব্যাপী, সবজায়গায় তাদের চোখ। এই ড্রোনগুলির জন্যই বিদ্রোহীদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর। মায়া পরিষ্কার বুঝতে পারলো, ড্রোনবাহিনীকে নিরস্ত্র না করতে পারলে, আকাশের দখল না নিতে পারলে স্বাধীন চট্টলার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

সমতলে বিদ্রোহে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। 'চট্টলা এক্স-মুসলিম ফেডারেশন' নামের এক সংগঠন, যারা এতকাল লুকিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার অন্তরালে থেকে জামাতিদের বিরুদ্ধে মূলত বৌদ্ধিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, ইসলাম-ত্যাগীদের এই সংগঠনের লোকেরা ইতিমধ্যেই চাকমা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মী। তাদের কেউ বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগ দিয়েছে, কেউ-বা গোপনে সরকারের অন্দরমহলের খবর পৌঁছে দিচ্ছে মায়ার কাছে।

বর্ষাঋতু শেষ হলেও মৌসুমী বায়ু এখনো বিদায় নেয়নি চট্টলা থেকে। কাল সারারাত অঝোরধারে বৃষ্টি হয়েছে। ভোররাতে বৃষ্টি ধরেছে, কিন্তু বাতাসে এখনো ভেজা জঙ্গলের ঘ্রাণ। কাদামাটির রং গাঢ় হয়েছে। পাহাড়ের ওপর থেকে চট্টলা বন্দরকে দেখে মনে হচ্ছে যেন নিভু-নিভু একটা কাঠের উনুন। ঘন ধোঁয়াশার মধ্যে মিটমিট করা সঞ্চারমান আলোর বিন্দু, মরণাগত পাওয়ার স্টেশনের শেষ আলোর ঝলক, মিলিটারি পেট্রোলের আলো, ড্রোনবাহিনীর

লাল-নীল চোখ।

বান্দরবানের মেঘ-ছোঁয়া পাহাড়ের একদম নির্জন এক খাঁজে লুকিয়ে থাকা এই পরিত্যক্ত আস্তানাটা যেন এক বিষণ্ণ ইতিহাসের কঙ্কাল। ঘন বাঁশঝাড় আর বুনো ফার্নের আড়ালে মাচাং ঘরটি এমনভাবে মিশে আছে যে, কয়েক ফুট দূর থেকেও একে চেনা অসম্ভব। এ যেন পাহাড়ের বুকের এক গোপন ক্ষত। বহু বছর আগে জেহাদিদের ভয়ে ফেলে যাওয়া এই কুটিরটির বাঁশের খুঁটিগুলো এখন উইপোকায় খেয়ে জীর্ণ করে ফেলেছে। ঘরের মাচা বা মেঝেটা জায়গায় জায়গায় ধসে পড়েছে, সেখানে জমছে ঝরাপাতার স্তূপ আর স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা। ঘরের ভেতরটা সবসময় এক গুমোট অন্ধকারে ডুবে থাকে। এক কোণে পড়ে আছে একটা পুরনো কাঠের গুঁড়ি, গায়ে গভীর ক্ষতের মতো ফাটল ধরেছে। মাটির উনুনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, তার পাশে পড়ে আছে একটা জংধরা টিনের মগ, যার তলায় ফুটো, সময়ের বালুরাশি জমে আছে ভেতরে। দেওয়ালের পচা বাঁশের চটা বেয়ে বুনো লতা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এ এখন আর কারোর সুখী গৃহকোণ নয়, বান্দরবানের এই গহীন অরণ্যের এক নিঃসঙ্গ ধ্বংসস্তূপ, যা সময়ের সঙ্গে পচে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

সেই ঘটনাটার পর আর ঘরে ফেরা হয়নি মায়ার। খুব ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে দেখতে, সব ঠিক সেরকমই আছে কিনা। তারপরেই ভয় করে। বাবা তো সেই আগের মতো ঘরের জানালার পাশে বসে নেই। ফাঁকা বাড়ির নির্মম দৃশ্য কি ও সহ্য করতে পারবে? মাথা নেড়ে ঘরের বাইরে বেরোলো মায়া। সেখানে আগুন জ্বলছিল, কাঁচা বাঁশের চোঙের ভেতর ঝরনার জলে পাহাড়ি চায়ের কাঁচা পাতা ফুটছিল। কাঠের একটা মগে কিছুটা চা ঢেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো মায়া। ফাটা কাঠের গুঁড়ির ওপর মেলে ধরে নিবিষ্টমনে একটা মানচিত্র দেখছিল থুরা। বন্দরের মানচিত্র, সেখানে লাল কালিতে দাগ দেওয়া আছে সেই জায়গাগুলো, যেখান থেকে ক্রমাগত ড্রোন আক্রমণ হচ্ছে। তার পাশে কালো কালিতে তালিকা করা আছে, কোন কোন সময়ে ড্রোন আক্রমণগুলো হচ্ছে। এর সঙ্গেই, হলুদ কালিতে আঁকা আছে, ড্রোনগুলো কোন পথ ধরে আসে।

''একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে,'' হাতের ধোঁয়া ওঠা মগটাকে গুঁড়ির ওপর রেখে বলল মায়া, ''ড্রোনগুলো ঠিক রাত বারোটা নাগাদ চট্টলা ক্যান্টনমেন্ট, মানে চট্টলা দুর্গের দিকে যায়। এটা একটা কমন প্যাটার্ন। তার মানে কী?''

''পাখি যতই আকাশে উড়ুক,'' বলল থুরা, ''দিনের শেষে বাসায় ঠিকই ফেরে। তার মানে, এই ব্যারাখতার-পাখির বাসা হলো চট্টলা দুর্গ। তুমি তো জানো, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই চট্টলা দুর্গের একটা ভূমিকা ছিল। আজ সেই দুর্গই সম্ভবত ওদের ড্রোনবাহিনীর কমান্ড সেন্টার।''

''আরও একটা ব্যাপার,'' বলল মায়া, ''দেখা যাচ্ছে, রাত ঠিক বারোটা পঁয়তাল্লিশ থেকে একটা পনেরোর মধ্যে কোনো ড্রোন-হামলা হয় না। কেন? ওই সময় কি ড্রোনগুলো মেন্টেনেন্সট মোডে থাকে? মেরামত, ব্যাটারি চার্জিং— এসব কি ওই সময় হয়?''

''সম্ভবত,'' বলল থুরা। তারপর মায়ার চায়ের মগটা গুঁড়ির ওপর থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখলো। সাবধানে জামার আস্তিন দিয়ে চায়ের দাগটা মুছে ফেলল গুঁড়ির ওপর থেকে।

''কী হলো?'' অবাক হলো মায়া, ''চায়ের মগটা কী অসুবিধে করছিল এখানে?''

''পাহাড়ি গ্রিন টি,'' গম্ভীর মুখে বলল থুরা, ''স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। কিন্তু কাগজের পক্ষে মোটেই ভালো না। ম্যাপে চায়ের দাগ লাগলে সেটা দেখতে খুব খারাপ লাগতো।''

রাগতে গিয়েও হেসে ফেললো মায়া, ''আপনি বড্ড সাবধানি মানুষ তো!''

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা দমকা বাতাস ওপরের দিকে ধেয়ে এল। জরাজীর্ণ ছাদের ছনগুলো খসখস শব্দ করে উঠল, শুনতে অনেকটা অশরীরীর ফিসফিসানির মতো লাগল। জানালার ভাঙা ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো মেঝেতে পড়েছে, ধূলিকণাগুলো সেখানে আনন্দে নাচছে। মনে করিয়ে দেয় যে, এখানে একসময় এক সুখী স্বচ্ছল জীবন ছিল। এখন সেখানে শুধু পাহাড়ি নির্জনতা আর মাঝে মাঝে কোনো বুনো জানোয়ারের পায়ের শব্দ।

''যদি ঠিক রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ থেকে একটা পনেরোর মধ্যে,'' বলল মায়া, ''চট্টলা দুর্গ আক্রমণ করে ওদের ড্রোন সেন্টার উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে একসঙ্গে সবকটা পাখি মারা পড়বে। আক্রমণ করাটা সমস্যা নয়। বিস্ফোরক,অস্ত্রশস্ত্র — সবই আমাদের কাছে যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, দুর্গের কোনো নকশা আমাদের কাছে নেই। চট্টলা দুর্গ একটা সামরিক ঘাঁটি, ভেতরের লোক ছাড়া কারোর কাছে সে নকশা থাকবে না। দুর্গের ভেতরটা কেমন, তা না জেনে আক্রমণ করলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হবে।''

''দৈবক্রমে,'' বলল থুরা, ''তোমার সমস্যার সমাধান হয়তো আমার কাছে আছে।''

''তার মানে?'' অবাক হলো মায়া।

পকেট থেকে নিজের মানিব্যাগ বের করল থুরা। ব্যাগের খাপে একরাশ মায়ানমার, পূর্ব খোরাসান ও ভারতের টাকার মধ্যে থেকে প্লাস্টিকে মোড়া একটা নীল তেলতেলে কাগজ বেরিয়ে এল। সাবধানে প্লাস্টিক মুক্ত করে সেই নীল কাগজটা মানচিত্রের পাশেই খুলে রাখলো থুরা। ছবিটা একটা নীলনকশা। মায়া ভালো করে দেখলো, নকশার কোণায় দিনাঙ্ক লেখা আছে ১৯৭০-এর। সঙ্গে ইংরেজি ও উর্দুতে কিছু লেখা আছে। ইংরেজিটা পড়ল মায়া। চট্টলা দুর্গ, পূর্ব পাকিস্তান। সঙ্গে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ডিভিশন ইত্যাদি লেখা রয়েছে।

''আশাকরি একাত্তরের পর দুর্গের ভেতরে বড়ো কোনো রদবদল হয়নি,'' বলল থুরা।

''এই নকশা আপনি কোথায় পেলেন?'' অবাক মায়া প্রশ্ন করল।

''ক'বছর আগে আমার ঠাকুর্দার পারলৌকিক কাজের জন্য বাড়ি গিয়েছিলাম। সেই সময় ওঁর কাগজপত্রের মধ্যে একটা পুরোনো চামড়ার ফাইল পেয়েছিলাম, ব্রিটিশ আমলে যেরকম ফাইল সামরিক মহলে ব্যবহার হতো, সেরকম। ফাইলের ওপরে লেখা ছিল 'জেনারেল ডেথ'। সেই ফাইলের অনেকরকম কাগজপত্রের মধ্যে এই নকশাটা পেয়েছিলাম। আরও কয়েকটা নকশা ছিল, একটা ছিল যশোর ক্যান্টনমেন্টের নকশা। সে যাই হোক, ততদিনে আরাকান আর্মির মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে, চট্টলার জন্য আমাদের কী করা উচিত, আমরা কী করতে পারি। আমার তখন মনে হয়েছিল, এই নকশাটা হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তাই আরাকান আর্মি যখন আমাকে চট্টলা পাঠাবে ঠিক করল, আমি দুটো দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এই নকশাটা সঙ্গে নিয়ে নিলাম।''

''আপনার ঠাকুর্দা এটা পেলেন কীভাবে?'' বললো মায়া।

''ঠিক জানি না। তবে আমার সন্দেহ হয়, ওই ফাইলটা আমার ঠাকুর্দার গুরু ওঁর কাছে রেখে গিয়েছিলেন।''

''গুরু? মানে, কোনো সন্ন্যাসী, কোনো আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ? তার কাছে এরকম একটা সামরিক দলিল আসবে কীভাবে?''

মানিব্যাগের খাপে একটা ছবি দেখা যাচ্ছিল। হলদে হয়ে ওঠা ল্যামিনেট করা একটা ফোটো। ফোটোতে ফ্রেমবন্দি দুই সৈনিক, পরনে পুরোনো দিনের সামরিক পোশাক। এরমধ্যে একটা মুখ খুব চেনা ঠেকলো মায়ার। সেই দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে থুরা বলল, ''আমার দেশে লোকে বংশানুক্রমিক পদবি ব্যবহার করে না। কিন্তু আমি করি। আমার পদবি 'সান' নয়, 'সান্যাল'। আমার ঠাকুর্দা এসেছিলেন এই পূর্ববঙ্গ থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বর্মার রণাঙ্গনে লড়েছিলেন উনি। কিন্তু ইংরেজরা জিতে গেল, আজাদ হিন্দ ফৌজকে আত্মসমর্পণ করতে হলো। আমার ঠাকুর্দা আনন্দ সান্যালের মতো আরও অনেক সৈনিককে তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিলেন, বর্মার স্থানীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশে যেতে, লড়াই চালিয়ে যেতে। খাতায়-কলমে আনন্দ সান্যাল মারা গেল, নতুন পরিচয়ে বর্মী ছদ্মবেশে তিনি আবার লড়াই শুরু করলেন।

বোসের সঙ্গে ঠাকুর্দার যোগাযোগ ছিল। বাড়িতে তখন কেউ 'বোস' নামটা উচ্চারণ করত না, বলত 'জেনারেল ডেথ'। সেই জেনারেল ডেথকে আমি সশরীরে দেখলাম ১৯৭১ নাগাদ, বর্মার মান্দালয়ে। আমার বাবা তখন বর্মার সামরিক গুপ্তচর বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার, জেনারেল ডেথ তখন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। সে বছর ঠাকুর্দা আর বাবা তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। বাড়িতে একটা পূজা হয়েছিল তখন, বেশ মনে আছে। সেই সময় সেই অনামা সন্ন্যাসী পরিকল্পনা করছিলেন, কীভাবে চট্টলা আর যশোর দুর্গ দখল করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে এগিয়ে আনা যায়। ওঁরা তিনজন মিলে কী পরিকল্পনা করেছিলেন, আমার তা জানা নেই। আমি তখন খুব ছোটো, কিন্তু আমাদের বাড়িতে এরকম অনেক গোপন মিটিং হতো, তার মধ্যে থেকে কিছু কথা আমার কানে আসতো। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হলো। আমার ধারণা, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় নিশ্চয়ই ওঁদের কোনো ভূমিকা ছিল। সে যাই হোক, এখন আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হলো, দুর্গের ভেতরে ক'জন প্রহরী আছে, তারা কোথায় কোথায় থাকে, রাতে কতজন ডিউটিতে থাকে, এই সব খবর জোগাড় করা।''

''আমার এক বন্ধু আছে,'' বলল মায়া, ''আরিফ আমার ছোটোবেলার বন্ধু, আমরা এক স্কুলে পড়েছি। ও এখানকার সামরিক বিভাগে কাজ করে। এক্স-মুসলিম সংগঠনে আছে, তাই ওর কাছ থেকে এসব খবর হয়তো পাওয়া যেতে পারে। আমি চেষ্টা করছি।''

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো মায়া। এদিক-ওদিক তাকালো।

''কী হলো?'' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল থুরা।

''একটা গন্ধ পাচ্ছ কি?'' বলল মায়া।

''কী গন্ধ?''

''নারকেল তেলের গন্ধ,'' বলল মায়া, ''মা চুল বাঁধার সময় ঠিক এইরকম নারকেল তেলের গন্ধ পেতাম। মা-কে আর আজকাল আমার মনে পড়ে না, শুধু এই গন্ধটা বারবার পাই।''



এই অঞ্চলে রাত্রি খুব দ্রুত নেমে আসে। এই মুহূর্তে জঙ্গল আলো হয়ে আছে, যেন এক অগ্নিগর্ভ মরকত-মণি। যেন মা তারার সবুজ রূপ, জীবনের প্রতীক। পরমুহূর্তেই তা দ্রুত পরিবর্তিত হলো মা তারার কালো রূপে, যে রূপে তিনি সর্বব্যাপী মৃত্যুরূপী কাল, জীবন-হন্তা। অন্ধকারে মিশে ওরা অগ্রসর হলো দুর্গের দিকে। একটু আগেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, এখনো তার ঝিরিঝিরি অবশেষ নিরন্তর চলছে। বাতাসের চিটচিটে আর্দ্রতা চামড়ায় জ্বালা ধরায়। কাদায় প্যাচপ্যাচে মাটি, ভারী বুটের শব্দ তাতে ঢাকা পড়ে যায়। ধোঁয়াশায় ঢেকে আছে চারিদিক। দূরে কোথাও লাউডস্পিকার থেকে আস্ফালন ভেসে আসছে— ''পবিত্রতাই ইসলাম। কাফের সাফ করো।''

বৃষ্টির কালো চাদরে ঢাকা পড়েছে পাহাড় আর সমতলের মিলনস্থল। ঘন অরণ্যের ভেতর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া যখন দুর্গের পাথুরে দেওয়ালে আছড়ে পড়ছে, তখন মনে হচ্ছে আদিম কোনো দানব অন্ধকারে গর্জন করছে। আকাশের বুক চিরে যখন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, তখন সেই ক্ষণিক আলোয় দুর্গের জরাজীর্ণ কঙ্কাল এক মুহূর্তের জন্য চরাচরে ভেসে ওঠে— বিবর্ণ প্রাচীর, ভেঙে পড়া চূড়া আর শিকড়বাকড়ে জড়ানো লাল পাথর। যেন কোনো

এক অভিশপ্ত প্রাসাদ। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই লাল দেওয়ালগুলো। গণেশ ঘোষ আর লোকনাথ বলের ছোঁড়া গুলির আঘাত এখনও গর্বভরে বুকে ধারণ করে আছে এই ইঁট-কাঠ-পাথর। মাস্টারদাকে এখনো ভোলেনি ওরা। পাকিস্তানি আমলে মুক্তিবাহিনীর লোকেদের এখানে ধরে নিয়ে আসা হতো যন্ত্রণা দিয়ে কথা বার করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের দাগ এখনো লেগে আছে দেওয়ালের গায়ে। সেসব স্মৃতিও ভোলেনি এই দেওয়ালগুলো।

দুর্গের ছাদহীন কক্ষগুলোতে অবিরাম ধারায় বৃষ্টির জল পড়েছে। পাথুরে মেঝেতে জমে থাকা জল যখন উপচে পড়ে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নীচে গড়িয়ে যায়, তখন সেই শব্দের প্রতিধ্বনি দুর্গের অন্ধকার অলিন্দে এক ভূতুড়ে সুর তৈরি করে। সমুদ্র আজ অত্যন্ত উত্তাল, উত্তাল কর্ণফুলী, তাদের মিলিত গর্জন এতদূরেও শোনা যায়। লোনা বাতাস থেকে থেকে সজোরে আঘাত করছে, বৃষ্টির আর্দ্রতার সঙ্গে মিশে দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। একদিকে জঙ্গলের বাঁশঝাড়ের একটানা ঘর্ষণ, অন্যদিকে নদী আর সমুদ্রের গম্ভীর হুঙ্কার, এই দুয়ের মাঝে দুর্গটি আজ বড়ো অসহায়। বৃষ্টির ঝাপটায় দেওয়াল বেয়ে নেমে আসা জলধারাগুলো দেখতে অনেকটা কান্নার দাগের মতো লাগছে। প্রাচীরের ফাটলে বাসা বাঁধা বুনো গাছগুলো বাতাসের তোড়ে উন্মত্তের মতো মাথা কুটছে দুর্গের গায়ে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকালে দেখা যায়, দুর্গের খিলানগুলো যেন কালো বিশাল চোখ নিয়ে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। এই দুর্যোগপূর্ণ রাতে পাহাড়ের অরণ্য সাগরের উন্মাদনা আর নদীর ক্রোধের মাঝে আটক পড়ে গেছে। অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গটি যেন মহাকালের একাকী এক রহস্যময় ধ্বংসস্তূপ, বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায় নিজের হারিয়ে যাওয়া অহংকারকে হাহাকার করে খুঁজে ফিরছে।

পাঁচিলের ফাটলে গজানো অশ্বত্থগাছ থেকে প্রেতের মতো ঝুপ করে নামল একটা কালো ছায়া— মায়া। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। ০০৪৩, মানে রাত বারোটা তেতাল্লিশ। ঠিক সময়। গলার কাছের ট্রান্সমিটারে দুবার টোকা দিল। ''টিম বজ্র!''

এক-এক করে বাকিদের উত্তর ভেসে এল মায়ার কানের মধ্যে লুকোনো ইয়ারফোনে। নীলা, বোধিচিত্ত, মৈত্রী, অমিতাভ, থুরা। ''ওঁম তারে তুত্তারে তুরে— বজ্রজ্বল ফট্ ফট্— রক্ষ রক্ষ স্বাহা!'' ছ'টি স্বর বেতারতরঙ্গে ফিসফিস করে উচ্চারণ করল হাজার বছরের পুরোনো এক মন্ত্র, যার উৎস এই পূর্ববঙ্গেরই সুপ্রাচীন বজ্রযোগিনী গ্রামে।

ছয় বিদ্রোহী, যেন ছ'টি প্রেত। ছ'টি নির্দিষ্ট দায়িত্ব।

নীলাঙ্ক ইলেক্ট্রনিক্স

বোধিচিত্তঙ্ক অনুপ্রবেশ ও বিস্ফোরক

মৈত্রীঙ্ক নজরদারি ও স্নাইপার

অমিতাভঙ্ক কাজ শেষে সবাইকে নিরাপদে বের করে আনা

মায়াঙ্ক নেতৃত্ব

থুরাঙ্ক নির্দেশক

আজ যা যা করতে হবে, থুরা ওদেরকে তার মহড়া দিয়েছে কমপক্ষে পঁচিশ বার। তবু আজ মায়ার বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। ''০০৪৫,'' বলল মায়া, ''সবাই ঘড়ি মিলিয়ে নাও।''

নাইট ভিশন দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখল মায়া। পাহাড়ের প্রান্তে দুর্গটা যেন এক অতিকায় কালচে লাল প্রেত। লোহার পাতে মোড়ানো ভারী কাঠের দুটো দরজা, ভারী দুটো পাথরের থাম অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে। থাম দুটোর ওপর ভাঙাচোরা দুটো সিংহের মূর্তি। এককালে তারা সগর্বে দুর্গকে রক্ষা করত, আজ তারা শুধুই অতীত গৌরবের সাক্ষী। দুর্গের দেওয়াল জুড়ে গুল্মলতার জঙ্গল। প্রাচীন সেই দেওয়ালের পেছন থেকে বিষাক্ত কাঁটার মতো উঁকি দিচ্ছে একাধিক বড়ো ছোটো স্টিলের অ্যান্টেনা। বড়ো একটা স্যাটেলাইট ডিস্ক নিঃশব্দে ঘুরে চলেছে। ওই ডিস্কের নীচেই আছে সার্ভার রুম। যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কম্পিউটার সফট্ ওয়্যার ঠিক করছে —কে বিশ্বাসী আর কে অবিশ্বাসী, কার বাঁচার অধিকার আছে আর কে ওয়াজিব-উল-কতল। বাইরে থেকে এখনো দেখে মনে হয় এটা একটা প্রাচীন দুর্গ। কিন্তু প্রাচীন দেওয়ালের আড়ালে এটা একটা আধুনিক ড্রোন কমান্ড সেন্টার। হঠাৎ একটা কথা মনে হলো থুরার। প্রতিটা স্বৈরাচারীই বোধহয় উত্তরাধিকার সূত্রে পায় তার আগের স্বৈরাচারীর সাম্রাজ্য, তার ব্যবস্থা, এর সঙ্গে তার গুপ্তকথা, তার অভিশাপ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল থুরা।

দুর্গপ্রাকার থেকে প্রায় দুশো মিটার দূরে পাহাড়ের খাঁজে শরীরটাকে আড়াল করে শুয়ে ছিল মৈত্রী, হাতে অয়েলক্লথ জড়ানো দ্রাগুনভ স্নাইপার রাইফেল। রাইফেলের টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে পেল, দুর্গপ্রাকারের ওপর দিয়ে দুদিক থেকে দুজন প্রহরী কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে। জলে ভেজা পাথরের গায়ে তাদের ভারী জুতোর আওয়াজ উঠছে— থপ থপ, ছপ ছপ— থপ থপ, ছপ ছপ। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল মৈত্রী। দুজন প্রহরীর মাথা যখন ওর রাইফেলের সঙ্গে এক সমান্তরাল রেখায় এল, ঠিক তখনি রাইফেলের ঘোড়া দাবালো মৈত্রী। রাইফেলের সাইলেন্সার থেকে ব্লপ্ করে মিহি একটা শব্দ নির্গত হলো, তার সঙ্গেই ধুপ্ করে আওয়াজের সঙ্গে একইসঙ্গে দুজন প্রহরী প্রাকার থেকে মাটিতে এসে পড়ল। পরমুহূর্তেই ওর গ্র্যাপলিং বন্দুক ফায়ার করল বোধিচিত্ত। বন্দুকের মুখ থেকে নির্গত হয়ে নোঙ্গর সোজা উড়ে গেল দুর্গপ্রাকারের দিকে, আটকে গেল সিংহের মূর্তিতে। দড়িতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেখল বোধিচিত্ত, সেটা খুব দৃঢ়ভাবে নোঙ্গরে আটকে আছে। নীলা প্রথম গেল। দড়ি ধরে একটা লাফ দিল, ওর পা যেন নাচের ভঙ্গিতে অনায়াসে পাঁচিলের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। মৈত্রী অনুসরণ করল, জীর্ণ দেওয়ালের ভাঙা ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে পা রেখে সাবধানে পৌঁছে গেল প্রাকারের ওপরে। এরপরে মায়া। বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে দুর্গের দেওয়াল। এমনকী দড়িটাও।

চামড়ায় ঘষা লেগে জ্বালা করে উঠল। মায়া যখন প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছেছে, হঠাৎ একটা সার্চলাইট ওর ওপর এসে পড়ল।

''হল্ট!''

ব্লপ্ করে একটা বোবা শব্দ হলো। মৈত্রীর গুলিতে স্তব্ধ হলো আরেকজন প্রহরী। পরের গুলিটা চুরমার করে দিল সার্চলাইটের তীব্র দৃষ্টি। শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে মায়া পৌঁছে গেল পাঁচিলের ওপারে। সেখান থেকে ভেতরটা দিব্বি দেখা যায়। দুর্গের ঠিক মধ্যিখানে একটা সমতল জমি। আগে নিশ্চয়ই এখানে প্রহরীদের কুচকাওয়াজ হতো। এখন সেই জায়গায় একধারে রয়েছে স্টিলের বিশাল এক খাঁচা, পুরো জায়গাটাই কাঁচের দেওয়ালে ঢাকা। ড্রোন হ্যাঙ্গার। শয়ে শয়ে ড্রোন সেখানে চার্জ হচ্ছে। সূক্ষ্ম লাল নীল আলোতে ভূতুড়ে হয়ে আছে জায়গাটা। একদল লোক ব্যস্ত আছে সেই ড্রোনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে, ডজনখানেক প্রহরী পাহারা দিচ্ছে তাদের। বাতাসে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে পাথরের গন্ধ, ইলেক্ট্রনিক সার্কিটের উষ্ণ গন্ধ। নাক সিঁটকালো মায়া।

''০০৫৬,'' বেতারতরঙ্গে বলল অমিতাভ।

দৃশ্যটা দেখে খটকা লাগলো মায়ার। আগে কখনো ড্রোন কমান্ড সেন্টার দেখেনি ও। কিন্তু মন বলছে, এটা যেন শুধু ড্রোন সেন্টার নয়। তারচেয়েও বড়ো কিছু। কাঁচের দেওয়ালে ঢাকা জায়গাটার অন্যপাশে ছড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো কিছু বৃত্তাকার কংক্রিটের ঢাকনা। থিরথির করে কাঁপছে মাটি, মৃদু গুঞ্জনের শব্দ ভেসে আসছে মাটির গভীর থেকে। মায়ার সতর্ক কান ইঙ্গিত দিল, যেন মাটির নীচে অনেক লোক কথাবার্তা বলছে। পুরো জায়গাটায় এক ধরনের অস্বস্তিকর থমথমে ভাব বিরাজ করছে। কী ব্যাপার?

সমতল জমিটার জায়গায় জায়গায় কামান রাখা আছে। কে জানে কত শতাব্দী তাদের থেকে আগুনবৃষ্টি হয়নি। মোটা তারের গোছা জড়িয়ে রাখা আছে তাদের গায়ে। নিঃশব্দে সেরকম একটা তারের গোছার জংশন বক্স খুলে ফেলল নীলা, পকেট থেকে বিস্কুটের মতো পাতলা একটা ইলেক্ট্রনিক বোর্ড বের করে তারমধ্যে ঢুকিয়ে দিল। মণিবন্ধ সংলগ্ন মনিটরে ভেসে উঠল একগুচ্ছ সংখ্যা আর হরফ—অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোড। নাকের ডগার চশমাটাকে ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে লেগে পড়ল সিকিউরিটি সিস্টেমের ফায়ারওয়াল কোড অধ্যয়নে। চশমার কাঁচে প্রতিফলিত সংখ্যাগুলো দ্রুত বদলাতে লাগলো। দাঁত কিড়মিড় করে ফায়ারওয়াল কোডের উদ্দেশ্যে কয়েকটা গালাগাল দিল নীলা। বলল মনে মনে, ভেবেছিস কী? তোদের ভাষা কেউ বোঝে না? ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় নীলার জেদের কাছে আত্মসমর্পণ করল ফায়ারওয়াল কোড। নিঃশব্দে দুর্গের সবকটা দরজার লক খুলে গেল। অন্ধ হয়ে গেল সবকটা ক্যামেরা।

''ফুরেইয়ে,'' বলল নীলা।

''০১০৪,'' বেতার তরঙ্গে ফিসফিস করে উঠল অমিতাভর স্বর।

মায়া আর বোধিচিত্ত নীচু হয়ে এগিয়ে গেল ড্রোন হ্যাঙ্গারের দিকে। ঝড়ের পর জমে থাকা বৃষ্টির জল ওদের বুটের নীচে চাপা ছপছপ শব্দ তুলছে। চারপাশে আধো অন্ধকার ; শুধু দূরের সার্চলাইট মাঝে মাঝে ঘুরে এসে কাঁচের দেওয়ালে সাদা আলো ফেলে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঙ্গারের কাঁচের দরজাটায় এক ইঞ্চি ফাঁক। ভেতর থেকে নীলাভ আলো বেরিয়ে আসছে। দরজার সামনে তিনজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। AK-47 কাঁধে ঝুলছে, চোখে ক্লান্তি। ওরা জানেই না, মৃত্যু ওদের কয়েক সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

মায়া কোমরবন্ধ থেকে একটা আধুলি-সাইজের ধাতব বস্তু বের করল। ছোট্ট একটু চাপ দিয়ে তারপর আঙুলের ফাঁকে ঘুরিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল ওদের দিকে।

ঠক।

জিনিসটা গড়িয়ে গিয়ে থামল প্রহরীদের বুটের কাছে।

একজন ভ্রূ কুঁচকে নীচু হলো।

''এটা আবার—''

ফ্ল্যাশ!

চোখ ধাঁধানো সাদা আলো পুরো করিডোর গ্রাস করল। সঙ্গে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল কাঁচের দেওয়াল।

প্রহরীরা চিৎকার করে উঠল। দু'হাতে চোখ চেপে ধরে এলোপাথাড়ি পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খেল।

ঠিক তখনই—

ঠাস!

দূর থেকে মৈত্রীর স্নাইপার রাইফেলের গুলি এসে প্রথম প্রহরীর কপাল ভেদ করল। লোকটার মাথা ঝাঁকুনি খেয়ে পেছনে ঘুরে গেল, শরীরটা যেন সুতোকাটা পুতুলনাচের পুতুলের মতো ধপ্ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

বাকি দু'জন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মায়া ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রথম লোকটার বুকের ওপর হাঁটুর আঘাত হেনে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল। একই সঙ্গে অন্যজনের গলা দু'হাতে চেপে ধরল। লোকটা রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল, মায়া তার কবজিতে মোচড় দিল।

মট্! হাড় ভাঙার শব্দ।

লোকটা আর্তনাদ করতেই মায়া তার মুখে কনুইয়ের গুঁতো মারল। দাঁত ভেঙে রক্ত ছিটকে পড়ল কাঁচের দরজায়। অন্য প্রহরীটা কোমর থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা করছিল। মায়া মাটিতে পড়ে থাকা রাইফেলটা লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার ঘাড়ের পাশে রদ্দা মারল।

ধপ!

লোকটা টাল খেয়ে পড়তেই মায়া তার মাথা ধরে সজোরে কাঁচের দেওয়ালে ঠুকে দিল। কাঁচ ফেটে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে গেল। একদলা রক্ত আর ঘিলু ধেবড়ে লেগে রইল তার

সঙ্গে।

এই ফাঁকে বোধিচিত্ত দরজার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

''০১০৬,'' ইয়ারপিসে ভেসে এল অমিতাভর শান্ত গলা।

পরের মুহূর্তেই —

ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়াওঁ—

তারস্বরে অ্যালার্ম বেজে উঠল। লাল জরুরি আলো জ্বলে উঠতেই পুরো হ্যাঙ্গারটা রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সারি সারি ড্রোনের কালো শরীরগুলো দেখতে লাগল রাগি ঘুমন্ত দানবের মতো।

দূরের করিডোর দিয়ে দৌড়ে আসছে বাকি প্রহরীরা। ভারী বুটের শব্দ ধাতব মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা থুরা প্রথম গুলি চালাল।

টাট! টাট!

দুই প্রহরী বুক চেপে পড়ে গেল।

নীলা পাশের স্তম্ভের আড়াল থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল চালাল। গুলির আঘাতে কাঁচ চূর্ণ হয়ে চারদিকে উড়ে গেল। অমিতাভ খুব হিসেব করে শট নিচ্ছে — প্রতিটা গুলি হাঁটু, গলা বা কাঁধে। যেন লোকগুলোকে থামিয়ে রাখা তার উদ্দেশ্য, হত্যা নয়।

বোধিচিত্ত ইতিমধ্যে হ্যাঙ্গারের ভেতরদিকে দৌড়েছে। ওর হাতে ছোটো ছোটো প্লাস্টিক বিস্ফোরক। একটার পর একটা বসিয়ে যাচ্ছে —ড্রোনের তাকগুলোর নীচে, জেনারেটরের পেছনে, ফুয়েল লাইনের জংশনে।

ক্লিক। ক্লিক। ক্লিক। চুম্বক আটকে যাচ্ছে ধাতুর গায়ে।

বোধিচিত্তর শ্বাস ভারী হয়ে উঠেছে। ঘামে ভিজে গেছে কপাল। কিন্তু হাত কাঁপছে না।

ঠিক তখনই — ক্লিক খঠাস্! মায়ার কান ঘেঁষে একটা গুলি উড়ে গেল।

মায়া পাশের সার্ভিস ডেস্কটা উলটে আড়াল নিল।

ঠাস্! আরেকটা গুলি ডেস্ক ভেদ করে চলে গেল, কাঠের টুকরো উড়ে গেল ওর মুখের পাশ দিয়ে। ও বুঝল, টেকনিশিয়ানদের কারোর কাছে অস্ত্র আছে।

লাল আলোয় দেখতে পেল, সাদা কোট পরা একজন লোক কন্ট্রোল কনসোলের আড়ালে বসে পিস্তল তাক করে আছে।

লোকটা আবার গুলি চালাল।

মায়া গড়িয়ে পাশ বদলালো। পরের গুলিটা কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেল। কয়েকটা চুল বাতাসে উড়ল।

মায়া নিঃশ্বাস চেপে অপেক্ষা করল।

এক সেকেন্ড।

দুই সেকেন্ড।

লোকটা মাথা তুলতেই ও টেবিলের ওপর ভর দিয়ে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দিল সামনে। মাঝ-আকাশে থেকেই ট্রিগার টিপল।

ধাম!

লোকটার কাঁধ ফেটে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোলো। পিস্তল হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে।

সময় শেষ হয়ে আসছে। ''০১১০,'' অমিতাভর গলা ভেসে এল ইয়ারপিসে, এবার আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ, ''আর দু'মিনিটের মধ্যে বেরোতে হবে!''

ঠিক তখনই শোনা গেল ভারী বুটের শব্দ।

ধুপ। ধুপ। ধুপ।

এটা সাধারণ প্রহরীদের হাঁটা নয়। তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসছে পুরো একটা স্কোয়াড।

রিজার্ভ সেনারা জেগে উঠেছে।

দূরের করিডোরে কালো ছায়াগুলো দেখা দিল। ভারী বডি-আর্মার, হেলমেট, নাইট-ভিশন গগলস। একজন হাঁটু গেড়ে বসে মেশিনগান সেট করল।

পরের মুহূর্তেই আগুনের ঝড় শুরু হলো।

ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট!... ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট!

গুলির চাপে কাঁচের দেওয়াল বিস্ফোরিত হয়ে উড়ে গেল। ড্রোনের সারিগুলো ভেঙে পড়তে লাগল। ধাতব টুকরো বাতাসে ছিটকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মায়া একটা উলটে যাওয়া ট্রলির আড়ালে আশ্রয় নিল। গরম সিসার ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে উড়ে যাচ্ছে। পাশেই একজন আহত প্রহরী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

বোধিচিত্ত শেষ বিস্ফোরকটা জেনারেটরের নীচে বসিয়ে চিৎকার করল—

''সবাই বের হও! ভাগ-অ ...!''

ঠিক তখনই একটা গুলি এসে ওর বাহু ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। একদলা রক্ত ছিটকে পড়ল ধাতব মেঝেতে।

মায়া মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে গিয়ে বোধিচিত্তকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল থামের আড়ালে। একই সঙ্গে পড়ে থাকা রাইফেল তুলে পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দিল করিডোরের দিকে।

''তৈরি?'' গুলি ছোঁড়ার ফাঁকেই বলল মায়া।

''তৈরি,'' বলল অমিতাভ। ইতিমধ্যেই অমিতাভ জিপলাইন টাঙিয়ে ফেলেছে, লম্বা একটা স্টিলের দড়ি দুর্গ থেকে সোজা চলে গেছে বাইরে, সোজা জঙ্গলের মধ্যে।

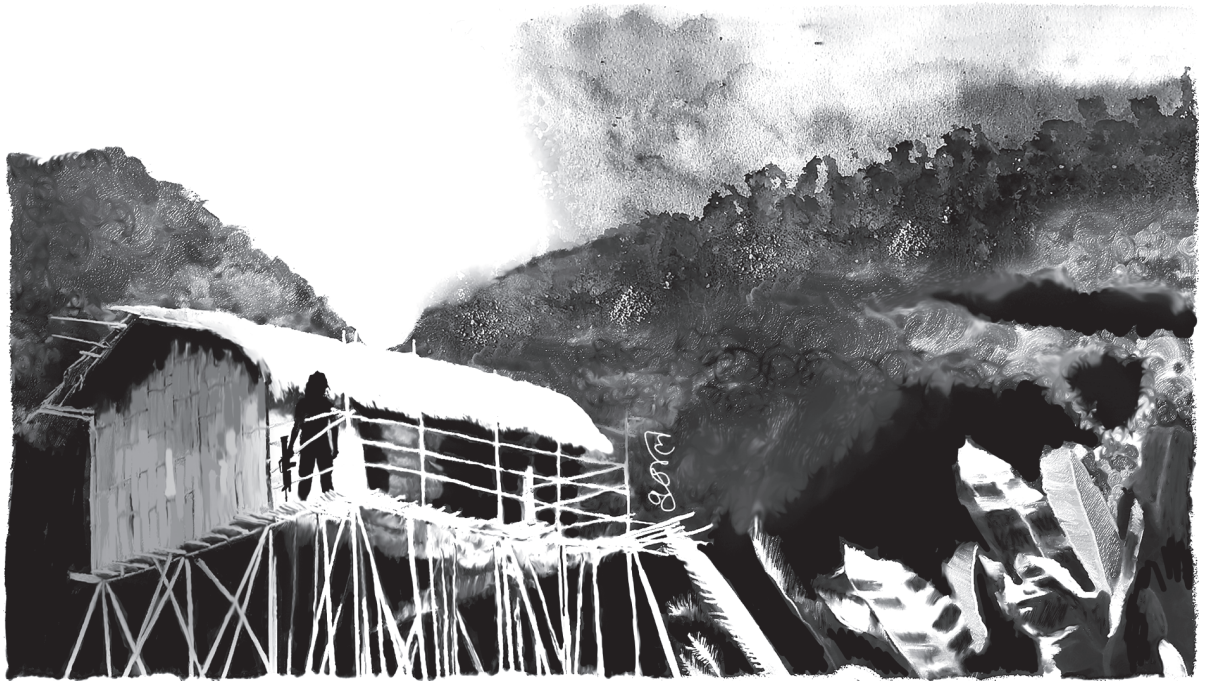
''নীলা,'' বলল মায়া।

''হাক্কন তাক,'' বলল নীলা, ''একটা বিদায় মেসেজ দিয়ে যাই!''

কীবোর্ডে শেষ কী ঠুকে জিপলাইনের দিকে দৌড়ল নীলা। ট্রলি ধরে ঝুলে পড়ল। নিমেষে স-র-র-র-র-র-র-র-র-র শব্দের সঙ্গে ট্রলি ওকে পৌঁছে দিল জঙ্গলের আড়ালে। ট্রলি ফিরে আসতেই লাফিয়ে ঝুলে পড়ল বোধিচিত্ত।

''মায়া, তুমি কোথায়?'' বলল অমিতাভ।

''তোমরা এগোও, আমি কভার ফায়ার দিচ্ছি, পেছন পেছন আসছি,'' বেতারে ভেসে এল মায়ার গলা।



ঠিক এই সময় একটা গুলি এসে লাগলো মায়ার পায়ে। হোঁচট খেয়ে পড়ল মায়া। পর মুহূর্তেই আরও দুটো গুলি এসে লাগলো ওর কাঁধে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল মায়া।

''মায়া!'' চিৎকার করে উঠল অমিতাভ।

''অমিতাভ,'' যন্ত্রণাক্লিষ্ট কিন্তু স্থির স্বরে নির্দেশ দিল মায়া, ''পালাও তোমরা। পরিকল্পনা মতো কাজ চালিয়ে যাও। এটাই আমার শেষ নির্দেশ।''

মৈত্রী লাফিয়ে উঠল ট্রলিতে।

''থুরা, এবার আপনি,'' বলল অমিতাভ।

''তুমি যাও,'' বলল থুরা, ''আমি মায়াকে নিয়েই ফিরবো।

''কিন্তু মায়ার নির্দেশ '' প্রতিবাদ করল অমিতাভ।

''মায়ার নির্দেশ তোমাদের ওপর প্রযোজ্য,'' বলল থুরা, ''আমার ওপর নয়।'' এই বলে অন্ধকারে যেখানে মায়ার অবয়বটা মাটিতে পড়ে আছে, সেদিকে দৌড়োল থুরা।

ঠিক সেই সময় একসঙ্গে সব বিস্ফোরক সক্রিয় হলো।

তুমুল শব্দে ফেটে পড়ল ড্রোন হ্যাঙ্গার। ভেঙে পড়ল অ্যান্টেনাগুলো, উত্তাপে গলে গেল সার্ভারের কাঠামো। দুর্গের প্রাচীন কাঠামো রইল অবিকৃত, কিন্তু মুহূর্তে তার মধ্যেকার আধুনিক হৃদয় গলে প্ল্যাস্টিক আর ফাইবারের নিথর দলায় পরিণত হলো।

জিপলাইনের ট্রলি বেয়ে ওপারে পৌঁছে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে নামলো অমিতাভ। ঠিক তখনি দেখল, জিপলাইনের অন্য প্রান্তে আগুন ধরে গেছে।

আচমকা আকাশে শোঁওওও করে একটা শব্দ হলো, মনে হলো যেন উল্কাপাত হলো। তার পরেই আরেক দফা বিস্ফোরণের দমকে কেঁপে উঠল মাটি। এবারের বিস্ফোরণ আগেরবারের থেকে অনেক গুণ বেশি। আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরণের মতো হাজারো ধাতুপিণ্ড মাটির গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হলো আকাশের দিকে। আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোটা দুর্গ জুড়ে।

দৌড় দৌড় দৌড়। ওরা যখন থামল, দুর্গের আগুন তখন একটা জোনাকির মতো দেখাচ্ছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, বিশাল একটা ছায়ামূর্তি ওদের দিকেই দৌড়ে আসছে। দূরবীনে চোখ লাগিয়েও বুঝতে পারল না অমিতাভ, কে ওটা। সবাই নিজের নিজের আগ্নেয়াস্ত্র বাগিয়ে ধরল।

ঝড়ের গতিতে অবয়বটা এসে পড়ল। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ এক নারীমূর্তি, শ্যামলা বরণ। পরনে কালো মিলিটারি প্যান্ট, অনেকগুলো পকেট তাতে। কোমরবন্ধের বাঁ-দিকে ঝুলছে খাঁজকাটা দীর্ঘ কমান্ডো ছুরি, ডানদিকে খাপের মধ্যে সাইলেন্সার যুক্ত গ্লক বন্দুক। উর্ধাঙ্গে কালো গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বলিষ্ঠ শরীর। ডুমো ডুমো মাংসপেশী খেলা করছে সারা শরীরে। গলায় দু'ছড়া রুদ্রাক্ষের মালার সঙ্গে একছড়া মুণ্ডমালা, কাপালিকরা যেমন ধারণ করে। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না। কাঁধ থেকে মায়াকে মাটিতে নামিয়ে রাখলো সেই নারী। অবাক হলো সবাই। এই এত ভারী মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে এতটা পথ দৌড়ে এল এই মহিলা, কিন্তু একটুও হাঁপাচ্ছে না!

চিৎ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল মায়া। চোখের পাতা আঠালো, খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। বহু বছর বাদে এই প্রথম দেখল, আকাশের ঘন মেঘের ক্যানভাসে ড্রোনের লাল-নীল আলোগুলো আর নেই।

''থুরা কোথায়, থুরা?'' জড়ানো স্বরে বলল মায়া। তারপরেই, ঝাপসা হয়ে এল ওর চোখজোড়া। ঠিক এই সময়, চট্টলার সবার মোবাইলে একসঙ্গে একটা মেসেজ পৌঁছল ; বাংলা, চট্টলা ও আরাকান ভাষায়।

আজ থেকে আমাদের আকাশ স্বাধীন হলো!

আইজ্জা তত্তুন আঁরার আকাশ স্বাধীন ওইল্ল!

ইয়েনেই ম্ন্যা সা ইয়ে, ঙাতো রি মো কৌন গিন দেঁ লুত লপ থোয়া বি!

ওঁম তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা!



জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ছিল বোধিচিত্ত। কুয়াশার পাতলা চাদর সরিয়ে জুম চাষের ঢালু জমি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সর্পিল পাহাড়ের গায়ে সবুজের বিভিন্ন মাত্রা। কোথাও গাঢ় নীলচে সবুজ, কোথাও বা কচি ধানের সতেজ আভা। এইমাত্র পুব আকাশের সিঁদুরে আভা পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে পড়ল, ঠিক তখনই চোখে পড়ল অনেক নীচে একলা একটা কুঁড়েঘর। জুম ক্ষেতের ঠিক মাঝখানে উঁচু মাচাঙের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশ আর ছনের তৈরি ছোট্ট ঘরটা যেন অনেক জন্মের চেনা। ঘরটা থেকে শেষ রাতের হালকা ধোঁয়া বেরিয়ে একটু একটু করে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে গিয়ে মিশছে। চারপাশে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক কমে এসে নাম-না-জানা পাহাড়ি পাখিদের কলকাকলি শুরু হয়েছে। ফসলের ওপর ভোরের শিশিরবিন্দু সূর্যের প্রথম স্পর্শে মুক্তোর মতো চিকচিক করে উঠছে। ঘন বাঁশঝাড় আর জংলি লতাগুল্মর নিবিড় জঙ্গল ভেদ করে কুয়াশার পাতলা চাদর ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বুনো লতাপাতা আর শ্যাওলার আর্দ্র গন্ধ মেশা বাতাসে এক অপার্থিব সতেজতা।

ওই কুঁড়েঘরটা .... ঠিক যেন আমার ফেলে আসা ঘরটার মতো। যেখানে এই জন্মে আর ফেরা হবে না। বিশেষ করে গত রাতের সাফল্যের পর জেহাদিরা ওকে নিশ্চয়ই হন্যে হয়ে খুঁজছে। চোখের জল মুছলো বোধিচিত্ত। অথচ ক'বছর আগেও ওই বাড়িটাই তো ছিল বোধিচিত্তর পৃথিবী। বিশেষ করে একটা ভোরের কথা আজ বারবার মনে পড়ছে।

''বোধিচিত্ত কথাটার মানে জানিস তো?'' সেদিন বলেছিল অমিতাভ, ''বোধিচিত্ত হলো জাগরিত চিত্ত, সুপার কনশাসনেস। সাধারণ মানুষ যা দেখে থেমে যায়, বোধিচিত্ত সেখান থেকেই পথ চলা শুরু করে। তোর ভেতরের এই বোধিচিত্ত শক্তিকে চিনতে শেখ, দেখবি জগতের কোনো ঘটনাই তোকে আর দমিয়ে রাখতে পারছে না।"

এই ভোরটার মতোই সেদিনও রাঙামাটির গহীন অরণ্যে ভোরের কুয়াশা বাঁশঝাড়ের মাথায় মুক্তোর মতো জমে ছিল। প্রতিদিনের মতোই সেদিনও কুড়ি বছরের তরুণ বোধিচিত্ত ভোরবেলায় জেগে উঠেছিল। ওর গ্রামটা মায়ানমার সীমান্তের ঠিক কোল ঘেঁষে, যেখানে উঁচু পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে মেঘেরা লুকোচুরি খেলে।

বোধিচিত্তর দিনটা শুরু হয়েছিল একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে। সকালের কড়া চায়ে চুমুক দিয়ে ও জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। একসময় এই পাহাড়ে শুধু চাকমাদের জুম চাষের গান আর বাঁশির সুর শোনা যেত, কিন্তু এখন দূর থেকে ভেসে আসে অচেনা কোলাহল। দিনে পাঁচবার প্রার্থনার ডাক। ভিনদেশী ভাষায়, অচেনা সুরে। যে ডেকে বলে, তোমার বুদ্ধ হলো বুৎপরস্তি, পাপ। তোমার বিশ্বাস সব মিথ্যে, সত্যি শুধু সাগরপারের আমদানি করা এক অন্ধ বিশ্বাস।

ওর ডায়েরির পাতায় কলম চলেছিল ঃ 'আমার জুমের ক্ষেতে আজ হার্মাদের ছায়া, কাঁটাতারে বিঁধে আছে পূর্বজদের মায়া।'

এই লাইনগুলো তো কেবল কবিতা ছিল না, ছিল ওর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। ও জানত, এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়, বরং কয়েক দশকের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত মুসলমান বসতি স্থাপন কর্মসূচির ফল, যা পার্বত্য চট্টলার জনবিন্যাসকে আমূল বদলে দিয়েছে। একসময় যেখানে জনজাতিরা ছিল মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশেরও বেশি, এখন সেখানে মুসলমান ও বৌদ্ধ জনসংখ্যা প্রায় সমান। ও অনুভব করছিল, ওর চেনা মানচিত্রটা যেন প্রতিদিন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। নতুন বসতি স্থাপনকারীদের আগমনে ভূমিবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। অনেক জনজাতি

*With Best Compliments from -*

**A**
**Well Wisher**

পরিবার তাদের পৈতৃক জমি হারিয়েছে। সমতল থেকে আগত লোকেরা অনেকেই আগ্রাসী, কট্টর । ওদের পেছনে আছে মিলিটারির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত।

চাকমা সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উৎসবের দিনগুলোতেও এখন এক ধরনের অজানা আতঙ্ক বিরাজ করে। জামাতের লোকেরা এসে উৎসবের মধ্যে হামলা করে, গণ্ডগোল পাকায়। ওদের পেছন পেছন আসে মিলিটারি। চাকমা যুবকদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। বোধিচিত্ত ভাবে, জনতাত্ত্বিক এই পরিবর্তন কি একদিন চাকমাদের নিজস্ব ভাষাকে মুছে দেবে? পাহাড়ে কাজ নেই। অনেক চাকমা তরুণ-তরুণী শিক্ষার খোঁজে বা উন্নত জীবনের আশায় শহরমুখী হচ্ছে। তারপর ছলে বলে কৌশলে তাদেরকে ধর্মান্তর করা হচ্ছে। চাকমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা সর্বত্র হারিয়ে যেতে বসেছে।

দুপুরের কড়া রোদে দেখা হয়েছিল বাল্যবন্ধু অমিতাভর সঙ্গে। অমিতাভ কিছুদিন আগে শহর থেকে গ্রামে ফিরেছে, তবে ছুটির আনন্দে নয়। ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই চাকমা জন্মভূমির জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। ওদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করার প্রতিবাদে ও ছিল সামনের সারিতে। ফলস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অমিতাভকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করেছে। সম্প্রতি ওকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যদি ও লিখিতভাবে ক্ষমা চায় এবং ভবিষ্যতে এসব আন্দোলন থেকে দূরে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবেই ওকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু অমিতাভ মাথা নত করেনি। ও বোধিচিত্তর দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল, 'নিজের শেকড়ের সঙ্গে বেইমানি করে পাওয়া ডিগ্রি দিয়ে আমি কী করব রে বোধি? ওরা আমাদের মাতৃভূমি কেড়ে নিচ্ছে, এবার আমাদের কণ্ঠস্বরও কেড়ে নিতে চায়।'

বিকেলে দুই বন্ধু মিলে সীমান্তের লাগোয়া সেই পুরনো ঝরনার পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়েছিল। অমিতাভর চোখেমুখে বিদ্রোহের আগুন, আর বোধিচিত্তর বুকে কবিতার বেদনা। সন্ধ্যার আবছায়ায় মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মাঝে বসে ও লিখে ফেলেছিল ওর নতুন কবিতা—'চিত্ত'। ও লিখেছিল,

'ভয়ের চাদরে ঢাকা ছিল যে নীরব নিশ্চল,
চেতনার আগুনে পুড়ে সে পাহাড় আজ হলো চঞ্চল।
ভেঙেছে অমিতাভর আজন্মকালের ধ্যান,
পাহাড়ের বুক গাইল সে এক নতুন ভোরের গান।'

রাত বাড়ল, সীমান্তের ওপারে সেনাচৌকির আলো জ্বলে উঠল। পার্বত্য চট্টলায় সামরিক উপস্থিতি এখানকার মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে গা-সওয়া হয়ে উঠেছে প্রতিদিনের অপমান, লুটতরাজ, ধর্ষণ। বোধিচিত্ত ওর ডায়েরিটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরেছিল। ও জানত, অমিতাভর মতো বন্ধুরা আছে বলেই হয়তো আজও এই পাহাড়ের আকাশটা ওদের নিজস্ব রয়ে গেছে। আগামীর সূর্য হয়তো কঠিনতর পরীক্ষা নেবে, কিন্তু চাকমারা তো আপোশ করতে শেখেনি। যতক্ষণ ওর কলম আছে, ততক্ষণ ও পাহাড় আর মানুষের কথা বলে যাবে।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি বোধিচিত্ত। অমিতাভর একটা কথা কাঁটার মতো খচখচ করছিল—''আন্দোলন করে আর কবিতা লিখে কোনো লাভ নেই রে বোধি! ওসব সভ্য সমাজে কাজে লাগে। এরা হলো বর্বর, অসভ্য। এরা একটাই ভাষা বোঝে, সেটা হলো অস্ত্রের ভাষা। মায়া চাকমার নাম শুনেছিস? বয়সে বোধহয় আমাদের থেকেও ছোটো, কিন্তু ওর আহ্বানে গোটা চাকমা সমাজ আজ এক হচ্ছে। আমি ভাবছি, ওর সঙ্গে দেখা করব।''

সেই দিনটা, আর আজকের দিনটা। ছিলাম কবি, হয়েছি যোদ্ধা। আমি আবার কবিতা লিখব। সেদিন, যেদিন সবাই এই মাটিতে মাথা উঁচিয়ে বাঁচতে পারবে।

''বোধিচিত্ত— বোধিচিত্ত!'' দূর থেকে মায়ার ডাকে সম্বিৎ ফিরল। তড়িঘড়ি করে পা চালালো।



''তোমরা কি পাগল?'' দীর্ঘদেহী সেই নারী ধমক দিল, ''পাঁচজন আনাড়ি মিলে দল বেঁধে বাঘের গুহায় ঢুকে তাণ্ডব করতে গিয়েছিলে!''

''পাঁচজন নয়, ছজন!'' দুর্বল স্বরে বলল মায়া, ''কিন্তু আপনি কে? ওখানে কী করছিলেন?''

সামনে দিগন্তজোড়া তুলোর মতো মেঘের সমুদ্র। মনে হয়, এখন থেকে হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যাবে, ওই মেঘগুলোকে ছোঁয়া যাবে। চারপাশ নিঝুম, কেবল তন্দ্রাচ্ছন্ন অরণ্যের প্রগাঢ় নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে, নিরন্তর। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভেঙে নীচে কোথাও একটা ঝরনার শব্দ শোনা যায়, কিন্তু এই উচ্চতা থেকে সেটাকে পরিষ্কার দেখা যায় না, কেবল দেখা যায় পাহাড়ের দেহে সাদা সুতোর মতো একটা সর্পিল অবয়বের নীরব আলিঙ্গন। দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়, গরিব এক গৃহস্থের জুম ঘরের দাওয়ায় জড়ো হয়েছিল ওরা।

পুব আকাশে এই এক্ষুনি রক্তিম আভা দেখা দিল। বিশাল পাহাড়ের চূড়াগুলো সোনার মুকুটের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল। ঘন জঙ্গলের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের প্রথম সোনালি রশ্মিগুলো যখন তির্যকভাবে নীচে নেমে এল, দেখে মনে হলো বনের অন্ধকার কাটাতে আকাশ থেকে কেউ যেন আলোর ঝরনাধারা নামিয়ে দিয়েছে। সেই আলোর ছোঁয়ায় গাছের পাতায় জমে থাকা

শিশিরবিন্দুগুলো নিমেষে হিরের কুচির মতো চিকচিক করে উঠল। বনের নিস্তব্ধতা ভেঙে জেগে উঠল নাম-না-জানা হাজারো পাখি। তাদের কলকাকলিতে পাহাড়ের প্রতিটি ভাঁজ মুখরিত হয়ে উঠল।

''বড়ো সুন্দর তোমাদের এই পাহাড়,'' বলল সেই নারী, ''এমন সুন্দর জায়গায় থেকেও জেহাদিরা কেন যে জেহাদ আর হিংস্রতা ভুলতে পারে না, কে জানে!''

মায়ার চোয়ালের কঠিন ভঙ্গিমা বুঝিয়ে দিল, প্রকৃতির বন্দনায় আপাতত কোনো উৎসাহ নেই ওর।

''আমার নাম মাতঙ্গী,'' বলল সেই নারী, ''তোমরা কে, তা আমি জানি। এবার বলো, চট্টলা দুর্গে কী করতে ঢুকেছিলে তোমরা, গতকাল রাতে? ড্রোন সেন্টার ধ্বংস করতে?''

''হ্যাঁ, কিন্তু ...'' বলার চেষ্টা করল মায়া।

''তোমাদের কোনো ধারণাই নেই,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''শুধু ড্রোন সেন্টার নয়, ওটাকে একটা দূরপাল্লার মিসাইল লঞ্চ ও কমান্ড সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি, পাকিস্তান থেকে একটা ডুবোজাহাজ বোঝাই করে পরমাণু বোমাবাহী ক্ষেপণাস্ত্র রওনা হয়েছে চট্টলা বন্দরের উদ্দেশে। ওদের পরিকল্পনা ছিল, সেগুলোকে এখানে মোতায়েন করা, আর এখান থেকেই ভারতের সম্পূর্ণ পূর্ব উপকূলকে নিশানায় নিয়ে আসা।''

''আপনি কি ভারতের গুপ্তচর?'' বলল মায়া।

''এককালে ছিলাম,'' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মাতঙ্গী, ''এখন অবসর নিয়ে একটা এনজিও চালাই।''

''এনজিও?'' মায়ার মনে সন্দেহ, ''কী রকমের এনজিও?''

''এপার ওপার দুই বঙ্গকে জেহাদিমুক্ত করাই আমাদের এনজিও-র উদ্দেশ্য।''

''কাল রাতে ওখানে কী করছিলেন?''

''তোমাদের কাছে কিছু লুকোবো না,'' বলল মাতঙ্গী, ''কারণ তোমাদের সাহায্য চাই আমার। এই অঞ্চলে ভারতের এমন কোনো সক্রিয় এজেন্ট আপাতত নেই, যে এই কাজটা করতে পারে। তাই আমার সাহায্য চেয়েছিল ওরা। আমার কাজটা খুবই ছোটো ছিল। দুর্গে ঢুকে দেখলাম, খবর সত্যি কিনা, ওখানে সত্যিই মিসাইল সেন্টার গড়ে উঠেছে কিনা। দেখে কনফার্ম করলাম, আর একটা জিপিএস ট্র্যাকার রেখে এলাম, যার সিগন্যাল অনুসরণ করে ভারতের একটা ব্রহ্মস্-এস মিসাইল মিজোরাম থেকে উড়ে এসে মিসাইল সেন্টারটা উড়িয়ে দিল। নতুন প্রজন্মের ব্রহ্মস্ এগুলো, সম্পূর্ণ স্টেল্থ বা অদৃশ্য। তা, সেই জিপিএস ট্র্যাকার রেখে যখন আমি বেরিয়ে আসছি, এমন সময় দেখি তোমাদের ওই দুড়ুম দাড়ুম কাণ্ডকারখানা। ওসব না করলেও গতকাল রাতে ওই ড্রোন সেন্টার ধ্বংস হতোই। মিছিমিছি তোমরা প্রাণের ঝুঁকি নিতে গিয়েছিলে।''

''আপনাদের মতো ব্রহ্মস্ মিসাইল বা ঘাতক ড্রোন আমাদের নেই,'' ব্যথিত স্বরে বলল মায়া, ''আমাদের যা আছে, তাই দিয়েই আমরা আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। ড্রোন সেন্টারটাকে ধ্বংস করা আমাদের কাছে ছিল বাঁচা-মরার সমস্যা। আমাদের সংগ্রামকে ছোটো করে দেখার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?''

''আমাকে ভুল বুঝো না,'' মায়ার হাত ধরে আর্দ্রস্বরে বলল মাতঙ্গী, ''আমি শুধু বলছি, তোমরা সবাই তোমাদের বিদ্রোহের প্রথম সারির নেতা। তার ওপর তোমাদের বড়ো রকমের কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ নেই। গতকাল রাতে তোমরা যা করতে গিয়েছিলে, তাতে তোমাদের সবার প্রাণ যেতে পারতো। তখন কী দশা হতো তোমাদের বিদ্রোহের?''

''আমার জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ,'' বলল মায়া, ''কিন্তু থুরার কী হলো?''

''আমি যখন তোমাকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছিলাম,'' বলল মাতঙ্গী, ''তখন একজন লোক আমাদের কভার ফায়ার দিচ্ছিল। সেই কি থুরা?''

''তাই হবে,'' বলল মায়া।

''তাকে তো আমার পেছনে আসতে দেখিনি,'' বলল মাতঙ্গী, ''তবে কি সে ধরা পড়ে গেল?''

''কিংবা হয়তো মারা গেছে,'' গলার স্বর ধরে এল মায়ার, ''গুলিতে বা বিস্ফোরণে।''

''এই থুরা কি আরাকান আর্মির থুরা ওয়াই সান?'' প্রশ্ন মাতঙ্গীর।

''হ্যাঁ,'' মায়ার গলা তখন কান্নায় ভেজা।

''তার সম্পর্কে আমি যতদূর শুনেছি,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''বেঘোরে মারা পড়বার মতো লোক থুরা ওয়াই সান নয়। তুমি তোমার সোর্সদের কাজে লাগাও, আমিও খোঁজ নিচ্ছি। হয়তো সে এখনো বেঁচে আছে।''

চোখ মুছে উঠে বসল মায়া, ''খিদে পেয়েছে,'' বলল অস্ফুটস্বরে।

''সাবধানে বসো,'' বলল নীলা, ''গুলিগুলো পেশী ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু গভীর ক্ষত রেখে গেছে। একটু বেশি নড়াচড়া হলেই রক্তক্ষরণ শুরু হবে।''

সকালের মিঠে কড়া রোদ বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মাচাং ঘরের মেঝেতে আল্পনা আঁকছে। গৃহস্থ দম্পতি মাটির সানকিতে ধোঁয়া ওঠা লাল চালের ভাত নিয়ে এল। চালের ঘ্রাণে মিশে আছে পাহাড়ি মাটির সোঁদা গন্ধ। ভাতের পাশে সযত্নে রাখা কলাপাতা দিয়ে মোড়ানো বাঁশ কোড়লের পদ, মাটির উনুনে ধিমে আঁচে রান্না। মসলার জাঁকজমক নেই, কেবল পাহাড়ি ঝরনার জল আর পাহাড়ি লাল মরিচের ঝালেই অনন্য। খেতে খেতে মাতঙ্গী বলল, ''তোমাদের উদ্দেশ্য, জেহাদিদের অত্যাচার থেকে চট্টলাকে মুক্ত করা। উলটোদিকে আমার উদ্দেশ্য, চট্টলা যাতে ভারতের পূর্ব উপকূলের বিপদ না হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করা। এখান থেকে ভারতের সম্পূর্ণ পূর্ব উপকূলকে নিশানায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে, সেই বিপদ ঘাড়ে নিয়ে ভারতের পক্ষে ইতিহাসে এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে হয়তো দুটো উদ্দেশ্যই

সাধিত হবে।"

''সবার আগে থুরাকে খুঁজে বের করতে হবে," বলল মায়া। সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো মাতঙ্গী।

''সত্যিই কি আপনার নাম মাতঙ্গী?" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর প্রশ্ন করল মায়া।

''কেন?" অবাক হলো মাতঙ্গী, ''কোনো সন্দেহ আছে?"

''আসলে ব্যাপারটা কী," ইতস্তত করে বলল মায়া, ''এই অঞ্চলে মাতঙ্গী নামের এক তান্ত্রিকের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই পাহাড়েই নাকি তার আনাগোনা। তার কত বয়স, কেউ জানে না। কেউ বলে দেড়শো, কেউ বলে না না, মাতঙ্গী নিতান্তই এক ষোড়শী যুবতী। সে নাকি কোনো খাবারদাবার খায় না, শুধু রক্ত খেয়ে বেঁচে আছে। এককালে নাকি সে দেবীগঞ্জ উপজেলায় থাকত। ওর পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিল জেহাদিরা, সে কোনোভাবে বেঁচে গিয়েছিল। তারপর ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল, কামরূপ কামাখ্যা পাহাড়ে অনেকদিন তপস্যা করে তন্ত্রসিদ্ধ হয়ে আবার এদেশে ফিরে এসেছিল। এইখানে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে আর অবিশ্বাস্য হয়ে যাচ্ছে। সে নাকি দেবীগঞ্জ উপজেলায় গ্রামে ফিরে গিয়ে যারা যারা ওর পরিবারকে মেরেছিল, তাদের ওপর ভূত লেলিয়ে দিয়েছিল। একে একে সবাই নাকি মারা পড়েছিল (স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা ১৪২৮, 'বোধন' উপন্যাস দ্রষ্টব্য)। তারপর থেকেই সেই মাতঙ্গীকে নাকি এই অঞ্চলের নানান জায়গায় দেখা যায়। সে নাকি পোষা কুমিরের পিঠে চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। ভূতেদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের সাক্ষী মানে, প্রয়োজন পড়লে ভূতেদের দলবল তার হয়ে লড়াইও করে। এ সবই নিশ্চয়ই গল্পকথা। একে আপনার নাম মাতঙ্গী, তার ওপর আপনার গলায় মুণ্ডমালা। তাই মনে হলো... কিন্তু আপনি তো স্পাই ছিলেন। স্পাই আবার তান্ত্রিক হয় নাকি? তাছাড়া সেই মাতঙ্গী তো একটা কিংবদন্তী মাত্র। ধ্যাৎ, কী সব আবোলতাবোল ভাবছি!"

মাতঙ্গী বোধহয় কথাগুলো ঠিক খেয়াল করল না। ভাঙা জানালায় রাতের শিশির এখনো ঝুলে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালো। সেই ভাঙা চৌকাঠে কখন যে নিঃশব্দে এসে বসেছে একটা সবুজ টিয়াপাখি, কেউ টেরই পায়নি। পাখিটা অদ্ভুত স্থির। যেন সে ডাকতে আসেনি, অপেক্ষা করতে এসেছে। তার লাল ঠোঁটে লেগে আছে পাহাড়ি বুনো ফলের দাগ, গোল লাল চোখদুটো নিবিড়ভাবে তাকিয়ে আছে ঘরের ভেতরের দিকে। মাতঙ্গীর দিকে।



দেওয়াল জুড়ে স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে লেখা আছে, ''কাফের হলো ওয়াজিব-উল-কতল। অবিশ্বাসীর শাস্তি হলো সর-তন-সে-জুদা। আল্লাই মহান। আল্লার কোনো শরিক নেই।"

এ এমন এক জায়গা, যার উল্লেখ কোনো মানচিত্র বা দাপ্তরিক দলিলে নেই। চট্টলার আর্দ্র ও গুমোট পাহাড়ের গভীরে মাটির নীচে তৈরি এই সুড়ঙ্গসম কারাগারটি 'অন্ধকূপ' বললেও কম বলা হয়। ভারী লোহার দরজা যখন গোঙানির মতো শব্দ করে খুলে যায়, তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বাসি রক্ত, ইঁদুরের বিষ্ঠা, ঘাম আর স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলার এক বমি উদ্রেককারী গন্ধ। কারাগারের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ এতোটাই ছোটো যে সেখানে একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পাথুরে দেওয়ালগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়া লোনা জল মেঝেকে সবসময় পিচ্ছিল করে রাখে। এখানে দিন আর রাতের কোনো পার্থক্য নেই। করিডোরে জ্বলে থাকা নিভু নিভু হলদেটে আলো কেবল বন্দিদের মনের ভীতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এখানকার নিস্তব্ধতা এতটাই প্রগাঢ় যে, পাশের ঘর থেকে আসা গোঙানি বা শিকল টানা শব্দও বজ্রপাতের মতো কানে বাজে।

লোকে একে আড়ালে বলে, 'রহমান  ঘর'। মানে, দয়ালুর ঘর।

নির্যাতন কক্ষগুলো যেন কোনো বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে। দেওয়ালের হুকে ঝুলে থাকা জং-ধরা শিকল, মেঝেতে ছোপ ছোপ কালচে রক্তের দাগ আর টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা ভোঁতা যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলো চিৎকার করে বলে দেয় এখানকার নৃশংসতার গল্প। বাতাসের প্রতিটি ঝাপটায় এখানে মানুষের চরম অসহায়তার হাহাকার মিশে থাকে। যাদের একবার এখানে আনা হয়, তাদের নাম-পরিচয় বাইরের পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে যায়। সাগর-পাহাড়ের গম্ভীর গর্জনের আড়ালে চাপা পড়ে যায় বন্দিদের আর্তনাদ। রহমান ঘরের কথা শুনলে সাধারণ মানুষের রক্ত হিম হয়ে আসে। এ হলো জীবন্ত মানুষের জন্য তৈরি করা এক যান্ত্রিক নরক, যেখান থেকে ফেরার কোনো পথ নেই।

অনেকে বলে, ব্রিটিশ আমলে এখানেই চট্টলা যুববিদ্রোহের নায়কদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এখানেই নাকি সূর্য সেন মাস্টারদার নখ উপড়ানো হয়েছিল। আজকাল এই যন্ত্রনাঘরের মালিক হয়ে বসেছে যে নরপিশাচ, তার নাম পূর্ব খোরাসানের ক্ষমতার অলিন্দে ৫০ শতাংশ সম্ভ্রমের সঙ্গে ৩০ শতাংশ ভয় আর ২০ শতাংশ ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। লোকে বলে, সকালবেলা নামটা শুনলে নাকি পুরো দিনটাই খারাপ যায়। জেনারেল হামিদ উল রহমান। হিন্দু-বৌদ্ধদের খুব ভালোবাসে।

জেনারেলের বাবাও ছিল জেনারেল। পাকিস্তান আর্মির উঠতি সৈনিক ছিল, অপারেশন সার্চলাইটে হিন্দুদের গণহত্যা করে ক্ষমতার শীর্ষে চড়ছিল একটি একটি করে সিঁড়ি। হঠাৎ করেই হাওয়া ঘুরে গেল। হাওয়ামোরগের মতোই দিক বদলে মুক্তিবাহিনীর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল। স্বাধীনতার পর বীরের সম্মান পেল। ছেলেকে সেই শিক্ষাই দিয়েছিল জেনারেল। খালেদা জিয়ার ব্লু

আইড বয় থেকে শেখ হাসিনার সরকারের জেনারেল হয়ে আজ জামাতিদের চোখের মণি হয়েছে জেনারেল রহমান। হিন্দু-বৌদ্ধদের খুব ভালোবাসে, ঠিক যেমন কসাই ভালোবাসে পশুদের। মাঝেমাঝেই দুঃখ করে বলে জেনারেল, এই জামাতিরা তো দেখছি একটা হিন্দু-বৌদ্ধকেও আর আস্ত রাখবে না! আমার বুড়ো বয়সটা কি তবে নিতান্তই নিরামিষ কাটবে?

''তুমি এতটা নিশ্চিত কীকরে হচ্ছ,'' রেডিয়োতে ফিসফিস করে বলল মাতঙ্গী, ' থুরা এখানেই আছে? এই জায়গাটা দেখে তো মনে হচ্ছে একটা প্রেতপুরী। কোনো দেহধারী মানুষ এখানে থাকতে পারে না!''

''আরিফ সাধারণত ভুল খবর দেয় না,'' কণ্ঠার কাছের বোতাম টিপে বলল মায়া, ''ও আমার ছোটোবেলার বন্ধু। এই অঞ্চলে এক্স-মুসলিম আন্দোলনের পথিকৃৎ ও।''

জলনিকাশি নালার মধ্যে উপুড় হয়ে লুকিয়ে ছিল মায়া, সবটুকু মনঃসংযোগ দিয়ে দেখছিল জেলের সুরক্ষা ব্যবস্থা আর পাহারাদারদের যাওয়া-আসা। থুরার ট্রেনিঙের প্রতিটা শিক্ষা মনে মনে আওড়াচ্ছিল। প্রতি কুড়ি সেকেন্ড অন্তর সার্চলাইট এক সেকেন্ডের জন্য একটা থামের আড়ালে পড়ে যায়। ওই এক সেকেন্ড জেলখানার প্রবেশদ্বার অন্ধকার থাকে। ক্ষিপ্রগতিতে সেই এক সেকেন্ডকে ব্যবহার করে পুতিদুর্গন্ধময় শীর্ণ নালার মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে মায়া পৌঁছে গেল জেলখানার ভেতরে। বাতাসে রক্ত ও আরবি উদ-জাতীয় ধূপের গন্ধ মিলেমিশে আছে। মৃত্যু ও বিশ্বাসের গন্ধ একই সঙ্গে । সুদীর্ঘ একটা শ্বাস নিল মায়া। থুরা বলেছিল, একজন গুপ্তচরকে অদৃশ্য হতে হয় না। সে শুধু আশেপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায়, যে পরিবেশ চোখের সামনে থেকেও লোকের কাছে অদৃশ্য।

দেওয়ালে কালো স্লেটের বোর্ড ঝুলছে, তাতে চকখড়ি দিয়ে লেখা আছে --- 'থুরা ওয়াই সান'। পাশে লেখা আছে, 'তিন'।

কণ্ঠার কাছের বোতাম চেপে ধরে মায়া ফিসফিসিয়ে বলল, ''পেয়ে গেছি।''

''যা করবার তা দশ মিনিটের মধ্যে করবে,'' বেতার তরঙ্গের অন্য পার থেকে বলল মাতঙ্গী, ''তারপর তোমাকে বের করে আনবো। কোনখান দিয়ে বেরোবে?''

''তার আর দরকার লাগবে না,'' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মায়া, ''আজ সবকিছুর শেষ হবে। এখানেই।''

''তার মানে?'' চমকে উঠল মাতঙ্গী, ''মায়া, পাগলামি করো না!''

জবাবে মাইক্রোফোন অফ করে দিল মায়া। সুদীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে কালরূপী কৃষ্ণতারাকে স্মরণ করল, ''ওঁম তারে তুত্তারে তুরে, সর্ব বিদ্যা আবরণয়ে, ভ্যে ফট স্বাহা!'' তারপর মেন্টেনেন্স শ্যারে অপরিসর নিম্নমুখী সুড়ঙ্গের মধ্যে নিজের ঋজু শরীরটাকে গলিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পর ধপ করে বোবা একটা শব্দের সঙ্গে নীচের তলায় অবতরণ করল। সেখানে পাহারারত সৈনিক শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালো। একটা ছোট্ট ধারালো বাঁশের কঞ্চি সৈনিকের কণ্ঠা ভেদ করল নির্ভুল লক্ষ্যে।

ফাঁকা ঘর। পাশের ঘর থেকেই শব্দ আসছে। ঘরের জায়গায় জায়গায় টাইম-ডিলে প্ল্যাস্টিক বিস্ফোরক লাগিয়ে দিল মায়া। সবুজ আলো জ্বলে উঠল। টাইমার নীরবে গণনা শুরু করল।

লোহার দরজা সন্তর্পণে খুলল। ভেতর থেকে আসা পচা রক্ত আর লোনা ধরা দেওয়ালের ভ্যাপসা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল। টর্চার চেম্বারের টিমটিমে হলুদ আলোয় থুরাকে দেখতে পেল। ঘরের একপাশে একটা নোংরা বিছানা। ছাদ থেকে ঝোলানো জং-ধরা শিকলগুলো থুরার কবজি কামড়ে ধরে আছে। শরীরটা অবশ হয়ে ঝুলে আছে, সারা গায়ে চাবুকের দাগ আর পোড়া ক্ষতের চিহ্ন। ঘরের একপাশে একটা নোংরা বিছানা। আপাতত আর কেউ নেই সে ঘরে। মায়ার বুকটা একবার কেঁপে উঠলেও ও নিজেকে সামলে নিল। ঘরের কোণ থেকে একটা টুল এনে থুরাকে তার ওপর দাঁড় করলো। তারপর কোমর থেকে সাইলেন্সার বন্দুক বের করে নির্ভুল লক্ষ্যে শিকলের তালা লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল। দুহাতের শিকল খুলে পড়ামাত্র থুরার দেহটা এলিয়ে পড়ল। ক্ষিপ্র হাতে থুরার পতন রোধ করল মায়া, অসাড় দেহটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিল। ঝটপট ঘরের দেওয়ালে একটা বিস্ফোরক লাগিয়ে দিল। থুরার অস্ফুট গোঙানি কানে এল — ''মায়া, কেন তুমি এখানে আসতে গেলে? চশমা, আমার চশমাটা '' এই বলে আবার এলিয়ে পড়ল থুরা।

মায়া কোনো কথা না বলে থুরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে করিডোর ধরে এগোল। ঢোকার পথটা সহজ ছিল, বেরোনোর পথটা কিন্তু লম্বা। বাইরে তখন ঝোড়ো বৃষ্টি আর পাহাড়ের গর্জনে আকাশ ভেঙে পড়ছে।

প্রথম মোড়ের আগে থামল মায়া। টুপ টুপ করে ছাদ থেকে জল পড়ছে।

মায়া হাঁটু গেড়ে বসে আয়নার মতো পালিশ করা একটা ছোটো ধাতব টুকরো করিডোরের কোণ দিয়ে এগিয়ে ধরল। প্রতিবিম্বে দেখা গেল একজন সেনা দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেল কাঁধে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে বিরক্ত মুখে সিগারেট টানছে।

মায়া নিঃশব্দে থুরাকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল। তারপর ধীরে ধীরে ছায়ার মধ্যে মিশে গেল।

সেনাটি কিছু টের পাওয়ার আগেই মায়া তার পেছনে পৌঁছে গেল। এক হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। অন্য হাতে ধারালো বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে দিল গলার নীচে, কলারবোনের পাশে।

খচ্।

লোকটার শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। চোখ বিস্ফারিত। চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু মুখ থেকে শুধু গোঙানি বেরোল।

কঞ্চিটা ঘুরিয়ে টেনে বের করল মায়া। গরম রক্ত ফিনকি দিয়ে

ছিটকে পড়ল। ধীরে ধীরে মৃতদেহটা মাটিতে শুইয়ে দিল মায়া, যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে কাউকে।

বিস্ফোরকটা বসালো করিডোরের বৈদ্যুতিক কন্ডুইটের পাশে। সবুজ আলো জ্বলে উঠল, টাইমার নীরবে গণনা শুরু করল।

আবার থুরাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটা।

সুড়ঙ্গটা ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। কোথাও কোথাও দেওয়ালের প্লাস্টার খসে ভেতরের স্যাঁতসেঁতে পাথর বেরিয়ে আছে। নোংরা হলদে আলোয় পুরো পথটা দেখতে লাগছে যেন কোনো জীবন্ত প্রাণীর অন্ত্রর অন্তর্ভাগ।

দূরে বুটের শব্দ। ধুপ। ধুপ। ধুপ। দু'জন সেনা টহল দিচ্ছে।

মায়া থুরাকে টেনে একটা খালি সেলের খোলা দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেনাদের টর্চের আলো গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে আবার সরে গেল।

''উপরে নাকি ছাদ ফুঁড়ে পানি ঢুকছে,'' একজন বলল।

''চুপ কর। ক্যাপ্টেন শুনলে —''

ঠিক তখন প্রায়-অচেতন থুরার গলা থেকে চাপা কাশির শব্দ বেরিয়ে গেল।

দু'জন সেনাই থেমে গেল।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা।

তারপর ধীরে ধীরে একজন এগিয়ে এল সেলের দিকে। টর্চের আলো এবার সরাসরি মায়ার মুখের ওপর পড়তে যাচ্ছিল—

মায়া অপেক্ষা করছিল এই মুহূর্তটার জন্য।

হঠাৎ নীচ থেকে বেরিয়ে এসে সেনাটার হাঁটুর পেছনে লাথি মারল। লোকটা ভারসাম্য হারিয়ে সামনে ঝুঁকতেই মায়া ওর গলার পাশে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল।

ব্লপ। সাইলেন্সারের দমবন্ধ শব্দ।

লোকটা পড়ে যাওয়ার আগেই মায়া তাকে ধরে ফেলল।

অন্য সেনা রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল। এতক্ষণ আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকা থুরা আচমকা দেওয়াল থেকে ভাঙা লোহার পাইপ খুলে লোকটার মুখে সজোরে ছুঁড়ে মারল।

ঠাস!

নাক ভেঙে রক্ত ছিটকে পড়ল।

মায়া সুযোগটা নিয়ে সামনে ঝাঁপাল। দু'জন মাটিতে গড়াতে লাগল। সেনাটা মায়ার কবজি চেপে ধরে পিস্তল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। মায়া কনুই দিয়ে লোকটার গলায় আঘাত করল। দম আটকে এল লোকটার।



তারপর খুব কাছ থেকে — ধাপ!

মায়া নিজের কপাল দিয়ে লোকটার মুখে মারল। দাঁত ভাঙার শব্দ হলো।

সেনাটার হাতদুটো ঢিলে হয়ে যেতেই মায়া ছুরি বের করে লোকটার বুকের নীচে ঢুকিয়ে দিল।

লোকটার শরীর একবার কেঁপে থেমে গেল।

মায়া দেখল, থুরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে। উত্তেজনায় নাক থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

ওরা আবার এগোল।

প্রতিটি মোড়ে মায়া একটা করে বিস্ফোরক বসিয়ে যাচ্ছে—কখনো পাইপলাইনের পাশে, কখনো সাপোর্ট বিমে,

কখনো বৈদ্যুতিক জংশন বক্সে। পুরো জেলখানাটাকে ধীরে ধীরে একটা বিশাল ফাঁদে পরিণত করছে।

উপরে বজ্রপাত হলো। পুরো সুড়ঙ্গ এক মুহূর্তের জন্য সাদা আলোয় ভেসে উঠল।

ঠিক তখনই সামনের মোড়ে দেখা গেল, চারজন সেনা নামছে সিঁড়ি বেয়ে। পরনে বুলেট প্রুফ আর্মার, হাতে শটগান আর ট্যাকটিক্যাল শিল্ড।

মায়া থেমে গেল। দূরত্ব খুব কম। লুকোনোর জায়গা নেই।

সেনাদের একজন ইতিমধ্যে ওদের দেখে ফেলেছে।

''ওখানে—!''

কথা শেষ হওয়ার আগেই মায়া কোমর থেকে ধোঁয়া গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল।

ফট্!

ঘন ধূসর ধোঁয়া মুহূর্তে করিডোর ভরে দিল। তারপর শুরু হলো অন্ধকারের ভেতর হাতাহাতি।

শুধু ভাঙা ছায়া দেখা যাচ্ছে। চাপা চিৎকার। ধাতব সংঘর্ষ।

একজন সেনা ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, ঠিক তখন মায়া দেওয়ালে পা রেখে লাফিয়ে উঠে তার গলায় দুই পা জড়িয়ে শরীরের ওজন দিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলল। লোকটার মাথা কংক্রিটে লেগে বিকট শব্দ হলো।

আরেকজন শটগান তাক করতেই থুরা ওর হাত ধরে উপরের দিকে ঠেলে দিল। গুলি ছাদে আঘাত করে কংক্রিট ঝরিয়ে দিল। মায়া পাশ থেকে এসে ছুরি বসিয়ে দিল লোকটার বগলের নীচে — আর্মারের ফাঁকা জায়গায়।

শেষ সেনাটা অন্ধভাবে গুলি চালাতে চালাতে পিছোচ্ছিল। মায়া মাটিতে পড়ে থাকা রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে ছোট্ট একটা বার্স্ট ছুড়ল।

টাটাট!

লোকটার মাথা ঝাঁকুনি খেল। ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরে বসে পড়ল।

ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে মায়া কয়েক সেকেন্ড হাঁপাতে লাগল। গালে রক্ত, কপালে ধুলো, হাতে কাঁপুনি। দেখল, থুরা মাটিতে এলিয়ে পড়েছে।

আবার থুরাকে কাঁধে তুলে নিল মায়া। এখনো বেরোনোর পথ অনেক বাকি। থুরা ততক্ষণে আবার আচ্ছন্ন, প্রায়-অজ্ঞান। ওদের পেছনে, জেলের প্রতিটি মোড়ে, নীরবে টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে বিস্ফোরণের কাউন্টডাউন।

বৃষ্টির ছাঁট যখন ওদের গায়ে লাগল, তখন থুরার জ্ঞান আবার ফিরতে শুরু করেছে। মায়া আরও শক্ত করে চেপে ধরল থুরার অবশ দেহটাকে। ওর প্রতিটি পেশি আজ বাবার সেই রক্তাক্ত নিথর দেহের আড়ালটা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকূপের শেষ প্রকোষ্ঠের ভারী লৌহকপাট ঠেলে মায়া যখন রক্তাক্ত থুরাকে কাঁধে নিয়ে বের হলো, ঠিক তখনই করিডোরের শেষ মাথায় ফুটে উঠল দীর্ঘ এক ছায়া। বুটের খটখট শব্দে পাথুরে মেঝে কেঁপে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে জেনারেল রহমান—মুখে সেই চেনা ক্রূর হাসি, এই গরমেও হাতে একজোড়া চামড়ার দস্তানা।

'মায়া চাকমা নাকি?' রহমানের কণ্ঠস্বরে বিষাক্ত শীতলতা, 'ইঁদুরকল থেকে ইঁদুর বের করা এতো সহজ নয় হে। তা, একরকম ভালোই হয়েছে। একের বদলে দুই, চৌকি চেপে শুই। তাই না? হিঃ হিঃ!'

মায়া ধীরে ধীরে থুরাকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। শরীরের প্রতিটি শিরা অপমান আর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। বৌদ্ধবিহারের অগ্নিকাণ্ড, বাবার শেষনিঃশ্বাস আর পাহাড়ের আর্তনাদ ওর কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

''কাজের সময় কথা বলা আমি পছন্দ করি না,'' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মায়া, ''কিন্তু আজ তোর সঙ্গে একটু গল্প করতে ইচ্ছে করছে। তুই নিজেকে যতই দক্ষ খুনি ভাবিস, আসলে তুই একটা আনাড়ি। তোর ব্যর্থতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তোর এই সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। রাঙ্গুনিয়া বিহার মনে আছে? ভেবেছিলি, সব্বাইকে মেরে ফেলেছিস। ভুল!''

রহমান চকিতে কোমর থেকে রিভলবার বের করল। মায়া কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করল না, কোমর থেকে দা বের করে বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রহমানের ওপর, এক কোপে রিভলবার শুদ্ধ হাতটা কবজি থেকে কেটে ফেলল। যন্ত্রণায় চিৎকার করার চেষ্টা করল রহমান। ওর টুঁটি চেপে ধরে সে শব্দ বন্ধ করে দিল, দেওয়ালে সজোরে আছড়ে ফেলল রহমানের ছটফট করা কলেবরটাকে। আগুনের মতো লাল মায়ার চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এই দিনটার জন্য আমি প্রতিটি শ্বাস গুনেছি, জেনারেল। রাঙ্গুনিয়া থেকে বেঁচে ফেরার পর থেকে প্রতিটি শ্বাস। ওঁম তারে!'

মিলিটারি ইউনিফর্ম ভেদ করে দায়ের ফলা ঢুকে গেল, প্রায় এক ইঞ্চি প্রবেশ করল জেনারেলের পাঁজরের ফাঁক দিয়ে। শেষ চেষ্টায় জেনারেল বাঁ-হাত দিয়ে মায়ার কবজি আঁকড়ে ধরল। প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দিল, দা যাতে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ না করে। ইতিমধ্যে জনাতিনেক সৈনিক ঢুকে পড়েছে, তাদের উদ্যত বন্দুক মায়ার দিকে তাক করা। জেনারেলের কাটা হাতটা নিমেষে তুলে নিল থুরা, সেই কাটা হাতে ধরা বন্দুক থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ে ভেদ করল উদ্যত সৈনিকদের মাথা। ছিটকে পড়ল রক্ত আর ঘিলু। সেই মুহূর্তে পেরিকার্ডিয়াল স্যাক ভেদ করে দা-এর ফলা প্রবেশ করল জেনারেলের হৃৎপিণ্ডে। জেনারেলের চোখের উদ্ধত আলো ধীরে ধীরে নিভে এল। নিথর দেহটা যখন অন্ধকূপের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে আছড়ে পড়ল, মায়া সুদীর্ঘ একটা শ্বাস নিল। বাতাসের আর্দ্রতায় তখন আর বারুদের গন্ধ নেই, বরং আছে এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুক্তির স্বাদ।

''হা-হা-হা-হা-হা!'' পাগলের মতো অট্টহাসি হেসে উঠল

মায়া।

তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, রক্তাক্ত থুরাকে আবার নিজের কাঁধে তুলে নিল। অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে বৃষ্টির শব্দের দিকে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করে বলল, 'ফুরেইয়ে, বাবা। ফুরেইয়ে।'

পিছনে তখন সাইরেনের বিকট শব্দ বেজে উঠেছে। সৈন্যরা বুঝে গেছে, শিকার পালিয়ে যাচ্ছে। এক ডজন ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠল রহমান ঘরের প্রাঙ্গণ জুড়ে। পরমুহূর্তেই জঙ্গলের প্রান্ত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে আলোগুলোকে চুরমার করে দিল। মাতঙ্গীর কভার ফায়ারের আড়াল নিয়ে অরণ্যের ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করল মায়া।

তার ঠিক পরেই রহমানের দয়ার ঘর মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল।

পিচ্ছিল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে থুরাকে নিয়ে মায়া যখন জঙ্গলের গভীরে মিলিয়ে গেল, তখন পেছনে ফেলে আসা সেই লেলিহান টর্চার চেম্বার পাহাড়ের গায়ে একটা উজ্জ্বল জোনাকির মতো দেখাচ্ছিল। পাহাড়ের গহন জঙ্গলের বৃষ্টি আজ ধুয়ে দিয়ে গেল বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা লাঞ্ছনার রক্তদাগ।



প্রায় এক দিন পরে, জঙ্গলের মধ্যে একটা ত্রিপল-ঢাকা আস্তানায় থুরা চোখ মেলল। মুখজোড়া সরল হাসি, চোখে কৌতুক। এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, লোকটাকে কি কিছুই বিন্দুমাত্র স্পর্শ করছে না? অবাক হলো মায়া। নীলা নাড়ি ধরে বসে ছিল, মাথা নেড়ে হেসে বলল, ''মুনুষ্যা বাচি গেইজ্জে! কচ্ছপের জান তোমার, থুরা!''

মায়া তড়িঘড়ি এসে থুরার পাশে বিছানায় বসল। উঠে বসার চেষ্টা করছিল থুরা, জোর করে ওকে শুইয়ে দিল।

''উঁহু উঁহু,'' মাথা নেড়ে বলল থুরা, ''আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না!''

''তাহলে কী করবেন এখন?'' ভুরু কুঁচকে বলল মায়া।

''আমার চশমা কোথায়, চশমা?'' থুরা হঠাৎই উচাটন হয়ে উঠল।

ঘাবড়ে গিয়ে নীলা তড়িঘড়ি করে চশমা খুঁজতে গেল। থুরা আবার বলে উঠল, ''চশমাটা কোথায় ফেললে তোমরা? হারিয়ে ফেললে নাকি? রহমান ঘর থেকে পালানোর সময় চশমাটা তো আমার নাকের ডগাতেই ছিল, ঠিক মনে আছে। ও ফায়া ফায়া, এখন আমি চশমা কোথায় পাই? চশমা ছাড়া আমি তো কিছুই ঠিকঠাক দেখতে পাই না। আখু বা-ফ্রিক-পো-লে, ফায়া ফায়া।''

বিরক্ত হলো মায়া। যে লোকটা এত যুদ্ধ জয় করেছে, এত কঠিন পরিস্থিতিতেও তার হেলদোল হয় না, সে কীকরে সামান্য একটা চশমা নিয়ে মাথা খারাপ করে?

''এই তো, এখানেই আছে,'' ভুরু কুঁচকে চশমার খাপটাকে বালিশের পাশ থেকে তুলে থুরার দিকে এগিয়ে দিল মায়া, ''যে জিনিসটা হাতের কাছেই আছে, সেটা নিয়ে পাড়া মাথায় করছেন কেন? আর কত্তবার বলেছি আপনাকে, আরাকানের ভাষা আমরা ঠিক করে বুঝতে পারি না। আরাকানের ভাষায় কথা বললে আমরা টেনশনে পড়ে যাই।''

''পরপর তিনটে যুদ্ধ আমরা জিতলাম, একের পর এক,'' কথা ঘোরানোর জন্য হেসে বলল থুরা, ''এই জয়কে উদ্‌যাপন করা হবে না? আমরা তো আরাকানে যুদ্ধে জিতলেই সবাই মিলে ভোজ লাগাই। তোমাদের চট্টলার আতিথেয়তার কথা আমরা শুনে থাকি, কোথায় সেই চট্টলার বিখ্যাত ভোজ?''

পাগলা বুড়ো একটা! ঠিক বাবার মতো! মুচকি হেসে মায়া বলল, ''আমরা সেটা আগেই ভেবে রেখেছি। বোধিচিত্ত, সুগন্ধ তো ভালোই আসছে। রান্না হয়ে গিয়ে থাকলে ওসব নিয়ে এসো ভাই। আরে, মাতঙ্গী কোথায়? তাকে দেখছি না তো?''

''উনি তো,'' একটু ইতস্তত করে বলল নীলা, ''মানে, রাতে তো কখনোই ওঁকে আশেপাশে দেখি না। কোথায় গিয়ে যে উনি ঘুম লাগান, কে জানে!''

ঠিক এই সময় মাতঙ্গী ঢুকলো ত্রিপল সরিয়ে, ''এই যে থুরা, জ্ঞান ফিরেছে? বাঃ, খুব ভালো। মায়া, খিদে পেয়েছে। রান্নার গন্ধ পাচ্ছি, কী বানাচ্ছো তোমরা?''

মাটির সানকিতে ধোঁয়া ওঠা লাল চালের ভাত। থালার এক কোণায় জুমের খেত থেকে তুলে আনা তাজা বেগুন আর মিষ্টি কুমড়োর লতা দিয়ে তৈরি ঘন সিঁদল ঝোল, ভেতরে ছোটো ছোটো পাহাড়ি কাঁকড়ার টুকরো। অন্য কোণায় পাথরের হামানদিস্তায় থেঁতো করা নাপ্পি ও পোড়া মরিচের ভর্তা। সেই ঝালের তীব্রতা এমনই মারাত্মক, যে সবার কপাল চুঁইয়ে ঘাম আর নাকের ডগার জল এসে গেল। সঙ্গে গাছ থেকে পেড়ে আনা টক-মিষ্টি পাহাড়ি লেবু। শেষে বাঁশের চোঙায় শীতল ঝরনার জল। চারদিকের নিস্তব্ধতার মাঝে ঝরনার একটানা ঝরঝর শব্দ, এই অনাড়ম্বর ভোজটি পেটের চেয়ে বেশি আত্মাকে শান্তি দিল।

খাওয়ায় শেষে হাত ধুয়ে থুরা নিজের সামরিক ইউনিফর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা পুরোনো হলদে হয়ে ওঠা তুলোট কাগজ। তাতে বাংলা হরফে লেখা, 'সংগ্রাম শেষ হয় না, শুধু তার রূপ পরিবর্তন করে।' নীচে সই, 'সুভাষ চন্দ্র বোস'। সেই কাগজে মোড়া ছিল একটা জং-ধরা ব্যাজ। আট-মুখী তারা, তার মধ্যে দুই উদ্যত তলোয়ার। ভেতরে সূর্যরশ্মির কেন্দ্রে বাঘের মুখ, সঙ্গে লেখা 'আজাদ হিন্দ'। কাগজ আর ব্যাজটা মাথায় ঠেকালো থুরা।

মাতঙ্গী আলতো করে স্পর্শ করল কাগজটা। সারা শরীরে কাঁটা

দিল, কেঁপে উঠল ও।

''এটা ওঁর হাতের লেখা,'' অস্ফুট স্বরে বলল মাতঙ্গী।

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল থুরা, ''আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ওঁর ছায়া, ওঁর একনিষ্ঠ শিষ্য। উনি আমার ঠাকুর্দাকে বলেছিলেন, পূর্বদিকে যাও। স্বাধীনতার যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় কোথায় আছে, খুঁজে বের করো।''

''হয়তো এটাই সেই যুদ্ধ। আমাদের বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য।'' বলল মাতঙ্গী।

''আমরা নিরস্ত্রদের সশস্ত্র করেছি, শত্রুকে অন্ধ করেছি। জনবিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। এরপর কী?'' প্রশ্ন মায়ার।

''এধরনের যুদ্ধের নির্দিষ্ট কয়েকটা ধাপ রয়েছে,'' বলল থুরা, ''আমরা আরাকানেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলাম। প্রথম ধাপ, নিরস্ত্রদের সশস্ত্র করা, যাতে নির্যাতিত জনতা প্রতিরোধ শুরু করে। দ্বিতীয় ধাপ হলো শত্রুর ইন্টেলিজেন্স পরিকাঠামো ধ্বংস করে তাদের অন্ধ করে দেওয়া। এই দুটোতে তোমরা সফল হয়েছ। এরপর আরও কয়েকটা ধাপ রয়েছে। তৃতীয় ধাপে চট্টলা ও শাহ্জালালাবাদের সংযোগস্থলকে কেটে ফেলতে হবে। স্ট্র্যাটেজিক আইসোলেশন। চতুর্থ ধাপ, স্থানীয় সরকারি প্রতিভূদের আত্মসমর্পণ বা পলায়ন। পঞ্চম ধাপ, তোমাদের নিজেদের সরকার গড়ে তোলা। ষষ্ঠ বা সবশেষ ধাপ, সেই সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।''

''মাস্টারদা সূর্য সেন একই চেষ্টা করেছিলেন,'' বলল মাতঙ্গী, ''তৃতীয় ধাপেই ব্যর্থতা এসেছিল। স্ট্র্যাটেজিক আইসোলেশন কাজটা সহজ নয়।''

ঘরে নীরবতা নেমে এল। আবার বৃষ্টি শুরু হলো। ধীরে, কিন্তু নিরন্তর। মাতঙ্গী একটু দূরে আড়ালে গিয়ে পদ্মাসনে ধ্যানে বসল। চশমার খাপ থেকে ছোট্ট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে থুরা ওর চশমার ডাঁটি টাইট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একবার চশমা পরছে, তারপর মাথা নেড়ে চশমা খুলে আবার খুটখাট করছে, আবার চশমা পরছে — এই চলছে বারবার। কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না।



(নাগাল্যান্ড, ভারত)

সূর্য নীল পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ প্রকৃতি এক মায়াবী রূপ ধারণ করল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা ছোটো ছোটো গ্রামগুলোতে তখন সন্ধ্যার মায়াজাল নেমে আসছে। গ্রাম জুড়ে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। উঠোনে দরজার পাশে টাঙানো দা আর ঝুড়ি বলে দিচ্ছে, আজকের মতো কাজ শেষ, এখন শুধুই অবসর। বাঁশ আর কাঠের তৈরি দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বিকেলের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে যেতেই ঘরের ভেতরে জ্বলে উঠল 'থাপ্পু' বা মাটির উনুন। দূর থেকে খংখাইয়ের গলার স্বর ভেসে এল, ''মেহুল, নো ক্যা লি বা, আ নুও? কোথায় গেলি, বাপ্ আমার?''

নাগাল্যান্ডের এই পেরেন জেলাটাকে লোকে 'সবুজ জেলা' বলে, সেটা অকারণে নয়। পাহাড়ের বুক চিরে কুয়াশার পাতলা চাদর ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে, যেন ধরিত্রীর শ্বাস। দূরে পাইন আর ওক গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ বিকেলের রক্তিম আভা জুম চাষের জমিতে পড়েছে, মনে হয় কোনো দক্ষ শিল্পী সযত্নে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছেন সবুজ ক্যানভাসে। একটু পরেই বাড়ির দাওয়া থেকে আগুনের হালকা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠতে শুরু করল। বাঁশের তৈরি মাচাং ঘরগুলোর ভেতর থেকে ভেসে আসছে কাঠের উনুনে রান্নার সোঁদা গন্ধ। কাছেই কোথাও রান্না হচ্ছে নাগাদের প্রিয় বাসতেঙ্গা ওয়োকো সো রুজন, গাঁজন করা টক বাঁশ কোড়ল আর নাগা লঙ্কা দিয়ে রান্না করা জংলি বরাহের মাংস। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় সেই সুবাস মিলেমিশে এক অলৌকিক প্রশান্তি তৈরি করেছে। আদিম অরণ্যের গন্ধে ঘেরা সেই সন্ধ্যায়, গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তে আগুনের পাশে বসে ছিল বৃদ্ধ খংখাই। ''মেহুল, কোথায় গেলি রে তুই? ঠাণ্ডা পড়ছে, আগুনটা একটু জ্বালিয়ে দে, বাপ্!''

হাতের কুঠার আর কাঁধের পাঁজা কাঠ মাটিতে নামিয়ে রেখে বুড়ো খংখাইয়ের পাশে এসে বসল তার নাতি, মেহুল। পাহাড়ি রাতের পতঙ্গরা নেমে এসেছে লোকালয়ে। ঝিঁঝিঁর ডাকে মাথা ঝিমঝিম করে। গাছের ডালপালায় পাখিদের ঘরে ফেরার কলকাকলি ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। পাহাড়ের ঢালে ছোটো ছোটো ঘরগুলোর জানালা দিয়ে একে একে আলো জ্বলে উঠল, মনে হলো আকাশের তারাগুলো যেন মাটির বুকে নেমে এসেছে। শীতল হাওয়ার ঝাপটা আর ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ঐকতানে ঘেরা সেই নির্জনতার এক গভীর গাম্ভীর্য থাকে। আধুনিক পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে, পাহাড়ের এই গভীরে সন্ধ্যা নামে এক শান্ত, প্রাচীন অথচ প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে। যেখানে প্রতিটি পাথরে আর ঝরনার শব্দে মিশে থাকে পূর্বজদের হাজার হাজার বছরের স্মৃতি।

কাঠের টুকরোগুলোকে গম্বুজের মতো করে সাজিয়ে তাতে আগুন দিল মেহুল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পৌ, তুমি গতকাল মায়ানমারের সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলে, তাই না? আমি বুঝতে পারি। ওখানে গেলেই তোমার মন খারাপ হয়ে যায়, আর সেই মনখারাপ থাকে পুরো একটা সপ্তাহ। আচ্ছা বলো তো পৌ, তুমি রোজ সন্ধ্যেবেলা কেন ওভাবে সীমান্তের ওপারের দিকে তাকিয়ে থাকো? ওখানে তো ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই।'

খংখাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওটা তো কেবল জঙ্গল নয় রে মেহুল, ওটা আমাদের শরীরের একটা কেটে ফেলা অংশ। এক সময় এই পাহাড়গুলোর মাঝে কোনো বেড়া ছিল না। আমাদের শিকারের পথ, উৎসবের গান আর বিয়ের

সম্বন্ধ এই পাহাড়ের এপার-ওপার জুড়ে বিনা বাধায় বয়ে যেত।'

মেহুল অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে এই কাঁটাতার এল কেন? কে নিয়ে এল? আমাদের ইতিহাস বইতে তো এসব কিছুই লেখা নেই।'

বৃদ্ধের গলায় বিষণ্ণতা নেমে এল, 'সাগরপার থেকে আসা সাদা মানুষেরা সাঁইত্রিশ সালে ম্যাপের ওপর কলম চালিয়ে দিল। তারা বুঝল না যে একটা পাহাড়কে ভাগ করা মানে একটা জাতির হৃদয় চিরে ফেলা। আমাদের ভাই-বোনেরা রাতারাতি অন্য দেশের মানুষ হয়ে গেল। আজ আমাদের উৎসবের ঢোল এপারে বাজলে ওপারে প্রতিধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু আমরা একে অপরের হাত ধরতে পারি না। এই বিভাজন আমাদের রক্তকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে।'

মেহুল ওর দাদুর হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, 'এই কষ্ট কি কোনোদিন শেষ হবে না?'

খংখাই মেহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, 'হবে। আমাদের নাগা জনজাতিগুলোকে একজোট করতেই হবে। অনেকে বলে, নাগা জনজাতির বাসস্থানের দুটো টুকরোকে ভারত আর মায়ানমার থেকে আলাদা করে নতুন একটা দেশ তৈরি করতে হবে। জেনে রাখিস, সেটা সবচেয়ে বড়ো ভুল হবে। যদি সেটা করি, তাহলে সাগরপাড়ের সাহেবরা আবার ফিরে আসবে, আমাদের পায়ে বেড়ি পরাবে।"

"তাহলে?" মেহুলের গলাটা অসহায় শোনালো।

"এটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিস যে, হিন্দুরা এখন দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবি, হিন্দুরা আর আমরা আসলে একই। ওরাও প্রকৃতির পুজো করে, আমরাও এককালে প্রকৃতির পুজো করতাম। আমাদের সব উৎসব আজও প্রকৃতি নির্ভর। ওরা প্রকৃতিকে জন্মদাত্রী মা বলে মানে, আমরাও তাই। উকে-পেনু-ও-পফু মানে জন্মদাত্রী, জানিস তো? তাই হিন্দুদেরকে সঙ্গে নিয়েই কিছু করতে হবে।"

"ঠিক করে বলো তো দাদু," চশমাটা নাকের ডগায় সোজা করে বসিয়ে বলল মেহুল, "কীকরে আমরা নাগারা আবার এক হবো?"

"উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের আগে তো এ সমস্যা ছিল না," বলল খংখাই, "তখনকার ম্যাপ দেখেছিস? মায়ানমার তখন ভারতের মধ্যেই ছিল। আমরা নাগারা আবার এক হবো, যদি কোনোদিন ভারত আবার আগের সেই অখণ্ড রূপ ফিরে পায়। যেদিন সীমান্ত থাকবে না, সেদিন পূর্ব থেকে পশ্চিম সব ভাই আবার এক হবে। ভারত যদি আবার এক হয়, তবেই আমাদের নাগাভূমি তার পূর্ণতা ফিরে পাবে। সেদিন আমি আর সীমান্তে দাঁড়িয়ে কাঁদবো না, বরং বুক ফুলিয়ে ওপারে গিয়ে আমার হারানো আত্মীয়দের জড়িয়ে ধরব। ওখানে জমি কিনব। বলা যায় না, পছন্দ হয়ে গেলে ওখানকার একটা সুন্দরী দেখে মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে পারি।'

কাঠের একটা টুকরো দিয়ে আগুনটা উসকে দিল খংখাই। আগুনের শিখাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাঠ পোড়ার সেই চিরচেনা শব্দ — চটপট চটপট করে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ার শব্দটা জোরালো হয়ে উঠল, তার সঙ্গে মিশে গেল পাইন কাঠের মিষ্টি সুগন্ধ, ধূপের মতো গন্ধ। আগুনের সেই আলো মেহুলে চোখেও।

"সেটা কি কোনোদিনও হবে, দাদু?" মেহুলের গলায় তবু অবিশ্বাসের সুর, "বরং উল্টোটাই তো হবে শুনছি। পূর্ব খোরাসানের নেতারা বলছে, খুব শিগগিরই শিলিগুড়ির গলা কেটে ওরা এই উত্তর-পূর্বকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তারপর তুর্কি আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ওরা ঢুকে পড়বে এখানে, পুরো উত্তর-পূর্ব ভারত দখল করে মুসলমান দেশ বানাবে।"

"গলা কাটবে!" বুড়ো খংখাইয়ের চোখে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, "সাহেবরা আমাদের কী বলে জানিস? 'হেড হান্টার'! এসে দেখুক না এদিকে, দাও দিয়ে সব জেহাদির মাথা কেটে মাথাগুলো দরজার ওপর টাঙিয়ে রাখবো।"

"হ্যাঁ," হেসে বলল মেহুল, "এমনিতেও গত পঞ্চাশ বছরে একটাও নতুন মাথা জোগাড় হয়নি, দরজার চৌকাঠটা কেমন যেন খালি খালি লাগছে, তাই না? আচ্ছা দাদু, এই যে আমরা কাটা মুণ্ডু দরজার ওপর সাজিয়ে রাখি, সেটা কেন করি? বিদেশিরা তো এজন্য আমাদের অসভ্য ভাবে।"

"নাগাদের বিশ্বাস," হেসে বলল খংখাই, "শত্রুর মাথা ছিনিয়ে নেওয়া মানে তার আত্মাকে বন্দি করে তার শক্তিকে হজম করে নেওয়া।"

"তুমি সেটা বিশ্বাস করো?" প্রশ্ন মেহুলের।

"হিন্দু তান্ত্রিকদের মধ্যেও কিন্তু এরকমই একটা বিশ্বাস আছে," বলল খংখাই, "ওরা মৃতদেহের ওপর বসে ধ্যান করে, মৃতের সব শক্তি শুষে নিয়ে শক্তিশালী হওয়ার জন্য। কিন্তু তুই তো এসব বিশ্বাস করবি না। তাই বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপারে গিয়ে দেখ। দেখতে পাবি, এটা হলো শত্রুর মনে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করার এক প্রাচীন কৌশল। খুব কাজের কৌশল এটা।"

"বুঝলাম," হেসে বলল মেহুল, "কিন্তু আমি বলি কী, জেহাদিরা চড়াও হলে তারপর আমরা দাও নিয়ে ভয় দেখাতে বেরোবো, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। তারচেয়ে বরং এখন থেকেই কিছু করা ভালো। তুমি তো আমাদের 'গাওঁবুড়া', আগামী গ্রাম পঞ্চায়েত মিটিঙে কথাটা তোলো না কেন?"

"করব, বাপ্ আমার," হেসে বলল বুড়ো খংখাই, "তার আগে বল, দাও কীভাবে ঠিক করে শান দিতে হয়, সেটা তোকে শিখিয়েছিলাম, মনে আছে তো? নাকি গুয়াহাটিতে আর্মি কলেজে লেখাপড়া করতে গিয়ে সব ভুলে গেছিস?"

"আমি গুয়াহাটিতে খুব কম সময়েই থাকি," কঠোরস্বরে বলল মেহুল, "বেশিরভাগ সময় তো আমার কাটে জেনজিবে ট্রেনিং

ক্যাম্পে। আর্মির প্রশিক্ষণ কী জিনিস, তুমি জানো না? তিরিশ কেজি ভারী পিঠের ব্যাগ আর অস্ত্র-সহ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামা করতে হয়। মাইনাস তাপমাত্রার মধ্যে, মুষলধারে অতিবৃষ্টির মধ্যেও ট্রেনিং চলে। কোনো রসদ বা খাবার ছাড়া কীভাবে ঘন জঙ্গলে দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে হয়, সেটা তুমি ছোটোবেলায় শিখিয়েছিলে। একই ট্রেনিং আর্মিও দিচ্ছে, নতুন অনেক টেকনিক শিখছি। তোমার কোনো শিক্ষাই আমি ভুলিনি। তুমি দা চালাতে শিখিয়েছিলে, আর্মিতে তার ওপর নতুন নতুন দাও চালানোর টেকনিক শিখেছি। কিন্তু দাও দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না, পৌ। তুমি ভাবছো মায়ানমারে আটকে পড়া আমাদের ভাই-বোনদের কথা। আর আমি ভাবছি শিলিগুড়ির কথা। যদি পূর্ব খোরাসান শিলিগুড়িতে ঢুকে পড়ে, তাহলে আমরা তো রসদের অভাবে বেঘোরে মারা পড়ব।"

"তুই শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত আজকালকার ছেলে," মাথা নেড়ে বলল খংখাই, "নাগা হওয়ার মানেটা কী, আজও বুঝলি না। নাগা রসদের অভাবে মরে না, মরে যখন সে নাগা হওয়া ভুলে যায়। আর তাছাড়া আমাদের এত নাচার ভাবছিস কেন? ওরা শিলিগুড়িতে ঢুকলে আমরাও ঢুকে পড়ব!"

"কোথায় ঢুকবে?" মেহুলের গলায় সন্দেহ।

"এই তো," হাত বাড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে দেখায় বুড়ো, "এই পাহাড়ের শিরা বরাবর চললে সোজা পৌঁছে যাবো ত্রিপুরা। ত্রিপুরা আর সমুদ্রের মাঝে আছে শুধু এক চিলতে জমি —নোয়াখালী! নাগাল্যান্ডে তখন রসদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাহাজে করে আসবে। হা হা হা হাঃ!"

দূরে কোথাও একটা পাহাড়ি নেকড়ে ডেকে উঠল। কুয়াশাচ্ছন্ন নাগা পাহাড়ের নিস্তব্ধতা পেরিয়ে সেই শব্দ যেন কোনো প্রাচীন আত্মার রণ-আহ্বানের মতো ছড়িয়ে পড়ল উপত্যকায়।

"চল, তোকে আগামী পূর্ণিমায় ভূতজুঁয়া দ্বীপে ঘুরিয়ে আনি। যাবি, আমার সঙ্গে?" বলল খংখাই।



(চট্টলা, পূর্ব খোরাসান)

ভারী কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই নাকে এল পুরনো কাগজ, ভিজে চুন আর ধুলোর ভ্যাপসা গন্ধ। হলরুমটি বিশাল, উঁচু সিলিঙের মাঝখান থেকে বিশালাকার ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। তবে তার কাচের অর্ধেকই ভাঙা, বাকিগুলো ধুলোর আস্তরণে ধূসর। মেঝেতে এককালে দামি মোজাইক ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ফাটল ধরেছে। দেওয়ালের গায়ে বিশাল এক আয়না, যার পারদ চটে গিয়ে এখন ঝাপসা হয়ে গেছে, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হয় আয়নার ভেতর থেকে অন্য কেউ লক্ষ্য রাখছে। ঘরের এক কোণায় স্তূপ করে রাখা আছে ব্রিটিশ আমলের কিছু ভাঙা আসবাবপত্র ; ইঁদুরের বাসা ভর্তি ভারী সোফা, হাতল ভাঙা চেয়ার, উল্টে থাকা টেবিল আর উইয়ে খাওয়া আলমারি। তারই কয়েকটা চেয়ার, যেগুলো কিছুটা হলেও ব্যবহার করার মতো অবস্থায় আছে, সেগুলোকে টেনে ধুলো ঝেড়ে বসল ওরা।

"কে এই রহিম চৌধুরী লোকটা?" অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, "কী এমন করেছে লোকটা, যে তাকে এত বিশ্বাস করছ?"

"এই ব্যাপারে কিন্তু আমি একমত," বলল থুরা, "জানা নেই শোনা নেই, শুধুমাত্র এক্স-মুসলিম হওয়ার সুবাদে লোকটাকে আমরা দেখা করার অনুমতি দিয়েছি, খুব বড়ো ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে এটা।"

"লোকটার কথাগুলো একবার শুনে দেখো," আশ্বাসের স্বরে বলল মায়া, "আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি। ওই তো, বোধিচিত্ত ওই কোণায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে, ওর চাদরের নীচে সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক আছে। তাছাড়া, ছাদের ওপর থেকে অমিতাভ নজর রাখছে। কোনো গাড়ি এদিকে আসতে দেখলেই ও বোধিচিত্তকে খবর দেবে। এছাড়া বাইরে গলির মোড়ে যে ভাঙা চায়ের দোকানটা দেখলে, সেটা থেকে পুরো বাড়িটার ওপর নজর রাখা যায়। সেখানেও আমাদের লোক রয়েছে।"

ফিরিঙ্গি বাজারের সরু গলির ভেতরে লুকিয়ে থাকা জরাজীর্ণ ভবন, এককালে কোনো হিন্দু জমিদারের পরিচালিত ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহার হতো। ছাদের ওপর থেকে দেখা যায় চাক্তাই খালের ধারের ঘিঞ্জি বস্তি আর দূরে কর্ণফুলী নদীর আবছায়া রেখা। চুন-সুরকির পলেস্তারা-খসা, শ্যাওলা-ধরা বিশাল এক ঔপনিবেশিক আমলের ইমারত। দেওয়ালে ফাটলগুলো মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে আছে, যা দেখে মনে হয় বাড়িটা যে কোনো সময় ভেঙে পড়বে। ভারী কাঠের দরজাগুলো উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে, মরচে ধরা লোহার গ্রিলগুলোর অধিকাংশই চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে। যেগুলো রয়ে গেছে, সেগুলোকে রদ্দির দামে বিকোলেও কিছু পাওয়া যাবে না। ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ, অন্ধকারে চামচিকের ডানার ঝাপটানি, আর হঠাৎ হঠাৎ করে কাঠের মড়মড় শব্দ।

পাশের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সবাই ওদিকে তাকাল। সাধারণ সুতির কুর্তা পাজামা পরা এক প্রৌঢ় ভেতরে এল। বয়স চল্লিশের কোঠায়, মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার সঙ্গে সংকল্পের ছাপ। হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা চামড়ার পুঁটলি। ঘরে ঢুকে একটু নাক কুঁচকালো, বোধহয় ঘরের দুর্গন্ধের জন্য।

"আপনার নাম কী?" প্রশ্ন করল থুরা।

"রহিম চৌধুরী, বাবা ব্রহ্মপুত্রের দয়া।"

"ব্রহ্মপুত্রে আজ ইলিশ উঠেছে?" প্রশ্ন থুরার।

"ইলিশ নয়, বোয়াল উঠেছে," বলল রহিম, "বেয়াল্লিশ টাকা

কিলো।"

মাতঙ্গী পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে রহিমের দেওয়া উত্তরগুলো মিলিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

"বসুন," সামনের চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে বলল মায়া।

লোকটাকে দেখেই মনে হয় খুব সাবধানি, গুছিয়ে কাজ করে। প্রথমে ঘরের কোণা থেকে একটা টেবিল খুঁজে বার করে সেটাকে ধুলো ঝেড়ে টেনে আনলো। তারপর চেয়ারটাকে তার সামনে টেনে বসল। পরম মমতায় চামড়ার পুঁটুলি খুলে পুরনো ভঙ্গুর একটা ম্যাপ আর ন্যাপথলিন গন্ধী হলদে কয়েকটা ফাইল খুলে সামনে মেলে ধরল। থুরা সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখল, ঔপনিবেশিক আমলের সিলমারা একটা জীর্ণ টেলিগ্রাম আর হাতে আঁকা নোয়াখালী ও চট্টলা করিডোরের ট্রানজিট রুট। পাতাগুলো হলুদ হয়ে এসেছে। পুরনো কালিতে একপাশে নোট লেখা ঃ

১. গজওয়া-এ-হিন্দ সফল করতে গেলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২. যতদিন চট্টলা ভারতের সঙ্গে আছে, ততদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

৩. ত্রিপুরা নিশ্চয়ই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাহলে চট্টলার সঙ্গে আমাদের পাকিস্তানের একমাত্র যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াবে নোয়াখালী।

৪. নোয়াখালী যদি ভারতে যায়, চট্টলা আমরা কিছুতেই দাবি করতে পারবো না।

৫. রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দাও।

৬. জনবিন্যাস বদলে দাও।

৭. নোয়াখালী দখল করো।

৮. করিডোর বিচ্ছিন্ন করো।

ম্যাপের পাশেই একটা পুরোনো দিনের লাল খেরোখাতার লেজারে ডজনখানেক মিলিশিয়া বাহিনীকে দেওয়া অর্থের হিসাব লেখা ছিল।

"এসব আপনি কোথায় পেলেন?" জিজ্ঞেস করল থুরা।

"আমার পূর্বপুরুষ ছিল নোয়াখালীর হিন্দু জমিদার," বলল রহিম চৌধুরী, "আমার দাদাজী, অর্থাৎ ঠাকুর্দা ছিল পরিবারের ছোটো ছেলে। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিল, গরিব মুসলমান প্রজাদের নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত। এরপর এল নোয়াখালীর সেই জেহাদি অত্যাচারের কালখণ্ড। আমার দাদাজী আগেভাগেই ধর্মান্তরিত হয়ে পাকিস্তানিদের দলে যোগ দিয়ে বেঁচে গেল, পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলা হলো।

আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা নোয়াখালীতেই। চাকরিসূত্রে চট্টলায় পোস্টেড। তবে প্রতি মাসেই আমি নোয়াখালী যাই।

আমি সারাজীবন বিশ্বাস করে এসেছিলাম, নোয়াখালীর জেহাদি আক্রমণ হয়েছিল হিন্দু জমিদারদের দোষে। তারা অত্যাচারী ছিল, তাই মুসলমান প্রজারা খেপে গিয়ে আক্রমণ করেছিল। আমাকে সেটাই শেখানো হয়েছিল। তাই দাদাজীর ইসলাম গ্রহণকে আমি ভাগ্যের বিচার বলেই মনে করতাম। কয়েকবছর আগে ইন্টারনেটে একটা সিনেমা দেখলাম — বেঙ্গল ফাইলস। প্রথমে মনে হয়েছিল, সিনেমাটা হিন্দুদের প্রোপাগান্ডা। কিন্তু একটা সন্দেহের কাঁটা মনে ঢুকে গিয়েছিল। সত্যিটা কী, আর মিথ্যে কোনটা, সেটা তখন থেকেই খোঁজা শুরু করি। যেমন যেমন নতুন তথ্য হাতে আসতে থাকে, তেমন তেমন আমার ঈমান নড়ে যায়। যেটার শুরু মিথ্যে দিয়ে, তার সবটাই তো মিথ্যে, তাই না? আর কতদিন এই মিথ্যে ঈমানের বোঝা বয়ে বেড়াবো? তখন থেকেই আমি স্থানীয় এক্স-মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে একটু একটু করে যুক্ত হতে থাকি।

গত মাসে গ্রামে গিয়েছিলাম। পুরনো তোরঙ্গগুলো বের করা হয়েছিল নতুন করে ন্যাপথলিন দেওয়ার জন্য, তার মধ্যে থেকে এই চামড়ার পুঁটুলিটা পাই। তারমধ্যে এসব ছাড়াও একটা চিরকুট ছিল, বোধহয় দাদাজীর লেখা। সেই চিরকুটে দাদাজী শুধু একটা কথাই বারবার লিখেছিল — মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে। এই জীবনটাই মিথ্যে!

দাদাজী ভুল ভাবেনি। এই পুরনো ম্যাপ আর কাগজপত্রগুলো কোনো আদর্শের কথা বলে না, গরিব মানুষের মঙ্গলের কথা বলে







না, বরং তাদের ব্যবহার করে দখলদারির কথা বলে। আধা-সামরিক জেহাদি মিলিশিয়া, সুযোগসন্ধানী দাঙ্গাবাজ ডাকাতের দল আর সুরাবর্দির পুলিশকে দিয়ে চট্টলাকে ভারতের বাণিজ্যপথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শত্রুদেশের প্রভাব বলয়ে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্তেরই অংশ ছিল আমার পূর্বপুরুষদের হত্যা। আমরা ছিলাম দাবার বোড়ে মাত্র। তলোয়ারের ভয়ে সালোয়ার পরেছিলাম, কী লজ্জা, ছি ছি!

ভালো করে দেখুন, এটা শুধুমাত্র স্মৃতি নয়। এটা বহু দশক ধরে চলে আসা এক সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের প্রমাণ, যা আজও বহাল তবিয়তে রয়েছে। এই জামাত আসলে পুরনো মুখের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা নতুন মুখোশ মাত্র। ওরাই আমার পূর্বপুরুষদের খুন করেছিল, ওদের জন্যই আজ আমি মিথ্যে একটা পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছি, ওদের আমি ছাড়বো না।"

''আপনি এখন কী করতে চান?" বলল মায়া।

''আমার দাদাজী ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, পাকিস্তানিদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। চট্টলার দুঃখকষ্টের মূলে আছে নোয়াখালী। সেই ভুল আমি সংশোধন করতে চাই। যারা আমার পূর্বপুরুষদের হত্যা করেছিল, তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। সবচেয়ে বেশি যেটা চাই সেটা হলো, এই মিথ্যে পরিচয়ের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চাই। নোয়াখালী থেকে শাহ্‌জালালাবাদের শাসন মুছে ফেলতে চাই। আপনারা কি আমাদের, মানে এক্স-মুসলিমদের সাহায্য করবেন? আমাদের দলে প্রায় হাজারখানেক স্বেচ্ছাসেবক আছে। অস্ত্রশত্রের জোগান পেলে আমরা নোয়াখালীতে বড়সড় গণ্ডগোল লাগিয়ে দিতে পারি। শত্রু এখন দুর্বল, এটাই সুযোগ।"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল থুরা আর মায়া।

''চাইলেও আপনাদের সাহায্য করার মতো পরিস্থিতিতে আমরা নেই," বলল মায়া, ''এখান থেকে নোয়াখালীতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে গেলে পথেই সেসব ধরা পড়ে যাবে।"

''ভারতের ত্রিপুরা আপনাদের থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি," মাতঙ্গীর চোখে এক নতুন পরিকল্পনার ছায়া, ''আচ্ছা, একটু সময় দিন, আমি ভেবে দেখছি কী করা যায়। একটা কথা বলুন তো, আমি শুনেছি ভারতের নাগাদের খুব ভয় পায় জামাতিরা। এটা কি সত্যি?"

''একদম সত্যি," বলল রহিম, ''একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সিলেট সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডকে অবরুদ্ধ করার যে নৃশংস কৌশল নাগারা নিয়েছিল, তা আজও লোকে ভোলেনি। ওরা অদৃশ্য থেকে জঙ্গলে যুদ্ধ করত, রাতে নিঃশব্দে বাঙ্কারে ঢুকে 'দা' দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মাথা কেটে নিয়ে যেত। কবন্ধ বলে সে ধড় ইসলামি রীতিতে কবর দেওয়া যেত না, অনন্ত দোজখ নসীব হতো ওই পাকিস্তানিদের। জেহাদিরা মরতে ভয় পায় না, কিন্তু দোজখকে খুব ভয় পায়। সিলেটের যুদ্ধে নাগা রেজিমেন্টের ভয়ে পাকিস্তানিরা লড়াই ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেছিল। সেসব কথা আজ কিংবদন্তী হয়ে গেছে। এই জামাতিরা তো পাকিস্তানিদেরই বেজন্মা পোলাপান। পাকিস্তানিরা যাদের ভয় পায়, জামাতিরা তাদের ডবল ভয় পায়।"

''ঠিক আছি, দেখি কী করা যায়। রহিম সাহেব, আপনার মোবাইল নম্বরটা বলুন। আমি দরকার মতো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

''আমি তাহলে এখন আসি," নম্বর দিয়ে তারপর হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিতে বলল রহিম, ''অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম। আপনাদের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় থাকবো।"



(চট্টলা, পূর্ব খোরাসান)

ভাঙা জানালার পাল্লার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল বোধিচিত্ত। ফাঁকা রাস্তায় কয়েকটা নেড়ি কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো জনমানুষের দেখা নেই। শীতের বাতাসে প্রেতের আঁশটে গন্ধ। রহিমের অবয়বটা দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর একটা গলা খাঁকারি দিল বোধিচিত্ত।

মাতঙ্গী বলল, ''নাগাল্যান্ডের পেরেন জেলায় থাকে এমন একজনকে আমি চিনি, যে হয়তো সাহায্য করতে পারে। জঙ্গলের রাস্তায় পেরেন থেকে ডিমা হাসাও, সেখান থেকে জাম্পুই পাহাড় আর তৃষ্ণা অভয়ারণ্য হয়ে ফেনী নদীর চর পৌঁছতে কতদিন লাগবে? ঠিক জানি না। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। তুমি এই এক্স-মুসলিমদের এত বিশ্বাস করো কেন? কী করে বুঝছো, এরা ছদ্মবেশী নয়? হয়তো মোল্লাবাদীরাই এদেরকে এক্স-মুসলিম সাজিয়ে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে — আমাদের খবর জানার জন্য, ভেতর থেকে লড়াইটাকে ভাঙার জন্য।"

মাথা নেড়ে বলল মায়া, ''আমি ওদের অন্ধভাবে বিশ্বাসও করি না, আবার পুরোপুরি বাদও দিতে চাই না। যেকোনো রাজনৈতিক বা আদর্শগত আন্দোলনে অনুপ্রবেশের ঝুঁকি থাকে। শুধু এক্স-মুসলিম কেন, আমাদের নিজেদের মধ্যেও তো থাকতে পারে। তাই প্রশ্নটা 'কে মুসলমান ছিল' নয়, প্রশ্নটা হলো — কে কতটা ধারাবাহিক, কতটা স্বচ্ছ, আর কঠিন সময়ে কোথায় দাঁড়ায়।"

''কিন্তু একজন মানুষ এক্স-মুসলিম হয় কেন?" প্রশ্ন থুরার, ''সবাই কি সত্যিই বিশ্বাস হারিয়ে বেরিয়ে আসে?"

''হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন," বলল মাতঙ্গী, ''আমি কর্মসূত্রে আবুধাবি আর দুবাইতে বড়ো একটা সময় কাটিয়েছি। সেখানকার স্থানীয় আরবদের কাছে ইসলাম ব্যক্তিগত উপাসনা পদ্ধতি, সেটা মানা আর না-মানা তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেটাকে আগ্রাসন আর টোটাল ডমিনেন্সের হাতিয়ার করে তোলেনি ওরা, এক্স-মুসলিমও হতে হয়নি ওদের। আমাদের এই উপমহাদেশে এত সমস্যা কেন?"

''এর একটা বড়ো কারণ খুবই সহজবোধ্য,'' বলল মায়া, ''ভারতে ইসলাম এসেছিল আগ্রাসনের মাধ্যমেই। এদেশে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ধরে রাখার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামি মোল্লবাদীরা সাধারণ মানুষকে জান্নাতের লোভ আর জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে বিশ্বাস ধরে রেখেছে। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে মানুষ প্রথমবারের মতো বিকল্প ব্যাখ্যা, ইতিহাস, সমালোচনা— সব একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছে। এখন শুধু 'পাপ হবে' বললেই মানুষ থেমে যাচ্ছে না।''

''এটা ঠিক বলেছো,'' বলল মাতঙ্গী, ''এই যুগে সেই মতবাদই টিকে থাকবে, যা মানুষকে বাস্তব জীবনে কিছু দিতে পারে —জ্ঞান, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, উন্নতি, মর্যাদা, আধ্যাত্মিকতা। শুধু পরকালের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর সমাজকে ধরে রাখা যাবে না। ইসলামি মোল্লাবাদীরা সেখানেই সমস্যায় পড়েছে। ধরো, পূর্ব খোরাসানের সব মাদ্রাসা যদি আজ বন্ধ হয়ে যায় —আগামী প্রজন্মের কতজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই গোঁড়ামির পথ বেছে নেবে?''

''তুমি আসলে বলছো,'' একটু ভেবে বলল থুরা, ''বিশ্বাসের ভিত দুর্বল হয়ে গেছে। ইরানেও তো শুনেছি একই অবস্থা, নব্বই শতাংশ মসজিদে তালা পড়ে গেছে। লোকে প্রকাশ্যে নমাজ পড়তে ভয় পায়, পাচ্ছে লোকে মোল্লাবাদী ভাবে। ইরানের মতো গোঁড়া দেশে যখন এই হাল, তখন পৃথিবীর অন্যত্র কী হচ্ছে, তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। রহিম সাহেব একটা কথা বললেন — 'মিথ্যে একটা পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছি', কথাটা খুব ভাবাচ্ছে। শুধুমাত্র ধর্মত্যাগী হওয়ার অপরাধে খুন হয়ে যাবে, এই ভয়ে অনেকে এখনো ঈমানে রয়েছে, কিন্তু তারাও একটু একটু করে সাহসী হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী, কেউ ভালোবেসে ইসলাম পালন করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই আগ্রাসী মনোভাব, এই জবরদস্তি বন্ধ হাওয়া দরকার। এই আগ্রাসন নিয়েই তো রাখাইনে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আমাদের সংঘাত বাধে।''

''শুধু তাই না,'' বলল মাতঙ্গী, ''এখানে আর একটা বিষয় কাজ করছে — 'ইউডেমনিক লেজিটিমেসি'। অর্থাৎ সাফল্য থেকে তৈরি হওয়া বৈধতা। ইতিহাসে বহু মানুষ কিছু মতবাদকে সত্য বলে মেনেছে শুধুমাত্র এইজন্য যে, সেটা যুদ্ধে জিতেছিল। এক সময় ইসলাম পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, যুদ্ধ জিতেছে, পরাক্রম দেখিয়েছে—সেটা থেকে অনেকে ভেবেছে, এদের পথই বুঝি সত্যের পথ। কিন্তু ইতিহাস তো স্থির নয়। এখন পৃথিবীর ক্ষমতার মানচিত্র বদলে গেছে। এখন নিদেনপক্ষে ভারতে তো দেখছি হিন্দুরা জিতছে। যে মধ্যপ্রাচ্য একসময় ইসলামের গৌরবের কেন্দ্র ছিল, সেখানে আজ নানা দেশ রাজনৈতিক ও সামরিক সংকটে জর্জরিত। ইরান আর তুর্কি সবচেয়ে গোঁড়া, ওরাই সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছে ইসলামি মোল্লাবাদীদের ঘোষিত চিরশত্রু ইহুদিদের হাতে। মানুষ দেখছে, শুধু ধর্মীয় পরিচয় সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়। তখন যারা 'জয় মানেই সত্য' ভেবে ইসলামে এসেছিল, এখন তাদের বংশধরদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে। সাফল্যের নতুন পথ খুঁজছে তারা। ইউডেমনিক লেজিটিমেসি একটা শাঁখের করাত, দুদিকেই কাটে। যারা সাফল্যের দ্বারা সৃষ্ট বৈধতা মেনে মুসলিম হয়েছিল, তারা এখন কী করবে?''

''ঠিক আছে,'' মাথা নেড়ে বলল থুরা, ''কিন্তু তবুও, এক্স-মুসলিমদের ওপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ। আজ তারা মোল্লাবাদের বিরুদ্ধে, কাল আবার ভয়ে বা চাপে ফিরে গেলে? বিশ্বাসঘাতকতা করলে?''



''সেই আশঙ্কা মোটেই অমূলক না,'' সম্মতি দিল মাতঙ্গী, ''আমাদের— মানে হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে ত্রিতাপের কন্সেপ্ট আছে। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। তেমনি শরীরে জীবাণু ঢুকলে অসুখ হয়, এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ত্রিতাপের কন্সেপ্ট নেই। অন্তত আছে, এমনটা আমার জানা নেই। আজকের অধিকাংশ মুসলমান সমাজে অতিপ্রাকৃত নিয়ে ভয়, যেকোনো ঘটনাকেই গজব বা পরকালের শাস্তি ভাবা— এগুলোর শিকড় গভীরে। অনেকেই যুক্তি দিয়ে মজহব ছাড়লেও মানসিকভাবে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে না। জীবনে বিপদ এলেই— চাকরি গেল, পরিবারের কেউ অসুস্থ হলো, তখন মোল্লাবাদীরা সেটাকে 'আল্লার শাস্তি' বলে চাপ তৈরি করতে পারে। এই মানসিক দুর্বলতা একটা রূঢ় বাস্তব। তখন তাকে দিয়ে মোল্লাবাদী জামাতিরা যা খুশি করিয়ে নিতে পারে। তাই কাউকে শুধু 'এক্স-মুসলিম' পরিচয়ের কারণে বিশ্বাস করা বোকামি হবে। বিশ্বাস গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময়ের আচরণ দিয়ে, পরিচয় দিয়ে নয়। সেইজন্যই আমার প্রশ্ন, এই রহিম সাহেবকে কি বিশ্বাস করা যায়? এই লোকটার ভরসায় কতটা ঝুঁকি আমরা নিতে পারি?''

''আমার ওপর বিশ্বাস রাখো,'' শান্ত স্বরে বলল মায়া, ''আমি অনেকদিন ধরে রহিম চৌধুরীর ওপর নজর রেখেছি। লোকটা সাচ্চা, বিশ্বাসী। লোকটার সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারি।''

''সে না হয় হলো,'' বলল থুরা, ''এই রহিম সাহেবকে আমারও সাচ্চা মনে হলো। কিন্তু আমি দেখেছি, এক্স-মুসলিমদের অনেকেই একটা রোম্যান্টিক ধারণার বশবর্তী হয়ে এক্স-মুসলিম হয়, তার পেছনে দীর্ঘদিনের মনন ও অভিজ্ঞতা থাকে না। এদের অনেকেই সব ধর্মকে অবজ্ঞা করে। হিন্দু, বৌদ্ধ — কাউকেই সম্মান করে না। এরা বলে সব ধর্মই কুসংস্কার, শুধু নাস্তিকতাই মুক্তি। এক্স-মুসলিমদের লড়াই তো মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের জন্য। এরা শুরুই করে যেকোনো আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে। এরা এক্স-মুসলিম হলেও অন্য সব ধর্মকে এরা ইসলামের দৃষ্টি দিয়েই দেখে। তাদের মধ্যে এরকম হামেশাই বলতে শোনা যায়, হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম হলো সবচেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মমত, ইসলাম তার থেকে ভালো, তবে নাস্তিকতা তার চেয়েও ভালো। আমরা আমাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আমাদের সভ্যতার অংশ মনে করি, এই অশ্রদ্ধা আমরা কীভাবে মেনে নেব? উদ্দেশ্যর এই বিরাট অমিল বড়ো ধরনের অবিশ্বাস তৈরি করেছে। ওদের সঙ্গে আমাদের আদর্শগত মিল কোথায়? একসঙ্গে কাজ করার জন্য ন্যূনতম কিছু অ্যালাইনমেন্ট তো চাই।''

''রাজনীতিতে সব জোট আদর্শগত মিল থেকে হয় না,'' বুঝিয়ে বলল মায়া, ''অনেক সময় নির্দিষ্ট বিপদের বিরুদ্ধে সীমিত সহযোগিতা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়ন একসঙ্গে লড়েছিল, নেতাজী দেশের স্বাধীনতার জন্য জার্মানির সাহায্য চেয়েছিলেন। শত্রুর শত্রু মিত্র।''

''মানে তুমি বলছো,'' বলল থুরা, ''স্থায়ী বন্ধুত্ব নয়, শুধুমাত্র কৌশলগত সহযোগিতা?''

''ঠিক তাই,'' নতুন উৎসাহে বলে উঠল মায়া, ''এক্স-মুসলিমরা ইসলামিক মোল্লবাদের বিরুদ্ধে। হিন্দু, বৌদ্ধ —এরকম অনেক গোষ্ঠীই ইসলামিক মোল্লাবাদের বিরোধী। তাই নির্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত সহযোগিতা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। তবে শর্ত আছে—অন্ধ বিশ্বাস নয়, পারস্পরিক সীমারেখা পরিষ্কার রাখতে হবে। কেউ যেন নিজের মতবাদ অন্যের ওপর চাপিয়ে না দেয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, জোটটা যেন শত্রুর প্রতি ঘৃণার ওপর না দাঁড়ায়, বরং স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারের ওপর দাঁড়ায়। এক্স-মুসলিমরা ইসলামি সংস্কৃতি ও মজহবি কিতাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে। মোল্লাবাদের তাত্ত্বিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে। অনেক এক্স-মুসলিম তাদের পরিবার, সমাজ এমনকী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে মজহব ত্যাগ করে। তাদের এই সাহসী অবস্থান প্রমাণ করে যে তারা মোল্লাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তরিক। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, জামাতিরাও ঠিক করে জানে না যে কে বিশ্বাসী মুসলিম আর কে এক্স-মুসলিম। ওদের এই অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ওদের হাঁড়ির খবর আমি নিয়মিত পাই।''

''তাহলে শেষ কথা কী?'' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল মাতঙ্গী।

''শেষ কথা হলো,'' শান্তস্বরে বলল মায়া, ''মানুষকে শুধু তার অতীত পরিচয় দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। এক্স-মুসলিমদের মধ্যে কেউ আন্তরিক, কেউ সুযোগসন্ধানী, কেউ বিভ্রান্ত —যেমন সব গোষ্ঠীতেই থাকে। কাজেই প্রশ্নটা 'ওরা কারা' নয়, প্রশ্নটা ওরা কী করছে, কেন করছে, আর সংকটের সময় কোথায় দাঁড়াচ্ছে, সেটা।''

''আমার হাতে আজ আর বেশি সময় নেই,'' বলল মাতঙ্গী, ''কিন্তু একটা গল্প যদি তোমাদের আজ না শোনাই তাহলে আর কখনো সুযোগ নাও হতে পারে। শুনবে?'

''নিশ্চয়ই,'' শিশুর মতো উৎসাহিত হয়ে উঠল মায়া, ''গল্প শুনতে আমি সবসময় একপায়ে খাড়া।''

''তাহলে শোনো,'' বলল মাতঙ্গী, ''হিন্দু পুরাণে বর্ণিত রক্তবীজ ছিল এক অসুর। সে এমন বর পেয়েছিল যে তার শরীর থেকে মাটিতে যত ফোঁটা রক্ত পড়বে, প্রতিটি ফোঁটা থেকে এক-একটি রক্তবীজ জন্ম নেবে। তাই মা দুর্গা তাকে যত আঘাত করেন, রক্তবীজের সংখ্যা ততই বেড়ে যায়। ফলে রক্তবীজকে পরাজিত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তখন মা কালী আবির্ভূত হলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এমনভাবে রক্তবীজকে আঘাত করতে লাগলেন, যে তার রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই মা কালী তা পান করে নিতেন। ফলে নতুন রক্তবীজ আর জন্মাতে পারল না। শেষপর্যন্ত রক্তবীজের বিনাশ হলো।

এখানে 'রক্ত' আসলে আত্মপরিচয়ের রূপক। এ 'রক্ত' শারীরিক রক্ত নয়, এটা মানুষের গভীর পরিচয়বোধ — অহং বা 'আমি কে' এই ধারণা। রক্তবীজ শুধু এক অসুর নয়, সে মানুষের সেই প্রবণতা, যেখানে আহত পরিচয় নিজেকে বারবার পুনর্জন্ম দিতে থাকে। মা কালী এখানে 'কাল' বা সময়ের কসমিক শক্তি। তিনি এমন এক শক্তি, যিনি পরিচয়ের এই উন্মত্ত পুনরুৎপাদনকে পান করে সময়ের গহ্বরে হজম করে ফেলেন।

মা কালী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই বুঝে ফেলেছিলেন, রক্তবীজরা মনে করে ওরা বিশিষ্ট, ওরা অন্যদের থেকে আলাদা। বিশিষ্টতার এই বোধটাই হলো রক্তবীজের প্রাণশক্তি। ওরা যে আলাদা, এই বিশ্বাসটাকে ওদের মন থেকে অপসারিত করতে হবে। তাহলেই রক্তবীজের ফিরে ফিরে আসা বন্ধ হবে।

রক্তবীজ আসলে এমন এক মানসিক বা সামাজিক শক্তির রূপক, যাকে সরাসরি দমন করতে গেলে সে আরও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন কোনো গোঁড়া পরিচয়কে কেবল বলপ্রয়োগে দমন করলে তা আরও বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে। অপমান, প্রতিশোধ বা শহিদবোধ নতুন নতুন 'রক্তবীজ' তৈরি করে। একটিকে হত্যা করলে তার রক্ত থেকে আরও একটি জন্ম নেয় ; অর্থাৎ, পরিচয়ের ক্ষত থেকে নতুন উগ্র পরিচয় তৈরি হয়। এখানে মা কালীর রক্ত পান করার অর্থ — পরিচয়ের উৎসকে মুছে ফেলা, অহং ও বিভেদের শক্তিকে মাটিতে শিকড় গাড়তে না দেওয়া। অথবা এমন এক চেতনা তৈরি করা, যা সমুদ্রস্রোতের মতো এসে বিভেদকামী পরিচয়কে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই অহিতকামী পরিচয়ের বিস্তারকে নিজের ভেতরে ধারণ করে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যেমনটি শ্রীচৈতন্যদেব করেছিলেন। কথায় বলে, 'ভয়ে বা ভক্তিতে'। শ্রীচৈতন্যদেব যে কাজটা ভক্তি দিয়ে করেছিলেন, সেই কাজটাই সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রাণপুরুষরা ভয়কে ব্যবহার করে সম্ভব করেছিলেন। যার কাহিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে আছে। এখন প্রশ্ন হলো, মা কালী এই দুই পন্থার কোনটা ব্যবহার করেছিলেন? কী জানি, হয়তো দুটোই।"

''কিন্তু,'' ভুরু কুঁচকে বলে থুরা, ''এই নলেজটা আমরা এখন কীভাবে কাজে লাগাবো? আমাদের কি আরেকজন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে?"

মাথার ওপরে ঝুলে থাকা ভাঙা ঝাড়লণ্ঠনটা বাতাস ছাড়াই হঠাৎ দুলে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে ভেসে এল একটা বুনো শেয়ালের ডাক — লম্বা, কাঁপা, মানুষের আর্তনাদের মতো। শব্দটা শুনে মনে হলো, পুরো ফিরিঙ্গিবাজার যেন এক মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। বাইরে কুকুরের ডাক থেমে গেছে, এমনকী বাতাসও যেন গলির ভেতর চলাচল বন্ধ করেছে। যেন আওয়াজটা শুনেই ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল মাতঙ্গী। বলল, ''রাত বাড়ছে, আমি চললাম। তোমরা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারো, আমার আর সময় নেই। আগামী মাসখানেক আমাকে দেখতে পাবে না। আই উইল হ্যাভ কমপ্লিট রেডিয়ো সাইলেন্স। চিন্তা করো না, আমি ঠিক সময়ে ফিরে আসবো।"



পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, যেখানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভারতের সীমান্ত নেমে গেছে ঘন অরণ্যের ভেতর, সেখানে রাত খুব দ্রুত নামে। সন্ধ্যার পর পাহাড়ি পথগুলো যেন পৃথিবীর মানচিত্র থেকেই মুছে যায়। বাঁশঝাড়ের ফাঁকে বাতাস সাঁই সাঁই শব্দ তোলে, দূরে কোথাও বুনো শেয়ালের ডাক ভেসে আসে, আর মাঝে মাঝে সীমান্তের ওপার থেকে অস্পষ্ট গুলির আওয়াজ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

এই অঞ্চলেই গত কয়েক মাস ধরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে এক উগ্র জামাতি জেহাদি । নাম তার মাওলানা কাশেম। একসময় মাদ্রাসার শিক্ষক ছিল। হজ করতে গিয়ে আফগান যুদ্ধফেরত কয়েকজন জেহাদির সংস্পর্শে এসেছিল, তখন থেকেই জেহাদি হওয়ার ভূত মাথায় চেপেছে। দেশে ফিরে দল পাকিয়েছে। পাহাড়ি বৌদ্ধ গ্রাম, চাকমা ও মারমা পরিবার, এমনকী স্থানীয় সুফি মুসলমানদের ওপরও হামলা চালাতে শুরু করেছে। রাতের অন্ধকারে মানুষ উধাও হয়ে যায়, পাহাড়ি মন্দিরে আগুন লাগে, আর গুজব ছড়িয়ে পড়ে — মাওলানার নাকি পোষা জ্বিন আছে, যারা জামাতিদের হয়ে কাজ করছে। ক্ষমতার ওপরতলার সঙ্গে প্রচুর যোগাযোগ আছে মাওলানা কাশেমের। পুলিশের লোকেরাও মাওলানার কথা শুনে চলে, বিভিন্ন বিষয়ে তার পরামর্শ নেয়।

এর পাশাপাশি আরেকটি গুজব আরও নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছিল। লোকেরা বলতে শুরু করেছে, পাহাড়ের গভীরে এক নারী বাস করে, যে মৃতদের ভাষা বোঝে। তার নাম মাতঙ্গী। বহুবার মাওলানা কাশেমের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এই নারী, প্রায় অলৌকিকভাবে।

সীমান্তঘেঁষা এক পরিত্যক্ত ব্রিটিশ বাংকারে বসে মাওলানা কাশেম তার অনুসারীদের নিয়ে পরিকল্পনা করছিল।

''এই পাহাড় শিরকের আস্তানা হয়ে গেছে,'' কাশেম বলছিল, ''বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, মাজারপূজারি —সবাইকে শেষ করতে হবে। সবচেয়ে আগে শেষ করতে হবে রাঙাপানির ওই কাফেরগুলোকে। নাফেজগুলা আমার চোখে চোখ রেখে কথা কয়, মালাউন হাইনরে এদ্দুর সাহস দেয় কনে?"

মাওলানার ডানহাত রশিদ নীচু গলায় বলল, ''হুজুর, এখন কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকাই ভালো। লোকে বলছে, এই জঙ্গলে নাকি এক ডাইনি এসেছে। সে জামাতি দেখলেই ঘাড় মটকে

রক্ত খায়। রাঙাপানির পথে যে শ্মশানটা পড়ে, সেখানেই নাকি মেয়েটাকে দেখা গেছে। আমি বলি কী, জিম্মি রাঙাপানি গ্রামটা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। গনিমতের মাল, পরেও লুঠ করা যাবে। এহন আর মারামারির ভিতরে ন গালানই গম ....”

কাশেমের চোখ জ্বলে উঠল, ‘‘ডাইনি না, ওটা ভারতের চর। আঁগিন বছর আগে ওটার নাম পুলিশের ফাইলে দেখেছিলাম। ও যদি সত্যিই ফিরে এসে থাকে, তাহলে আজই ওর শেষরাত। রাঙাপানি যাওয়ার পথে শ্মশানেই হুনু কাম্মান আগে সারি লই। আগে গনিমতের মাল হিসেবে ভোগ করব, তারপরে তোদের দিয়ে দেব। মেরে ফেলার আগে তরা যা খুশি কইরস মাগিটার সাথে।”

কাশেম জানত না, বাংকারের ঠিক ওপরে পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে তখন কেউ ওদের কথা শুনছে।

মাতঙ্গী।

চাঁদের আলোয় মুখটা অদ্ভুত ফ্যাকাশে লাগছিল। কপালে লাল সিঁদুরের প্রলেপ, গলায় রুদ্রাক্ষ আর মুণ্ডুমালা। ছোট্ট ছোট্ট আঙুলের কড়ের সাইজের খুলি দিয়ে তৈরি মালা —সাপের খুলি, পাখির খুলি, কুকুরের ভ্রূণের খুলি। মাঝে মানুষের আঙুলের হাড়। ভয়হীন চোখে এক শীতল হিসেবি দৃষ্টি, যেন এখনও গুপ্তচরবৃত্তির দিনগুলো ভুলে যায়নি। আস্তে করে মাটিতে হাত রাখল মাতঙ্গী, চোখ বন্ধ করল। মুহূর্তে চারপাশের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

‘‘ওরা আসছে, তোরা তৈরি থাকিস! আজ তোদের ঋণ শোধের রাত।” ফিসফিস করে বলল মাতঙ্গী। ওর পিছনে ছায়ার মতো কিছু অবয়ব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। অর্ধস্বচ্ছ, কুয়াশার তৈরি মানুষের মতো আকৃতি। কারও শরীরে গুলির ক্ষত, কারও গলা কাটা।



নিঝুম রাতের অন্ধকারে মাতঙ্গী যখন শ্মশানের এক কোণে আসন পাতলো, চাঁদ তখনও ওঠেনি। চারদিক পাহাড়ের কালো অবয়ব। বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে পোড়া কাঠ আর পুরনো ছাইয়ের গন্ধ। কয়েকটা অর্ধদগ্ধ চিতার কাঠ এখনো নিভু নিভু জ্বলছে — লালচে আগুন মাঝে মাঝে হঠাৎ ফুস করে জ্বলে উঠছে, যেন অন্ধকারের বুক থেকে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে।

চারপাশে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতারও শব্দ আছে। দূরে পাহাড়ি ঝরনার ক্ষীণ কলকল, বাঁশঝাড়ে বাতাসের সরসর আওয়াজ, কোথাও অদৃশ্য কোনো রাতচরা পাখির কর্কশ ডাক। মাঝে মাঝে মনে হয়, কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল শুকনো পাতার উপর, কিন্তু তাকালে দেখা যায় কিছুই নেই।

শ্মশানের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বেঁকে যাওয়া শেওলাধরা বটগাছ। তাদের ঝুলে থাকা অগণিত শিকড় বাতাসে দুলছে, যেন অন্ধকারে কেউ ধীরে ধীরে হাত নাড়ছে। লোকমুখে শোনা যায়, রাত গভীর হলে ওই গাছগুলোর নীচে নাকি প্রেতেরা ভিড় জমায়। তারা নাকি গাছের চারপাশে বসে নিজেদের অপূর্ণ জীবনের কথা ফিসফিস করে বলে। পাহাড়ি কুয়াশার ভেতর দিয়ে সাদা ছায়ার মতো কিছু চলাফেরা করতে দেখা যায়—মানুষের মতো, অথচ মানুষ নয়।

হঠাৎ এক ঝাপটা ঠাণ্ডা বাতাস এল। চিতার ছাই উড়ে উঠে বাতাসে পাক খেল। বোঝা যায় না, সেটা বাতাসের খামখেয়ালিপনা, নাকি সত্যিই কোনো অদৃশ্য উপস্থিতি শ্মশানের অন্ধকারে জেগে উঠেছে। সদ্য জোগাড় করা জয়ন্তী গাছের শিকড় নিজের কবজিতে জড়িয়ে দেহবন্ধন করল মাতঙ্গী। গত রাতে মেরে ফেলা জামাতিটার মৃতদেহ আগে থেকেই নদীর জল ও পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করিয়ে কলাপাতায় মুড়ে রাখা ছিল। লাল সুতো দিয়ে হাত-পা বাঁধা, মুখ বন্ধ করা পোড়া মাছ দিয়ে। যত্ন করে তার চুল আঁচড়ে দেহে চন্দন লেপে দিল মাতঙ্গী। কপালে ও বাহুমূলে দিল চিতাভস্মের ছাই। সামনে ধুনির আগুন জ্বলছে, তার নীলচে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। আগুনে বেশ কিছুটা সাদা সর্ষে ঢেলে দিল, তারপর মৃতদেহকে প্রণাম করে শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে সাধনার অনুমতি নিল। অঙ্গন্যাস ও মন্ত্রের মাধ্যমে মৃতদেহকে পবিত্র আসনে রূপান্তরিত করল। শেষে মৃতদেহের বুকের ওপর পদ্মাসনে বসল।

চোখ বুজে কুকুরের মতো দ্রুতলয়ে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল মাতঙ্গী। শিরায় শিরায় জেগে উঠল আদিম শক্তির পাশবিক নিষ্ঠুরতা। শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠল, মনের মধ্যে উন্মাদ উদ্দীপনা। চারপাশের পৃথিবী হঠাৎ খুব দ্রুত চলতে শুরু করল। মনের মধ্যে অবদমিত সব আবেগ একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে বের হয়ে এল। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। মনে হলো ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, অতীত বলেও কিছু নেই। আছে শুধু এই মুহূর্তটি। মাংসপেশিতে তীব্র শক্তি, শিরায় শিরায় হিংস্র ক্ষিপ্রতা।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসের গতি কমতে শুরু করল, দীর্ঘায়িত হতে লাগলো, পাখির মতো দীর্ঘ ও ধীর নিঃশ্বাস। শরীর পালকের মতো হালকা, মনটা আকাশের মতো মুক্ত লাগতে শুরু করল। মনে হলো ও মাটির টান ছেড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ধুলোবালি আর ওকে স্পর্শ করতে পারছে না। চারপাশের জগৎটা খুব স্পষ্ট ও উজ্জ্বল মনে হতে লাগল। সব অবসাদ কেটে নতুন শক্তির সঞ্চার হলো। বাস্তবতা এখন আর কোনো খাঁচা নয়, ডানা মেলার এক বিশাল আকাশ। পৃথিবীটা একটা স্থির ক্যানভাস। অনেক বড়ো, সীমানাহীন। চারপাশের অবযবগুলো ধীরগতির লক্ষ্যবস্তু। প্রতিটা পিঁপড়ের চলাফেরা, প্রতিটা রাতচরা পাখির নড়াচড়া মাতঙ্গীর পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দিতে লাগল।

সেখান থেকে আরও ধীরে আরও দীর্ঘ নিঃশ্বাস — সাপের মতো। বাতাস বরফের মতো শীতল হয়ে এল। জঙ্গলের কোলাহল

আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। শুধু নিজের শ্বাসের 'হিস্' শব্দ স্পষ্ট, আর সবকিছু মুছে গেল। মনে হলো, পৃথিবীর আবর্তন-পরিক্রমণের গতি ধীর হয়ে যাচ্ছে। সময়ও বুঝি ধীর হতে হতে একসময় থমকে গেল। মনের ভেতর থেকে সব চিন্তা দূর হয়ে রয়ে গেল এক গভীর শূন্যতা। শরীর সম্পূর্ণ শিথিল। বুকের ভেতর হিমশীতল নীরবতা। মাতঙ্গীর মনে হলো, চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে ও মিশে গেছে। বোঝার উপায় নেই, ও জীবিত না মৃত।

সেখান থেকে আবার পাখি, তারপর কুকুর। ক্রমাগত এই চক্র চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর চোখ মেললো মাতঙ্গী। পকেট থেকে বের করল সিঁদুর মাখানো আয়নার টুকরো, জড়িবুটি আর ভস্ম, আগুনে নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসের গন্ধ বদলে গেল — এক তীব্র, কটু অথচ নেশা ধরানো সুগন্ধে ভরে উঠল চারপাশ। একরাশ ধুতরো ফুল সংগ্রহ করে পাশে রাখা ছিল। আর ছিল সাপের চর্বি থেকে তৈরি তেল, কাকের বাসার সরু কঞ্চি। উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটা করে ধুতরো ফুল, তার সঙ্গে সাপের তেলে ডুবিয়ে কাকের বাসার কঞ্চি আগুনে উৎসর্গ করতে লাগলো মাতঙ্গী।



পূর্ণিমার চাঁদ মাথার ওপর উঠলে কাশেম তার পঞ্চাশজন সশস্ত্র অনুগামী নিয়ে রাঙাপানি গ্রামের দিকে অগ্রসর হলো, হাতে চীনা রাইফেল। পাহাড়ি পথের মাঝখানে পৌঁছতেই অদ্ভুত কিছু ঘটনা শুরু হলো। প্রথমেই রশিদ খুঁতখুঁত করে উঠল, ''হুজুর, বাতাসত আতপ চাউলের গন্ধ আইল ক্যান গরি?'' এক ধমকে রশিদকে চুপ করিয়ে দিল কাশেম। আর প্রায় একশো পা চলার পরেই ওয়্যারলেস সেটগুলো বিকট শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। ধুতরো ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। রশিদ কাঁপা গলায় বলল কাশেমকে, ''হুজুর...ইঁন্ডে বেশি শীদ লাগের ....ডর লাগের ....''

কাশেম উত্তর দেওয়ার আগেই সামনের জঙ্গলে একটি শিশুর হাসি শোনা গেল।

খিলখিল।

তারপর আরেকটি।

তারপর শত শত।

জঙ্গলের অন্ধকারে হঠাৎ অসংখ্য ছোটো ছোটো চোখ জ্বলে উঠল।

জামাতিরা ভয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল, ''ওই দেখ! গাছে মানুষ ঝুলছে!''

টর্চের আলো ফেলে সবাই তাকিয়ে দেখল, গাছের ডাল থেকে ঝুলছে কয়েকটা পচাগলা মৃতদেহ। তাদের চোখ খোলা। আর সেই চোখগুলো একসঙ্গে তাকিয়ে আছে কাশেমের দিকে।

কাশেম বন্দুক তুলতেই ওর পিছনের তিনজন হঠাৎ মাটিতে উলটে পড়ে ছটফট করতে লাগল, গলা আঁচড়াতে লাগলো, যেন অদৃশ্য কেউ ওদের গলা টিপে ধরেছে।

''ওরে আল্লা রে ....'' আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল কাশেমের মুখ। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আয়াতুল কুরসি পড়তে আরম্ভ করল, ''... ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম....''

হঠাৎ কাশেমের মনে হলো, পায়ের তলার মাটিটা যেন জলার পাঁকের মতো নরম হয়ে যাচ্ছে। অনুচরদের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠল। ওরা কেউ আর সেখানে নেই। ওদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওদের কঙ্কালসার প্রেতদেহ, জোড়া জোড়া চোখ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত।

'ক্বুল আউযু বিরাব্বিন নাস....' গলার সব জোর দিয়ে চেঁচিয়ে দোয়া পড়ার চেষ্টা চালিয়ে গেল কাশেম, কিন্তু নিজের গলার স্বর ও নিজেই শুনতে পেল না। ঠিক তখনই কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মাতঙ্গী। ধীরগতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল কাশেমের দিকে। পায়ের নীচে শুকনো পাতা নয়, রাশি রাশি কালো ছাই উড়ছে।

''তুই?'' কাশেম ফিসফিস করল। মাতঙ্গী অট্টহাসি হেসে উঠল। কাশেম দেখল, শ্মশানের প্রতিটি গাছ এক-একটি অতিকায় সাপে রূপান্তরিত হয়ে ওকে গিলে খেতে আসছে। আগুনের ফুলকির মতো হাজার হাজার জ্বলন্ত পতঙ্গ গায়ে কামড় বসাচ্ছে। যেদিকেই তাকাচ্ছে, দেখছে মাতঙ্গীর শতশত প্রতিচ্ছবি ওকে ঘিরে অট্টহাসি হাসছে। কাশেমের চারপাশে তখন মৃতদের ফিসফিসানি।

''আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে...''

''আমার মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গেলি...''

''আগুনে কেন পোড়ালি...''

''আমাদের রক্তের হিসাব দে....''

কাশেম দেখল, চারপাশে চেনা মুখের জঙ্গল। আজ অব্দি যেসব মালাউনদের ও খুন করেছিল, তারা সবাই এগিয়ে আসছে। পোড়া মুখ, রক্তাক্ত চোখ, ছিন্ন অঙ্গ। দেখল, ওর সাগরেদ রশিদ ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। হাতের বন্দুকটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শূন্যচোখে মরা মাছের দৃষ্টি। ডুকরে কেঁদে উঠল কাশেম, ''রশিদ, চল, ফুডাই যাই!''

উত্তরে মুখটা হাঁ করল রশিদ। মুখগহ্বর থেকে একরাশ মাকড়শা কিলবিল করে বেরিয়ে এল।

প্রাণভয়ে দৌড়তে শুরু করল কাশেম। কিন্তু যতই দৌড়য়, দেখে যে ও বারবার একই জায়গায় ফিরে আসছে, সেই পুরনো শ্মশানের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে মাতঙ্গী শেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করল।

চারপাশের মৃত আত্মাগুলো ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরতে লাগল। জামাতিদের কেউ দেখল আকাশ ভেঙে পড়ছে, কেউ দেখল মাটি

ফুঁড়ে বেরোচ্ছে প্রেতাত্মাদের কঙ্কাল হাত। মানসিক ভারসাম্য ভেঙে পড়তে লাগল। কেউ নিজের সঙ্গীকেই গুলি করল, কেউ-বা পাহাড়ের খাদে ঝাঁপ দিল। হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল কাশেম।

''আমাকে বাঁচাও ... দয়া করো ... ''

''তোর দলবল যখন ফুলের মতো ছোট্ট শিশুদের আগুনে ফেলে দিচ্ছিল,'' ঠাণ্ডা গলায় বলল মাতঙ্গী, ওর চোখে বিন্দুমাত্র করুণা নেই, ''তখন কি তুই তাদের বাঁচিয়েছিলি? দয়া করেছিলি?''

পাহাড় কাঁপিয়ে এক বিকট আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর সব শান্ত।

পরদিন সকালে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পাহাড়ি পথে শুধু পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র আর আতঙ্কিত কয়েকজন বেঁচে থাকা জামাতিকে খুঁজে পেল। সবাই বদ্ধ উন্মাদ, উলঙ্গ। কেউ আয়াতুল কুরসী বিড়বিড় করছিল, কেউ-বা নিজের চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল। মাওলানা কাশেমের কিন্তু কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। না জীবিত, না তার মৃতদেহ। মাতঙ্গী ততক্ষণে অনেক দূরে, পাহাড়ের কুয়াশা ভেদ করে সীমান্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।



বুনো বাঁশঝাড়ের ঘন অন্ধকার বুক চিরে তরতরিয়ে এগিয়ে চলল মাতঙ্গী। চারদিকের লতাবাঁশের ধারালো পাতাগুলো হাত-পায়ে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে, সেদিকে ওর বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বনের আরও গভীরে, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে ভয় পায়, সেখানে প্রাচীন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে শতবর্ষী এক বুড়ো বৈলাম গাছ। আকাশছোঁয়া সেই দৈত্যাকার গাছের গোড়ার দিকে মাটির ওপর দেওয়ালের মতো ছড়িয়ে আছে বিশালাকার তক্তার মতো শিকড়, যা প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি করেছে এক অন্ধকার গোপন কুঠুরি। আর তাকে আরও নিশ্ছিদ্রভাবে আড়াল করে রেখেছে চারপাশের বুনো বাঁশের ঘন জঙ্গল।

মাতঙ্গী ক্ষিপ্র হাতে ওপরের ডালপালা আর লতাগুল্ম সরিয়ে ফেলল। বৈলাম গাছের সেই কোটরে, শুকনো পাতা আর জংলি লতার চাদরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জলপাই-সবুজ রঙের ইস্পাতের তৈরি দানব, একটা ভারী মিলিটারি মোটরবাইক। বাইকটার গায়ে জমে থাকা ধুলো আর শুকনো পাতা যত্ন করে ঝেড়ে ফেলে সেটার ওপর চড়ে বসল মাতঙ্গী। ভারী বুট দিয়ে কিকস্টার্টারে সজোরে লাথি মারল। একবার, দুবার, তৃতীয়বারে গর্জে উঠল বাইকের শক্তিশালী ইঞ্জিন। সেই গম্ভীর, গুরুগুরু আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল নিস্তব্ধ বাঁশঝাড়। ডালপালা থেকে হুড়মুড় করে উড়ে গেল একঝাঁক বাদুড়।

গিয়ার বদলে অ্যাক্সিলারেটরে মোচড় দিল মাতঙ্গী। হেডলাইটের তীব্র হলুদ আলো বনের জমাটবাঁধা অন্ধকারকে ফালাফালা করে দিল। শক্তিশালী চওড়া টায়ার দুটো মাটি কামড়ে শুকনো বাঁশ আর ডালপালা দুমড়ে-মুচড়ে সামনে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা, অসমতল জংলি পথ ধরে ঝড়ের গতিতে ছুটল সে। ইঞ্জিনের গর্জন আর পেছনের চাকা থেকে ছিটকে ওঠা শুকনো ধুলোয় পাহাড়ি জঙ্গলকে আচ্ছন্ন করে মুহূর্তের মধ্যে বনের সবুজ গোলকধাঁধায় উধাও হয়ে গেল মাতঙ্গী।



(নাগাল্যান্ড, ভারত)

''শোন বাছা, তোকে বলি। চাঁদ যখন এই নদীর ঠিক ওপরে দেখা দেয়, ঠিক তখন ঘটনাটা ঘটে। গোল নিটোল পূর্ণিমার চাঁদ, একটুও জলের নীচে নেই, কিন্তু জলকে ছুঁয়ে আছে, সেই মুহূর্তে দিগন্তজুড়ে একশো ঢাক বেজে ওঠে। রাতের বাতাসে ভর করে রাতফুলের সুবাসের সঙ্গে সেই ঢাকের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে এই পূরবী পাহাড়ে। তুই জানিস, কে সেই ঢাক বাজায়? দোয়াং নদীর এই ভূতজুঁয়া দ্বীপ। যে তার অতীতকে এখনো ভোলেনি।''

দোয়াং নদীর শান্ত জলরাশির মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপটা যেন রূপকথার এক মায়াবী ভূখণ্ড। মাথার ওপর ভাঙা চাঁদ উঠেছে, গোটা দ্বীপ রুপালি চাদরে ঢাকা পড়েছে। নাগাল্যান্ডের উঁচু পাহাড়গুলোর ছায়া নদীর স্বচ্ছ আয়নার মতো জলে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, দ্বীপটা আর স্থির নেই। এটা যেন এক ভাসমান স্বপ্নতরী, নদীর মিষ্টি জল কেটে উজানে এগিয়ে চলেছে।

''লোকে বলে,'' আবার বলে উঠল বুড়ো, ''সাতচল্লিশ সালে নাকি দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কী জানি, আমাদের জন্য তো হলো উলটো। এদিকে ভারত, অন্যদিকে বার্মা, আমাদের এক জনগোষ্ঠী দুই স্বাধীন দেশের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে রয়ে গেল। শুধু কি তাই? বাঙ্গালিদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে —পেত্নির হাতে পুত্ সমর্পণ। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য সেই ব্যবস্থাই করলেন, যাতে এই পূর্বী পাহাড়গুলো খ্রিস্টান মিশনারিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে। কেন? তাহলেই তো আমরা আমাদের অতীতকে ভুলে যাবো। আমাদের দাও আর বর্শা ফেলে দিয়ে ওদের গিটার আর ভিক্ষাপাত্র ধরব, খুশিমনে দাসত্ব স্বীকার করব।

তারপর যেন এক অভিশাপ নেমে এল আমাদের ওপর। আমাদের সভ্য করার নাম করে ধরেবেঁধে ইংরেজি শেখানো হল। বিদেশি গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে চাপা পড়ে গেল আমাদের জনজাতি ঢাকের আওয়াজ। আমাদের যুব প্রজন্ম 'যেযু যেযু' করে উন্মত্তের

মতো লাফালাফি করে রাতভর, চোখধাঁধানো আলো আর কানফাটানো বাজনার সঙ্গে। চাঁদনি রাতে এই জলজঙ্গল যে কত কথা বলে আমাদেরকে, সে তারা শুনবে কী করে? মিশনারিরা আসার আগে কেমন ছিলাম আমরা, সে কথা সবাই ভুলে গেল, ভুলল না শুধু এই ভূতজুঁয়া দ্বীপ। এই দ্বীপের শিকড় ছড়িয়ে আছে দোয়াং নদীর গভীরে। এ দ্বীপের নিঃশ্বাসের তালে জোয়ার-ভাঁটা হয় নদীর জলে।

সাদা পাদরিরা আসার আগে এই নাগা পাহাড়ের মানুষরা প্রকৃতির কোলে আরামে ঘুমোতো। চাঁদনি রাতে মাছ ধরত, তারার আলোয় চাষের খেতে বীজ ছড়াতো, গান গেয়ে এই নদীর দেবীকে, আকাশের দেবতাকে, এই পাহাড় এই জঙ্গল —প্রকৃতির শক্তিদের প্রতি তাদের অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। সবার ওপরে আকাশজুড়ে ভেসে বেড়াতেন জন্মদাত্রী উকে-পেনু-ও-পফু। সৃষ্টির আদিতে তিনিই তো শুধু ছিলেন। পঞ্চভূত দিয়ে তিনিই তো গড়েছেন এই সবকিছু। আমরা তাঁরই সন্তান। আলাদা করে গির্জা গড়তে হতো না আমাদের, প্রকৃতির কোল ছিল আমাদের উপাসনাস্থল।

কিন্তু তারপর এল ওরা। পরনে সাদা আলখাল্লা, মনে জমাট অন্ধকার আর অনন্ত খিদে। হাতে তাদের লোহার ক্রশ আর আগুন বৃষ্টিকারী লোহার নল। ওরা নিয়ে এল এমন এক দেবতাকে, যে নিজেই কোনোদিন এই পাহাড় জঙ্গল নদী দেখেনি। নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে কিছুই দেখার ক্ষমতা ছিল না সেই সাদা লোকেদের। আর সেই সংকীর্ণতাই ওরা চাপিয়ে দিল আমাদের ওপর। ওরা এসে বলল, আমাদের দেবতারা নাকি মিথ্যে। আমাদের পবিত্র স্থানগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল, আমাদের ঢাকগুলো ফাটিয়ে দিল, থামিয়ে দিল আমাদের গান, আমাদের হাজার হাজার বছরের জীবনচর্যা। বাতাস ভারী হলো পোড়া ছাইয়ের গন্ধে, বন্দুকের গর্জনে স্তব্ধ হলো উকে-পেনু-ও-পফু দেবীর স্তবের প্রাচীন মন্ত্রোচ্চারণ।

আমাদের লোকেরা যারা তখনও তাদের প্রাচীন বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বেঁচে ছিল, সমাজে কোণঠাসা হয়ে পিছু হটতে হটতে তারা শেষমেশ এই ভূতজুঁয়া দ্বীপে এসে আশ্রয় নিল। সেখানেও তাদের শান্তিতে বাঁচতে দিল না পাদরিরা। নব্যমতের অনুরাগে অন্ধ নাগাদের সঙ্গে নিয়ে তারা নৌকো করে পার হলো নদী, আগুন ধরিয়ে দিল দ্বীপের জঙ্গলে।

সেটা ছিল এক পূর্ণিমার রাত। সেই রাতে আচমকা চাঁদ ঢেকে গেল মেঘে, আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামলো, নিভিয়ে দিল সব আগুন। মেঘের গর্জনে আমাদের জন্মদাত্রী উকে-পেনু-ও-পফু বললেন, নাগা পাহাড় জুড়ে যা করেছ তা সহ্য করেছি, আর নয়। এই ভূতজুঁয়া দ্বীপে তোমাদের কোনো অধিকার নেই। যে চেতনার জন্ম প্রকৃতির উন্মেষের সঙ্গে, তাকে তোমরা ভোলাবে কীকরে? দোয়াং নদীর ঢেউ যাকে মনে রেখেছে, তোমরা তাকে ভোলাবে কীকরে?

সেই রাতে দোয়াং নদীতে বান ডাকলো, ভাসিয়ে নিয়ে গেল দ্বীপ। জন্মদাত্রী হলেন অদৃশ্য। কেউ বলে, তিনি নদীর জলে বিলীন হয়েছেন। অন্যরা বলে, এই দ্বীপের শিকড় ধরে তিনি ফিরে গেছেন সৃষ্টির আদিমুহূর্তের সেই শূন্যতাতে। কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি জাগিয়ে দিয়ে গেছেন এই দ্বীপের আত্মাকে। বলে গেছেন, যেদিন এই পাহাড়ের শিশুরা তাদের গান ভুলে যাবে, তুমি তখন গান করো, মনে করিয়ে দিও ওদেরকে।

তাই ভূতজুঁয়া দ্বীপ আজও গান গায়।

যে রাতে দোয়াং নদীর বন্যায় সব ভেসে গিয়েছিল, তারপর আরেকটা মাস কেটে গেল। আবার রুপোলি আলোয় আকাশ আলো করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। নাগা পাহাড় চমকে গেল, ভূতজুঁয়া দ্বীপ জুড়ে হাজার হাজার ঢাক বাজছে! কে বাজাচ্ছে ওই ঢাক? ভূতজুঁয়া দ্বীপে তো আর কোনো জীবন্ত মানুষ থাকে না! মানুষ নয়, ও ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে মাটির গভীর থেকে। তার তালে তালে দোয়াং নদীর জল উথাল-পাথাল নেচে উঠল। মনে হলো, যেন আকাশের সব তারা খসে পড়েছে দ্বীপে, জঙ্গলের আনাচেকানাচে অসংখ্য আলো জ্বলে উঠল। দূরে শহরের গির্জার ভেতর আশ্রয় নিল ভয়ার্ত নব্য-ধর্মান্তরিত নাগারা। পাদরি তাদের বলল, ওই ভূতজুঁয়া দ্বীপে কক্ষনো যেও না, ওখানে শয়তানের বাস।"

বুড়ো খংখাই দম নেওয়ার জন্য থামলো। পাথরের মগ থেকে এক ঢোঁক ঝরনার জল খেয়ে ''আহ্'' বলে তৃপ্তির একটা শব্দ করল।

''তারপর কেটে গেল কয়েকটা প্রজন্ম,'' আবার বলতে শুরু করল বুড়ো খংখাই। কপালে গভীর ভাঁজ, চোখদুটো শত বছরের নাগা ইতিহাসের সাক্ষী।

''শহর বেড়ে বেড়ে জঙ্গলের শরীর শুধু নয়, তার আত্মাকেও গ্রাস করে নিল। কিন্তু সে জঙ্গলকে ভুললো না দোয়াং নদীর ঢেউ।

কেথোর নাম তুই নিশ্চয়ই শুনেছিস। ও আঙ্গামী জনজাতির মেয়ে, লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল। চার্চ থেকে বৃত্তি পেয়ে আমেরিকা গিয়েছিল লেখাপড়া শিখতে। খুব ভালো গান গাইতো, গিটার বাজিয়ে। আমেরিকায় ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গানের অনুষ্ঠানে ওর ডাক পড়েছিল, নাগা গান শোনানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও গাইতে উঠেছিল। ওর গান শুনে মুখ ভেটকে ছিল শ্রোতারা। বলেছিল, এসব তো আমাদেরই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নকল, তোমাদের নিজস্ব গান কই? বিরাট ধাক্কা লেগেছিল কেথোর মনে। বুঝেছিল, ওর নিজের গানেই পৃথিবীর কাছে ওর পরিচয়, কিন্তু সে পরিচয়, সে গান তো হারিয়ে গেছে।

লেখাপড়া সেরে ফিরে এসেছিল পাহাড়ে। কাজ করত মিশনারি স্কুলে। কিন্তু মনে মনে আসল নাগা গানের সন্ধান ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একদিন কী খেয়াল হলো ওর, চাকরিতে

ইস্তফা দিয়ে জঙ্গল ডিঙিয়ে নদী পার হয়ে পৌঁছে গেল ভূতজুঁয়া দ্বীপে। একা। শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়ে, জনজাতি গল্পকথায় বিশ্বাস ছিল না ওর। কিন্তু যে রাতে কেথো পৌঁছলো ভূতজুঁয়া দ্বীপে, সে রাতটা ছিল পূর্ণিমা। সে রাতে কেথো নিজের কানে শুনলো। হাজার হাজার ঢাকের বাদ্যিতে কথা কয়ে উঠলো ভূতজুঁয়া দ্বীপের মাটি, হাজার হাজার বছরের নাগা ইতিহাস সেই রাতে কেথোর কাছে সিনেমার দৃশ্যের মতো ধরা দিল।

সেই রাতটা বদলে দিল কেথোর জীবন। তারপর থেকেই কেথো পাগলের মতো উঠেপড়ে লাগলো ভূতজুঁয়া দ্বীপের গান নাগাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। বারবার হামলা হয়েছে ওর ওপর, গুলি লেগেছে গায়ে। কিন্তু জন্মদাত্রী বারবারই বাঁচিয়ে দিয়েছেন ওকে। কেথোর দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফল ফলতে শুরু করেছে এখন। নাগা সভ্যতার পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন জেগে উঠছে, সঙ্গে জেগে উঠছে নাগা জনগোষ্ঠীর আবার একসঙ্গে থাকার ইচ্ছে।"

"কিন্তু নাগা পাহাড় তো আজ আন্তর্জাতিক সীমারেখা দিয়ে বিভক্ত," বলল মাতঙ্গী।

"ঠিক এই কথাই হচ্ছিল আমার নাতি মেহুলের সঙ্গে," বলল খংখাই। "আমরা এখন চাই, মাঝখানের এই কাঁটাতাঁতের বেড়া সরিয়ে ফেলতে।"

"সেটা কীকরে হবে?" প্রশ্ন করল মাতঙ্গী।

"খুব সোজা," বলল খংখাই, "ভারতবর্ষ যতকাল অখণ্ড ছিল, ততকাল নাগা সমাজ বিনা বাধায় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছে। আবার যদি অখণ্ড ভারতবর্ষ হয়, তাহলে আমাদের মধ্যেকার এই কৃত্রিম সীমান্ত মুছে যাবে।"

"হুঁ," বলল মাতঙ্গী, "বুঝলাম"।

"এবার তুই বল," বুড়ো আকুল স্বরে বলল, "ভারত কি তৈরি আছে, আমাদের সাহায্য করার জন্য?"

ভূতজুঁয়া দ্বীপের তীরের পাথরগুলো চাঁদের আলোয় হিরের মতো জ্বলজ্বল করছে। নদীর ছলাৎ ছলাৎ জল হালকা বাতাসে দুলতে দুলতে তীরের বালিতে আছড়ে পড়ছে, তৈরি করছে এক মৃদু ছন্দময় শব্দ, নির্জন রাতের প্রাণের সঙ্গীত। দ্বীপের বুকে জেগে থাকা দেবদারু আর পাইন গাছগুলোর সরু পাতা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো চুঁইয়ে নীচে পড়ছে, মাটির ওপর তৈরি করছে আলোছায়ার এক জটিল আলপনা। নাগা জনজাতির প্রাণের নিজস্ব আলপনা।

"কাজটা সহজ নয়," বলল মাতঙ্গী, "অনেক বছর লাগবে। কিন্তু আমি আপনাদের যথাযত সাহায্য করতে রাজি। পরিবর্তে আপনাদের একটা সাহায্য আমার চাই।"

দূরে পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে কোনো গ্রামের দু-একটি টিমটিমে আলো দেখা দিল, দেখে মনে হয় আকাশের তারা। এই দ্বীপে কিন্তু কেবলই নিস্তব্ধতার রাজত্ব। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে পাহাড়ের বুনো ফুলের এক হালকা মিষ্টি ঘ্রাণ আর নদীর আর্দ্র সতেজতা। মাঝে মাঝে কোনো রাতচরা পাখির ডানার শব্দ নদীর শান্ত বুক চিরে এক মুহূর্তের জন্য প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার মিলিয়ে যায়।

প্রকৃতির এই অপরূপ অকৃপণ সম্ভারে বুঁদ হয়ে মাতঙ্গী ভাবছিল, কী এক অসম্ভব প্রস্তাব রাখলো বুড়ো খংখাই। কোনো এক শহরের ক্যাফেতে বসে এই প্রস্তাব শুনলে ও হেসেই উড়িয়ে দিত। কিন্তু এই জল-জঙ্গলের মাঝে আজ রাতে কিছুই অসম্ভব মনে হচ্ছে না। আকাশ-পাতাল ভাবছিল মাতঙ্গী, ঠিক এই সময় ওর ফোনটা বেজে উঠল।

ফোনে কথা বলতে বলতে দেখছিল, নদীর স্রোত যখন দ্বীপের দুই পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তখন চাঁদের আলোর প্রতিফলন ঢেউয়ের গায়ে রুপালি সাপের মতো আঁ কিবুকি কাটছে। এই জ্যোৎস্না রাতে পাহাড়ের নিস্তব্ধতা আর দোয়াং নদীর শীতলতা মিলেমিশে দ্বীপটিকে এমন এক জায়গায় পরিণত করেছে, যেখানে সময় নিজেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সবই সম্ভব। অখণ্ড ভারতও সম্ভব।

ভূতজুঁয়া দ্বীপ নাগভূমির অরণ্য-হৃদয়ের এক পলেস্তারা খসা প্রশান্তি। যে তার অতীতকে এখনো ভোলেনি। আজ সে নতুন কিছু চায়।



বৃষ্টি তো নয়, মনে হচ্ছিল যেন আকাশের ওপার থেকে কোনো এক অলৌকিক শক্তি অদৃশ্য সব মারণাস্ত্র ছুঁড়ছে। ডিমা হাসাও'য়ের বুকে এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। শুধু ডিমা হাসাও কেন, সারা পূর্বী পাহাড়েই বৃষ্টি হওয়াটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, বরং মেঘ কেটে গিয়ে কড়া সূর্য উঠলেই লোকে সচকিত হয়ে আকাশের দিকে তাকায়। জলপাই রঙের মডিফাইড মহিন্দ্রা থার গাড়িটার ভেতরকার বাতাস ভেজা ক্যানভাস, সস্তা তামাক আর বন্দুকের তেলের কড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল। মেহুল ওর দা-টা একটু সরিয়ে রাখল, বাঁশের হাতলটা পিতলের জাল দিয়ে মোড়া, ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ কলারবোনে এসে ঠেকছিল। মেহুলের চোখদুটো স্থির ছিল সামনের দুর্গম পথের ওপর। ঠিক পেছনেই, একটা তুবড়ে যাওয়া পুরনো উইলি জিপের ওপর গুটিসুটি মেরে বসেছিল আরও চারজন নাগা যোদ্ধা—ঝোপোলো, কেলেই, থেপফুভোলি এবং ভেখোসা। তুয়েনসাং-এর চেনা সবুজ পাহাড় ছেড়ে তারা বহু দূরে চলে এসেছে, এমন এক অচেনা ভূখণ্ডের দিকে যার সাধারণ মানুষজন জানেই না যে ওরা আসছে।

'ডিফ-লকটা অন কর, ঝোপোলো', গিয়ার বক্সের যান্ত্রিক আওয়াজ ভেদ করে নীচুস্বরে বলল মেহুল', এই খাদে যদি একবার



গাড়ি পিছলে পড়ে, তবে আমাদের পুরো অপারেশনটাই ভেস্তে যাবে। শিকারের আগেই অসমের কাদার গর্তে ডুবে মরলে গাঁওবুড়োর আর প্রেস্টিজ থাকবে না।'

''হাইওয়ে ধরলে এত সমস্যা হতো না,'' বেজার মুখে বলল ঝোপোলো।

''আকাশ থেকে হাইওয়ে দেখা যায়,'' বলল মেহুল, ''তার ওপর পথে চেকপোস্ট আছে। দশখানা গাড়ির কনভয়, রাস্তার অন্য গাড়িগুলো আমাদের দেখে সন্দেহ করতে পারে। খবর বাইরে যায়, এমন কোনো কিছু করলে চলবে না। জঙ্গলের পথ আকাশ থেকে দেখা যায় না, এখানে কোনো লোকজন নেই। এটাই ভালো।''

উত্তরে ঝোপোলো কিছু বলল না। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ওর আঙুলের গাঁটগুলো শক্ত হয়ে সাদা হয়ে আসছিল। নিঃশব্দে ছোটো সেকেন্ডারি গিয়ার লিভারটাকে টেনে ৪-লো মোডে ফেলল। লোহার শিকল জড়ানো চাকাগুলো জাম্পুই পাহাড়ের হাঁটু-সমান চটচটে লাল মাটি কামড়ে গোঙানির মতো শব্দ করে এগিয়ে চলল। একপাশে বাঁশঝাড়ে ঢাকা গভীর পাতাল-খাদ, অন্যপাশে ত্রিপুরার সীমান্ত অরণ্যের শ্বাসরোধকারী অন্ধকার গাছের ছাউনি। তিনটি রাজ্যের সীমান্ত পাহাড়ের চোরাপথ দিয়ে মেহুলের নেতৃত্বে দশখানা গাড়ি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

যাত্রার শেষ দিনের মাঝরাতে পাহাড়ি চড়াই-উতরাই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। ডিমা হাসাও আর জাম্পুইয়ের খাড়া পাথুরে দেওয়ালগুলো হারিয়ে গেল দক্ষিণ ত্রিপুরার তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের জলমগ্ন, স্যাঁতসেঁতে নিচু সমতলে। চারপাশের বাতাস রাতারাতি বদলে গেল। সমুদ্রের লোনা ছোঁয়া আর পচা জলাভূমির গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে দিল ঝোপোলো। কুয়াশা আর মেঘের ফাঁক গলে নেমে আসা ম্লান চাঁদের আলো ভরসা করে পাহাড়ি নদীর কর্দমাক্ত খাত ধরে এগোতে লাগল। দুই পাশের হাতিঘাসগুলো এত লম্বা, যে সেগুলো গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে এসে নখের মতো আঁচড় কাটছিল।

'গাড়ি থামা, ঝোপোলো!' হাত তুলে ইশারা করল মেহুল। হাতিঘাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে থার গাড়িটার ইঞ্জিন অলসভাবে চলতে লাগল, উঁচু এক্সহস্ট পাইপ দিয়ে জলের নীচে ক্রমাগত বুড়বুড়ি কেটে। সামনের ঘন কুয়াশা ফুঁড়ে জঙ্গলটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ঠিক সামনেই শুয়ে আছে এক বিশাল, কালো আয়নার মতো বয়ে চলা জলধারা — ফেনী নদী।

নদীর কালো জলের ওপারে নোয়াখালীর বিস্তৃত সমতলভূমি। কুয়াশার চাদর ভেদ করে দূরের বিএসএফ আউটপোস্ট থেকে সার্চলাইটের তীব্র সাদা আলো কাদার চরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পূর্বপরিকল্পনা মাফিক, সার্চলাইটের আলোটা আকাশের দিকে তাক করে দু'বার কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই আলোর উৎস নদী থেকে সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরে গেল, বনের ভেতরের গভীর খাঁড়িটি ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেল।

ঠিক তখনই ওপার থেকে, পূর্ব খোরাসানের সীমানার ভেতরের নলখাগড়ার বন থেকে একটা সবুজ পেনলাইটের আলো তিনবার ছোটো ছোটো ঝলকানি দিয়ে উঠল।

খোলা জিপের ওপর উঠে দাঁড়াল মেহুল, বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ভেজা হাওয়ার ঝাপটা মুখে এসে লাগল। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল মেহুল। আমাদের সমুদ্র!

গাড়ির মেঝে থেকে একটা জলনিরোধক ভারী বাক্স টেনে তুলল ঝোপোলো, যার ভেতর রয়েছে ভারতীয় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, ডিটোনেটর আর সুরক্ষিত স্যাটেলাইট যোগাযোগের সরঞ্জাম। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির তৈরি, কিন্তু তার গায়ে ছাপ লিথুয়ানিয়ার একটা কোম্পানির।

'থেপফুভোলি, ভেখোসা, পেছনের গাড়িগুলো থেকে বাক্সগুলো নামাও!' নির্দেশ দিল মেহুল, ''জোয়ারের কারণে নদীতে জল বাড়ছে। দেরি করলে চলবে না। আমরা হেঁটেই পার হব।''

জিপের ভারী দরজাগুলো ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গেল। দশ ডজন শিকারি বুটজুতো দেবে গেল নদীর কালো কাদায়। পাহাড়ি

কুয়াশার ভূতের মতো নিঃশব্দে মেহুল আর ওর দলবল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পা বাড়াল ফেনী নদীর সেই অন্ধকার বিতর্কিত জলে, যার কাদায় মিশে আছে নোয়াখালীর দাঙ্গার বলি হাজারো হিন্দুর রক্ত আর অশ্রু।

ফেনী নদীর বুক সমান লোনা জল কেটে ওপারে পা রাখতেই মেহুল অনুভব করল, মাটির চরিত্র বদলে গেছে। নোয়াখালীর এই কর্দমাক্ত চর পাহাড়ের মতো শক্ত নয়, বরং বিশ্বাসঘাতক চোরাবালির মতো পা টেনে ধরে। থেপফুভোলি আর ভেখোসা ভারী অস্ত্রের কাঠের বাক্সগুলো কাঁধে নিয়ে পাড়ের নলখাগড়ার বনে এসে ধড়াম করে সেগুলোকে মাটিতে আছড়ে ফেলল।

''আস্তে, আস্তে,'' বলল মেহুল।

ওপার থেকে সংকেত পাঠানো সবুজ পেনলাইটের মালিক রহিম এগিয়ে এল।

''দেরি হয়ে গেল, ভাই!'' রহিমের গলায় স্পষ্ট আতঙ্ক। ''বিজিবি, মানে বর্ডার গার্ডের একটা স্পিডবোট একটু আগেই এই চরে টহল দিয়ে গেছে। ওরা আবার ফিরতে পারে।''

মেহুল কোনো কথা না বলে পেছন ফিরে তাকাল। নদীর ওপারে ভারতের সীমানায় সারবেঁধে ওদের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ঝোপোলো আর কেলেই গাড়িগুলোকে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে তার ওপর গাছের ডালপালা এমন করে সাজিয়ে রেখেছে যে, অন্ধকার জঙ্গলে গাড়িগুলো পুরোপুরি লুকিয়ে পড়েছে। ঠিক তখনই, নলখাগড়ার বনের নিস্তব্ধতা চিরে দূর থেকে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এল। ফেনী নদীর কালো জল কেটে তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে একটা হালকা মোটরচালিত স্পিডবোট। তার সার্চলাইটের হলুদ আলো চরের অন্ধকারকে ফালাফালা করে দিচ্ছে।

''বর্ডার গার্ড!'' রহিম ফিসফিসিয়ে বলল, হাত কাঁপছিল ওর, ''ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে!''

''পজিশন নাও!'' মেহুলের শান্ত গলা নাগা যোদ্ধাদের মধ্যে বিদ্যুতের মতো কাজ করল। মুহূর্তের মধ্যে থেপফুভোলি আর ভেখোসা কাদার মধ্যে শুয়ে পড়ল, হাতে উদ্যত ধনুক, তিরগুলোর মুখ সোজা তাক করা স্পিডবোটের দিকে। স্পিডবোটটা চরের ঠিক কুড়ি গজ দূরে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করল। সার্চলাইটের আলোটা সরাসরি এসে পড়ল মেহুলের মুখের ওপর।

''ওখানে কে? হাত ওপরে তোলো!'' ওপার থেকে বাংলায় ভারী গলার হুঙ্কার ভেসে এল। দুজন বিজিবি জওয়ান বোটের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের চৈনিক রাইফেল মেহুলের দিকে তাক করল। মেহুল ওর হাত দুটো আস্তে আস্তে ওপরে তুলল। ডান হাতটা বুকের কাছে নিয়ে ওর এনক্রিপ্টেড স্যাটেলাইট রেডিয়োতে বর্ডার গার্ড চ্যানেলে খুব ধীরস্থিরভাবে বাংলায় উত্তর দিল, ''চোরাকারবারি নই। আমি আপনাদের জোন কমান্ডারের পরিচিত।''

বোটের ওপর থাকা গার্ডরা কিছুটা থমকে গেল। একে তো উত্তর আসছে ওদেরই রেডিয়ো চ্যানেলে, তার ওপর মেহুলের গলার স্বর এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে বর্ডার গার্ডদের আঙুল রাইফেলের ট্রিগার থেকে কিছুটা আলগা হয়ে এল। কয়েক সেকেন্ডের এক তীব্র, শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতা। বাতাসে শুধু ফেনী নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। নাগা যোদ্ধাদের আঙুল তখনও ধনুকের ছিলায় স্থির, মেহুলের একটা চোখের ইশারায় বিজিবির জওয়ানদের ঝাঁঝরা করে দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত। জওয়ানটি বোটে ফিরে গিয়ে তার ওয়্যারলেস সেটে কিছু একটা কোড বলল। ওপার থেকে কী উত্তর এল জানা গেল না, তবে তার পরেই সার্চলাইটের তীব্র আলোটা মেহুলের মুখ থেকে সরিয়ে নদীর জলের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

''পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই চর ফাঁকা হয়ে যাওয়া চাই,'' বোটের চালক জওয়ানটি শীতল গলায় বলল। পরক্ষণেই স্পিডবোটের ইঞ্জিন আবার গর্জে উঠল এবং মেহুলদের গ্রেফতার না করেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মেহুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত নামাল। দিল্লির অদৃশ্য হাত যে এত দূর পর্যন্ত কাজ করবে, তা ও ভাবেনি।

''আমাদের সময় কম,'' রহিমের দিকে তাকিয়ে মেহুল বলল। ''তোমার লোকেদের বলো, বাক্সগুলো তুলতে।''

''এখান থেকে আপনাদের নিজেদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নেবেন না?'' অবাক হল রহিম।

''গাওঁবুড়া বলে দিয়েছে,'' হেসে বলল মেহুল, ''এটা যুদ্ধ নয়, শিকার। শিকারে আজও আমরা দা আর বর্শা ব্যবহার করি। আজ রাতে আমরা কেউ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করব না।''

''ওদের জানিয়ে দিতে হবে,'' এতক্ষণ পরে মুখ খুলল ঝোপোলো, ''নাগাদের বন্দুক দরকার হয় না। যে বর্শা আর দাও নাগাদের ঘরে-ঘরে থাকে, ওদের জব্দ করতে সেসবই যথেষ্ট। আজ রাতের পর ওরা আমাদের পাহাড়ের দিকে আড়চোখে তাকানোর আগেও দুবার ঢোক গিলবে।''



(নোয়াখালী, পূর্ব খোরাসান)

সারাদিন ভিক্ষে করে অন্যদিনের তুলনায় কয়েকটা পয়সা বেশিই পেয়েছিল সুলতান। মনে আনন্দ, অনেকদিন পরে আজ হয়তো একটু মাছ জুটবে কপালে। কিন্তু সে টাকা থেকেও বখরা দিতে হলো রক্ষীদের। মনে মনে একটা খুব খারাপ গালাগাল দিল সুলতান। এরা ভিখিরির পয়সাতেও ভাগ বসায়!

যে কটা পয়সা বাকি ছিল, তাই দিয়ে আলির হোটেল থেকে পান্তাভাত আর খেসারির ডাল কিনে রাতের খাওয়া সারলো

সুলতান। হোটেলে ঢুকেই মরিচ শুঁটকির ভর্তার গন্ধ পেয়েছিল সুলতান। ভেবেছিল, একটু ভর্তা জুটবে। কিন্তু আলির বোধহয় আজ মনমেজাজ খারাপ, ফাউ কিছু কপালে জুটলো না সুলতানের।

নোয়াখালী জামে মসজিদের সামনের বাজারটাই হলো সুলতানের স্থায়ী ঠিকানা। আর পাঁচটা রাতের মতোই সেদিন রাতেও খোলা নর্দমার একপাশে জড়ো করে রাখা খড়ের গাদার ওপর ছেঁড়া চট বিছিয়ে শুয়ে ছিল ও। গ্রাম থেকে যখন প্রথম এখানে এসে ডেরা বেঁধেছিল, নর্দমার দুর্গন্ধ কষ্ট দিত। ঘুম আসতো না। এখন সবই গা-সওয়া হয়ে গেছে। আজব জায়গা এই বাজারটা। পচা শাকসবজি, মাছের আঁশ আর প্লাস্টিক বর্জ্য সবাই মিলে ড্রেন আটকে দিয়ে এক ধরনের উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছে। একটু বৃষ্টি হলেই পুরো এলাকা হাঁটু-সমান কাদা আর উপচে পড়া ময়লা নোংরা জলে একাকার হয়ে যায়। এরই মধ্যে সরু রাস্তার ওপর যত্রতত্র অটোরিকশা, ভ্যান আর হকারদের দখল, হাঁটাচলার জায়গা নেই। মানুষের চিৎকার আর যানবাহনের হর্নের শব্দে কান কালা হয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে থাকা অস্থায়ী দোকানগুলো কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই গড়ে উঠেছে, এমন ঘিঞ্জি জায়গা সুলতান বাপের জন্মে দেখেনি।

ছেঁড়া চটটা গায়ে টেনে যখন একটু চোখের পাতা এক করতে যাচ্ছিল, তখনই সেই আওয়াজটা কানে এল। নোয়াখালীর এই ভুতুড়ে শহরে রাতের বেলা শুধু মজহবি রক্ষীবাহিনীর বুটের শব্দ আর সামরিক ভ্যানের ভোঁ ভোঁ সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া যায়।

*With Best Compliments from -*

**A**
**Well Wisher**

কিন্তু আজকের শব্দটা আলাদা। একটা চাপা থরথর কম্পন, যেন মাটি ফুঁড়ে কোনো আদিম দানব জেগে উঠছে। ল্যাম্পপোস্টের মিটমিটে আলোয় দেখল, অন্ধকারের বুক চিরে একদল ছায়া এগিয়ে আসছে। ওরা যখন পাশ দিয়ে গেল, গায়ের গন্ধে বুনো পাহাড়ের একটা কড়া গন্ধ পেল সুলতান। রাস্তার ধারের ঘোলাটে আলোয় দেখল, লোকগুলোর গায়ে ধনেশ পাখি আঁকা লাল-কালো শাল। হাতে তির-ধনুক, লম্বা দা। সুলতান লোকমুখে শুনেছে, নাগারা এই বিশেষ ধরনের অতিকায় বাঁকানো দা ব্যবহার করে। হায় আল্লা, এরা সব নাগা! নাগাদের সম্বন্ধে অনেক ভয়ঙ্কর গল্প শুনেছে সুলতান। ভয়ে কুঁকড়ে ছেঁড়া চটের টুকরোটাকে দিয়ে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল, ওরা সুলতানকে উপেক্ষা করে সরাসরি রক্ষীবাহিনীর চেকপোস্টের দিকে এগোচ্ছে। সুলতান দেখল, ওদের একজনের পিঠে বিশাল এক মহিষের চামড়ার ঢাল, হাতে লম্বা বর্শা। এই যুগে এমন সব অস্ত্রশস্ত্র! একবার ভাবল, হয়তো কোনো নাটক হচ্ছে। কিন্তু ভুল ভাঙল পরমুহূর্তেই। রক্ষীবাহিনীর জিপটা এগিয়ে আসতেই চারদিক থেকে শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ হলো। নাগা যোদ্ধারা বাতাসের মতো ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনো গুলি চলল না, শুধু একটা করে চাপা ধাতব 'খ্যাঁচ্' শব্দ আর রক্ষীদের আর্তনাদ।

তারপরেই দেখল, রাস্তার ধারের নর্দমা আর ঝোপঝাপ থেকে ছায়ার মতো একদল নাগা উঠে এল। তাদের হাতে কোনো বন্দুক নেই, আছে শুধু রক্তপিপাসু নাগা দা। অন্ধকারে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছিল রক্ষীবাহিনী। বেশিরভাগ বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে, ঠিক তখনই একজন নাগা যোদ্ধা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে এক রক্ষীর ঘাড়ে দা বসিয়ে দিল। এক কোপেই মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। রাস্তার ওপাশে দেখল আরেকদল নাগা যোদ্ধা অদ্ভুত এক রণহুঙ্কার দিচ্ছে, সঙ্গে ওদের হাতের ভারী বর্শাগুলোকে মাটিতে ঠুকছে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে রক্ষীরা যখন পালানোর চেষ্টা করল, তখনই ওরা পা দিল নাগাদের পাতা ফাঁদে। মাটির নীচে পুঁতে রাখা তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাঁশের কীলকগুলো রক্ষীদের বুট ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নাগারা।

ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সুলতান। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখল ভোর হচ্ছে। রক্ষীদের কাটা মাথাগুলো বর্শার আগায় গেঁথে উন্মত্তের মতো নাচছে নাগারা। 'জয় দুর্গা নাগা' , 'জয় দুর্গা নাগা' মুহুর্মুহু হুঙ্কারে আবার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলো সুলতানের, রক্তের গন্ধে বমি ঠেলে উঠলো। দেখল, জামাতি একনায়কতন্ত্রের সুশিক্ষিত সেনারা এই আদিম নৃশংসতা দেখে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। যে ড্রেন দিয়ে রোজ নোয়াখালীর নোংরা জল বয়, আজ সেই ড্রেন দিয়ে রক্ষীদের রক্ত বইছে। রক্তস্নাত ভোরে যখন কুয়াশা কিছুটা পাতলা হয়ে এল, প্রথমবারের মতো খুব কাছ থেকে যোদ্ধাদের অবয়ব দেখার সুযোগ পেল সুলতান। শরীর জুড়ে নীলচে-কালো

রঙের অদ্ভুত সব উল্কি, যেন কোনো প্রাচীন আত্মার জীবন্ত রূপ। বিশেষ করে দলপতির বুকে আর গলায় বিশাল এক জ্যামিতিক নকশা। দলপতির চোখে চশমা দেখে অবাক হলো সুলতান। এরা তাহলে জংলি নয়, শিক্ষিত?

মাথায় বাঁশ ও বেতের তৈরি মুকুট, তাতে সগর্বে গোঁজা ধনেশ পাখির সাদা-কালো পালক। বাতাসের সঙ্গে সেই পালকগুলো দুলছিল, মনে হচ্ছিল অরণ্যের আত্মা মাথা নেড়ে ওদের উৎসাহ দিচ্ছে। কানে বাঘের নখ আর বুনো শুয়োরের দাঁতের তৈরি দুল, গলায় ঝোলানো পেতলের তৈরি ছোটো ছোটো মানুষের মাথার খুলির মালা। 'জয় দুর্গা নাগা' হুঙ্কারে আকাশ বিদীর্ণ করে নাগা যোদ্ধারা যখন ফেনীর চরের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, ওদের পিঠের ওপর আঁকা সর্পিল উল্কিগুলো দেখে মনে হলো, ওরা সাধারণ কোনো মানুষ নয়, পাহাড় আর প্রকৃতির আদিম ক্রোধ, যা নোয়াখালীর এই পরাধীন জনপদে মুক্তির আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল। দিগন্ত জুড়ে তখন দাউদাউ আগুন জ্বলছে। বন্দুক হাতে একদল লোক সরকারি ভবনগুলো লুঠ করছে। যত্রতত্র বোমা ফাটছে।



(চট্টলা, পূর্ব খোরাসান)

বিদ্রোহের আগুন প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ের মঠ থেকে ব-দ্বীপের মৎস্যজীবী গ্রাম — সব জায়গা থেকে একজোট হয়েছে মানুষ। কৃষক, শিক্ষক, ছাত্র, বৌদ্ধ ভিক্ষু। যা শুরু হয়েছিল ফিসফাস থেকে, আজ তা এক সেনাবাহিনীর রূপ নিয়েছে, যাদের কোনো উর্দি নেই, নেই কোনো পতাকা। পথেঘাটে তারাই আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এখনও চট্টলা শহর আগলে বসে আছে। শোনা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই রাজধানী শাহ্‌জালালাবাদ থেকে বিশাল এক সেনাবাহিনী এসে পৌঁছবে, বিদ্রোহীদের সমূলে বিনাশ করতে। কিন্তু তারা কবে এসে পৌঁছবে, কেউ জানে না। মধ্যপ্রাচ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে, মরণপণ যুদ্ধে মেতেছে তুর্কি ও ইজরায়েল। সেই যুদ্ধে তুর্কিদের সাহায্য করতে গেছে পূর্ব খোরাসানের মিলিটারি। খলিফার দেশ তুর্কিকে সাহায্য করবে না পূর্ব খোরাসান, তা কি হয়?

বৈশাখী ভোরের কাঁচা রোদ তখনো বন্দরের বিশাল ক্রেনগুলোর মাথা ছাড়ায়নি। কুয়াশা আর ধোঁয়া মেশানো বাতাসে চড়া লোনা গন্ধ। নদীর ওপার থেকে একটা সাম্পান ঢেউ কেটে এপারে আসছিল, তার বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভোরের নীরবতায় দোলা দিচ্ছিল। দূরে একটা বিশাল বিদেশি জাহাজ তীব্র আওয়াজে সাইরেন বাজিয়ে সুর কেটে দিল।

চট্টলায় পূর্ব খোরাসান নৌবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি হলো বিএনএস ঈসা খান, কর্ণফুলীর তীরে। নৌবাহিনীর নৌবহর ও প্রশিক্ষণের প্রধান কেন্দ্রও এটাই। গতকাল রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বিএনএস ঈসা খানের পতন হয়েছে। দুর্ঘটনা নাকি অন্তর্ঘাত, সেটা কেউ জানে না। চারদিকে এখন শুধু পোড়া গন্ধ আর ধ্বংসস্তূপ। রাতের সেই আগুনের লেলিহান শিখা এখন কালচে ধোঁয়ার রূপ নিয়েছে, বাতাসের সাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। আকাশ কালো হয়ে রয়েছে, চিল-শকুনও কাছে ঘেঁষছে না। জেটির মূল কাঠামোটা ভেঙে ঝুলে পড়েছে লোনা জলের ওপর। যে বিশালাকার যুদ্ধজাহাজগুলো গতকালও আধিপত্যের প্রতীক ছিল, সেগুলো এখন আধো-ডুবন্ত অবস্থায় কাত হয়ে আছে। তাদের স্টিলের শরীরে বিশাল গর্তগুলো দিয়ে এখনো হিসহিস করে বাষ্প বেরোচ্ছে। একসময় যেখানে বুটের শব্দ আর সাইরেনের আওয়াজে কান পাতা যেত না, সেখানে এখন এক গা-ছমছমে নীরবতা। কন্ট্রোল টাওয়ারের কাচগুলো গুঁড়িয়ে গিয়ে চকমক করছে মেঝেতে। বাতাসের ধাক্কায় আধখোলা একটা লোহার দরজা একঘেয়ে শব্দে বারবার আছড়ে পড়ছে দেওয়ালে। নৌঘাঁটির প্রধান ফটকের ওপর থেকে সরকারি পতাকাটা নীচে পড়ে আছে, চাকার দাগ আর ধুলোয় মাখা। কিছু হতবিহ্বল সৈন্যকে দেখা যাচ্ছে ধ্বংসস্তূপের মাঝে বেঁচে যাওয়া সরঞ্জাম হাতড়াতে। তাদের চেহারায় দম্ভের বদলে এখন ক্লান্তি আর পরাজয়ের আতঙ্ক। সমুদ্রের শান্ত নীল জলে কুচকুচে কালো তেলের আস্তরণ।

ঈসা খানের পতন বিদ্রোহীদের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে উপস্থিত হয়েছে। এটাই সঠিক সময়, চট্টলা থেকে শাহ্‌জালালাবাদের শাসনকে মূল থেকে উপড়ে ফেলার। ঈসা খান বিপর্যস্ত, কিন্তু চট্টলা শহর আজও অধরা। সেখানে চারিদিকে ইস্পাতের মিনার আর নজরদারি টাওয়ারের গোলকধাঁধা। প্রোপাগান্ডা স্ক্রিনের পাহারায় সেখানে দিন-রাত শুধু আনুগত্যের গান বাজে। শহর দখল করতে হলে শহরকে ঘিরে ফেলা দরকার। সাগর আর নদীকে দরকার। মায়া উত্তর তীরের বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে পরিকল্পনার শেষ প্রস্তুতি দেখছিল। ব্যারাখতার ড্রোনের নতুন কোনো চালান তুর্কি থেকে এসে পৌঁছয়নি, এসে পৌঁছনোর সম্ভাবনাও ক্ষীণ। তাই আকাশ এখনও শান্ত, সরকারের নজরদারি থেকে মুক্ত। এখন লড়াইটা কেবল মাটিতে আর জলে।

''তোমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে,'' বলল মাতঙ্গী, ''এটা কোনো আবেগপ্রবণ বিদ্রোহ নয়। এটি একটি কৌশলগত বিচ্ছিন্নকরণ, স্ট্র্যাটেজিক আইসোলেশন। আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট — চট্টলাকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরকারের অর্থনৈতিক হৃৎপিণ্ড থামিয়ে দেওয়া। শাহ্‌জালালাবাদ ও চট্টলার মধ্যেকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্টের ওপর নির্ভরশীল, যা আমাদের কৌশলের জন্য বড়ো সুযোগ।

**সড়ক ও রেল যোগাযোগঃ** শাহ্‌জালালাবাদ-চট্টলা রুটের রেল

ও সড়ক পথে মেঘনা ও গোমতী নদীর ওপর মাত্র কয়েকটি বড়ো সেতু রয়েছে। এই সেতুগুলোতে হামলা চালালে পুরো সড়ক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে।

**জ্বালানি সংযোগ ঃ** চট্টলা থেকে শাহ্জালালাবাদ পর্যন্ত ভূ গর্ভস্থ তেলের পাইপলাইন রয়েছে। যদি এই পাইপলাইনের রিলে স্টেশন বা পাম্পিং স্টেশনগুলো অকেজো করে দেওয়া যায়, তাহলে রাজধানীর জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। জালানি ছাড়া যেকোনো সামরিক বাহিনী অচল হয়ে পড়ে।

**বিদ্যুৎ পরিষেবা ঃ** প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো অকেজো করে দিলে শহরের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়বে। প্রোপাগান্ডা স্ক্রিনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। জনসাধারণ ক্ষেপে উঠবে।

বোঝা গেল, পুরো পরিকল্পনাটা?"

ইতিবাচক মাথা নাড়ল সবাই।

বাঁধের ওপর নমাজ পড়ার জন্য উঁচু একটা বেদী রয়েছে। মাতঙ্গী তার ওপর একটা মানচিত্র মেলে ধরল। লেজার পয়েন্টার দিয়ে দেখালো, ''আমাদের লক্ষ্য চারটি চোক পয়েন্ট। প্রথমত, পতেঙ্গার প্রধান জ্বালানি টার্মিনাল। দ্বিতীয়ত, ফৌজদারহাটের গ্রিড স্টেশন। তৃতীয়ত, কালুরঘাট ও শাহ আমানত সেতুর সংযোগস্থল। আর সবশেষে, শাহ্জালালাবাদ-চট্টলা ভূগর্ভস্থ তেল পাইপলাইনের মূল পাম্পিং স্টেশন।"

''এর সঙ্গে আরেকটা ব্যবস্থা করতে হবে, শান্ত গলায় বলল মায়া, ''সেটা হলো আমাদের পাঁচ নম্বর।"

''কী সেটা?" প্রশ্ন মাতঙ্গীর।

''কমিউনিকেশন," বলল মায়া, ''চট্টলার সামরিক ও বেসামরিক সব বেতারকেন্দ্র ও তার সঙ্গে জলের তলার ফাইবার অপটিক লাইন ধ্বংস করতে হবে। মাস্টারদার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ সমুদ্রের একটা জাহাজ বিদ্রোহীদের গতিবিধি ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দিচ্ছিল। একই পরিস্থিতি আমাদের সঙ্গেও হতে পারে। আকাশে ওদের চোখ নেই ঠিকই, কিন্তু সমুদ্রপথে ওদের নজরদারি এখনো প্রবল। সেটাকে আগেই অকেজো করতে হবে, প্রথমে ইএমপি চার্জ দিয়ে, তারপর রিমোট কন্ট্রোলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বন্দর পরিকাঠামোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে। বন্দরে বড়সড় আগুন লাগলে বন্দরমুখী সব জাহাজের সেফটি প্রোটোকল কার্যকর হবে, ওরা বন্দর থেকে কয়েক নটিক্যাল মাইল দূরে সরে যাবে। শহরের খবর পাবে না।"

''তার পরেও কোনো শখের হ্যাম রেডিয়ো অপারেটর খবর পাঠাতে পারে।" বলল বোধিচিত্ত, ''তাছাড়া, সামরিক বাহিনীর গোপন কোনো বেতারকেন্দ্র থাকতে পারে আশেপাশে, যার খবর হয়তো আমাদের কাছে নেই।"

''ভারতীয় এজেন্সির একজন লোক আছে," বলল মাতঙ্গী, ''শাহ্জালালাবাদে গোপন সামরিক কমিউনিকেশন কোর-এ। তাকে বলে দেবো, চট্টলা থেকে যাওয়া সব জরুরি বার্তা আমাকে রিলে করে জানাতে।"

''তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা করা যাক," বলল থুরা।

''হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি," বলল মায়া, ''আজ রাতেই!"

''এত তাড়াতাড়ি সব প্রস্তুতি শেষ করতে পারবে?" বলল মাতঙ্গী।

''সব ব্যাবস্থা হয়ে যাবে," আশ্বস্ত করল মায়া, ''বহুদিন ধরে আমরা এই দিনটার জন্য একটু একটু করে তৈরি হচ্ছিলাম।"

''এত তাড়াতাড়ি ইএমপি চার্জ জোগাড় হবে কীকরে?" থুরা প্রশ্ন করল।

''জোগাড় হয়েই আছে," হেসে বলল নীলা, ''চট্টলা দুর্গ থেকে ড্রোনের ভাঙা টুকরোগুলো জোগাড় করে সেগুলো দিয়ে ইএমপি চার্জ বানাচ্ছিলাম গত কয়েক মাস ধরে। সেগুলো এবার কাজে লাগবে।"

''জিনিয়াস," উচ্ছ্বাসের স্বরে বলল মাতঙ্গী।

''নীলা," নির্দেশ দিল মায়া, ''তুমি নদীর নীচে ইএমপি চার্জগুলো লাগানোর দায়িত্ব নাও, ওটা তোমারই সাবজেক্ট। বোধিচিত্ত, তুমি ফৌজদারহাটের ব্যাবস্থা করবে। পতেঙ্গার দায়িত্ব নেবে অমিতাভ। কালুরঘাট সেতুর দায়িত্ব নিচ্ছে মৈত্রী, আর শাহ আমানত সেতু তথাগতর দায়িত্ব। আমরা বাকি যারা রয়ে গেলাম, তারা সবাই ছোটো নৌকোগুলো নিয়ে নীলাকে গার্ড দেবো, যাতে ও সময়মতো চার্জগুলো ফাটাতে পারে। নীলার কাজ শেষ হলে আমরা সরাসরি বন্দরের দিকে যাবো, সেখানে নিরাপদ দূরত্ব থেকে রিমোট কন্ট্রোলে বন্দর জুড়ে বিস্ফোরণ ঘটাবো। এরমধ্যে কোস্ট গার্ডরা এসে পড়লে তাদেরকে সামলানোর দায়িত্ব আমাদের।"

থুরাকে তবু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। মায়া প্রশ্ন করল, ''কী হলো, পরিকল্পনা পছন্দ হয়নি? কোনো সমস্যা রয়েছে?"

''তুমি একটা কথা বারবার বলো," মায়াকে বলল থুরা, ''জামাতের লোকেরা ওদের ভুল থেকে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষা নেয়। আমরা ওদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা লড়াই জিতলাম গত এক বছর, তার বিরুদ্ধে ওরা কি আর কোনো পালটা পরিকল্পনা করছে না? হয়তো ওরা কোনো ফাঁদ পেতেছে?"

''সেরকম একটা সম্ভাবনা তো আছেই," বলল মায়া, ''কিন্তু এমন কোনো খবর এখনও আমার কাছে আসেনি। শুধু আন্দাজের ভিত্তিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কি ঠিক?"

''না, তা আমি বলছি না," মাথা নেড়ে বলল থুরা, ''কিন্তু আমরা যাতে আমাদের কাজটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে পারি, তার জন্য ওদেরকে আজ রাতটা ভুল বুঝিয়ে রাখতে হবে।"

''সেটা কীভাবে?" মাতঙ্গীকে আগ্রহী দেখালো।

''তুমি তো জানো," মাতঙ্গীকে বলল থুরা, ''মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মনস্তত্ত্বের ওপর। একটা লোককে একই মিথ্যে খবর যদি তিনটে ভিন্ন উৎস থেকে খাওয়ানো যায়, তবে লোকটা সেই মিথ্যেটাকেই সত্যি বলে ভেবে বসে।

চলো, আজ একটা নতুন মিথ্যে তৈরি করা যাক। এতে পুরোটা না হলেও শাহ্জালালাবাদের মনোযোগের অন্তত সিংহভাগ আজ রাতের জন্য ভুল দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। মিথ্যে খবরের জল্পনায় ওরা রাত্রে ব্যস্ত থাকবে, আমরা সেই ফাঁকে কার্যসিদ্ধি করে বেরিয়ে যাব। একটা খবর চাউর করা যাক যে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে এসেছে। এর পাশাপাশি আমার সঙ্গে মায়ার একটা বড়ো রকমের ঝগড়া হয়ে গেছে। আজ রাতেই আমি আরাকানে ফিরে যাচ্ছি। আরাকান আর্মির ইন্টেলিজেন্স বিভাগকে দিয়ে মিথ্যে রেডিয়ো চ্যাটার তৈরি করছি, যাতে এই খবরটা এদিককার বর্ডার গার্ডদের কাছে পৌঁছে যায়। এর পাশাপাশি ওরা আজ রাতে বর্ডার শান্ত রাখবে, কোনো গুলিগোলা চালাবে না। ভাবটা এমন রাখবে যেন আমাকে আরাকানে ফিরে যাওয়ার সেফ প্যাসেজ দিতেই ওরা গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখছে।"

''খুব ভালো প্ল্যান,'' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মাতঙ্গী, ''শাহ্জালালাবাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে ভারতের লোক আছে। আমি তাদের মাধ্যমে একই খবর পাঠাচ্ছি।"

''আমি সেটাই ভাবছিলাম,'' বলল থুরা।

''তুমি বলেছিলে মিথ্যে খবর তিনটে ভিন্ন উৎস থেকে খাওয়াতে হবে,'' বলল মায়া, ''এটা তো দুটো হলো। তিন নম্বরটা কোনটা?"

''কেন?'' অবাক হলো থুরা, ''জামাতিদের মধ্যে এক্স-মুসলিমদের নেটওয়ার্ক আছে তোমার। তাদের মাধ্যমে একই খবর ছড়িয়ে দাও। কী, পারবে না?"

''হয়ে যাবে,'' বলল মায়া। ওর গলার আত্মবিশ্বাসের অভাবটা সবার নজর এড়িয়ে গেলেও মাতঙ্গী সেটা খেয়াল করল।

গুনগুন করে কোনো একটা গান গাইছিল থুরা। সুরটা চেনা লাগলেও গানটা কী, বুঝতে পারছিল না কেউ। শেষমেশ মায়া জিজ্ঞেস করল, ''কী গান এটা?"

''আমার ঠাকুর্দা এই গানটা খুব গাইতেন,'' বলল থুরা, ''ছোটবেলায় শুনেছি, কথাগুলো খুব একটা মনে নেই। কিন্তু সুরটা মনে আছে। গানটা অনেকটা এইরকম,

লাল লালা / লাল লালা / লা লা / লা লা / লা,
কত / পরাঁ / হল / প-লি-দান,
লে-খা / আ-ছে / অক-ছু / জ-লে ...."



থুরার আরাকান উচ্চারণের আড়ালে বাংলা গানটা চিনতে অসুবিধে হলো না মাতঙ্গীর। ও গুনগুন করে উঠল,

''মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হল বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে ...."

চশমা খুলে চোখের জল মুছলো থুরা। বহু যুগ পরে গানটা আবার শুনল। হ্যাঁ, এখন কথাগুলো আবার মনে পড়ে যাচ্ছে। ঠাকুর্দার মুখটা তবু ঠিকমতো মনে করতে পারল না থুরা। ঝাপসা একটা অবয়ব। সোনালি ফ্রেমের গোল চশমাটাই শুধু মনে পড়ে। ঠিক ওর নিজের চশমাটার মতো। নেতাজী সুভাষ বোসের চশমার মতো।



পণ্যবাহী জাহাজগুলো যেন ঘুমন্ত তিমি, অলস গতিতে ভেসে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় ডেকের ওপর আবছায়া আভা, নদীর গভীরে মাছধরা ট্রলারের ছদ্মবেশে বিদ্রোহীরা ইএমপি চার্জ বসাচ্ছিল। লক্ষ্য, নদীর তলার ফাইবার অপটিক কেবল ও বন্দরের সেন্সর নেটওয়ার্ক অকেজো করা।

থুরা পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, ''বন্দর জুড়ে ডেটোনেটর লাগানো হয়ে গেছে। এদিকের কাজও তো দেখছি ভালোই এগোচ্ছে। হুঁ, চট্টলা বন্দর অচল মানে পূর্ব খোরাসানের ৯০ শতাংশ রসদ আমদানি বন্ধ। সাপ্লাই বন্ধ হলে মিলিটারি তিন দিনের বেশি টিকবে না।"

পাশে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে মাতঙ্গী নীচু স্বরে বলল, ''কোস্ট গার্ডের টহল প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর। একবার পার হলে অনেকটা সময় পাবে।"

''পনেরো মিনিটই যথেষ্ট,'' মায়ার উত্তর এল দৃঢ় কণ্ঠে, ''চার্জগুলোর পরপর বিস্ফোরণ হবে,'' বলল মায়া, ''নদীর নীচে ফাইবার পাইপের মাধ্যমে চেইন রিঅ্যাকশন হয়ে মূল স্পাইনটা জ্বলে যাবে। একবার কাজ হয়ে গেলে শহরের পুরো কমিউনিকেশ গ্রিড অচল হয়ে যাবে। এমনকী বলা যায় না, পুরো পূর্ব খোরাসানের ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

মাতঙ্গী ইতস্তত করে বলল, ''একটা কথা মাথায় রেখো। একসঙ্গে কমিউনিকেশন আর পাওয়ার গ্রিড যদি খুব দ্রুত ভেঙে পড়ে, তবে ওয়াটার পাম্প, হাসপাতাল — সব অন্ধকার হয়ে যাবে।"

মায়ার চোয়াল শক্ত হলো। ''ওরা অনেকদিন অন্ধকারে বেঁচে আছে,'' বলল মায়া, ''আর কয়েকটা রাত ওদেরকে মারবে না, বরং সবাইকে বাঁচিয়ে দেবে। জ্বালানি সংযোগ বন্ধ করাটা সবচেয়ে জরুরি। অমিতাভ নিশ্চয়ই কাজটা সময়মতো শেষ করতে পারবে, কী বলো?"

''অবশ্যই, বিশ্বাস রাখো।" মাতঙ্গী একমত হলো। ''রাজধানীর

সামরিক গাড়ি আর জেনারেটরগুলো এই তেলের ওপর নির্ভর করে। ওটা গেলে শাহ্‌জালালাবাদের যুদ্ধযন্ত্র স্থবির হয়ে পড়বে।"

"ওঁম তারে তুত্তারে তুরে, বজ্রজ্বল ফট্ ফট্!" হুঙ্কার দিল মায়া।

"রক্ষ রক্ষ স্বাহা!" সমবেত হুঙ্কারে চট্টলা বন্দর কেঁপে উঠল।



মাঝরাতে অপারেশন শুরু হলো।

কর্ণফুলী নদীর বুকে আজ আক্ষরিক অর্থেই কালবৈশাখী প্রলয় নেমেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। শ্রাবণের ধারার মতো অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, পাল্লা দিয়ে বইছে হিংস্র হাওয়া। ছোটো ছোটো ঢেউগুলো ক্রুদ্ধ গর্জনে নৌকোগুলোর গায়ে আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা যেন কোনো অদৃশ্য চাবুক, গায়ে আর মুখে সপাং সপাং করে পড়ছে। ছোট নৌকোগুলো ঢেউয়ের তালে খড়কুটোর মতো দুলছে। সবার পরনের কাপড় সপসপে ভেজা, হাড়ে কাঁপুনি ধরানো শীত। কিন্তু কারও মুখে ক্লান্তি নেই, আছে শুধু অদম্য জেদ আর স্বাধীনতার গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রত্যয়।

মাতঙ্গী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ কী তারিখ, খেয়াল করেছো?"

"আঠেরোই এপ্রিল," বলল মায়া, "কেন বলো তো?"

"নিজের অজান্তেই আমরা এই তারিখটা বেছে নিয়েছি," বলল মাতঙ্গী, "নাকি ভাগ্যদেবীই সেটা আমাদের জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছেন?"

কিছুক্ষণ মাতঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মায়া। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, "গম্ ওয়ে!"

"হুঁ," বলল মাতঙ্গী, "আঠেরোই এপ্রিল, উনিশশো' তিরিশ। মাস্টারদার বিদ্রোহ।"

মাঝেমাঝেই বিদ্যুৎ চমকে পুরো নদীর বুক মুহূর্তের জন্য দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সেই ক্ষণিক আলোয় দেখা যাচ্ছে, কর্ণফুলীর দু'পাড়ের নিবিড় জঙ্গলে বাতাসের তাণ্ডব। মায়ার চোখদুটো বিদ্যুতের আলোয় জ্বলছে, শক্ত হাতে বোটের হুইল ধরে আছে। বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছিল গায়ে। মায়ার বোট সবার আগে। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে রেডিয়োতে একটা অচেনা সিগন্যাল ভেসে এল।

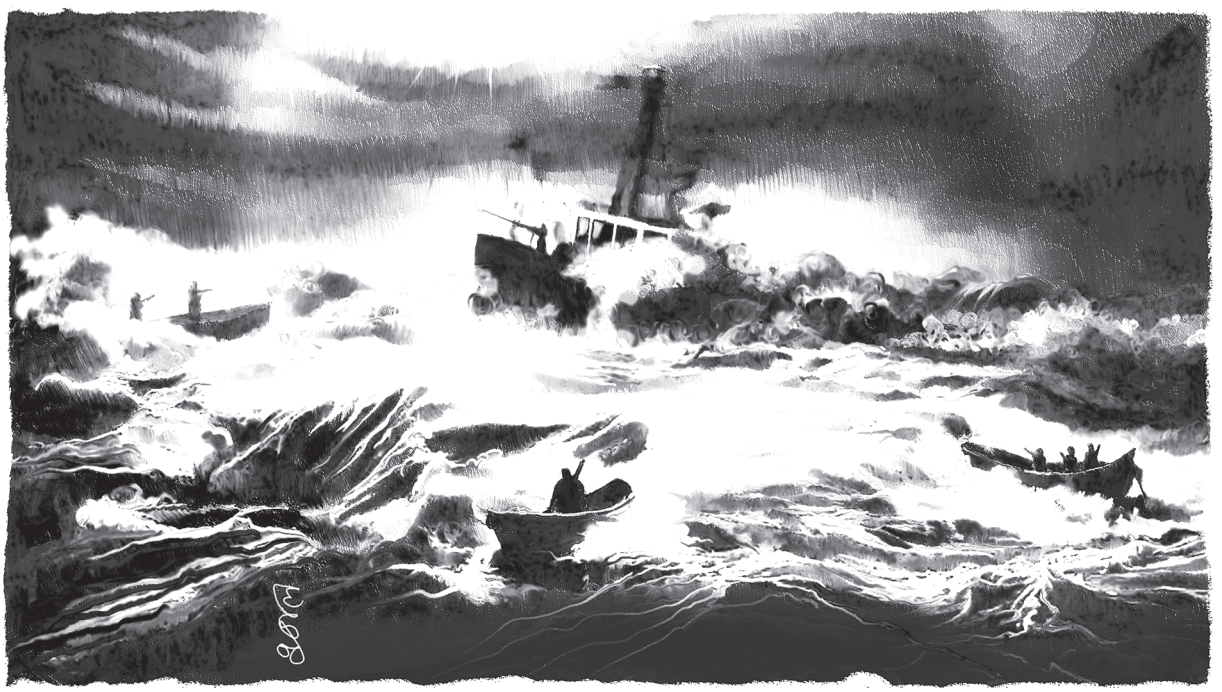
"জনাব .... — শশশ — বি এন এস বখতিয়ার খিলজি হিয়ার .... বিদ্রোহী বোট দ্রুত এগোচ্ছে .... — শশশ — কোঅর্ডিনেট আপলিঙ্ক করা হয়েছে ... — শশশ — সকল কোস্ট গার্ড ইউনিট, ইন্টারসেপ্ট করুন .... রিপিট, ইন্টারসেপ্ট করুন ..... ওভার!"

শিরদাঁড়া দিয়ে একটা আতঙ্কের স্রোত নেমে গেল মায়ার।

"ওরা জানল কী করে?" মাতঙ্গীর চোখ বড়ো হয়ে গেল, "নেভির জাহাজ এখানে এল কীকরে? তারমানে কাল রাতে সবকটা জাহাজ ধ্বংস হয়নি? বি এন এস বখতিয়ার খিলজি অন্য কোথাও ছিল?"

মুহূর্তের মধ্যে দক্ষিণ তীরে সার্চলাইট জ্বলে উঠল। নেভির জাহাজ থেকে ফায়ার করা মেশিনগানের গুলিতে নদীর জল তোলপাড় হয়ে গেল।

"অ্যাম্বুশ! আমাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছে!" কেউ একজন



চিৎকার করে উঠল।

শান্তস্বরে মায়া বলল, ''আমি বুঝতে পেরেছি, কী হয়েছে, কে আমাদের বিশ্বাসঘাতক। আরিফ! সম্প্রতি ওর মেয়ে রেডিয়েশন ইন্ডিউসড ক্যান্সারে লিভার ফেইল করে মারা গেছে। তারপর থেকেই আল্লার গজব আর জাহান্নামের ভয় ওকে পেয়ে বসেছে!''

''আমাদের পরিকল্পনার কতটুকু জানে আরিফ?'' মাতঙ্গীর কণ্ঠে চাপা ক্ষোভ।

''সবটা নয়,'' মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল মায়া, ''তবে ওর কাছে ভাসাভাসা একটা ধারণা আছে। আমরা যে ঈসা খানের পতনের সুযোগ নেব, আর সেটা খুব শিগগিরই, এটা আন্দাজ করা ওর পক্ষে কঠিন নয়।''

''নির্দিষ্ট কী খবর আছে ওর কাছে?'' মাতঙ্গীর কণ্ঠে দৃঢ়তা, ''শুধুমাত্র আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে নিশ্চয়ই এখানে নেভির জাহাজ উপস্থিত হয়নি। বিশেষ করে এরকম পরিস্থিতিতে, যেখানে নৌবহরের একটা বড়ো অংশ এখন জলের তলায়।''

''ও শুধু এটুকুই জানে যে,'' বলল মায়া, ''আমি আজ একা নৌকো নিয়ে ঈসা খানের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করতে আসবো। ওকে বলেছিলাম, নৌবাহিনীর রাডার যাতে এই সময়টা বন্ধ করে রাখে। তবু, এখনো জেতার সুযোগ রয়েছে। আরিফ শুধু আমার অবস্থান জানে, আর কারোর কথা জানে না।''

কণ্ঠার বোতামে চাপ দিয়ে অন্য নৌকোগুলোতে সঙ্গীদের খবর পাঠালো মায়া, ''তোমরা ভয় পেয়ো না, এখনো সবটাকে গুটিয়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। বাকিদেরকে কাজ সমাধা করবার সুযোগ দিতে হবে। বুলেট খেয়ে সময় কিনতে হবে, তারমধ্যেও বেঁচে থাকতে হবে। নদীর ওপর গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। সরাইঘাটের যুদ্ধের কথা তোমাদের অনেকবার বলেছি, মনে আছে তো? সেই পদ্ধতি নাও।''

নদীবক্ষে শুরু হলো এক অসম যুদ্ধ।

কালো মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ নদীটা দেখতে লাগছিল যেন উত্তাল কোনো মহাজাগতিক যুদ্ধক্ষেত্র। ঝড়ের দমকে জল ফুলে উঠছে, ঢেউ আছড়ে পড়ছে নৌকোর গায়ে। দূর থেকে নেভির যুদ্ধজাহাজটা অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে ---বিশাল, লৌহদেহী, যেন নদীর বুক চিরে জেগে ওঠা কোনো প্রাগৈতিহাসিক জলদানব। তার সামনের ডেকে বসানো স্বয়ংক্রিয় কামান ঘুরে দাঁড়াল।

পরমুহূর্তেই---ধুম ধুম ধুম ধুম!

কয়েকটা আগুনের গোলা ছিটকে বেরোলো রাতের অন্ধকার চিরে। বিস্ফোরণের আলোয় মুহূর্তের জন্য নদী রক্তিম হয়ে উঠল।

প্রথম গোলাটা গিয়ে আঘাত করল বিদ্রোহীদের একটা নৌকোয়। পুরো নৌকোটা মাঝ-আকাশে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। জ্বলন্ত কাঠ, মানুষের শরীর আর ধাতব টুকরো ছিটকে পড়ল নদীতে।

চিৎকার।

ধোঁয়া।

জ্বলন্ত তেলের গন্ধ।

আকাশের বুক চিরে একের পর এক আগুনের গোলা নেমে এল।

কিন্তু তবু বিদ্রোহীরা থামল না।

ওরা বড়ো কোনো যুদ্ধজাহাজ আনেনি। সরাইঘাটের অহোমদের মতোই ওদের শক্তি হলো গতি, নদীর আনাচকানাচের পরিচিতি, ছোটো নৌকো চালানোর দক্ষতা আর সংখ্যার উন্মত্ত সাহস। কয়েক ডজন ছোটো ছোটো ইঞ্জিনচালিত নৌকো বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়ল নদীর বুক জুড়ে। কেউ সরাসরি এগোচ্ছে, কেউ ঘুরে যাচ্ছে চর আর অগভীর খাঁজের ভেতর দিয়ে।

নেভির বিশাল জাহাজটা কামান ঘোরাতে ঘোরাতেই সময় হারাচ্ছে। ছোটো নৌকোগুলো জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের মতো।

একটা নৌকো ঠিক কামানের সামনে চলে এসেও আচমকা বাঁক নিল। গোলাটা তার পাশ ঘেঁষে নদীতে আঘাত করল। বিকট বিস্ফোরণে বিশাল জলস্তম্ভ উঠে গেল আকাশে। বৃষ্টিধারার মতো জল এসে পড়ল আশেপাশের নৌকোগুলোর ওপর।

মায়া দাঁড়িয়ে ছিল সামনের নৌকোর মাথায়। ভিজে চুল মুখে লেপটে আছে। চোখ স্থির। চারপাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে গুলি উড়ে যাচ্ছে।

ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! নেভির ডেক থেকে ভারী মেশিনগান আগুন ছুঁড়ছে। গরম সিসে জলে আঘাত করে ছোটো ছোটো বিস্ফোরণের মতো জল ছিটকাচ্ছে। একটা গুলি এসে মায়ার নৌকোর কাঠের পাশ ভেদ করল। কাঠের টুকরো উড়ে এসে কপালে গভীর ক্ষত করে দিল। ঠিক তখন মাতঙ্গী ওকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিল। পরের মুহূর্তেই যেখানে মায়া দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে গুলির ঝাঁক এসে আঘাত করল।

মাতঙ্গী হাঁটু গেড়ে বসে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক তুলে আগুনবৃষ্টি শুরু করল। বন্দুকের নল লাল হয়ে উঠল— টা-টা-টা-টা-ট!

নেভির জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সেনা ঝাঁকুনি খেয়ে পড়ে গেল। আরেকজন আড়ালে ঢুকতে গিয়ে রেলিং টপকে নদীতে পড়ে গেল।

''ডান দিক ঘোরাও!'' চিৎকার করল মাতঙ্গী।

থুরা সঙ্গে সঙ্গে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল। নৌকোটা ঢেউ কেটে তীব্র বাঁক নিল। সবাই প্রায় ছিটকে পড়ছিল, অনেক কষ্টে সামলে নিল।

পেছনে আরেকটা বিদ্রোহী নৌকো গোলার আঘাতে জ্বলে উঠেছে। তবু তার মাঝি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত স্টিয়ারিং ছাড়েনি। জ্বলন্ত নৌকোটা সরাসরি নেভির জাহাজের দিকে চালিয়ে দিল সে।

''ওঁম তারে তুত্তারে ....''

''জয় তারা!''

চিৎকার মিশে গেল ঝড়ের গর্জনে।

জ্বলন্ত নৌকোটা গিয়ে আঘাত করল যুদ্ধজাহাজের পাশে।

ধাম্ম!

বিস্ফোরণে পুরো নদী কেঁপে উঠল। জাহাজের খোলের ইস্পাত বাঁকিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ল ডেকে। কয়েকজন নেভি সেনা আগুনে জ্বলতে জ্বলতে নদীতে ঝাঁপ দিল।

কিন্তু যুদ্ধজাহাজটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তার ডেকের ওপর থেকে আবার কামান ঘুরছে।

মায়া রকেট লঞ্চারটা হাতে তুলল। জল আর ঘামে হাত পিছলে যাচ্ছে। মাতঙ্গী একহাতে ওর কাঁধ চেপে ধরে ভারসাম্য দিল।

''এখন!''

মায়া নিঃশ্বাস আটকে ট্রিগার টিপল।

ফসসসস!

রকেটটা আগুনের রেখা টেনে ছুটে গেল নিকষ অন্ধকারের মধ্যে।

ঠিক তখন নেভির জাহাজ থেকেও গুলি ছুটে এল।

একটা ভারী গুলি এসে পাশের নৌকোটাকে দু'টুকরো করে দিল। মানুষজন ছিটকে পড়ল জলে। কেউ ভেসে উঠল, কেউ আর উঠল না। নদীর কালো জল ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠতে লাগল।

রকেটটা গিয়ে আঘাত করল জাহাজের রাডারের নীচে। বিস্ফোরণের সঙ্গে আগুন আর ধোঁয়া বেরিয়ে এল। পুরো জাহাজ কেঁপে উঠল। বিদ্রোহীদের নৌকোগুলো সেই সুযোগে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল যুদ্ধজাহাজটাকে।

এ যেন সরাইঘাটেরই পুনরাবৃত্তি — শুধু পালতোলা নৌকোর জায়গায় এখন ইঞ্জিনচালিত দ্রুতগামী বোট, তির-ধনুকের জায়গায় মেশিনগান আর রকেট লঞ্চার। কিন্তু যুদ্ধের আত্মা একই।

মায়ার নৌকো জাহাজের এত কাছে চলে এসেছে যে এখন ডেকের সেনাদের মুখও দেখা যাচ্ছে। ভয়, ক্রোধ, বিভ্রান্তি — সব স্পষ্ট।

একজন নেভি কমান্ডো ডেক থেকে দড়ি ছুঁড়ে তাতে ঝুলে পড়ল, মুহূর্তে পৌঁছে গেল মায়ার নৌকোয়। মাতঙ্গী এক লাথিতে লোকটাকে নৌকোর খোলের ওপর ফেলে দিল। ঠিক সেই সময় প্রবল ধাক্কায় নৌকো নড়ে উঠল, মাতঙ্গী পড়ে গেল তার পাশেই।

কমান্ডোটা ছুরি বের করল। বজ্রপাতের আলোয় ফলাটা চকচক করে উঠল।

কমান্ডো নাইফের ধারালো ফলা মাতঙ্গীর গলার দিকে আঘাত করল। মাতঙ্গী লোকটার কবজি চেপে ধরল। দু'জনের হাত কাঁপছে, পেশি ফুলে উঠেছে। নৌকো ঢেউয়ে দুলছে, ভারসাম্য রাখা কঠিন।

কমান্ডোটা হাঁটু তুলে মাতঙ্গীর পেটে আঘাত করল। প্রাণায়ামের শক্তি ব্যবহার করে মাতঙ্গী পেটটাকে বজ্রকঠোর করে তুলল, পেটের আঘাত কোনো ক্ষতি করতে পারল না। সুযোগ বুঝে লোকটা আবার ছুরি চালাল। মায়া পাশ থেকে এসে রাইফেলের বাঁট সজোরে বসিয়ে দিল লোকটার মুখে।

ঠাস!

লোকটার নাক থেঁতলে গেল। টাল খেয়ে পড়তেই মাতঙ্গী লোকটার কবজি মুচড়ে ছুরিটা ফেলে দিল নদীতে। তারপর এক ধাক্কায় লোকটাকে জলে ঠেলে ফেলে দিল। সেই মুহূর্তে মায়া একঝাঁক গুলি চালালো লোকটার ওপর।

মাতঙ্গীর গলা থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। নদী তখন জ্বলছে। চারদিকে ভাসছে আগুন, ধোঁয়া, রক্ত আর ভাঙা কাঠ। আর সেই জ্বলন্ত নদীর বুক চিরে বিদ্রোহীদের ছোটো ছোটো নৌকোগুলো এখনো হানা দিয়ে চলেছে যুদ্ধজাহাজটার ওপর, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। ইতিমধ্যে কাঁটায় কাঁটায় রাত একটা বাজল। মায়া রেডিয়োতে সংকেত দিল, ''কোডঙ্খ ব্ল্যাকআউট।''

মুহূর্তের মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটল। বোধিচিত্তর স্থলবাহিনী ফৌজদারহাটে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র উড়িয়ে দিল। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল পুরো চট্টলা। অমিতাভর নেতৃত্বে পতেঙ্গার পাম্পিং স্টেশনে বিস্ফোরণের ফলে শাহ্জালালাবাদ-চ ট্টলা ফুয়েল পাইপলাইনের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। মৈত্রী ও তথাগতর আক্রমণে কালুরঘাট সেতু ও শাহ আমানত সেতু দুটোই একসঙ্গে তুমুল শব্দ করে নদীর গর্ভে তলিয়ে গেল। ঠিক এই সময় নীলার নেতৃত্বে নদীর নীচে ইএমপি চার্জগুলো ফাটলো। এক তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বন্দরের সব ডিজিটাল লজিস্টিক সিস্টেম এবং রাডার অকেজো হয়ে গেল। বন্দরের স্বয়ংক্রিয় গেটগুলো লক হয়ে গেল। জাহাজগুলো মাঝনদীতে আটকা পড়ল। রাজধানীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের সঙ্গে সঙ্গে চট্টলার সংযোগকারী সব ডিজিটাল সিগন্যাল এখন মৃত।

মাতঙ্গী ওভাররাইড রিমোট কন্ট্রোল সুইচটা টিপল।

এক সেকেন্ড।

দুই সেকেন্ড।

তিন সেকেন্ড।

কিছুই হলো না।

মাতঙ্গী আবার ওভাররাইড সুইচ টিপল।

এবারও কিছুই হলো না।

''ডেটোনেটরগুলো কাজ করছে না কেন?'' হতভম্ব মায়া।

অবাক মাতঙ্গীও, ''ওগুলো কি খারাপ হয়ে গেল?''

''এতগুলো ডেটোনেটর একসঙ্গে খারাপ হয়ে যেতে পারে না,'' গম্ভীর স্বরে বলল থুরা, ''জাহাজটায় নিশ্চয়ই সিগন্যাল জ্যামার আছে।''

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো মায়া। তারপর হালের চাকা ঘুরিয়ে দিল বন্দরের দিকে, ঝড়ের বেগে নৌকো চালিয়ে দিল। মাতঙ্গী একের পর এক গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে যন্ত্রণা থেকে মনটাকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল। গলায় ছুরির গভীর ক্ষত। পায়ে, কাঁধে, হাতে গুলির

আঘাত। ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। মাথা ঘোরাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি চোখদুটোয় অন্ধকার নেমে আসবে।

নৌকো যখন বন্দরের থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে পৌঁছল, তখন মায়া বলল, ''এইবার!''

''বিস্ফোরণের আঘাত কিন্তু এই নৌকোতেও এসে পৌঁছবে,'' ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ গলায় বলল মাতঙ্গী। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আবার ওভাররাইড সুইচটা টিপল। একটা অন্ধ করা আলোর ঝলকানিতে বন্দরজুড়ে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটল। জলোচ্ছ্বাসে অন্ধ হলো চোখ। নৌকোর মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল সবাই।

ধোঁয়া পরিষ্কার হলো, নদীর জল কাটতে কাটতে মায়া উঠে দাঁড়ালো। থুরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল, জামা পুড়ে গেছে, চামড়া ঝলসে গেছে, পায়ে একরাশ স্প্লিন্টারের ক্ষত।

''কাজ শেষ,'' থুরা বলল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মায়া।

''না,'' আর্তনাদ করে উঠল মাতঙ্গী। একটা বস্তার ওপর ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে, হাতে স্যাটেলাইট ফোন। ''রাজধানীর অপারেটিভ এইমাত্র জানালো, শহরের মধ্যে থেকে কেউ একটা বেতার তরঙ্গে খবর পাঠাচ্ছে। অর্থাৎ, মাস্টারদা যে পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, আমরাও ঠিক সেই বিপদেই পড়েছি।''

মায়া শহরের দিগন্তের দিকে তাকালো। গোটা শহরটা অন্ধকার। অন্ধকার আকাশটাও। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু মিনারে তখনও আলো জ্বলছে। মাথা নেড়ে বলল, ''একটা কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, ওই দ্যাখো!''

দ্রুত হালের চাকা ঘুরিয়ে মায়া নৌকো তীরের দিকে ভিড়িয়ে দিল। দূরে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই উঁচু টাওয়ার, যা এখন প্রোপাগান্ডা নয়, সামরিক সিগন্যাল ট্রান্সমিটার আর বুস্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

''তোমার কাছে ব্যাকআপ ডেটোনেটর আছে?'' থুরাকে জিজ্ঞেস করল মায়া।

বোটের খোলের বাক্স হাতড়ে ডিনামাইটের একটা বান্ডিল খুঁজে বের করল থুরা, হতাশার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, ''একমাত্র এটাই রয়েছে। কিন্তু এটাকে তো রিমোট কন্ট্রোলে ফাটানো যাবে না।''

''এটাই যথেষ্ট,'' বলল মায়া, ''আমি এটাকে দূর থেকে ছুঁড়ে দেব। পুরোনো দিনের ভাঙাচোরা টাওয়ার, এক ধাক্কাতেই পড়ে যাবে।''

মায়া বান্ডিলটা হাতে নিল। ওর মনে পড়ল, ঠাকুমার মুখে অনেক শুনেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কয়েকটা অসমসাহসী যুবকের আত্মবলিদানের কথা। ১৯৩০ সালের সেই বিপ্লবীদের কথা, যারা অস্ত্রাগার হস্তগতর পর পাহাড়ের বুক আগলে লড়েছিল। এতগুলো বছর পরে লড়াইয়ের ধরন বদলেছে, কিন্তু তার মূলভূত ধর্ম, তার আবেগ বদলায়নি।

মায়ার হাত চেপে ধরল মাতঙ্গী। নীরবে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নৌকোর খোল থেকে একটা বাইসাইকেল টেনে বের করল মায়া। ছুঁড়ে দিল পাড়ের দিকে। তারপর নিজেও ঝাঁপ দিল অগভীর জলে।

ওপারে উঠে বাইসাইকেলটা মাটি থেকে তুলে তাতে চড়ে বসল মায়া। পেছন ফিরে তাকাল। জল কাদা আর ঝুলকালি মাখা মুখে হাসল।

''হয়তো আমরা কেউ কেউ আর কাল সকালে থাকব না,'' বলল মায়া, ''কিন্তু কাল সকালে যখন এই বন্দর খুলবে না, যখন রাজধানীর সাঁজোয়া গাড়িগুলো তেলের অভাবে থেমে যাবে, যখন প্রতিটি ফোনে 'নো সিগন্যাল' দেখা যাবে, তখন মানুষ বুঝবে, স্বাধীনতা আর মাত্র কতটুকু দূরে।''

হঠাৎ সন্দেহ হলো থুরার। পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, ''মায়া! 'দূর থেকে ছুঁড়ে দেব'? মিথ্যে বলেছিস! তুই তো আর ফিরবি না।''

''রহমান ঘরে যেদিন ঢুকেছিলাম,'' চেঁচিয়ে বলল মায়া, ''সেদিনই ভেবেছিলাম, আর ফিরব না। লোকটাকে মেরে আমিও মরব। তোমার জন্যই সেটা হয়নি। তারপর এতগুলো দিন যে বেঁচে আছি, সেটাই তো বোনাস। বাঁচার ইচ্ছে আমার অনেকদিন আগেই ফুরিয়ে গেছে। চট্টলাবাসীর মনে এক প্রেত হয়েই আমি বেঁচে থাকব।''

বন্দরের জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনকে পাশ কাটিয়ে মায়া বাইসাইকেল নিয়ে শহরে ঢুকে পড়ল।

সূর্য তখন সবে উঁকি মেরেছে শহরের বাড়িগুলোর পেছন থেকে। দক্ষিণের বস্তিগুলোর ওপর দিয়ে মায়া বাইসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। দেখল, উন্মত্ত জনতা আজ পথে নেমেছে। ওর মনে পড়ল, দশ বছর আগে এরকমই একটা উন্মত্ত মিছিল ও দেখেছিল এই রাজপথে। সেই মিছিলের স্লোগান ছিল, কাফেরদের গর্দান চাই। আজ তাদের মুখে অন্য স্লোগান। সাধারণ মানুষ আজ পাথর ছুঁড়ে প্রোপাগান্ডা স্ক্রিনগুলো ভেঙে ফেলছে, লাউডস্পিকার চুরমার করছে, দেওয়ালে দেওয়ালে পুরনো জনজাতীয় চিহ্ন আঁকছে। সাপ, প্যাঁচা, ফুল, বাঁশি, পদ্মফুল, ওঙ্কার, স্বস্তিক, ত্রিশূল। যেগুলো আঁকা এতকাল ছিল নিষিদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টাওয়ারের দোরগোড়ায় এসে থামল মায়া। সাইকেলটা সেখানে ফেলে রেখে গেট খুলে ঢুকলো। দেওয়ালের কাছে গিয়ে ডিনামাইটের বান্ডিলে আগুন দিল। বিড়বিড় করে বলল মায়া, ''বাবা সেদিন ধর্ম আর সঙ্ঘের মানে আমাকে বলে যেতে পারেনি। কিন্তু আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি। এটাই আমার ধর্ম। আমার সঙ্ঘ, মানে আমার সমাজের জন্য আত্মবলিদান। আমি এর জন্যই জন্মেছি।''

হঠাৎ মায়ের চুল বাঁধার সেই নারকেল তেলের গন্ধটা পেল মায়া।

গায়ের জোরে বান্ডিলটা ছুঁড়ে দিল, টাওয়ারের খোলা জানালা দিয়ে সেটা ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। চিৎকার করে বলল মায়া,

''পাহাড়ের জন্য। নদীর জন্য। যাদের মৃতদেহের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, তাদের জন্য। ওঁ স্বাহা!''

বিস্ফোরণ আগুনে গড়া সাপের মতো টাওয়ার বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই এক বিশাল অগ্নিপিণ্ড কর্ণফুলীর বুক চিরে জেগে উঠল। বিস্ফোটের তীব্রতায় নদীর জল কয়েক ফুট উঁচুতে নেচে উঠল। সেই কম্পন রাজধানী ছাড়িয়ে নদীর বুক চিরে চট্টলার ওপারে সমুদ্রেও লাল আভা ছড়িয়ে দিল।



দু'দিন পরের কথা। সীমান্তের পাহাড়ে থুরার পাশে বসে ছিল মাতঙ্গী। শরীর খুব দুর্বল। অপারেশন করে আধ ডজন গুলি ওর শরীর থেকে বের করতে হয়েছে। শরীরের অসংখ্য জায়গায় স্টিচ। ও যে বেঁচে আছে, সেটাই নাকি আশ্চর্য। থুরার পায়ে ব্যান্ডেজ, সঙ্গে ক্রাচ। হাইড্রো-জেল পট্টি দিয়ে ঢাকা পোড়া ক্ষতগুলো।

রেডিয়োতে খবর আসছে, চট্টলার সর্বত্র সেনাবাহিনীর লোকেরা আত্মসমর্পণ করছে, সরকারি পদস্থ অফিসাররা পালাচ্ছে, বহু বছর পর শহরের ভগ্নপ্রায় মঠগুলোতে মুক্তির ঘণ্টা বাজছে। শাহ্জালালাবাদ থেকে আসা সব সামরিক কলাম কুমিল্লার কাছে এসে থেমে গেছে। জ্বালানি আর যোগাযোগের অভাবে তারা আর এগোতে পারছে না। তাছাড়া, তুমুল সংঘর্ষ চলছে নোয়াখালীতে। ফেনী নদীর ওপরের সেতুর সলিলসমাধি হয়েছে।

চট্টলা এখন বিদ্রোহীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। নদীর যেখানে তেল চুঁইয়ে পড়েছে, সেখানে এখনও আগুন জ্বলছে। পাহাড়ে পাহাড়ের শিশুরা গেয়ে উঠছে সেই গান, যা এক প্রজন্ম ধরে শোনা যায়নি — স্বাধীনতার গান, পূর্বপুরুষের গান, নদী আর সমুদ্রের গান।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই নতুন এক আপদ এসে হাজির হয়েছে। উপকূলের অদূরে এক রহস্যময় মালবাহী জাহাজ দেখা গেছে, সেটা কোস্টগার্ডের জাহাজ বা মাছধরা ট্রলার নয়। ভারতীয় স্যাটেলাইট থেকে তোলা বেশ কিছু ছবি এসেছে মাতঙ্গীর কাছে। সিভিলিয়ান ভেসল হলেও জাহাজটা অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই, অস্ত্রের বাক্সগুলোতে এক বেসরকারি কন্ট্রাক্টরের চিহ্ন। নাবিকদের পোশাক সিভিলিয়ান হলেও হাবভাব আধুনিক যোদ্ধাদের মতো। এরা কি আমেরিকার ভাড়াটে সৈন্য, ঘোলাজলে মাছ ধরতে আসছে? সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ওপর আমেরিকার লোভ বরাবরের। কে বলতে পারে, হয়তো শুধুমাত্র সেন্ট মার্টিন নয়, গোটা চট্টলার ওপরেই নজর পড়েছে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর? এরই মধ্যে একদল অচেনা সশস্ত্র মানুষকে মায়ানমারের জঙ্গল ভেদ করে লোকালয়ের দিকে আসতে দেখা গেছে। ভাষা তাদের চীনাদের মতো। সীমান্ত বরাবর আরাকান আর্মির সঙ্গে তাদের কয়েকটা দলের ছোটোখাটো সংঘর্ষ হয়েছে গত কয়েকদিনে। শহরের ধ্বংসস্তূপে এখন নতুন ফিসফিসানি, তৃতীয় কোনো পক্ষ ঢুকেছে চট্টলায়।

''মায়ার কোনো খবর পেলে?'' মাতঙ্গী জিজ্ঞেস করল।

দিগন্তের দিকে তাকাল থুরা। সেখান থেকে এখনও কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশে। বলল, ''মায়া বলেছিল, ও প্রেতাত্মা হয়ে বেঁচে থাকবে। আত্মারা তো কোনো খবর পাঠায় না।''

পাহাড়ের ওপারে সূর্য উঠছে। কর্ণফুলী নদী আজও বইছে, তবে আজ তার বুক জুড়ে জয়ের গান। মায়া আজ আর নেই, কিন্তু চট্টলার প্রতিটি ধ্বংসস্তূপে ওর রক্তরাঙা স্বাক্ষর চিরতরে লেখা হয়ে গেছে।

সারা আকাশ প্রদক্ষিণ করে সূর্য সমুদ্রে ডুব দিল। আবার রাত নামল। রাজধানীর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে, ভাঙা যোগাযোগ ব্যবস্থার স্ট্যাটিক শব্দের মাঝে এক নারীর কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে ভেসে এল:

''শৃঙ্খল ভেঙেছে। পাহাড় আর সমুদ্র আজ স্বাধীন। আমি গরিব মেয়ে, বাপ-মা হারা। তোমাদের জন্য শুধু একটি জিনিস রেখে গেলাম — তা হলো আমার স্বপ্ন ... নিজের সত্তা নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন। ওঁম তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা!''

সেই শব্দ একটু একটু করে ক্ষীণ হয়ে শেষে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।



সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

# স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
## বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
## বিশ্বস্ত একটাই নাম




চির পরিচিত

# দুলালের®

# তালমিছরি

**আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।**

সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩



উত্তর ভিয়েতনামের একটি প্যাগোডা

# ভিয়েতনাম দেখে এলাম

ডাঃ মধুসূদন পাল

কম্বোডিয়া থেকে চলে গেলাম উত্তর ভিয়েতনাম। সিএম রিপ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দু'ঘণ্টার উড়ান। নামলাম হ্যানয় বিমানবন্দরে অর্থাৎ ভিয়েতনামের রাজধানীতে। এটি একসময়ে ছিল হো-চি-মিন (১৯ মে ১৮৯০-২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)-এর প্রধান কর্মক্ষেত্র। হ্যানয় দক্ষিণ-পূর্ব চীন সংলগ্ন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ দক্ষিণ চীন সাগরের তীরে। পূর্বনির্ধারিত দর্শনীয় স্থান হো-চি-মিনের স্মৃতি সৌধ হো-চি-মিন মৌসলিয়াম (Ho Chi Minh Mausoleum)। বিরাট ক্যাম্পাসে বহু গাছপালা, বিশেষত আমগাছ। হো-চি-মিন মাছ ধরতে পছন্দ করতেন, তাই সংলগ্ন কয়েকটি পুকুরে ছাড়া আছে রঙিন মাছ। একটি রাজকীয় বাড়িতে প্রেসিডেন্ট হাউস। হো-চি-মিনের বসবাসের জন্য এই বাড়িটি দেওয়া হলেও তিনি থাকেননি। এখন সরকারি অতিথি নিবাস। আগে এটি ছিল ফরাসি শাসকের বাসস্থান। হো-চি-মিনের জন্য রয়েছে একটি ছোট দোতলা বাড়ি। এক তলায় বাঙ্কার। বোমা পড়লে উনি সরাসরি বাঙ্কারে চলে যেতেন। বাঙ্কারের উপরে প্রচুর গাছপালা। হো-চি-মিনের মরদেহ মমি করে রাখা আছে। এখানে প্রবেশ করতে হয় শান্তভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে। কোনো কথা বলা যায় না। ওখানের মানুষ হো-চি-মিনকে খুবই শ্রদ্ধা করেন।

হো-চি-মিন জীবিতাবস্থায় পুরো ভিয়েতনাম পাননি। দক্ষিণ ভিয়েতনাম বিদেশি শাসনমুক্ত হয়ে ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওনার মৃত্যুর পরে। অর্থাৎ অখণ্ড ভিয়েতনামের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে হো-চি-মিন পরবর্তী সময়ে।

হো-চি-মিন ভারতেও খুব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি এদেশে আসেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তিনি কলকাতায় একটি ছোটো অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা বিপ্লবী দেবনাথ দাসের হাতে তুলে দেন। দেবনাথ ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজির সহযোগী। কেন হো-চি-মিন জাতীয় পতাকা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কিংবা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর হাতে তুলে দেননি, তা অনুসন্ধান করলে ইতিহাসের অনেক না দেখা পাতা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যথাসময়ে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করব।

উত্তর ভিয়েতনামে অনেক প্যাগোডা আছে। আমরা দেখতে গেলাম Temple of Literature। এটি ভিয়েতনামের সবচেয়ে পুরাতন ও এদেশের প্রথম




লিয়ন প্রচণ্ডীর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ছিল রাজপরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদান কেন্দ্র। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের সন্তানদের জন্যও অবারিত করা হয়। পরবর্তী গন্তব্য বৌদ্ধ রাজাদের তৈরি Tran Quoc Pagoda। ১০০০-১৫০০ বছরের পুরাতন প্যাগোডা দেখে আপ্লুত হলাম। বিস্ময় যেন থই পায় না। এই ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যটিকে খুব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রেখেছে সরকার।

এরপর গেলাম Hoan Kiem Lake দেখতে। লেকের চারদিকে প্রচুর প্যাগোডা। প্রায় হাজার বছরের পুরানো বড়ো গাছ ভ্রমণার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে। ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট দেশ হলেও অনেকেই এখানে ফুল-পাতা-নারকেল ইত্যাদি দিয়ে পুজো করছেন। পদ্মফুলের প্রাচুর্য। দেবতার পুজোতেও পদ্মফুল আবার হো-চি-মিনের পায়ের তলাতেও পদ্মফুল। কমিউনিস্ট দেশে এত দেবতার মূর্তি, মন্দির, প্যাগোডা দেখে ভারতের কমিউনিস্টদের দেবদেবীদের মূর্তি বিদ্বেষের কথা মনে এল। তাহলে, ভিয়েতনামের কমরেডরা কি জালি কমরেড না 'কম রেট'-এর কমিউনিস্ট?

পরবর্তী গন্তব্য— Hanoi। Ha long Bay। যাওয়ার পথে দেখলাম বিরাট সরকারি ফার্ম হাউস। এখানে সমুদ্রের জল ঢুকিয়ে তৈরি করা হয়েছে অনেক লেক। চাষ করা হয় কৃত্রিম মুক্তা। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের এটি অন্যতম ক্ষেত্র। মেয়েরাই এখানে চাষবাস-সহ সব কাজ করছে। উল্লেখ্য, বিমানবন্দরে পর্যটকদের জন্য বাস দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সেখান থেকেই নির্দিষ্ট বাসে চড়ে ঘুরেছি। দুর্ভাগ্য, ভারতের সবচেয়ে পুরাতন নেতাজী সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দমদমে বাস রাখার কোনো জায়গা নেই। অথচ এদের সব বিমানবন্দরে বাস রাখার প্রচুর জায়গা রয়েছে। পর্যটকদের জন্য সব রকমের ব্যবস্থা রেখেছে এরা। আমরা পারিনি।

আমাদের বাসটি থাকল সমুদ্রসৈকতে। ওখান থেকে ছোটো ছোটো ডিঙিতে গেলাম উপসাগরের মধ্যে যাত্রীদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা লাক্সারি ক্রুজ (Cruise)-এ। জাহাজ পর্যটকদের নিয়ে গেল উপসাগরের গভীরে। উত্তর ভিয়েতনামের সব থেকে বড়ো নদী 'রেড রিভার'। ফিরলাম রেড রিভার-এর অববাহিকার উপর দিয়ে। এর চারদিকের সবুজ ধানক্ষেত পর্যটকদের মনোহরণ করবেই। আমরাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম শ্যামলিমার দিকে। উত্তর ভিয়েতনামে চীনা সংস্কৃতি ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য।

আগের কথায় আসি। উপসাগরের ভিতর রয়েছে মাঝারি উচ্চতার হাজার হাজার পাহাড়। পাহাড়ে প্রচুর গাছপালা। পাহাড়গুলি আগ্নেয় শিলা, আর চুনাপাথর দিয়ে গঠিত। জাহাজ পাহাড়গুলোকে কাটিয়ে এঁকেবেঁকে চলতে লাগল। বেশ মজার অভিজ্ঞতা। স্বচ্ছ নীল জলের দিকে তাকিয়ে থাকলাম নিষ্পলক ভাবে।

জাহাজেই খাওয়া-দাওয়া। এরপর বাঁশের তৈরি ছোটো ছোটো ডিঙিতে চড়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ঘুরতে লাগলাম। এক একটা বোটে ১০ জন যাত্রী। এই বোটে চড়ে পাহাড়ের খুব কাছে পৌঁছানো যায়। একবার কায়াকিং (Kayaking) করলাম। বোটগুলি প্লাস্টিকের তৈরি। আয়তনে বেশ ছোট। একটা বোটে দু'জন চড়া

যায়। আমরা দু'জন একটা বোটে চড়ে নিজেরাই বৈঠা টেনে ঘুরলাম খুব সাবধানে ভারসাম্য বজায় রেখে। কারণ, সামান্য এদিক ওদিক হলেই বিপদের সম্ভাবনা। এখানে জাহাজে বসে দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা জীবনের মস্তবড় অভিজ্ঞতা।

এই উপসাগর বেশ শান্ত। স্থানীয় মেয়েরা ডিঙিতে চড়ে নানারকম জিনিসপত্র, নানারকম পানীয়, সিগারেট, খাবার ইত্যাদি বিদেশী পর্যটকদের কাছে বিক্রি করছে। কেউ কেউ মাছ ধরছে ডিঙিতে। সর্বত্র মেয়েদের প্রাধান্য। এদেশের মেয়েরা সুন্দরী এবং তাঁদের বিভিন্ন পণ্য বিক্রির কৌশলও বেশ উন্নত। ফলে মেয়েরাই এসব কাজে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে।

জাহাজ থেকে নেমে বাসে চড়ে এলাম Danang বিমানবন্দরে। জায়গাটির অবস্থান মধ্য ভিয়েতনামে। যখন হো-চি-মিনের দখলে ছিল উত্তর ভিয়েতনাম, আমেরিকান বাহিনীর দখলে ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনাম, তখন Danang ছিল আমেরিকানদের হাতে। Danang-এর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান— Bana hill। বাসে চড়ে অনেক জঙ্গল পেরিয়ে গেলাম Bana hills-এর গোড়ায়। টিকিট কেটে রোপওয়ে চড়ে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের মাথায়। পায়ের নীচে জঙ্গল, ঝর্ণা, নদী মনে রোমাঞ্চ তৈরি করতে লাগল প্রতি মুহূর্তে। পুরো শহরটা ছবির মতো লাগছিল। পাহাড়ের উপর প্যাগোডা, বুদ্ধমূর্তি এককথায় অসাধারণ। দেখলাম পাহাড়ের উপর ফরাসীদের তৈরি করা শহর। সেখানে বড়ো বড়ো হোটেল, বাড়ি, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি রয়েছে। একসময় কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এগুলো ভাঙতে শুরু করে। পরে অবশ্য অনেকটাই সংস্কার করা হয়েছে। কারণ, ফরাসী পর্যটকরা এখানে ভালো সংখ্যায় আসে। তা থেকে ভালো রকম আয় হয় ভিয়েতনামের।

এবার গন্তব্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম। ডানাং (Danang) বিমান বন্দর থেকে বিমানে এসে নামলাম হো-চি-মিন সিটি (সায়গন)-তে। হোটেলে রাত্রি কাটিয়ে সকালে পৌঁছালাম লিয়ন প্রচণ্ডীর ভাঙা বাড়ি দেখতে। লিয়ন প্রচণ্ডী সম্পর্কে পরে বিস্তৃত বলব। কারণ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লিয়ন প্রচণ্ডীর একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ওখান থেকে গেলাম মেকং নদীর বুকে গজিয়ে ওঠা কিছু বদ্বীপ দেখতে। বাস থেকে নেমে নৌকায় নদী অতিক্রম করে খাল-বিলে পৌঁছালাম। বারবার সুন্দরবনের কথা মনে পড়ছিল। খাল-বিলের আশেপাশের গ্রামগুলিতে প্রচুর জনবসতি। দেখলাম অসংখ্য নারকেল গাছ আর ফলবাগিচা। এরা প্রাচীন গ্রামীণ জীবনধারা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ধরে রেখেছে আন্তরিকতার সঙ্গে। দেখলাম, এবিষয়ে ওরা খুবই সংবেদনশীল।

বিকেলে গেলাম Vinh Trang Pagoda দেখতে। এই প্যাগোডা খুবই বিখ্যাত। চীন-কম্বোজ এবং ফরাসী শিল্প স্থাপত্যের মিশনে তৈরি এক অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তি। পরদিন সকালের গন্তব্য Cuchi Tunnels। এটির অবস্থান দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক বিশাল জঙ্গলে। এখানে মাটির তলায় স্বাধীনতাকামী ভিয়েতনাম গেরিলারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি করেছে মাইলের পর মাইল সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের মুখগুলো মাটির উপরে। বাইরে থেকে এগুলো বোঝা



*দক্ষিণ ভিয়েতনামের জঙ্গলে যুদ্ধক্ষেত্রে গেরিলাদের তৈরি শত্রু ধরার ফাঁদ, যা ঘাস-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হতো।*

মুশকিল। কারণ, সুড়ঙ্গের মুখ গাছপালা কিংবা পিঁপড়ের ঢিবি দিয়ে ঢাকা। এর ভেতরটা এত সরু যে, আমেরিকান সৈন্য সুড়ঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে ওদের বিশাল চেহারার জন্য। বাঙ্কারে রাখা আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার, জল ইত্যাদি। বিশ্রামেরও যথেষ্ট জায়গা আছে সেখানে। উপর থেকে শত্রু বিমানবাহিনীর বোমা মেরে, কিংবা পদাতিক বাহিনী নামিয়েও যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। ১৯৭৫-এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আমেরিকান সৈন্য পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল এখান থেকে। ভিয়েতনাম সরকার এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি খুব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রেখেছে।

এরপর গেলাম, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য War Remnants Museum দেখতে। শক্তিমত্ত দাম্ভিক আমেরিকা যুদ্ধক্ষেত্রে বিমান,




*লিয়ন প্রচণ্ডীর ভাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেদক।*

হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেছিল যথেচ্ছভাবে। তার অনেকগুলোর দখল নিয়েছিল ভিয়েতনামের গেরিলারা। আরো অনেক যুদ্ধাস্ত্র আমেরিকান সৈন্য ফেলে আসে বাধ্য হয়ে। পরবর্তীকালে ঠিক এরকমই দেখা গিয়েছিল আফগানিস্তানে। বিরুদ্ধপক্ষের ফেলে যাওয়া সামরিক অস্ত্র নিয়ে এখানেই গড়ে উঠেছে মিউজিয়াম। তথাকথিত সুসভ্য আমেরিকান সৈন্যরা ভিয়েতনামের মানুষের উপর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল তার অসংখ্য ছবি রাখা হয়েছে এই ক্যাম্পাসের একটি বড় বাড়িতে। উন্নত সভ্যতার দাবিদার আমেরিকা। তাদের নৃশংস আচরণ এবং তাদের পতনেরও একটি ভাল স্মারক এই মিউজিয়াম। এই মিউজিয়াম দেখা প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। এরপর আমরা বিমানে ফিরে আসি কলকাতায়।

এবার আসি লিয়ন প্রচণ্ডীর কথায়। উত্তর ভিয়েতনামের ইতিহাস ও কৃষ্টিতে যেমন চীনের প্রভাব গভীর তেমনি দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াতে প্রভাব বেশি ভারতের। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ বহু হাজার বছরের।

একসময় ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া পরিচিত ছিল ইন্দো-চীন নামে। এখানে ফরাসীরা রাজত্ব করেছে দু'শো বছরেরও বেশি সময়। প্রায় একই সময় তারা ভারতের পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরে রাজত্ব করেছে। লিয়ন প্রচণ্ডীর জন্ম পণ্ডিচেরীতে ১৯০১ সালে। ভাগ্যান্বেষণের জন্য তাঁর যৌবন অতিবাহিত হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনে। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জাপানীরা ফরাসীদের উৎখাত করে ইন্দো-চীনের দখল নেয়। সেই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে। আজাদ হিন্দ বাহিনী ও আজাদ হিন্দ সরকারের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল সায়গনে লিয়ন প্রচণ্ডীর বাড়িতে। এই সংগঠনের জন্য তিনি তার নিজস্ব বাড়ি ও উপার্জিত সম্পদ দান করেন। বাড়ির ঠিকানা— 76, HAL BA TRUNG , SAYGAN। সায়গন শহরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সমস্ত বাড়ি হয় ভেঙে পড়েছে না হয় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আগেকার বাড়িগুলি সাধারণত ২-৩ তলা, লালচে রঙের। সায়গন শহরে এধরনের বাড়ি আছে ৪-৫টি। এখন এগুলো সবই ভারতীয় রেস্তোরাঁ। একমাত্র এই বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ শরীর নিয়ে। আশ্চর্য, বাড়িটির দখল নেয়নি কেউ। গোটা সায়গন শহরে এই বাড়িটি যেন ব্যতিক্রম। ৮০ বছর ধরে বাড়িটি একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে অথচ কেউ দখল নেয়নি। এর পেছনে নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ বর্তমান। আমাদের নিশ্চিত ধারণা, এটিই লিয়ন প্রচণ্ডীর সেই ঐতিহাসিক বাড়ি। ব্রিটিশদের লেখা Transfer of Power (Volume VI)-এ পরিষ্কার লেখা আছে— বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরেও 'বোসকে সায়গন শহরে

কয়েকদিন দেখা গেছে।' এটিই এই বাড়িটির প্রধান গুরুত্ব। দ্বিতীয় গুরুত্ব, হো-চি-মিন যখন ১৯৫৮-তে ভারত ভ্রমণে আসেন তখন সায়গনে নেতাজীর প্রধান কেন্দ্রে ব্যবহৃত ভারতের তেরঙা পতাকা কলকাতায় নেতাজীর সহযোগী দেবনাথ দাসকে হস্তান্তর করেন। হো-চি-মিন এই পতাকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কিংবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে দেননি।

প্রশ্ন, হো-চি-মিন এই পতাকা কিভাবে পান? অনুমান, তাদের মধ্যে কোনো গোপন সম্পর্ক ছিল। গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তিনি ১৯৪৫-৫৮ এই ১৩ বছর পতাকাটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন। তৃতীয় গুরুত্ব হল , জাস্টিস খোসলা কমিশনে ডাঃ রামচন্দ্র রাও সাক্ষ্য দিয়েছেন— সায়গন নৌবন্দর থেকেই নেতাজী জার্মান সাবমেরিনে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পরেও লিওন প্রচণ্ডীর সঙ্গে নেতাজির যোগ ছিল এবং তিনি অন্তর্ধানের বিষয়ে সাহায্য করেছেন এই সন্দেহে তাকে ফরাসিরা বন্দি করে অত্যাচার চালায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য। পরে একই কারণে ব্রিটিশ শক্তি তার উপর এমন অত্যাচার করে যে তিনি পঙ্গু হয়ে যান শারীরিকভাবে। তাঁর মস্তিষ্ক প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাঃ রামচন্দ্র রাওকে তো স্বাধীন ভারতেও বন্দি রাখা হয়েছিল।

গোরাচাঁদ সান্যাল IPS প্রেসকে বলেন, নেতাজীর শেষযাত্রা বিমানে নয়, সাবমেরিনে। নেতাজীর ব্যবহার করা দু'টি তরবারি গোরাচাঁদ সান্যাল পেয়েছিলেন একজন জাপ অফিসারের কাছ থেকে। সুব্রত মুখার্জী (পরবর্তীকালে ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধান)-র সাহায্যে গোরাচাঁদ এই দু'টি তরবারি কলকাতায় আনেন এবং প্রেস বিবৃতি দেন! পরে গোরাচাঁদ খুন হয়ে যান উত্তর কলকাতায় নিজ বাসভবনে। তার মুণ্ডকে শরীর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জীর রহস্যজনক মৃত্যু হয় টোকিওর একটি হোটেলে।

ভিয়েতনাম ভ্রমণে নেতাজীর ১৯৪৫-এর আগস্টে সায়গন থেকে সাবমেরিনে অন্তর্ধানের বিষয়ে লিয়ন প্রচণ্ডীর সংযোগ অনুধাবন করাই ছিল ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিবেদকের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।


*শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—*



**Usha Kamal**

*With Best Compliments from :*

## PIONEER PAPER AND STATIONERY PVT. LTD.

**(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)**

*REGD OFFICE & WORKS:*

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

LAUREL

***FINANCIAL SOLUTIONS***

## Laurel Securities Private Limited

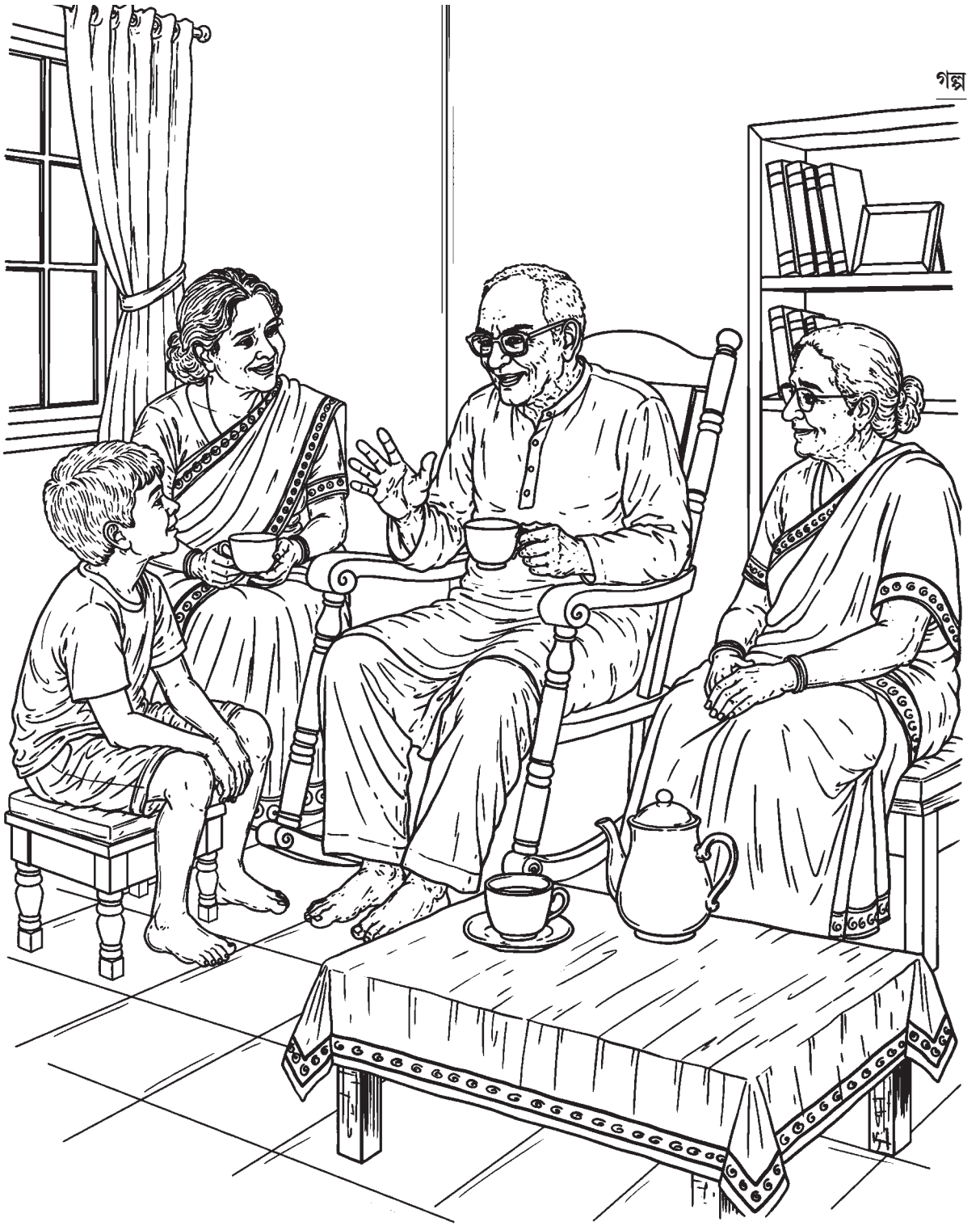
(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

(Stock Broker and Portfolio Manager Service)

LAURELMF FINMART PRIVATE LIMITED
(Member of Association of Mutual Funds in India)
MUTUAL FUND DISTRIBUTOR

JAIN BAID & CO.
(Chartered Accountants)

**909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001**
**Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com**



# ইংলিশ জেঠু—১৯৭১

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন স্কুল ছুটি হবার পর টিউশন সেরে ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। একে তো রাস্তায় জ্যাম তার উপর আজ স্যারের পড়ানোর পর গল্পের মুড এসে গিয়েছিল। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কত রকমারি এয়ার-ডিফেন্স সিস্টেম যে ব্যবহার করে তা স্যার না বললে জানতেই পারতাম না। পড়া শেষ হয়ে যাবার পর স্যারকে হঠাৎ-ই প্রশ্ন করেছিলাম আমরা। সুতরাং যা হবার তাই হলো। যথারীতি দেরি।

দমকলের স্টাইলে বেল বাজিয়ে বাড়ি ঢুকেই স্কুলের ব্যাগটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলতেই শুরু হলো মায়ের বকুনি।

''—ধাড়ি ছেলে! এ বাড়িতে কি সবাই কালা? এতবার বেল বাজাতে বারণ করেছি না। আবার বই এর ব্যাগ বিছানায় ছুঁড়ে ফেলেছিস। কেন, ঠিক জায়গায় রাখতে পারিস না?''

''খিদে পেয়েছে খেতে দাও, এত কথা বলার কী হয়েছে? সেই কখন স্কুলে টিফিন খেয়েছি।'' আমি ঝাঁঝিয়ে উঠতেই দাদুর গলা শুনতে পেলাম—''বৌমা ছেলেটাকে আর বকো না। সেই সকালে স্কুলে গেছে আর এখন ফিরল। হ্যাঁরে, আজ এত দেরি হলো।''

''আর বলো না দাদু, সারা রাস্তা জ্যাম।'' আর স্যার আজকে পড়ানোর পর সারা পৃথিবীর যত দেশ আছে তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে বলছিলেন। তাই দেরি হয়ে গেল।''

আমি হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং-এ এলাম। নিনি অর্থাৎ আমার ঠাকুমা রুটি আর তরকারি আমার মুখে গুঁজে দিতে দিতে বলল—''অনেক দেরি হয়ে গেছে, একদম রাতের খাওয়া শেষ করে নে; আর বড়ো হচ্ছিস তো, এখন একটু দস্যিপনাটা কমা।''

সঙ্গে সঙ্গে মা-ও শুরু করল, আমি রাগ চেপে মনে মনে বললাম—''একজন বাঁয়া আর একজন তবলা।'' মুখ গোঁজ করে খেয়ে উঠে এলাম। ভেবেছিলাম, বাড়ি ফিরে দাদুকে সব গল্প করবো, কিন্তু পরিস্থিতিটাই পাল্টে গেল—কিছু ভালো লাগছে না— মনটাই বিস্বাদ হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরেই এমন একটা ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাবো, এটা আশা করিনি। আসলে বড়োরা যখন বড়ো হয়ে যায় তখন ছোটোবেলাটা তাদের আর মনে থাকে না। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাবার ফিরতে এখনও একটু দেরি আছে। রাস্তার লাইটগুলোর দিকে চেয়ে আমি যখন প্রতিজ্ঞা করছি, বড়ো হয়ে গেলেও আমি ছোটোবেলাকে মনে রাখবো; ঠিক তখনই কানে এল দাদু ছড়া কাটছে—

'হুকোমুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?'

দাদু আমাকেই হুকোমুখো বলছে নাকি। ভাবতেই খেয়াল হলো আরে, এ যে সুকুমার রায়। তাহলে দাদুর মন আবার কল্পনার আকাশে পাখা মেলেছে। দুই লাফে বারান্দা পেরিয়ে দাদুর ঘরে ঢুকেই দেখি, দাদু তার প্রিয় রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে ছড়া কাটছে।

''দাদু!''

''হ্যাঁ দাদু! তুমি যা ভাবছো তাই।'' দাদু মিটিমিটি করে হাসতে লাগলো।

''আমরাও কি বসতে পারি তোমাদের সঙ্গে?'' নিনি আর মা কখন যে একসঙ্গে ঘরে ঢুকেছে দেখতে পাইনি। মায়ের হাতে চায়ের কাপ। কাপটা নিতে নিতে দাদু বলল—''নিশ্চয়।''

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—''তোদের স্যার আজ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে কী কী বললো?''

ওই যে বিশ্বের প্রথম অপারেশনাল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাইকি আয়াক্স, তারপরেই সোভিয়েত ইউনিয়ানের S-75 Divina, ব্রিটেনের Shy Sabra, ফ্রান্সের Mamba, ফ্রান্স ও ইতালির যৌথ উদ্যোগে Sanpa/TNG, জার্মানির প্যাট্রিয়ট থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার অত্যাধুনিক MIM-104 Patriot, THAAD, Aegis (AEGIS), রাশিয়ার S-400, S-500, ব্রিটেনের RAVEN System, ফ্রান্সের GM-403M, জার্মানির ARROW-3, Oertitron System, ইজরাইলের FRON DOME, ভারতের BHASKAR-8, S-400 Triny বা সুদর্শন চক্র এসব নিয়েই বলছিলেন।''

''বাঃ! তা এগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝেছিস তো?'' দাদু চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমি কিছু বলার আগেই নিনি মাকে বলে উঠলো।

''চল আমরা বরং টিভি দেখি। তোমার শ্বশুরমশাই বোধহয় আজ এসব করেই কাটাবে। দাদু আর নাতি ওদের জ্ঞানচর্চা নিয়ে থাকুক। নিনির গলায় হতাশার সুর। আমি যখন মনে মনে ভাবছি—''যাক, আপদ গেলো। এখানে থাকলেই আজে বাজে প্রশ্ন করবে, গল্প শোনাটাই হয়তো বাতিল হয়ে যাবে। তার আগেই দাদু বলে উঠলো—

''আচ্ছা সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা তোমার মনে আছে?''

''না থাকার কী আছে?'' নিনিকে শেষ করতে না দিয়েই দাদু আবার বলল—''না, মানে তোমার ভাই যে কীর্তি করেছিল, সেটা তোমার মনে আছে?''

''সে তো একমাত্র সে আর তার পেয়ারের জামাইবাবু ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানতে পারে না। তা আজ কোন উপাখ্যান। আমার ছোটো ভাইটার কোন কীর্তির কথা তোমার মনে পড়লো?'' নিনির ছোট্ট খোঁচাটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দাদু বলল—''আরে না না। তোমার নাতি বলছিল ওর স্যার আজকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্ট বা মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম মানে

ইজরায়েলের আয়রন ডোম, ভারতের সুদর্শন চক্র বা আমেরিকার থাড, এসবের যে কনসেপ্ট তা কিন্তু প্রথম আসে ভারতেরই মাথায়। আর সেটা প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে।"

''তাহলে তার আগে কী? এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বলে কিছু ছিল না?"—আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

''না না, অনেক আগে থেকেই ছিল অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্ট গান। আর প্রথম সারফেস টু এয়ার মিসাইল ১৯৫০ সালে তৈরি হয় Nibe Ajax। কিন্তু সবচেয়ে সস্তায় দেশীয় প্রযুক্তিতে একটা under developed country যে concept বাজারে এনেছিল এবং প্রমাণ করেছিল, তা আজ যতই আয়রন ডোম সুদর্শন চক্র বা থাড দেখাও না কেন ১৯৭১-এ ভারতের Kite System ছিল পথিকৃৎ। আজ যেমন এইসব সিস্টেম ক্র্যাক করা মুশকিল সেদিন ভারতের Kite System-কেও ফাঁকি দিয়ে কেউ পার পায়নি।"

''কিন্তু এর সঙ্গে আমার ভাইয়ের কী সম্পর্ক?" দাদুকে থামিয়ে দিয়ে নিনি প্রশ্ন করে বসলো। আমিও অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম—''সত্যিই তো দাদু, এর সঙ্গে ইংলিশ জেঠুর কী সম্পর্ক?"

''আছে আছে। এই রাডার ভিত্তিক ডিফেন্স সিস্টেমগুলো তৈরি করার আগে তোদের আমেরিকা, রাশিয়া, ইজরায়েল এরা কার সঙ্গে যোগাযোগ ও পরামর্শ করেছিল জানিস।

''আর যার সঙ্গে করুক না কেনো নিশ্চয় ইংলিশ জেঠুর সঙ্গে নয়। কোথায় বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশ আর কোথায় ভারতবর্ষ। শুধু তাই নয় আবার ইংলিশ জেঠু। কোনোটার সঙ্গে কোনোটাই মিলছে না দাদু।"

তোরা জানিসই না যে এই প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়ার আগে মার্কিন, রাশিয়ান বা ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন খুব গোপনে ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় তোর বাবার মামার বাড়ি এসেছিল।

হ্যাঁ ঠিক তো, ওরা গভীর রাতে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপি চুপি আসতো আর সেটা আমরা বাড়ির লোকেরা কেউ কিছু না বুঝলেও একমাত্র তুমি আর তোমার শালা জানতে। যত্তো সব গাঁজাখুরি। নিনির বক্রোক্তির সঙ্গে সঙ্গে মা'র প্রশ্ন—''বাবা, এর সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কী সম্পর্ক?"

''সম্পর্ক আছে বৌমা।" নিনির বক্রোক্তিকে পাত্তা না দিয়ে মার প্রশ্নের উত্তর দিল দাদু। আসলে এই মুক্তিযুদ্ধ না হলে রাডার ভিত্তিক উন্নতমানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পৃথিবীর দেশগুলো হয়তো তেমন করে ভাবনাচিন্তা করতো না। আগেকার প্রায় সবকটি সিস্টেমই ছিল যুদ্ধবিমান বা ছোটোখাটো রকেট আটকানোর জন্য কিন্তু পরবর্তীতে যখন মিসাইল চলে এল তখন সেগুলো আটকানোর চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে বড়ো বড়ো দেশগুলো নজর দিল ১৯৭১ সালে ভারত এ ব্যাপারে কী করেছিল।

দাদু তুমি বললে ভারতের Kite System-এর সাফল্য পৃথিবীর দেশগুলোকে রাস্তা দেখিয়েছিল। Kite মানে তো ঘুড়ি।

ঠিক তাই। চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে দাদু ফের বলতে শুরু করলো।

তখন ১৯৭১ সাল। সারা বাংলাদেশ অর্থাৎ তখনকার পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের রেশ ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাভাষার মর্যাদা, বাঙ্গালির জাত্যভিমানকে রক্ষা করতে ওপার বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান একযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। যে প্রচণ্ড অত্যাচারের শিকার ওপার বাঙ্গলার মানুষদের পশ্চিম পাকিস্তানের খান সেনাদের দ্বারা হতে হয়েছে তা এখনকার ছেলে-মেয়েরা চিন্তা করতেও পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান সৈন্যরা আর তাদের পদলেহী পূর্বপাকিস্তানের কিছু লোক যাদের 'রাজাকার' বলে তারা মিলে পূর্ববঙ্গ জুড়ে বীভৎস অত্যাচার করছে। তখনো ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়নি, হবে হবে করছে। ভারতের বর্ডার এলাকাগুলো দিয়ে লাখে লাখে শরণার্থীর ঢল নেমেছে। পূর্ব-পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করার ষড়যন্ত্রে পশ্চিম পাকিস্তান পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠেছে। এ সেই সময়ের কথা। একটানা এতগুলো কথা বলে দাদু একটু থামতেই তাড়া লাগালাম।

তারপর! দাদু ফের বলা শুরু করল—

তোদের ইংলিশ জেঠু তখন ২০-২২ বছরের যুবক। ভীষণ ঘুড়ি ওড়াতে ভালবাসত। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত একেবারে। নানান ধরনের ঘুড়ি আর লাটাইতে ওর ঘর ভরে থাকত। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় ওকে হারানোর মতো লোক তখন পশ্চিমবঙ্গে খুব কমই ছিল। অন্যের ঘুড়ি কীভাবে কাটাতে হবে তার বিভিন্ন প্যাঁচ পয়জার ওর আয়ত্তে ছিল। শুধু তাই নয় এইসব প্যাঁচ পয়জার শেখার জন্য বহু ছেলে ছোকরা ওর কাছে আসত রীতিমতো গুরুদক্ষিণা প্রদান করে। ঘুড়ি ওড়ানো শেখানো ব্যাপারটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ফেলেছিল তোদের ইংলিশ জেঠু। যারা ঘুড়ির ব্যবসা করতো তারা চাইতো তাদের ঘুড়ি প্রথম ওড়াক তোদের ইংলিশ জেঠু কারণ যে ঘুড়ি ও ওড়াবে সেই ঘুড়ির বিক্রি বাজারে সবচেয়ে বেশি হবে। এজন্য ইংলিশ জেঠু সম্মান দক্ষিণাও পেত।

তাহলে তো সরকার থেকেও ইংলিশ

জেঠুর এই প্রতিভাকে সম্মান জানানো উচিত ছিল। বললাম আমি। একটু চুপ করে দাদু কী একটা ভাবলো, তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললো—'বঙ্গীয় ঘুড়ি সমাজ' ওকে 'ঘুড়িশ্রী' উপাধি দিলেও সে সময় ভারত সরকার 'অর্জুন' পুরস্কার দেবে বলে ডেকেছিল ঠিক সেই সময়েই পূর্বপাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

কেন যুদ্ধের পরেও তো দেওয়া যেতে পারত? মা'র টিপ্পনী কাটার অভ্যাসটা আর গেল না। একদম নিনির মতো স্বভাব পেয়েছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে দাদু বলল—''সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। ১৯৮৫ সালে দ্রোণাচার্য পুরস্কার দেবার কথা উঠলে তোমাদের ইংলিশ জেঠুর সঠিক কোনটা পাওয়া উচিত 'অর্জুন' না 'দ্রোণাচার্য' সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। যে কারণে ১৯৯১-৯২ তে রাজীব খেলরত্ন ও ইংলিশ জেঠুকে দিতে পারা যায়নি।

এরপর নিনি কি আর চুপ করে থাকতে পারে। যথারীতি বলে বসলো—সম্পূর্ণ গুল! কারণ এগুলো কোনোদিন কোনোও খবরের কাগজ, টেলিভিশন বা রেডিয়োতে বলেনি এবং আমরা তার নিটকজনরাও কোনোদিন শুনিনি বা জানতে পারিনি।

একটা হাত তুলে নিনিকে থামিয়ে দিয়ে দাদু বলতে শুরু করল—''আরে জানবে কী করে, পুরোটাই তো সরকার মনে মনে ভাবছিল। দেবে কী দেবে না। দাদুর কথার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে ফেললাম। মুচকি হেসে দাদু শুরু করল—''ওই যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছিলাম না। এই মুক্তিযুদ্ধে এপার বাঙ্গলার হাজার হাজার ছেলে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়ে পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করেছিল। তখনই যখন সরকারিভাবে ভারত যুদ্ধে নামল ঠিক সেই সময়ই ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মানেকশ-র মাথায় আসে তোদের ইংলিশ জেঠুর কথা। মনে রাখবি, সেই সময় ভারত কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের একটা অনুন্নত দেশ। এটা কিন্তু আজকের উন্নতশীল দেশ নয় বা অচিরে যে উন্নত দেশে পরিণত হবে তাও নয়। অনুন্নত থেকে উন্নতিশীল সেখান থেকে উন্নতদেশে পরিণত হতে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতকে একশো বছর পার হতে হবে, কারণ ইংরেজরা আমাদের সবকিছুই প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছিল। একটু থেমে একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে দাদু বলল—''যাই হোক, সে সময় পাকিস্তানের তুলনায় এয়ার ডিফেন্স ভালো থাকলেও ভারত সরকার বা আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগ চাইছিল কেমন করে কম খরচে, প্লেন না উড়িয়ে অথবা অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট গানের গুলি খরচ না করেও পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের প্লেনকে রুখে দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। তখনই জেনারেল মানেক্শ গোপনে শরণাপন্ন হলেন তোদের ইংলিশ জেঠুর। দেশের জন্য জীবন দিতে বা দেশের রক্ষার্থে কোনো কাজেই তো ইংলিশ জেঠু কোনদিনও পিছপা ছিল না; সুতরাং সে চলে গেল বর্ডারে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তা করার জন্য। তারপর তো ইতিহাস। মাত্র ১৩ দিনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান। তৈরি হলো স্বাধীন বাংলাদেশ।''

''তাতে ইংলিশ জেঠুর অবদান কী?'' আমি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে উঠলাম।

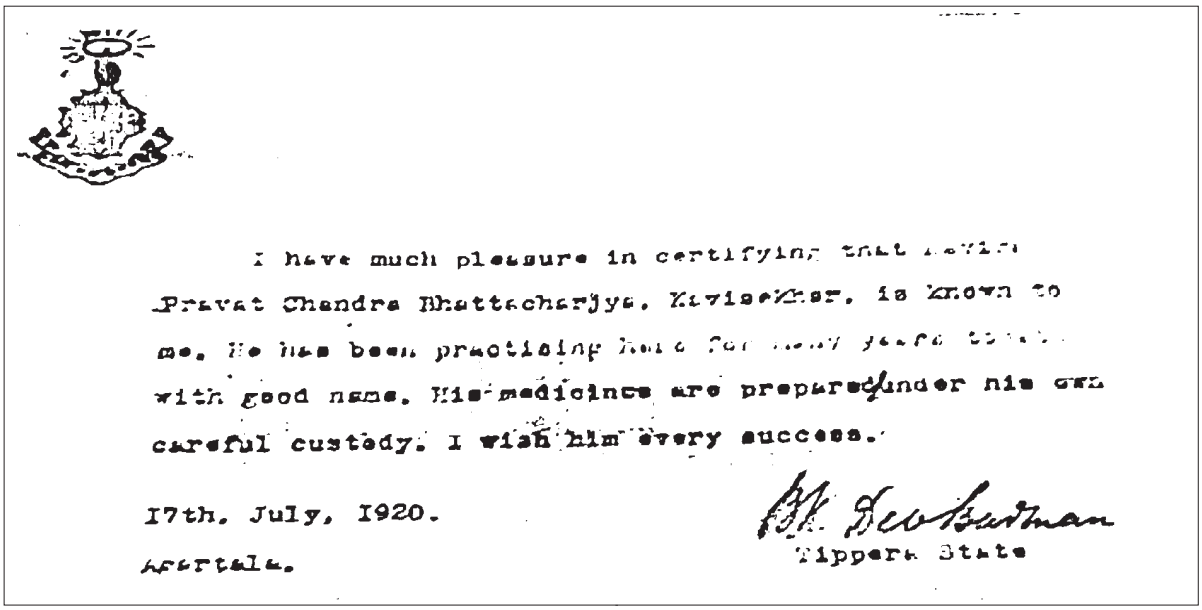
কেন রে, যতবার পাকিস্তানী প্লেন পূর্ব ভারতের বর্ডার ক্রস করতে গেছে ততবারই আকাশ ছেয়ে গেছে ঘুড়িতে ঘুড়িতে। আর সে কী ঘুড়ি। এক একটা সুতোর থেকে শাখায় শাখায় ঘুড়ি! যেদিকেই পাকিস্তানের প্লেন উড়তে চায় সেদিকেই ঘুড়ি! ইংলিশ জ্যেঠু আর তার সাকরেদরা বর্ডারের এপার থেকে ঘুড়ি উড়িয়ে পাকিস্তানের সব প্ল্যান বানচাল করে দিয়েছিল। তাই আকাশ যুদ্ধ ওরা আর করতে পারেনি, আর সেই সুযোগে আমাদের আর্মি ওদের গোহারান হারিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই পরে বড়ো বড়ো দেশগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বানাতে। যার ফলশ্রুতি চীনের HQ সিস্টেম, রাশিয়ার –S-500, আমেরিকার THAD, ইজরায়েলের IRON DOME বা ভারতের সুদর্শনচক্র। ভারতের সামরিক বাহিনী সবরকম সাহায্য করেছিল তোদের ইংলিশ জেঠুকে। এমনকী ওরা খুব কষ্টও পেয়েছিল যেহেতু সিভিল লোক বলে ওরা তোদের ইংলিশ জেঠুকে 'বীরচক্র' বা 'পরমবীর চক্র' দিতে পারেনি বলে। আর দেশের জন্য কাজ করে পুরস্কার নেবার মানসিকতাও তোদের ইংলিশ জেঠুর ছিল না। সে ছিল প্রকৃতই দেশ অন্তঃপ্রাণ। ভারতমাতাই তার সবকিছু। থামল দাদু। আমরা তিনজন সম্পূর্ণ স্তব্ধ। আমার সবকিছু কেমন যেন ঘুলিয়ে যেতে থাকলো। মা আর নিনি ঘরের বাইরে চলে গেল হাসতে হাসতে। দাদুর গলায় আবার সুকুমার রায়—

মাছি মারা ফন্দি-এ যতভাবি মন দিয়ে..... আর আমি? বসে রইলাম বিমূঢ় হয়ে। এবার রাতটাই বোধ হয় ভেবে ভেবে কেটে যাবে হুঁকোমুখোর দিনটা যেমন কেটেছিল।

# ত্রিপুরা রাজ্য—সেকাল একাল

গৌতম দেবনাথ

উত্তরপূর্ব ভারতের ছোট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা। আশির দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছি বহুবার। ত্রিপুরা বললে অনেকেই চিনতে পারত না। আগরতলা বললে আগরপাড়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত। বছর কুড়ি আগে হায়দরাবাদে এক সেমিনারে একজন মহিলা সিনিয়র পুলিশ অফিসার আমাকে



I have much pleasure in certifying that Babu
Pravat Chandra Bhattacharjya, Kaviratnar, is known to
me. He has been practising here for many years with
with good name. His medicines are prepared under his own
careful custody. I wish him every success.

17th. July, 1920.
Agartala.

Tippera State

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্য কেরালায় কি না। আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে শুধরে দিয়েছিলাম যে ত্রিপুরা কেরালায় নয়, কর্ণাটকে। সম্ভবত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সে সেমিনারটি হয়েছিল। একজন অভিজ্ঞ আই.এ.এস. মিঃ সিনহা ছিলেন ডাইরেক্টর। ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রামে দু মিনিট বলতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের তথাকথিত উগ্রপন্থী সমস্যার কারণ বোধ হয় এ ধরনের উন্নাসিকতা। মিঃ সিন্‌হা আমাকে জড়িয়ে ধরে পরিষ্কার বাংলায় ভূতপুর্ব মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর প্রশাসনিক দক্ষতার প্রসংশা করে আমার ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরকে গুরুত্ব না দেওয়াও ত্রিপুরার পরিচিতির অভাবের জন্য সমানভাবে দায়ী ছিল। অথচ ত্রিপুরার অপার প্রাকৃতির সৌন্দর্য ছাড়াও অনেক আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে যা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হবে। যদিও সে সময় রেললাইন ছিল না। কিন্তু আকাশ পথে যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া ডোমেস্টিক টুরিজম্‌ও অবহেলিত ছিল। গত দশ বছরে ভারত সরকার ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর- পূর্বাঞ্চলে রেল সম্প্রসারণ-সহ পর্যটন শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ত্রিপুরা এখন টুরিজম্‌ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে।

রাজন্য ত্রিপুরা ঃ মহারাজা ধন্যমাণিক্যের সভাপণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর 'রাজমালা' রচনা করার সময় তৎকালীন ত্রিপুরার ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা করেছিলেন এভাবে—

'কিরাতনগরে রাজা বিধির গঠন।

রাজ্যের সীমানা কহি শুনহ বচন।।
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী, দক্ষিণে রসাঙ্গ।
পূর্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কাচবঙ্গ।।
ত্রিবেগ স্থানেতে রাজা করিল এক পুরী।
নানামত নির্ম্মাইল পুরীর চত্তারী।'

'রসাঙ্গ' (আরাকান) 'মেখলি' (মণিপুর) পশ্চিমে রাজ্যের সীমা ছিল বঙ্গের সংলগ্ন। সভাপণ্ডিত শুক্রেশ্বর এবং বাণেশ্বর প্রণীত রাজমালা বহুল প্রচলিত নয়। পরবর্তী সময়ে কৈলাশ চন্দ্র সিংহ প্রণীত 'রাজমালা'য় আধুনিক ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার মহারাজাদের পরিচিতি অনেক বেশি প্রচলিত এবং সেকারণে তা সমাদৃত। অন্যান্য মহারাজদের সময় ও রাজমালার কয়েক খণ্ড লেখা হয়েছিল। কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পরিবার পুরুষানুক্রমে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে রাজকার্যে জড়িত ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে কৈলাশ চন্দ্র সিংহ রাজকার্যে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।

মহারাজা ঈশান চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে সে সময়ের সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং সে বিরোধ ব্রিটিশ আদালতে গড়ায়। কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় কুমার বাহাদুর নবদ্বীপ চন্দ্রের পক্ষে মোকদ্দমা দেখভাল করেছিলেন। আদালতের রায়ে কুমার বাহাদুর নবদ্বীপ চন্দ্র হেরে যান। তৎকালীন ত্রিপুরার চাকলা রোশনাবাদ হিসাবে পরিচিত অর্থাৎ কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম যা বর্তমানে বাংলাদেশের অংশ। কুমিল্লায় তার বংশধর পরবর্তী সময়ে পৃথিবী বিখ্যাত শচীন দেববর্মন এবং তার সুযোগ্য পুত্র রাহুল দেববর্মন বসবাস করতেন। রাহুল দেববর্মন ছাত্র জীবনের কয়েকবছর কলকাতায় ছিলেন। তাঁদের একটা বাড়িও কলকাতায় ছিল। শচীন দেববর্মন কিছুসময় কলকাতায় কাটালেও কোনোভাবেই তাঁকে কলকাতার বাসিন্দা বলা যায় না। তাঁরা ত্রিপুরার ভূমিপুত্র। বছর দুয়েক আগে আগরতলার লিচুবাগান অঞ্চলে শচীন দেববর্মনের একটি মূর্তি বসানো হয়েছে।

অবিভক্ত বাংলার পাঁচটি বিভাগ ছিল অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি বিভাগ (কলকাতা), বর্ধমান বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত ছিল নোয়াখালি ও ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার রাজসিংহাসন অষ্টকোণ এবং ষোড়শ সিংহ। ৯টি রাজকীয় প্রধান চিহ্ন। তাছাড়া আছে কিছু উপচিহ্ন। (সূত্র কৈলাশ চন্দ্র সিংহ—রাজমালা)

রাধাকিশোর মাণিক্য ১৮৯৭-১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা থাকাকালীন গভীরভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকে ত্রিপুরার রাজপরিবারের অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করে 'রাজর্ষি' উপন্যাস এবং 'বিসর্জন' ও 'মুকুট' নামে দুটি নাটক লিখেছিলেন। তাছাড়া সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মহারাজ বীরচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন। তখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরায় আসেননি। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দেখা হয় পশ্চিমবঙ্গের কার্সিয়াঙে। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাংলা ভাষায় কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য হল 'অকাল কুসুম', 'প্রেমমরীচিকা', 'ঝুলন' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগরতলার উমাকান্ত স্কুলে চারবার এসেছিলেন। সম্ভাব্য তারিখ ১ জুলাই ১৯০৫, ১০ নভেম্বর ১৯০৫, ৯ নভেম্বর ১৯১৯। সেদিন তিনি স্কুলের পরিদর্শন পুস্তকে স্বাক্ষর করেছিলেন। আরেকবার এসেছিলেন ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। ১৮৯৮ সালে মহারানি তুলসীবতী স্কুল প্রতিষ্ঠাকালেও এসেছিলেন বলে কিছু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে ত্রিপুরার মহারাজা প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

ত্রিপুরার মহারাজদের সিংহাসন ও প্রচলিত মুদ্রা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া সম্ভব যে তাঁরা ছিলেন চিরাচরিতভাবে হিন্দু। যদিও মুসলমান এমনকী কিছু খ্রিস্টানও এ রাজ্যে ছিলেন। মহারাজারা ছিলেন ধর্মীয়ভাবে খুবই উদার।

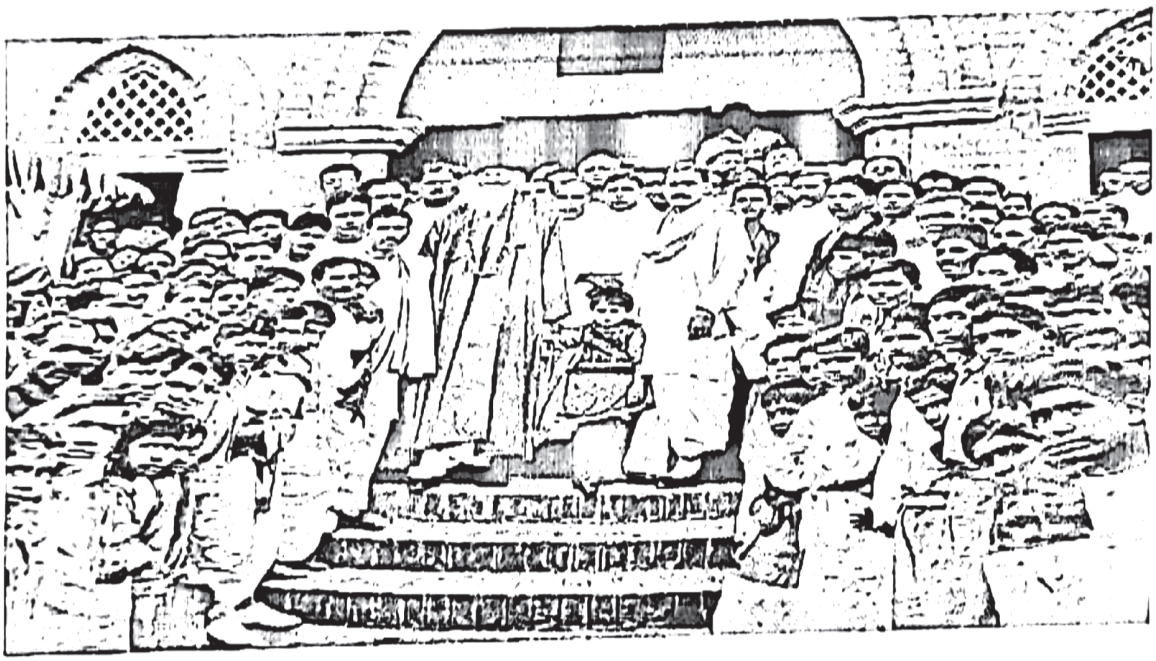
**ত্রিপুরার রাজকার্য ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** ত্রিপুরার রাজকার্য বাংলা ভাষায় পরিচালিত হতো। সেজন্য সাহিত্যের উন্নতিও হয়েছিল। প্রমাণ হিসাবে রাজপণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর মহোদয়ের লিখিত 'রাজমালা' বা কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের 'রাজমালা' বাংলা ভাষায় লিখিত এবং হরফও বাংলা। এছাড়াও অন্যান্য মহারাজদের সময়েও রাজমালার বিভিন্ন খণ্ড লেখা হয়েছিল বাংলা হরফে।

আধুনিক ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। প্রামাণ্য দলিল হিসাবে তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত মহাশয়ের ১৩৮৯ সালের লেখা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার স্মৃতি' বেশ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এ প্রবন্ধের অনেক তথ্য সে বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও মূলত তিনি শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একজন অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি।

১৯৪৭ সালে মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যে স্বাধীন ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হবে তাহলে চাকলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিপুরা সফরে উমাকান্ত একাডেমিতে কিশোর সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।



রোশনাবাদ অর্থাৎ কুমিল্লা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট জেলা-সহ যে সুবিশাল অংশ এখন বাংলাদেশভুক্ত তা ভারতের অংশ হতেও পারত। যে অঞ্চলে ত্রিপুরার মহারাজদের জমিদারি ছিল, সে অঞ্চল থেকে ত্রিপুরার মহারাজরা খাজনা আদায় করতেন। মুঘল আমল থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। চাকলা রোশনাবাদের তালুকদাররা সে অঞ্চলের শাসন কার্যের ব্যয়ভার বহন করেও ত্রিপুরার মহারাজদের ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত রাজস্ব দিতেন যা ত্রিপুরার বাজেটে যুক্ত হতো। তৎকালীন ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধাচারণ করে ত্রিপুরার বিশেষ ব্যক্তিত্ব হরিগঙ্গা বসাক কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ পাঠাতেন সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর হরিগঙ্গা বসাক তাঁর ঢাকার বাড়িতে গেলে গ্রেপ্তার হয়ে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে মৃত্যুবরণ করেন। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে হরিগঙ্গা বসাক রোড।

**ত্রিপুরা পর্বতমালা ও নদী ঃ** নদীকে কেন্দ্র করেই জনবসতি গড়ে ওঠে। ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রধান নদী গোমতি ও মনু। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা হাওড়া নদীর তীরে অবস্থিত। আসলে যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির কারণে আগরতলায় ত্রিপুরার রাজধানী বহু পরে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নামে খ্যাত রাজবাড়ি ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ত্রিপুরার জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। তার আগে পুরানো অর্থাৎ খয়েরপুর অঞ্চলে ছিল রাজবাড়ি। বস্তুত পক্ষে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে প্রথম রাজধানী জাম্বুল নগর যা উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর আর কৈলাশহর অঞ্চলের মাঝামাঝি অঞ্চলে ছিল। তারপর অমরপুর, উদয়পুর বা রাঙামাটি ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। একাধিকবার রাজধানী পরিবর্তনের কারণ যুদ্ধবিগ্রহ বা বহিশত্রুর আক্রমণ। তাছাড়া ফেনি, মুহুরি নদী এবং এসব নদী থেকে সৃষ্ট বেশ কিছু উপনদী ঘিরে জনপদ গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে দেশভাগের পর চাকলা রোশনাবাদ থেকে স্থানান্তরিত বাঙালিরা বসতি স্থাপন করেন এবং পতিত জমিকে শস্যভাণ্ডার হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। দেশভাগের পর চাক্‌লা রোশনাবাদের বাঙালিদের ভৌগোলিকভাবে স্বাভাবিক গন্তব্য স্থল ছিল ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও অসম। সিএএ আইন পাশ করার

সময় ত্রিপুরা রাজ্যকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে জনবিন্যাস পরিবর্তনের প্রশ্নে।

ত্রিপুরার পর্বতশ্রেণী পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে বন্যহাতি এখনো বড়মুড়া, আঠারমুড়া পর্যন্ত মাঝে মাঝেই আসা যাওয়া করে। তাছাড়া ভাল্লুক, বিভিন্ন প্রজাতির বন বিড়াল, বানর, বিশেষত চশমা বানর যা ত্রিপুরা রাজ্যেই শুধুমাত্র পাওয়া যায়। এছাড়া অসংখ্য প্রজাতির হরিণ, বন্যমহিষ ত্রিপুরার অন্যতম বন্য প্রাণী।

১৯৪৮ সালে আগরতলায় নেতাজী স্কুল, ১৯৫০ সালে আগরতলায় গান্ধীস্কুল, ১৯৫১ সালে উদয়পুরে রমেশ স্কুল সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের প্রয়োজনেই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত প্রসার শুরু হয়েছিল। যার প্রভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতি যুবকরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার তাগিদ অনুভব করে এবং স্কুলের বোর্ডিং হাউস থেকে পড়াশোনা করা শুরু করে।

১৯৪৭ সালে আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ চালু হলেও বস্তুতপক্ষে তার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। এ কলেজে সাধারণ ডিগ্রি ছাড়াও কারিগরি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি চালু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু মহারাজ বীরবিক্রমের ৩৯ বছর বয়সে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অকাল প্রয়াণ এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে নির্মীয়মান কলেজ চলে যায় সেনাবাহিনীর দখলে। তাছাড়া কৈলাশহরে কিছু বর্ধিষ্ণু মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য তাপস চৈতন্য মহারাজের উদ্যোগে কৈলাশহরে আর.কে.এস.পি স্কুল এবং মহাবিদ্যালয়ের স্থাপন হয়েছিল ১৯৫০ সালে। কাজেই গত শতকের পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙ্গালিদের অধিক সংখ্যায় আগমনের ফলে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত খুলেছিল তা সংশয়াতীত।

বর্তমানে ত্রিপুরার এন.আই.টি, তিনটি মেডিকেল কলেজ, ন্যাশন্যাল ল ইউনিভার্সিটি-সহ বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করে।

**চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ** রাজন্য ত্রিপুরা ছিল মূলত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নির্ভর। শ্রী প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব যাঁর নামেও আগরতলায় প্রভাত মার্কেট হয়েছে। ১৭ জুলাই ১৯২০ সালে মহারাজ বীর বিক্রমের প্রভাতবাবুকে দেওয়া

*With Best Compliments from -*

**Ganpati Laminators**

**&**

**Packagers Pvt. Ltd.**

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

সার্টিফিকেট নিম্নরূপ— (সার্টিফিকেটের ছবি)

বাসন্তী ঔষধালয় ১৮৯৩ সালে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করেন কবিরাজ নবকুমার ভট্টাচার্য্য। ১৯৪৬ সালে আগরতলায় তা স্থানান্তরিত হয় এবং বর্তমানেও ডাঃ পি ভট্টাচার্য্য ওই বাসন্তী ঔষধালয় চালিয়ে যাচ্ছেন।

**রাজনীতি ঃ** বিশেষত গত শতাব্দীর চার এর দশকের শেষ দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সময়। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্যেও পড়েছিল। উমেশ চন্দ্র সিংহ, শচীন্দ্র লাল সিংহ, অঘোর দেববর্মন, বীরেন দত্ত প্রমুখ প্রজাদের অধিকার আদায়ে একসঙ্গে আন্দোলন করলেও পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট ভাবধারার আকর্ষণে অঘোর বাবু, বীরেনবাবুরা মূলত পাহাড়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। পাহাড়ের কুড়িটা সিটের মধ্যে প্রায় সবকটি দীর্ঘদিন তাঁদের দখলেই ছিল। যদিও বর্তমানে শূন্য। গত শতকের সত্তরের দশকে পাহাড়ের উপজাতি সমাজের নিজস্ব নেতৃত্ব তৈরি করার তাগিদে টি.ইউ.জে.এস তৈরি হয় এবং সাফল্যও পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আই.এন.পিটি.এন.এস,পি.টি আই, পি.এফ.টি ইত্যাদি দল হয়ে বর্তমানে তিপ্রা মথা দলের আত্মপ্রকাশ হয়েছে ত্রিপুরার রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে। বর্তমানে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তিপ্রা মথার দখলে আছে।



*রবিঠাকুর ও ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য*

ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অধীনে বর্তমানে ৫৮৬টি ভিলেজ কমিটি আছে। ১৯৮২ সালে সংবিধানের ৭ম তফশীলির অধীনে টি.টি.এ.এ.ডি.সি গঠিত হয়ে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯৮৫ সালে তা সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত হয়। টি.টি.এ.এ.ডি.সি-এর আয়তন প্রায় ৭১৩২ স্কোয়ার কিঃমিঃ। উপজাতি ভিত্তিক দলগুলো জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য টি.টি.এ.এ.ডি.সি-এর অধিক ক্ষমতার দাবি করে আসছে।

**ত্রিপুরা রাজ্যের ক্লাব সংস্কৃতি ঃ** ১৯২৭-২৮ সালে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণায় আগরতলায় লালবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়িতে 'ছাত্র সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোরা খেলা, লাঠি খেলা বিভিন্ন ব্যায়াম ইত্যাদির প্রভাব বিস্তার হয়। পরবর্তী সময়ে ছাত্র সঙ্ঘ ভেঙে ভ্রাতৃসংঘ নামে অপর একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ছাত্র সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমানে আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মধ্যপাড়া অঞ্চলে, এরপর বিভিন্ন পাড়ায় অন্যান্য ক্লাব গড়ে উঠে। এই ক্লাবগুলো ব্যায়াম প্রদর্শনের দ্বারা মহারাজার আনুকূল্য লাভের প্রচেষ্টা করত। মহারাজা বীরবিক্রম কোনো কোনো সময়ে এসব প্রদর্শনীতে সশরীরে উপস্থিত থেকে উৎসাহ প্রদান করতেন। ক্রমশই ক্লাবগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। অল্পকিছু বছর মাতৃসঙ্ঘ নামে আরও একটি ক্লাবের জন্ম হয়। ভ্রাতৃসংঘ মেয়েদের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল এবং সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এরপর বিভিন্ন এলাকায় আরও অনেক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খেলাধুলা ঃ** উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ছেলেরা সারাভারতে দাপিয়ে ফুটবল খেলছে। ত্রিপুরার পাহাড়ি ছেলেদের অফুরন্ত দম থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পিছিয়ে রয়েছে। মধুমানিক লোধ ও আর্জন আলি নামে দুজন ফুটবলার নিজেদের উদ্যোগে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে ফুটবল খেলেছিল। একই অবস্থা ক্রিকেটে। প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় কোনো আই.পি.এল হয় না। কিন্তু জিমনাস্টিকে ১৯৬৯ সালে শ্রী মন্টু দেবনাথ মস্কো অলিম্পিকে ভারতের হয়ে সোনার পদক জিতেছিলেন। মন্টু দেবনাথ স্যারের সঙ্গে কদিন আগেও আমি কথা বলেছি। তাছাড়া দীপা কর্মকার ভারতের একমাত্র মেয়ে জিমনাস্ট অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে প্রদোনভা ভল্টের মতো কঠিন ভল্ট সফলতার সঙ্গে দিয়েছেন। শুধুমাত্র ল্যান্ডিং-এ সামান্য গণ্ডগোল হওয়ায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিলেন। ত্রিপুরার ভূমিপুত্র সোমদেব দেববর্মা টেনিসে ভারত এমনকী বিশ্বেও পরিচিত নাম।

**পর্যটন ঃ** অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনের বহু স্থান থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির দীনতায় ত্রিপুরা পর্যটনে পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার পর্যটনে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা পর্যটনে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

**মাতাবাড়ী ঃ** একান্ন পীঠের এক পীঠ মাতাবাড়ী বা ত্রিপুরা

সুন্দরী মন্দির উদয়পুরে অবস্থিত। বর্তমান সরকার মাতাবাড়ীর প্রভূত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে পর্যটক-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির কারণে পর্যটনের অন্যতম স্থান হয়ে উঠেছে। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

**নীরমহল ঃ** ভারতের সবচেয়ে বড়ো ওয়াটার প্যালেস নীরমহল ১৯৩০ সালে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য তৈরি করেছিলেন। আগরতলা থেকে যা ৫৩ কিলোমিটার দূরে মেলাঘরে অবস্থিত। বর্তমানে তার আমূল সংস্কার করা হয়েছে। দেখতে অপূর্ব সুন্দর।

**জম্পুই হিলস্ ঃ** চিরবসন্তের জায়গা জম্পুই হিলস্ উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে। আগরতলা থেকে ২২০ কি. মি.দুরত্বে টুরিস্ট লজ আছে। বর্তমানে অনেক হোম স্টে আছে। একরাত কাটালে 'মনে হয় স্বর্গে আছি'।

**ছবিমূরা ঃ** অমরপুরের ছবিমুরা আগরতলা থেকে প্রায় ৮৭ কিলোমিটার। নৌকায় বসে শিব, বিষ্ণু, কার্তিক, দুর্গাদেবীর মূর্তি পাহাড়ে খোদাই করা দেখতে পাওয়া যায়। এযেন নৌকায় করে আমাজনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো।

**ডুম্বর লেইক অমরপুর ঃ** প্রায় ৪১ কিলোমিটার জলাভূমির মধ্যে অসংখ্য দ্বীপ। অন্যতম দ্বীপ নারকেলকুঞ্জ। অনেক লগ্ হাট তৈরি হয়েছে। একটা রাত কাটালে ভ্রমণ পিপাসা মিটবেই। এ আমার অঙ্গীকার। আগরতলা থেকে দূরত্ব ১২৫ কিলোমিটার। একেবারেই মিস্ করবেন না।

**সিপাহিজলা ঃ** আগরতলা শহর থেকে মাত্র ২৮ কিলোমিটার দূরত্বে প্রায় ১৯ স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে এই অভয়ারণ্যে এক বেলা কাটালে পয়সার উশুল হবেই হবে। থাকারও ব্যবস্থা আছে।

**কমলাসাগর ঃ** আগরতলা থেকে ৩০/৪০ মিনিটের রাস্তা। বাংলাদেশ সংলগ্ন এই মন্দির দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে পারলে মন্দ হয় না।

**উনকোটি ঃ** আগরতলা থেকে প্রায় ১৮৬ কিলোমিটার দূরত্ব ৭ম থেকে ৮ম শতাব্দীতে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা বিভিন্ন শিবমূর্তি। এছাড়া রয়েছে আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, চতুর্দশ দেবতার মন্দির, মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ও সংলগ্ন লেইক পার্ক। এক সন্ধ্যা অবশ্যই এখানে বেড়াতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এতবড়ো এলাকা নিয়ে এত সুন্দর কলেজ ও পার্ক ভারতে আছে বলে মনে হয় না।

**থাকার ব্যবস্থা ঃ** উল্লেখিত প্রত্যেকটি স্থানে সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। গুগুলে সব পেয়ে যাবেন। অনলাইন বুকিং করে নেওয়া ভালো। তাছাড়া রয়েছে বেসরকারি হোটেল।

পর্যটকদের সুবিধার জন্য আমি একটি টুরিস্ট গাইড তৈরি করে দিলাম।

রেল বা বিমানে আগরতলা অবতরণ করলে অনুভব করবেন যে একটা সুন্দর রাজ্যে বেড়াতে এসেছেন। গ্যারান্টি দিয়ে রাখলাম। সেদিনটি আগরতলা শহরের চতুর্দশ দেবতার মন্দির-সহ অন্যান্য স্থানগুলি যা উল্লেখ করেছি তা ঘুরে কাটিয়ে দিন। তবে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ দেখতে হবে দিনের বেলায়। টিকিট ৫০ টাকা। আর অফিস টাইমে ত্রিপুরা সরকারের পরিচালিত 'পূর্বাশা' ত্রিপুরা সিল্কের কাপড় এবং অন্যান্য কুটির শিল্প কেনাকাটা করতে পারেন। বিভিন্ন শপিং মল না হয় সেদিনের জন্য বাকি থাক। পরের দিন সকালে স্নান সেরে জল খাবার খেয়ে ৯টার মধ্যে বেরিয়ে যাবেন প্রথমে কমলাসাগর কালী মন্দিরে। সেখান থেকে সিপাহিজলা ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটিয়ে চলে যান নীরমহল। নৌকা দিয়ে নীড়মহল ভ্রমণ করে চলে যাবে উদয়পুর। সে রাতটা উদয়পুরে থেকে যাবেন। মাতাবাড়ীতে গুণবতী গেস্ট হাউস বা শহরের কয়েকটা হোটেলে থাকতে পারেন। তবে উদয়পুর থাকার সেরা জায়গা কিন্তু টেপানিয়া ইকো পার্ক। ২৫০০ টাকায় ডাবল প্রিমিয়ার বেড্ রুম আছে ২টি, তিনটি লগ্ হাট এবং দুটি ট্রি হাউস। অনলাইন বুকিং করে যাবেন। পরের দিন মাতাবাড়ী মন্দিরে পূজা দিয়ে অমরপুরের ছবিমুড়া দেখে দুপুরের খাবার খেয়ে সন্ধ্যার আগে পৌঁছে যান ডম্বুর। অন্ লাইন বুকিং করে যাবেন। বেশ কিছু রির্সট আছে। একটি মায়াবী রাত কাটিয়ে পরের দিন জল খাবার খেয়ে চলে আসুন আগরতলা।

এক রাত কাটিয়ে পরের দিন ট্রেনে করে পেঁচার থল স্টেশনে নেমে গাড়ি নিয়ে চলে যান চিরবসন্তের জায়গা জম্পুই হিলস্। অন লাইন বুকিং করে 'ইডেন' এ থাকুন অথবা হোমস্টে ও অনেক আছে। ঘুরে বেড়ান পাহাড়ে। সন্ধ্যায় অনতিদূরের মিজোরামের পাহাড়ের সৌন্দর্যও উপভোগ করতে পারবেন। জম্পুই হিলসে সন্ধ্যার সৌন্দর্য আপনাকে মোহিত করবেই। সম্ভব হলে পরের দিন উনকোটি দেখে ট্রেনে বা নিজস্ব ভাড়া গাড়ি করে চলে আসুন আগরতলা। আত্মীয়তা অনুভূত হলে আরও দিন দুয়েক ঘুরে কাটান না ঐতিহাসিক শহর আগরতলা। বিভিন্ন মলে শপিং করতে পারেন। আগরতলা থেকে সরাসরি বিমান যায় গৌহাটি, কোলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও চেন্নাই। রেলতো আছেই। নিমন্ত্রণ রইল।



১৯২০ সালে তাসখন্দে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় সম্মেলনে সিপিআই সৃষ্টির মুহূর্ত।

# ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ন্যক্কারজনক ভূমিকা

ড: অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

**তাসের ঘর ও ক্রেমলিনের সুতো**

ইতিহাসের গতিপথ সর্বদা সরলরেখায় চলে না, বিশেষত যখন কোনো রাজনৈতিক দলের আদর্শগত কম্পাস স্বদেশের মাটি ছেড়ে বিদেশের নির্দেশে পরিচালিত হয়। ১৯২০ সালে তাসখন্দের মাটিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং অবনী মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রূণ গঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ১৯২৫ সালে যা কানপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয়, তার জন্মলগ্ন থেকেই এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক স্ববিরোধিতা কাজ করছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যেখানে ছিল ভারতের নিজস্ব মাটি, সমাজ ও সংস্কৃতির বুক থেকে উঠে আসা এক জৈব আন্দোলন, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ আসত সরাসরি মস্কোর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বা কমিন্টার্নের সদর দপ্তর থেকে। স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়েও তাদের কাছে বেশি জরুরি ছিল আন্তর্জাতিক লাল শিবিরের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ। ফলে যখনই মস্কোর স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সংঘাত বেধেছে, তখনই ভারতের কমিউনিস্টরা এক ঐতিহাসিক ও নির্মম বেইমানির পথে পা বাড়িয়েছেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্টদের এই সাম্রাজ্যবাদী তোষণ এবং স্বদেশের পিঠে কুঠারাঘাতের ইতিহাস আজ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মহাতপ্ত অধ্যায়। এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও বিদেশি আনুগত্যের ধারাবাহিকতা কেবল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের মধ্য দিয়েই শেষ হয়নি, বরং স্বাধীন ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রেও এর কুৎসিত রূপ বারবার উন্মোচিত হয়েছে।

**প্রারম্ভিক দ্বন্দ্ব ও অসহযোগের অন্ধ গলি (১৯২৯–১৯৩৪)**

এমন নয় যে ভারতীয় কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তির মিত্র ছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের দমনে অত্যন্ত কঠোর নীতি নিয়েছিল। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ঐতিহাসিক মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ফিলিপ স্প্র্যাট এবং বেঞ্জামিন ব্রাডলির মতো দুই ব্রিটিশ কমিউনিস্ট-সহ মোট ৩২ জন বিশিষ্ট শ্রমিক ও কলোনিয়াল রাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার

করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের অভিযোগ ছিল যে, এই আসামিরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে প্রবেশ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি শ্রমিক বিপ্লব এবং প্রলেতারিয়েতে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য দেশজুড়ে গোপন চক্রান্ত চালাচ্ছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১-এ ধারায় অভিযুক্ত এই নেতাদের পক্ষে কংগ্রেসের শীর্ষ আইনজীবীরা সওয়াল করেছিলেন এবং এই দীর্ঘ মামলাটি ১৯৩৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত চলেছিল।

কিন্তু এই নির্যাতনের বিপরীতে কমিউনিস্টদের আচরণ ছিল চরম সুবিধাবাদী। ১৯৩০ সালের কমিন্টার্নের দশম প্লেনামের নির্দেশে যখন 'শ্রেণী বনাম শ্রেণী' এবং 'সোশ্যাল ফ্যাসিজম' তত্ত্ব আমদানি করা হলো, তখন ভারতের কমিউনিস্টরা নিজেদের দেশের স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। কমিন্টার্নের মুখপত্র 'ইমপ্রেকোর' বা 'ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপন্ডেন্স'-এ প্রকাশিত ১৯৩০ সালের 'খসড়া কর্মসূচি' অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের 'বুর্জোয়া সংস্কারবাদ' উন্মোচন করতে এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের তীব্র বিরোধিতা করতে।

এরই ফলশ্রুতি হিসেবে, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যখন হাজার হাজার ভারতবাসী বুক পেতে ব্রিটিশের লাঠি ও বুলেট বরণ করছিলেন, তখন কমিউনিস্টরা আন্দোলনকে 'ধনীর স্বপ্নের চাল' আখ্যা দিয়ে এর থেকে দূরে সরে থাকেন। এমনকী তারা লবণ সত্যাগ্রহ বা সল্ট ট্যাক্স বাতিলের আন্দোলনকে ভারতীয় ধনী ব্যক্তিদের ও বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র ও সুবিধাবাদী কৌশল বলে অভিহিত করেছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে তাঁরা ভারতীয় জনগণের স্বার্থের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা বলে দেগে দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কঠোর সমালোচনা করে লিখেছিলেন যে, উগ্র-বামপন্থী অতিবুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বিপ্লবী দাবি করলেও স্বদেশের মূল গণ-আন্দোলনকে বুর্জোয়া আখ্যা দিয়ে চরম সংকটকালে ঘরের কোণে বসে রইলেন এবং প্রকারান্তরে ঔপনিবেশিক শাসনকে পরোক্ষ সুবিধা পাইয়ে দিলেন।

**বিশ্বযুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ ঃ রাতারাতি ভোলবদল এবং 'জনযুদ্ধ'**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্বে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে জুন ১৯৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, কমিউনিস্টরা কমিন্টার্নের নির্দেশে এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তৎকালীন সময়ে বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল মিলের ৯০ হাজার শ্রমিক ঐতিহাসিক ধর্মঘট (২ অক্টোবর ১৯৩৯)-সহ একাধিক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তারা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু এই তথাকথিত আদর্শগত ধারাবাহিকতা ধূলিসাৎ হয়ে গেল ১৯৪১ সালের ২২ জুন। নাৎসি জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে রাতারাতি সাম্রাজ্যবাদী শোষক ব্রিটিশ হয়ে গেল 'মহৎ মিত্র'।

পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলমোচনের চেয়েও তাঁদের কাছে বড়ো হয়ে উঠল সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ রক্ষা। তাঁরা আওয়াজ তুললেন—এই যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদীদের কামড়াকামড়ি নয়, এটি হলো সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতকে রক্ষার পবিত্র 'জনযুদ্ধ'। মস্কো থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্টদের কাছে নির্দেশ নিয়ে এলেন কুখ্যাত কোরিয়ার আছাড় সিংহ ছিনা ওরফে লারকিন, যিনি কমিন্টার্নের সরাসরি বার্তাবাহক হিসেবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। এমনকী ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল নিজে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির হ্যারি পলিটের একটি দেওলি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মুজফফ্‌র আহমেদ ও বি.টি. রণদিভের হাতে পৌঁছে দিলেন। যেখানে নির্দেশ ছিল—অবিলম্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ করে যুদ্ধ উৎপাদনে সর্বাত্মক সাহায্য করতে হবে।

কমিউনিস্টরা রাতারাতি ঘোষণা করলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এখন অপ্রাসঙ্গিক, ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনো 'শর্ত ছাড়াই' সর্বাত্মক সাহায্য জোগানোই হলো কমিউনিস্টদের প্রধান ধর্ম। প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক ডি. এন. গুপ্তার 'কমিউনিজম অ্যান্ড ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক বেইমানির নিখুঁত বিবরণ নথিভুক্ত রয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে একটি দেশীয় রাজনৈতিক দল বিদেশের ভূরাজনৈতিক স্বার্থে নিজের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে স্থগিত করার ঘোষণা দেয়।

**জোশী-ম্যাক্সওয়েল চুক্তি ঃ স্বরাষ্ট্র দপ্তরে বেইজিং ও মস্কোর কোলাকুলি**

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। ১৯৩৪ সাল থেকে নিষিদ্ধ থাকা কমিউনিস্ট পার্টিকে ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই রাতারাতি বৈধতা দেওয়া হলো—যা ছিল ৮ আগস্ট কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণের ঠিক পনেরো দিন আগের ঘটনা। এই বৈধতা লাভের পর ব্রিটিশ সরকার দ্রুত জেলখানা থেকে বি. টি. রণদিভে, আর.এস.নিম্বকর, এস. জি পাটকর, এস. এস মিরাজকর এবং সাজ্জাদ জাহিরের মতো উগ্র কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্তি দেয়, যাতে তারা বাইরে এসে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করতে পারে। কমিউনিস্ট এবং তাদের সহযোগী এন. এম. জোশী পরিকল্পিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিজেদের উপযোগিতা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ জোশী এবং ব্রিটিশ ভারতের স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং গোপন সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়, যা ইতিহাসে 'জোশী-ম্যাক্সওয়েল প্যাক্ট' নামে




পরিচিত। প্রখ্যাত কলামিস্ট অরুণ শৌরির প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দ্য ওনলি ফাদারল্যান্ড'-এ জাতীয় আর্কাইভের নথিপত্র ঘেঁটে প্রমাণ করা হয়েছে যে জোশী স্বরাষ্ট্র সচিব ম্যাক্সওয়েলের কাছে একটি ১২০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ কর্ম-বিবরণী রিপোর্ট ও চিঠি পেশ করেছিলেন। এই রিপোর্টে জোশী গর্ব করে দাবি করেছিলেন যে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে দমন করতে এবং যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট শিল্পে জাতীয়তাবাদীদের ধর্মঘট আটকাতে কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ পুলিশের চেয়েও বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য এস. এস. বাতলিওয়ালার সাক্ষ্য অনুসারে (যা পরবর্তীতে বোম্বাইয়ের সংবাদমাধ্যমে বিস্তারিত প্রকাশিত হয়), এই সমঝোতার অধীনে কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ সেনা গোয়েন্দা দপ্তরকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা, রুট, গতিবিধি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের মুভমেন্ট এবং বোম্বাই ও কলকাতার কলকারখানাগুলোর বিপ্লবী শ্রমিকদের নামের তালিকা বা ব্ল্যাকলিস্ট সরবরাহ করতেন। কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ রাজের কাছে গর্ব করতেন যে তারা সফলভাবে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে বিভক্ত করতে পেরেছেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কে. কে. চৌধুরী তাঁর 'কুইট ইন্ডিয়া রেভল্যুশন : দ্য ইথোস অফ ইটস্ সেন্ট্রাল ডিরেকশন' গ্রন্থে লিখেছেন যে, জোশীর সেই ১২০ পৃষ্ঠার পারফরম্যান্স রিপোর্ট ভারতের স্বাধীনতার প্রতি এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর মতে, কোনো কুইসলিং বা সাম্রাজ্যবাদী দালালও ব্রিটিশের তোষণে এর চেয়ে নিখুঁত প্রতিবেদন তৈরি করতে পারত না। কমিউনিস্টদের নিজস্ব মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার'-এর পাতায় জোশী গর্ব করে লিখেছিলেন, ''আমরা আমাদের স্ট্রাইক পলিসি পরিহার করেছি, কারণ আমরা একে জাতীয়তাবিরোধী এবং জাপানি আগ্রাসন- কারীদের সাহায্যকারী বলে মনে করি।''

**নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কদর্য চরিত্রহনন**

কমিউনিস্টদের প্রচারপত্র 'পিপলস ওয়ার' সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের অর্থ, কাগজ ও লাইসেন্সের বিশেষ অনুমতিতে প্রকাশিত হতো। এর তীব্রতা দেখে ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব স্যার রিচার্ড টটেনহ্যাম সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ফাইলে নোট লিখেছিলেন, ''Better and better'' (আরও ভালো হচ্ছে)।

এই মুখপত্রে সবচেয়ে নোংরা ও কদর্য আক্রমণ শানানো হয়েছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর। যে বীর জওয়ানরা ব্রিটিশের জাঁতাকল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে জীবন দিচ্ছিলেন, কমিউনিস্টদের চোখে তাঁরা ছিলেন 'দস্যু' ও 'দাবার বোড়ে'। প্রখ্যাত গবেষক টি. জে. নসিটারের 'মার্ক্সবাদ ইন আ মিক্সড ইকোনমি' গ্রন্থে এই কুৎসিত মিডিয়া প্রচারের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকার ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের প্রতিটি সংখ্যায় নেতাজীকে চিত্রিত করা হয়েছিল অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ কার্টুনের মাধ্যমে ঃ

১৯৪২ সালের ১৯ জুলাইয়ের কার্টুনে নেতাজীকে দেখানো হয় এক বিশ্বস্ত 'গাধা' হিসেবে, যার পিঠে চড়ে জাপানি প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো চাবুক মারছে।

১৯৪২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের কার্টুনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখানো হয় নাৎসি প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের কোলে বসে থাকা এক 'নেড়িকুত্তা' হিসেবে।

১৯৪৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের কার্টুনে নেতাজী ছিলেন

জাপানি সাম্রাজ্যবাদী রাক্ষসের হাতের পুতুল বা এক বামন, যাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খেলাচ্ছে।

অন্যান্য কার্টুনে নেতাজিকে জাপানি যুদ্ধ দানবের মুখে ঢাকা একটি নিছক ফেয়ার-কালারড ফেস মাস্ক বা মুখোশ হিসেবেও দেখানো হয়, যার আসল উদ্দেশ্য ভারতের বুকে দাঙ্গা ও হত্যা ছড়ানো। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতা বি. টি. রণদিভে ১৯৪২ সালের ৬ ডিসেম্বর 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকায় সরাসরি লিখেছিলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হলেন 'জাপানি সাম্রাজ্যবাদের ডাকাত' এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ হলো 'লুটেরা ও ডাকাতদের একটি ভাড়াটে সৈন্যদল'। কেরালা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি. কৃষ্ণ পিল্লাই ১৯৪২ সালের ৪ অক্টোবর 'দেশাভিমানী' পত্রিকায় নেতাজীকে 'নর্দমার কীট' ও 'জাপানিদের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া ঘৃণ্য দেশদ্রোহী' বলে কুৎসা রটিয়েছিলেন। এমনকি বেইজিং রেডিয়োর সুরে সুর মিলিয়ে কমিউনিস্টরা দাবি করেছিল যে, সুভাষ বসু রেঙ্গুনের এক বিলাসবহুল প্রাসাদে জাপানিদের দেওয়া নোংরা টাকায় আমোদ-প্রমোদে মেতে আছেন। তবে সবচেয়ে বড়ো ও সুবিধাবাদী ভোলবদল ঘটে ১৯৪৬ সালে, যখন লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে আবেগের বন্যা বয়ে যায়, তখন এই কমিউনিস্টরাই নিজেদের পাপ ঢাকতে নেতাজির মেকি জয়ধ্বনি দেওয়া শুরু করে।

১৯৪৩ সালের বঙ্গে দুর্ভিক্ষের সময় যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা ২৫০টিরও বেশি ত্রাণ শিবির গড়ে তুলেছিলেন, তখন কমিউনিস্টরা ব্রিটিশের শস্য বাজেয়াপ্তকরণ নীতির সমালোচনা না করে কেবল 'হিন্দু মজুতদারদের' দায়ী করে ব্রিটিশ ও মুসলিম লিগের ইশপাহানি মিনিস্ট্রিকে সম্পূর্ণ আড়াল করেছিল, যা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের 'থ্রি এসেস অন দি এনকোয়ারি' প্রবন্ধে কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে। কমিউনিস্টরা গঠিত ফুড কমিটিগুলোতে আসলে স্টালিনের শস্য বাজেয়াপ্তকরণের অনুরূপ কাজই বাংলায় করছিল।

**দেশভাগের চক্রান্ত ঃ 'অধিকারী থিসিস' (১৯৪২)**

ভারতের ইতিহাসে কমিউনিস্টদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হলো মহম্মদ আলি জিন্নার 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' এবং ভারতের ভৌগোলিক খণ্ডীকরণকে তাত্ত্বিক ন্যায্যতা প্রদান করা। ১৯৪২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী একটি প্রস্তাব পাশ করেন, যা ইতিহাসে 'অধিকারী থিসিস' নামে কুখ্যাত। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. সি. জোশী আর্কাইভে (File CPI-31/1942) সংরক্ষিত এই থিসিসটির মূল বক্তব্য ছিল—ভারত কোনো একটি একক রাষ্ট্র বা জাতি নয়; এটি আসলে আঠারোটি সার্বভৌম রাজ্যের এক কৃত্রিম জগাখিচুড়ি।

স্টালিনের ১৯১৩ 'মার্ক্সবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন' নিবন্ধের বিকৃত অপব্যাখ্যা করে অধিকারী তাঁর ১৯৪৩ সালের পুস্তিকা 'পাকিস্তান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিটি'-তে দাবি করেছিলেন যে, জিন্নার পাকিস্তানের দাবি কোনো সাম্প্রদায়িক দাবি নয়, বরং মুসলমান জনগণের 'প্রগতিশীল স্বাধিকার আন্দোলন'। এই থিসিসের ভিত্তিতেই কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগকে 'প্রগতিশীল শক্তি' বলে ছাড়পত্র দেয় এবং সাজ্জাদ জাহির, আবদুল্লা মালিক ও দানিয়াল লতিফির মতো ধুরন্ধর কমিউনিস্ট নেতাদের আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লিগে যোগ দিয়ে দেশভাগের আন্দোলনকে তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের ক্রিপস মিশন ও ক্যাবিনেট মিশনের কাছে দেওয়া স্মারকলিপিতে কমিউনিস্টরা দাবি করেছিল যে, ভারতকে একটি স্বাধীন দেশ না করে আঠারোটি অন্তর্বর্তীকালীন সার্বভৌম দেশে ভেঙে দেওয়া হোক, যা ছিল একটি কনফেডারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস-এ ব্লুপ্রিন্ট। বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী লেখক ও প্রামাণ্য সমাজকর্মী খাজা আহমেদ আব্বাস পরবর্তীতে লিখেছিলেন যে, কমিউনিস্টরা মুসলমান বিচ্ছিন্নতা -বাদীদের হাতে তাত্ত্বিক অস্ত্র তুলে দিয়ে ভারতকে হত্যা করেছে।

**স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ১৯৬২-র চরম বিশ্বাসঘাতকতা**

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলেও কমিউনিস্টদের দেশবিরোধী চক্রান্ত থেমে থাকেনি। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে জোশীকে সরিয়ে বি.টি.রণদিভে সাধারণ সম্পাদক হন এবং ক্রেমলিনের কোমিনফর্মের মুখপত্র 'ফর আ লাস্টিং পিস, ফর আ পিপলস ডেমোক্রেসি'-র নির্দেশে স্লোগান তোলেন—'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। তাঁরা স্বাধীন ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিদ্রোহের নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানো হয়, যেখানে প্রায় ৪ হাজার গ্রামে সমান্তরাল 'গ্রাম রাজ্যম' গড়ে তুলে ভারতের ভৌগোলিক সংহতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

কিন্তু চূড়ান্ত বেইমানি ঘটে ১৯৬২ সালের ভারত–চীন যুদ্ধের সময়। বাম পার্টির উগ্র চীনাপন্থী অংশটি (যারা ১৯৬৪ সালে সিপিআই-এম গঠন করে), যার নেতৃত্বে ছিলেন হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ ও বাসভপুন্নিয়া, (উইকিলিকসের ডিক্লাসিফায়েড নথি ও সিআই-এর 'পলো' এবং 'সিজার' সিরিজের রিপোর্ট অনুযায়ী) তারা ১৯৫৯ সাল থেকেই ভারতের সীমান্তে চীনা দাবিকে সমর্থন করে আসছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে রণক্ষেত্রে আহত ভারতীয় জওয়ানদের রক্তের যখন তীব্র প্রয়োজন ছিল, তখন কেরলের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ভি. এস. অচ্যুতানন্দনের নেতৃত্বে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পলিটব্যুরো ও পার্টি এই রক্তদানকে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রতোষণ' আখ্যা দিয়ে অচ্যুতানন্দনকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শাস্তিস্বরূপ বহিষ্কার করে

এবং এক বছরের জন্য ব্রাঞ্চ লেভেলে নির্বাসিত করে। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির সশস্ত্র হিংসাত্মক আন্দোলনের সময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস ডেইলি' একে ভারতের বুকে 'বসন্তের বজ্রনিনাদ' বলে স্বাগতও জানিয়েছিল।

**সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণে সোভিয়েত ফান্ডিং ও কুৎসিত হস্তক্ষেপ**

কমিউনিস্টদের এই নীতি ও কর্মসূচি কিন্তু কোনো অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক আলোচনার ফসল ছিল না, তা ছিল বিদেশি শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অর্থায়নে পুষ্ট। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ডিক্লাসিফায়েড মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই-এর বিশেষ রিপোর্ট 'দ্য সোভিয়েতস ইন ইন্ডিয়া' পরিষ্কার তথ্যপ্রমাণ দিয়ে উন্মোচিত করেছে যে কীভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ গোপন আর্থিক অনুদান ও কিক-ব্যাক স্কিমের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। মস্কোর এই আর্থিক সাহায্য দলটির জাতীয় আনুগত্যকে চিরতরে অবদমিত করে রেখেছিল। একই ধারায়, ১৯৭৬ সালের ২৪মে তারিখে প্রণীত সিআইএ মেমোরেন্ডাম 'ইন্ডিয়া : প্রেজেন্ট সিন, ফিউচার প্রসপেক্টস্' প্রকাশ করে যে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার সময়েও কমিউনিস্টরা (সোভিয়েত নির্দেশে কাজ করেছিল যাতে ভারতের সার্বভৌম অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করা যায় এবং স্বাধীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যাহত করা যায়।

**উপসংহার ঃ ইতিহাসের কাঠগড়ায় লাল ইশতেহার**

১৯৬৪ সালের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ''১৯৪২ সালের আন্দোলনে শামিল না হওয়া এবং পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করা আমাদের চরম ভুল ছিল যা পার্টির ভাবমূর্তি চিরতরে ধূলিসাৎ করেছে।'' ২০০২ সালে নেতাজীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকীতে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন 'নেতাজীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁকে দেশদ্রোহী বলা আমাদের ঐতিহাসিক ভুল ছিল।''

ইতিহাসের বিচার বড়ো নির্মম। যে দল একদা সর্বহারাদের অধিকার রক্ষার বুলি আউড়ে ভারতের জাতীয় সত্তা, সার্বভৌমত্ব ও সংস্কৃতিকে বারবার বিদেশি প্রভুদের ইশারায় বলি দিয়েছে, ইতিহাসের পাতায় তাদের কপালে চিরকালের জন্য এঁটে গেছে 'পঞ্চম বাহিনী' এবং 'সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত দালাল'-এর তকমা।

**বিশেষ আকর গ্রন্থ ও রেফারেন্স নির্দেশিকা ঃ**

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রতিটির ঐতিহাসিক সত্যতা ও নথিপত্রের জন্য বিশ্বস্ত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রেফারেন্স গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলো —

(ক) প্রধান ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ ও জাতীয় আর্কাইভ নথিপত্র

(১) Shourie, Arun. The Only Fatherland : Communists, 'Quit India and the Soviet Union, New Delhi ASA Publications, 1991.

জোশী ম্যাক্সওয়েল চুক্তির মূল চিঠিপত্র, ব্রিটিশ হোম ডিপার্টমেন্টের ফাইল এবং পি সি জোশীর ১২০ পৃষ্ঠার পারফরম্যান্স রিপোর্টের অনুলিপি সংবলিত সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

(২) Chaudhury, K K. Quit India Revolution : The Ethos of its Central Direction. Mumbai : Popular Prakashan, 1996.

ভারত ছাড়ো আন্দোলনকালে কমিউনিস্টদের ধর্মঘট দমন এবং ব্রিটিশ তোষণের চুলচেরা বিশ্লেষণ।

(৩) Gupta, D.N. Communism and Nationalism in Colonial India. New Delhi : Sage Publications, 2008.

১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত বিবর্তন ও জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতার চমৎকার বিবরণ।

(৪) Overstreet, Gene D., and Marshal Windmiller. Communism in India. Berkeley : University of California Press, 1959.

ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম দিককার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ এবং কমিন্টার্নের প্রভাব নিয়ে ধ্রুপদী আকাদেমির কাজ।

(৫) Nossiter, T.J. Marxism in a Mixed Economy : Democratic Socialism in India. West London : Palgrave Macmillan, 1988.

কমিউনিস্টদের মিডিয়া প্রচার 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকার কুরুচিপূর্ণ কার্টুন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চরিত্রহননের ঐতিহাসিক বিবরণ।

**(খ) কমিউনিস্ট দলিল এবং নেতাদের আত্মজীবনী**

(৬) Adhikari, Gangadhar. Paskistan and Indian National Unity, London : Communist Party of Great Britain, 1943.

দেশভাগের তাত্ত্বিক ভিত্তি বা 'অধিকারী থিসিস'-এর মূল মুদ্রিত দলিল।

(৭) Joshi, Puran Chand. Communist Reply to Congress Working Committee's Charges, Bombay : People's Publishing House, 1945.

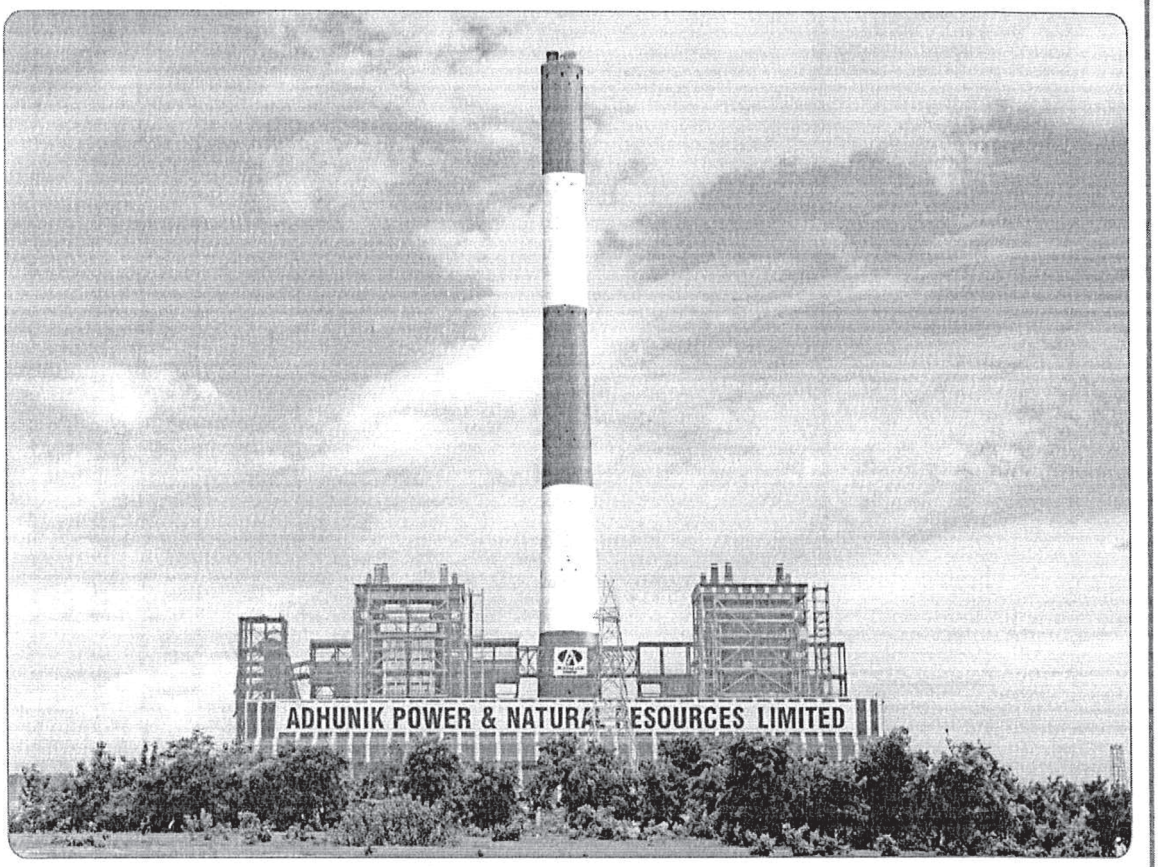
১৯৪৫ সালে কংগ্রেসের 'দালালি'র প্রত্যুত্তরে পি সি জোশীর সাফাই ও দ্বিচারিতার আত্মপক্ষ সমর্থন। ১৯৬২-র যুদ্ধে চীনপন্থী কমিউনিস্টদের আন্ডারগ্রাউন্ড কার্যকলাপ এবং রক্তদান বিতর্ক নিয়ে জ্যোতি বসুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

Basu Jyoti. Memoirs : A Political Autobiography, Calcutta : National Book Agency, 1997.

১৯৬২-র যুদ্ধে চীনপন্থী কমিউনিস্টদের আন্ডারগ্রাউন্ড কার্যকলাপ এবং রক্তদান বিতর্ক নিয়ে জ্যোতি বসুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। □

# Adhunik Power & Natural Resources Ltd

**Adhunik Power And Natural Resources (APNRL) is an Independent Power Producer (IPP) owning and operating a 2x270 MW coal based thermal power plant in Padampur, Saraikela-Kharsawan, Jharkhand State. APNRL inaugurated its first unit of 2x270 MW coal fired thermal power plant.**




**Lansdowne Towers, 2/1A, Sarat Bose Road,**
**Kolkata, West Bengal, Bharat- 700020**
**website:info@adhunikgroup.com**



# বনবহ্নি— রানি শিরোমণি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

**... তেমন মুগুর।**

কিছু নিলে যে কিছু দিতেও হয় সাহেব। না হলে যে মান থাকে না। মনে হবে বুঝি ভিক্ষে চাইছে।

এমন উত্তর আশা করেনি লেঃ ফার্গুশন। মেদিনীপুরে কোম্পানির সেনাপ্রধানের মুখের ওপর এমন কথা! তাও এক নেটিভ মহিলার। রাগে লাল মুখটা আরও লাল হয়ে ওঠে। মেজাজ হারানোর মুখে একটু থমকিয়ে তির্যকভাবে ফার্গুশনের প্রশ্ন, অর্থাৎ—

কর্ণগড়ের রানি শিরোমণিরও তেমনই বাঁকা সুরে উত্তর, তোমাদের প্রার্থনা মতো সেনা দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করতে পারি। কিন্তু তার জন্য যে টাকা দিতে হবে।

—টাকা! আমাদের!

—হ্যাঁ তোমাদের। বেনিয়া তোমরা। মাল কেনা-বেচা করো, সেটা কি মুফতে হয়। তারজন্য দাম দিতে হয় না?

কথাটা শুনেই চিৎকার করে বলতে চায় লেঃ ফার্গুশন, এত স্পর্ধা! তাও সামান্য এক নারীর! জানে না কার সঙ্গে কথা বলছে! আমার কাছে টাকা চাইছে। আমরা যে দেশের রাজা, কথাটা কি ভুলে গেছে রানি! রানি কি জানে না আমরা টাকা নিই, দিই না।

মনে মনে এসব কথা বলে যেন একটু দম নেয় ফার্গুশন, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, সরি! আমাদের সেনার দরকার নেই।

গজ গজ করতে করতে বিদায় নেয় লেঃ ফার্গুশন। ভাবে, বঙ্গের নবাবের মসনদ নিয়ে ব্যবসা করেছি আমরা। যাকে ইচ্ছে তাকেই গদিতে বসাচ্ছি চাহিদা মতো অর্থ পেতেই, সেই নবাবের অধীন এক জমিদারের কিনা এমন মেজাজ। কোথায় সাহায্য চাইছি বলে ধন্য হবে, তা না টাকা চাইছে! এত ঔদ্ধত্য! যোগ্য জবাব দেব এর।

ফার্গুশনের এহেন আস্ফালনের অবশ্যই কিছু কারণ আছে। অষ্টাদশ শতকের এই শেষপর্বে ভাগ্য ছিল ইংরেজের সহায়। সেনা বা শক্তি নয়, কূটবুদ্ধি, চক্রান্ত আর প্রতারণার পথ ধরে আজ তারা রাজা। পলাশিতে সিরাজের বিরাট বাহিনীকে হারিয়েছে কিছু নিমকহারামের হাত ধরে। ইংরেজ জানে, বিশ্বাসঘাতকরাই প্রকৃত ভরসা। শক্তিও।

পলাশিতে নবাবের সিপাহশলার মিরজাফর এবং কিছু বিশ্বাসঘাতক নিজেরাই এগিয়ে এসে হাত মেলায় কোম্পানির সঙ্গে। বেইমানি করে নবাব সিরাজকে হারায় হত্যা করে। বিদেশি বণিক ইংরেজকে জিতিয়ে দেশের স্বাধীনতাকেই বিকিয়ে দেয় লোভী চক্রান্তকারীরা।

**শুরু হয় শোষণ, লুণ্ঠন**

আর ইংরেজ ফাঁকতালে জিতে নামে এক বিচিত্র খেলায়। মিরজাফরকে নবাবের তখতে বসিয়ে আদায় করে বিরাট অঙ্কের নজরানা। নবাবের প্রায় পুরো কোষাগারটাই হয় বণিক ইংরেজের। আর তখনই মিরজাফরকেও সরিয়ে তখতে মিরকাশিমকে তারা বসায় আরও বেশি অর্থ পাবার আশায়।

মিরকাশিম নবাবের গদিতে বসে দেখেন, কোষাগার ফাঁকা। কোথা থেকে দেবেন টাকা? নিরুপায় মিরকাশিম নগদ অর্থের বদলে ইংরেজের হাতে তুলে দেয় মেদিনীপুর-সহ তিনটি জেলা। কোম্পানি হয় ওই তিন জেলার মালিক। সব রাজস্বই তাদের। এক অর্থে এদেশে ইংরেজের রাজা হওয়ার পথটা খুলে যায় এখান থেকেই।

ইংরেজ অবশ্য তারই মধ্যে দিল্লির মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে সুবে বাঙ্গলার দেওয়ানি। আর সেই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় তাদের লুঠ ও শোষণের পালা। নিত্যনতুন আইনের ফাঁসে তারা অধিকারচ্যুত করতে থাকে একের পর এক জমিদারকে। সেই রহিত করে নিষ্কর জমি ভোগের অধিকার।

তারই মধ্যে ঘটে ১৭৭০-এর মহা দুর্ভিক্ষ। প্রাণ যায় হাজার হাজার মানুষের। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম। বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস লন্ডনে বড় কর্তাদের কাছে সবকিছু জানিয়ে বলেন বঙ্গের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই কমে গেছে এই দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরে। তার ফলে কম আদায় হচ্ছে বার্ষিক রাজস্বও।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি পাওয়ার পরই যেনতেন প্রকারেণ এদেশ থেকে অর্থ লুণ্ঠনের খেলা শুরু করে। প্রতি বছরই তারা রাজস্ব আদায়ের একটি লক্ষ্য ধার্য করে। সেই লক্ষ্য মতো অর্থ আদায়ের জন্য তারা নানা ফন্দিফিকির বের করে কার্যত জমিদার থেকে সাধারণ মানুষ, জমিদারদের আমলে নিষ্কর জমির অধিকারী পত্রিক বা নানা শ্রেণীর নিম্নবর্গীয়দের উৎখাত করে এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৭৮৬-৬৯ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ১৫,২৪, ৫৬৭ পাউন্ড। আদায় হয়েছিল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্যমাত্রা একই থাকলেও আদায় হয় মাত্র ৬৫, ৩৫৫ পাউন্ড। রাজস্ব আদায় এত কম হওয়ার কারণ হিসেবে জানানো হয় দুর্ভিক্ষ-মড়কে বহু লোকের মারা যাওয়া বা দেশান্তরী হওয়ার কারণে বহু জমি অনাবাদী থেকে যায়। তাছাড়া ফসলের উৎপাদন কম হওয়ার কারণেও রাজস্ব আদায় কমেছে।

**বিদ্রোহের সূচনা**

রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির সরকার যেসব ভূমি সংস্কার নীতি নেয় তাতে দেশের স্থিতিশীল কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে। বহু জমিদার নিঃস্ব হয়। বহু কৃষক ও কৃষিকর্মী, পাইক ইত্যাদি কর্মচ্যুত, বাস্তুচ্যুত হয়ে কার্যত জীবন-মরণের প্রান্তে দাঁড়ায়। পরিণতিতে সব হারানো ওই মানুষগুলি বিদ্রোহ শুরু করে। চোরাগোপ্তা আক্রমণে তারা ইংরেজদের একেবারে নাজেহাল করতে শুরু করে। সেই বিদ্রোহ দমন করার মতো উপযুক্ত সৈন্য কোম্পানির ছিল না। সে কারণে তারা জমিদারদের নিজস্ব লেঠেল এবং সেনাদের সাহায্য চায়।

কোম্পানির তাঁবেদার একশ্রেণীর জমিদার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সেই অনুরোধে সাড়া দেয়। ফলে তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী দিয়ে নয়, তাঁরা নিজেরাও সাধারণ মানুষের ওই জাগরণকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে নিজেরাও দণ্ডধর হয়ে উঠেন। ইংরেজ সাধারণ মানুষের এই প্রতিবাদকে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' বলে নিজেদের দাম্ভিকতারই পরিচয় দিয়েছে।

ওই রকম অবস্থায় অন্যান্যদের মতো কর্ণগড়ের রানি শিরোমণির কাছেও দূত পাঠায়। সেই দূতের কাছে সেনা পাঠাবার বিনিময়ে অর্থ চেয়ে বসেন রানি। আর তাতেই চটে লাল

ফার্গুসন। বিদ্রোহীদের পরিবর্তে তারা রানির বিরুদ্ধেই অভিযান চালায়। সেই অভিযান পর্বে যাওয়ার আগে বরং চোখ বোলানো যাক রানি শিরোমণির জীবনপাতায়।

**কৃষক কন্যা হলো রাজরানি**

পারাং নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম আনন্দপুর। ছবির মতো গ্রামটি নানারকম গাছপালায় ছায়ায় ঢাকা। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষেরই জীবিকা কৃষি। সম্পন্ন না হলেও গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মানুষ মোটামুটি খেয়ে পরে শান্তিতেই বসবাস করে।

বর্তমান কেশিয়াড়ির সেই গ্রামেরই এক কৃষক পরিবারের কর্তা বৈদ্যনাথ সরকার। বৈদ্যনাথের স্ত্রীর নাম শান্তিমণি। শান্তিমণির কারণেই পরিবারটির সব কিছুতেই রয়েছে একটা লক্ষ্মীশ্রী। গ্রামের সকলেই বলে, শান্তিমণির জন্যই সরকারদের এত সমৃদ্ধি। বৈদ্যনাথ ও শান্তিমণিরই মেয়ে শিরোমণি। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, কেবল শিরোমণি নয়, পরিবারের বড়ো মেয়ের নাম ভবানী।

এই দুই বোনকেই বিয়ে করেন কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহ। তবে কিছু গবেষকের অভিমত, ভবানী ছিলেন বড়ো রানি। অজিত সিংহের প্রথম স্ত্রী। শিরোমণিকে রাজা বিয়ে করেন তুলনায় কিছু বেশি বয়সে। সেদিক থেকে শিরোমণি ভবানীর তুলনায় বয়সে অনেকটাই ছোটো। আর তাই সপত্ন নয়, প্রথম থেকেই ভবানী নেয় শিরোমণিকে দিদির মতো আগলে রাখার দায়। শিরোমণিও দিদিঅন্ত প্রাণ। অন্তঃপুরে নেই কলহ। তার থেকেই অনেকের ধারণা, দুই রানি বুঝি সহদোরা।

শিরোমণি ছিল ডাকসাইটে সুন্দরী। তৎকালীন গ্রামীণ পরিবেশে লেখাপড়া তেমন হয়নি। কিন্তু বুদ্ধি চাতুর্যে শিরোমণি ছিল এককথায় অসাধারণ। প্রথম থেকেই সে ছিল একটু ডানপিটে। গ্রামের বনে বনে ঘুরে বেড়াতো সে। কখনও বা পারাং নদীর ধারে বসে থাকত চুপচাপ। নদীর বহমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে ভাবতো কত সব। সে সময় সে যেন এক আপনভোলা সাধিকা। কোনো দিকে হুঁশ থাকত না তার।

আবার হঠাৎ-ই একসময় উঠে যেত কোনো আমগাছে। ডাল ধরে দোল খেত। সে সময় তাকে মনে হতো যেন কোনো বনবালিকা। অরণ্যকন্যা। কেবল বনে বনে ঘুরে বেড়ানো নয়, ছেলের দলে মিশে করত দৌড়ঝাঁপ। নানা খেলাধুলা, লাঠিখেলা, তির-ধনুক বা গুলতি ছুঁড়ে আকাশে ভেসে যাওয়া পাখি মারা বা গাছের ফল পাড়া—এই সব আর কী । সব খেলাতেই শিরোমণি পাল্লা দিত ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে। তাই-বা কেন, সেই ছিল সেরা। তারই জন্য ছেলের দলেরও সেই মেয়েই ছিল সর্দার।

দলের একটি ছেলে কিন্তু শিরোমণির এই সর্দারিটা ঠিক মেনে নিতে পারত না। বারবারই তার মনে খচখচ করত একটা কথা, ছেলের দলের সর্দারি করবে কেন একটি মেয়ে? মেয়েরা তো সব সময়ই ছেলেদের মানবে। তাদেরই কথায় ওঠবোস করবে, এমনটাই তো নিয়ম। তাহলে এখানে কেন অন্যরকম হবে? আর তাই খেলায় থাকলেও ছেলেটি বেশ গম্ভীর হয়ে থাকত। একটু মুরুব্বি মুরুব্বি ভাব আর কী। তাই খেলুড়ে হলেও অন্য সকলেও তাকে একটু সমীহই করত।

শিরোমণি কিন্তু ছেলেটিকে সেভাবে পাত্তাই দিত না। বরং 'জ্যেঠামশাই' বলে তাকে খেপাতো। আর তাতেই মেজাজ হারাতো ছেলেটি। দল ছেড়ে দূরে বসে থাকত। শিরোমণিই তখন তার মান ভাঙাতো। হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেত খেলার জায়গায়।

শিরোমণির ছেলেবেলার ওই সাথীটির নাম জনার্দন। ওরা এক গাঁয়েতেই থাকে। ছেলেটি অবশ্য বয়সে শিরোমণির চেয়ে বেশ কিছু বড়োই। কিন্তু মানুষের জীবনের সকালবেলার নিয়মটাই ওইরকম। দু'চার-পাঁচ বছরের কম-বেশিতে মেলামেশা বা খেলাধুলায় তেমন বাধা হলো না তার। একসঙ্গেই বাড়তে থাকে তারা। ছেলেটির রূপ যে কখন অনুরাগে গাঢ় হয়েছে তা জানে না সে। শিরোমণির মনেও সেই রঙের ছোঁয়া লেগেছিল কিনা তা জানা নেই। তবে কোনো কারণে ছেলেটি কোনোদিন না এলে সবকিছু কেমন যেন এক মনখারাপ করা বিষণ্ণতার গভীরে ডুব দিত। ভালো লাগতো না কিছুই। খেলা ছেড়ে বসে থাকত সে ওই পারাং নদীর পাড়ে।

এমনিভাবেই কাটছিল বেশ দিন। সকলেই আস্তে আস্তে বড় হয়। বাড়ির শাসন বাড়তে থাকে একটু আধটু করে। সেই বাঁধা বুলি—মেয়ে তুমি, এখন আর অমনভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না। লোকে নানা কথা বলবে। তাই সমঝে চলো। একলা চলো।

শিরোমণি আর এখন ছেলেদের সঙ্গে খেলে না। মেশে না, সেভাবে অন্য মেয়েদের সঙ্গেও। অবশ্য মিশবে কী করে, তার সেইসব খেলার সাথীদের যে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে একে একে। আনন্দপুর ছেড়ে তারা যে সব চলে গেছে ভিন গাঁয়ে। তাই শিরোমণি একা।

একলা মেয়ের এখন আর সেভাবে বনেজঙ্গলে ঘোরাফেরা করা হয় না। নানা ধরনের বারণ তার পায়ে যেন শেকল হয়ে ওঠে। অবশ্য নদীর পাড়ে যাওয়ার বাধা নেই তার। একলা মেয়ে তাই সেখানে নদীর সঙ্গে কথা বলে। একাই বলে। কত না কথা। নদীর জলের মতোই সেই কলকলানি—সে-ই বক্তা—শ্রোতাও সে-ই।

নদীর ধার ছাড়া মেয়েটির যাওয়ার আর একটি জায়গা আছে। সেটাও অবশ্য নদীর দিকেই। কমলাসনা দেবীর মন্দির। সেঁউতি চাঁপা আর শিউলি ফুলের গাছে ঘেরা মন্দিরটি ছিল শিরোমণির খুবই প্রিয় জায়গা। যখন তখন চলে আসতো মন্দিরে। এ আসায় কোনো বাধা ছিল না, বরং ছিল এক ধরনের প্রশ্রয়ই।

মন্দিরের ফুলের বনে অথবা মন্দিরের চাতালে একলা মেয়ে শিরোমণি। সেই মন্দিরেই হঠাৎ হঠাৎ চলে আসত জনার্দনও। তার আসাটাও অবাধ।

এই যাওয়া আসার ফাঁকেই কখনও কখনও মুখোমুখি হয়ে যেত তারা। একটু হাসি—অল্প কথা। তারপরে আবার একলা হয়ে

যাওয়া। তারই মধ্যে আকাশে লাগতো রামধনুর সাত-সাতটা রং। জনার্দন রাঙা হতো। শিরোমণির মনেও কি লাগত রং? কে জানে। জানত না ঠিক জনার্দনও। তাই মনের কথা থাকত তার মনেই। কোনো দিনই সে কথা ডালপালা ছড়াতে পারত না আকাশে। কেমন একটা ব্যথায় চিন চিনিয়ে উঠত বুক। এক চিলতে হাসি যেন রাহু হয়ে গিলে খেত তার সব ব্যথা।

বয়স হচ্ছে শিরোমণির। রূপের ছটাও ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে তারই সঙ্গে তাল রেখে। একসময় কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের কানেও যায় রূপবতী শিরোমণির কথা। আর তার পরই দূত বা ঘটক পৌঁছে যায় শিরোমণির বাবা বৈদ্যনাথের দুয়ারে। এটাই ছিল সেকালের জমিদারদের একটা রীতি। প্রথমত, ছোটই হোক আর বড়ই হোক, প্রজারা জমিদারকে ডাকত রাজা বা রাজাবাবু বলে। আর তারই রেশ ধরে জমিদারের বউরা হতেন রানি।

দ্বিতীয়ত, সে সময় বহু বিবাহটা ছিল একটা মর্যাদার ব্যাপার। জমিদারদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। দুই থেকে চার-পাঁচ জন স্ত্রী নিয়ে ঘর করতেন বহু রাজা-জমিদারই। আর এই বিয়ের ব্যাপারে পাত্রীর রূপটাই ছিল বড় কথা। কোন ঘরের মেয়ে বা তার বাবার আর্থিক অবস্থা কী তা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না। কোনো প্রজার ঘরে সুন্দরী মেয়ে আছে খবর পেলেই চলে আসত ওই দূত।

তেমনই এক দূত কড়া নাড়ে বৈদ্যনাথের বাড়িতে। বলে, রাজা অজিত সিংহের কাছ থেকে আসছি। একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

রাজার দূত—বৈদ্যনাথ তো শশব্যস্ত। কী জানি কী করেছে সে। হয়তো চটে আছেন রাজামশাই। সেটা জানাতেই এসেছে কি দূত? তাই প্রায় গলায় গামছা দিয়ে একটু হেঁট হয়েই শুধোয় বৈদ্যনাথ, কী কথা? কী বলেছেন রাজা বাহাদুর।

বৈদ্যনাথের ভাব দেখে দূতের বেশ মজাই লাগে। তাই গম্ভীর হয়ে গিয়েও হেসেই ফেলে সে দূত। হাসি মুখেই বলে, রাজামশাই আপনার মেয়েটিকে চেয়েছেন।

এই চাওয়া কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না বৈদ্যনাথ। তাই খুব নরম আর নীচু গলায় বলে তাকে, চেয়েছেন—কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না! তাই যদি —

—আরে ঘাবড়ার কিছু নেই। আপনার মেয়ে— ওই শিরোমণি যার নাম, রাজামশাই তাকে বিয়ে করতে চান। এখন আপনি যদি রাজি থাকেন—

দূতের কথা শেষ হবার আগেই বৈদ্যনাথ বলেন থাক থাক, আর বলতে হবে না কিছু। কিন্তু তিনি আমার মেয়েকে!

—জানেনই তো আমার অবস্থা।

—তিনি সব জানেন। জেনে শুনেই প্রস্তাবটি পাঠিয়েছেন। শুধু শোনা নয়, কমলাসনার মন্দিরে একদিন আপনার মেয়েকে দেখেওছেন,ভারি পছন্দ তাঁর—

রাজার পছন্দে প্রজা আর না বলে কী করে। তাই অন্য কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলেই বৈদ্যনাথ বলে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। এতে আমার আপত্তির কোনো জায়গাই নেই। আমি রাজি, রাজি এই বিয়েতে।

তাহলে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে নেওয়া যাক। কথাটা বলেই ঝোলা থেকে পাততাড়ি বের করে কীসব আঁক কষে বিয়ের দিন ঠিক করে বিদায় নেয় দূত। আর সেই নির্দিষ্ট দিনেই রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় শিরোমণির।

**আশীর্বাদ—সর্বনাশ**

বিদায়ের আগে কমলাসনার মন্দিরে যায় শিরোমণি। দেবীকে প্রণামের পর বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শিরোমণি। দেখে চারিদিকটা। এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার জীবনের বহু স্মৃতি। অদ্ভুত এক স্মৃতিমেদুরতায় মগ্ন শিরোমণি। হঠাৎ-ই তার চোখ চলে যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণের এক কোণায়। সেখানে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। মুহূর্তের দ্বিধা। ধীরে ধীরে সেই মূর্তির দিকে এগিয়ে যায় শিরোমণি।

মুখোমুখি দু'জন। এক তরুণী আর এক তরুণ। কোনো কথা নয়। কেবলই তাকিয়ে থাকা। শিরোমণি দেখছে সেই মূর্তিকে। সে মূর্তি জনার্দনের। শিরোমণির মনে হয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক পাথরের মূর্তি। স্থির নিষ্পন্দ। পলকহীন তার দু'টি চোখ থেকে যেন বেরিয়ে আসছে তীব্র এক আলো। সে আলো যেন দগ্ধ করতে চায় তাকে। কিন্তু কেন? বুঝতে পারে না শিরোমণি। তাই তাকিয়েই থাকে তার দিকে।

দেখছে জনার্দনও। রুক্ষ দুই চোখে। দেখছে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শিরোমণি। সেই-সেই মেয়েটি—পারাং নদীর মতোই যে ছিল উচ্ছল। কিন্তু আজ যেন ধীরে বয়ে চলেছে পারাং। তরঙ্গহীন, যেন কোনো গভীর বেদনার ভার নিয়ে সে স্থির। ঠিক তেমনি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই শিরোমণি। তার সিঁথিতে আজ টকটকে লাল সিঁদুর। লাল বেনারসি আর সোনার অলংকারে ভরা শিরোমণিকে যেন চেনাই যায় না। কৃষক ঘরের মেয়ে আজ রাজরানি। তাই কি অজানা কোনো অহংকারে এমন স্থির। জনার্দন ভাবনায় উত্তাল।

নিশ্চল ওই দুই মূর্তির মধ্যে শিরোমণিই প্রথম সচল। নীচু হয়ে প্রণাম করে জনার্দনকে। বলে আমি চলে যাচ্ছি।

কোনো কথা বলে না জনার্দন। তাকিয়ে থাকে সে একই ভাবে। শিরোমণি বলে, কই আশীর্বাদ করলে না তো!

—আশীর্বাদ!

—প্রণাম করলে তো আশীর্বাদই করতে হয়।

—আশীর্বাদের ভার বইতে পারবে তো।

জনার্দনের এহেন কথায় থমকে যায় শিরোমণি। বুঝতে পারে না তার কথার অর্থ। তাই পলকের জন্য নিস্তব্ধতা। তারপর হাসিমুখেই বলে, বেশ তো, তোমার যেমন ইচ্ছে তেমন আশীর্বাদই করো। আমি সব কিছুই মেনে নিতে তৈরি।

—তাহলে শোনো—কেমন যেন হিসহিসিয়ে ওঠে জনার্দনের

গলা। ওই তীক্ষ্ণস্বরে শিরোমণি যে ভয় পায় না তা নয়, তবুও হাসি হাসি মুখেই বলে, কই করো আশীর্বাদ।

—তোমার সর্বনাশ হোক!

চমকে ওঠে শিরোমণি। অনেক কিছু ভাবলেও এমন ভয়ংকর আশীর্বাদের জন্য তৈরি ছিল না শিরোমণি। আশীর্বাদ শুনে যেন বিবশ হয়ে যায় শিরোমণির সারা শরীর। তবে সে এক পলকেরই জন্য। তারপর শিরোমণি যেন আবার স্বাভাবিক হয়। বলে, তুমি যাই বলো সেতো আশীর্বাদই। আমি তোমার এই আশীর্বাদ মাথা পেতে নিচ্ছি। যতো ভয়ংকরই হোক, আশীর্বাদ—আশীর্বাদই হয়। শুধু একটা কথা—

—কী?

—তোমার মনে যে এসব ছিল কোনোদিন বলোনি তো?

—সব কথা কি বলতে হয়!

—কিছু কিছু কথা তো বলতেই হয়, তাই না! যাইহোক এবার আমায় বিদায় দাও। আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না।

—সব কিছুই কি এভাবে বলা যায়। যায় না। যাইহোক, এবার তুমিও আমাকে বিদায় দাও।

কথাটা শুনে কিছুটা অবাক হয়েই শিরোমণি বলে, বিদায়! তুমি আবার কোথায় যাবে?

—আমি আর এ সংসারে থাকবো না। এই গ্রাম ছেড়ে আমিও চলে যাচ্ছি। সন্ন্যাস নিয়ে আমি সাধনায় বসবো। আমার কথা আমাকে রাখতেই হবে।

জনার্দনের এহেন সিদ্ধান্তের কথায় শিরোমণি বিচলিত। একটা অপরাধবোধ জেগে উঠল তার মধ্যে। মনে হলো, জনার্দন যে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি, তার উচিত ছিল সেকথা বোঝা। আর এই না বোঝার ব্যর্থতার জন্যই আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, না—যেও না, যেও না তুমি সংসার ছেড়ে—এই প্রাণ ছেড়ে।

জনার্দন বলে, আজ আর তা সম্ভব নয়। আজ আর তোমার কোনো কথাই আমি শুনব না। তাই-বা কেন, আজ তোমার কথা শোনার কোনো বাধ্যকতা নেই আমার। তাই বিদায় জানাই তোমাকে, তুমিও বিদায় জানাও আমাকে। কথাগুলি বলতে বলতে পা বাড়ায় জনার্দন।

জনার্দনের সেই চলে যাওয়া মূর্তিটা দেখতে দেখতে জল আসে শিরোমণির চোখে। সেকথা লেখা নেই কোথাও।

সেদিনই আনন্দপুর ছেড়ে পতিগৃহে যাত্রা করে শিরোমণি।

—কর্ণগড়ের নতুন রানি। মন্দিরে তখন বাজছে ঘণ্টা—বাজছে ঢাক—রণিত হচ্ছে বুকভাঙা কান্নার বিষাদ মাখা সুর—যেও না —যেও না—।

**বধূবরণ**

বধূবরণের জন্য সেজে উঠেছে কর্ণগড় দুর্গ। রাজা অজিত সিংহ যে আবার বিয়ে করেছেন, এতে সবচেয়ে বেশি খুশি গ্রামের প্রজারা। বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের মনে জমে উঠছিল একটা ভয়ের কালো মেঘ। প্রজাদের ভয়, রাজা অজিত সিংহের অবর্তমানে কে রক্ষা করবে তাদের? কে হবে রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

তাদের ভয়ের কারণ, রাজা এখনও নিঃসন্তান। বিয়ে হয়েছে তাঁর বহুদিন। কিন্তু রানি ভবানী এখনও কোনও সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি। তৎকালীন সামাজিক রীতিতে এই সন্তান না হওয়ার জন্য আর সকলের মতো প্রজারাও দায়ী করেন রানি ভবানীকেই। সকলেই মনে করে রানি বন্ধ্যা। তাই রাজ্যরক্ষার জন্য, সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারীর জন্য রাজার আবার বিয়ে করা উচিত।

নিজের আপনজন, সভাসদ ইত্যাদির মতো প্রজারাও তাঁর সন্তানহীনতার জন্য চিন্তিত, শঙ্কিত—একথা রাজা অজিত সিংহও জানেন। কিন্তু রানি ভবানীকে তিনি সত্যিই খুব ভালোবাসেন। আর সকলের মতো ওই সন্তান হীনতার জন্য কেবল ভবানীকেই দায়ী করতে চান না। তাঁর মনে একটা প্রশ্ন, গলায় বেঁধা মাছের কাঁটার মতো সবসময় খচখচ করে। তাঁর নিজের সম্পর্কেই ওঠে প্রশ্নটা। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি জানেন, এমন কথা যদি প্রকাশ পায় তাহলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সব রাজা জমিদাররাও সক্রিয় হয়ে উঠবে। তাতে জীবিত অবস্থাতেই হয়তো রাজ্যহারা হবেন তিনি। তাই চুপ থাকেন তিনি। ওইসঙ্গে আবার বিয়ে না করার ব্যাপারেও ছিলেন কৃতসংকল্প।

কিন্তু সবকিছু তাঁর ওলটপালট হয়ে যায় শিরোমণিকে দেখার পর। তারই জমিদারির মধ্যে পড়ে আনন্দপুর গ্রামটা। আর সেই সূত্রেই তিনি গিয়েছিলেন সেই গ্রামে। সেখানেই দেখেন তিনি শিরোমণিকে। দেখেই মনে হয়, যেন বহ্নিশিখা। পতঙ্গের মতোই ওই আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় মন। তাই সংকল্পচ্যুত হলেন। কর্ণগড়ে ফিরেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন, দ্বিতীয় বিয়ে করবেন তিনি। সে কথাটা প্রথমেই জানালেন ভবানীকে।

সব শুনে ভবানী কিন্তু এতটুকু বাধা দেন না। বরং এতদিনে রাজা যে মত বদলেছেন এতে তিনি খুশিই। সেকালে সাধারণ মানুষই যেখানে একাধিক বিয়ে করে, সেখানে রাজা-জমিদারদের বেলা তো কথাই নেই। বিশেষ করে সন্তানহীনতার ক্ষেত্রে। আর অন্যদের মতো তিনিও তো চিন্তিত এই রাজত্ব বা জমিদারির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নিয়ে। তিনিও চান, রাজা আবার বিয়ে করুক। এখন রাজা যে আরেকটা বিয়ে করতে চাইছেন তা শুনে সবচেয়ে খুশি হলেন তিনিই। বলেন, মনে যখন ধরেছে, তখন তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে তোলার ব্যবস্থা করো।

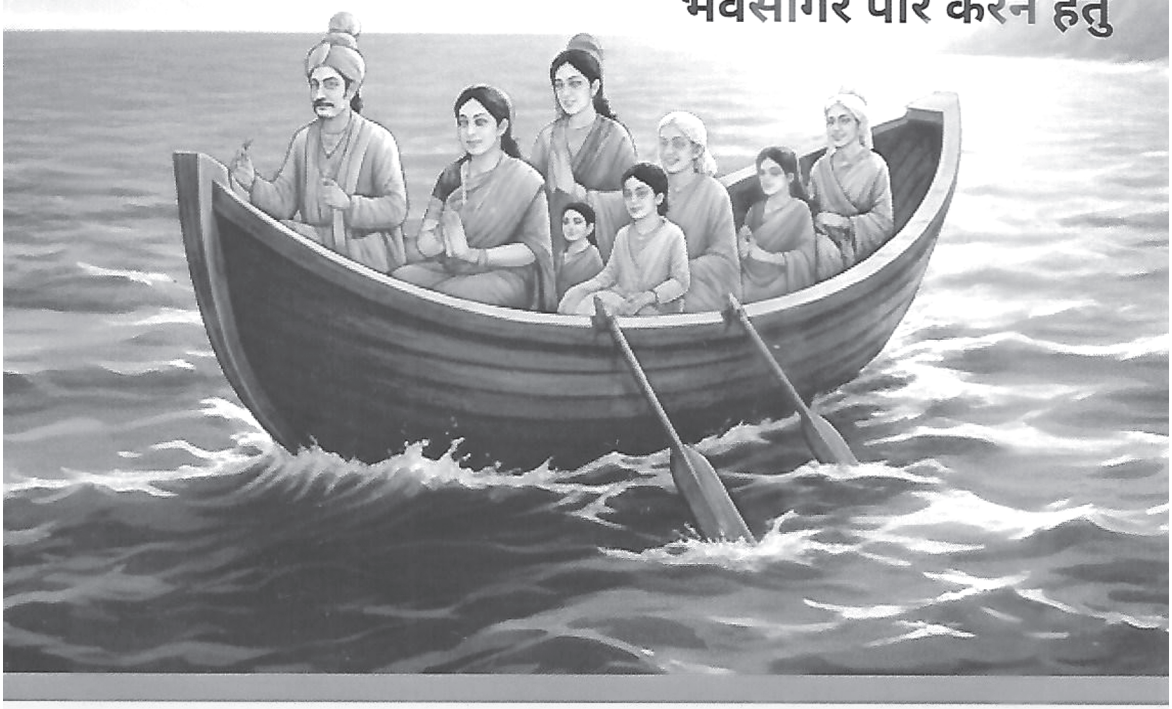
ভবানীর একথায় অজিত সিংহের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়। ভবানী যে তাঁকে এমনভাবে সমর্থন করবে তা ভাবতেও পারেননি তিনি। এবার তাই মুগ্ধ মনেই দূত পাঠান আনন্দপুরে। এবং তার পরের ঘটনাগুলিরই পরিণতি এই বধূপ্রবেশ বা বধূবরণের উৎসব।

**ঐতিহ্যের প্রতীক কর্ণগড়**

গ্রামের সাধারণ কৃষক ঘরের মেয়ে শিরোমণি। গ্রামে অনেক

# कुटुंब प्रबोधन

**जीवन यात्रा की नौका है परिवार,**
**जिसमे हम सात जन साथ हैं,**
**भवसागर पार करने हेतु**



## लक्ष्य

| | |
|---|---|
| **संयुक्त परिवार** | संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार |
| **स्वस्थ परिवार** | समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार |
| **सुसंस्कृत परिवार** | समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार |
| **आदर्श परिवार** | समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार |

বিয়ে বা বধূবরণ দেখেছে সে। তাদের মধ্যে বৈভবে যারা কিছুটা উঁচুতলার তাদের বিয়ে কিংবা অন্য অনেক আনন্দ উৎসবও দেখেছে। নানা ধরনের বাজনা আর সশস্ত্র সেনাদের কুচকাওয়াজের মধ্যে গড়ে প্রবেশ করার সময় মুহূর্তের জন্য হলেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শিরোমণি। দু'চোখ মেলে জরিপ করে সব। সেই এই কর্ণগড় সম্পর্কে একদিন যেসব কথা শুনেছে, সেগুলিই মনে করতে থাকে শিরোমণি।

কর্ণগড়। নামটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পৌরাণিক, মহাকাব্যিক এবং নানা ঐতিহাসিক কাহিনি। সেসব কাহিনির সঙ্গে আজকের কর্ণগড়ের অনেক কিছুরই তেমন মিল নেই। তবুও কর্ণগড় তার চোখের সামনে যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন নানা ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে।

পুরাণ কাহিনি মতে, শিবহীন দক্ষযজ্ঞে পতির অবমাননায় শিবানী সতী করলেন দেহত্যাগ। তাঁর সেই দেহ নিয়ে শিব শুরু করেন তাণ্ডব নৃত্য। সে নৃত্যে সৃষ্টির বিনাশ হয়ে ওঠে অনিবার্য। সৃষ্টির রক্ষায় দেবতাদের প্রার্থনায় শিবকে শান্ত করতে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন সতীর দেহ। সতীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেখানে যেখানে পড়ে তা আজ মহাতীর্থ সতীপীঠ। সুদর্শন চক্রে ছিন্ন সতীদেহের কান বা কর্ণমূল এসে পড়েছিল মেদিনীপুরের শালবনির কাছে। সেই জায়গাই আজকের কর্ণগড়। সতীর কান বা কর্ণমূল পড়েছিল বলে জায়গার নাম হয়েছিল কর্ণপুরি। কিন্তু পরবর্তীকালে এখানে রাজাদের দুর্গ বা গড় প্রতিষ্ঠার কারণে কর্ণপুর হয়ে যায় কর্ণগড়।

শোনা যায়, মহাভারতের কর্ণ, যিনি ছিলেন অঙ্গরাজ, তিনিই এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। আর তারপরেই এই জায়গাটার নাম হয় কর্ণগড়। অন্যরা অবশ্য বলেন, এটি নেহাতই লোককথা। এই জায়গার সঙ্গে মহাভারতের কর্ণের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা বলে তো থেমে থাকে না লোক কাহিনির ডালপালা লেখা। আর তাই দাতা কর্ণের এই দুর্গেই নাকি একসময় বাস করেন পাণ্ডবরাও।

পৌরাণিক এইসব বিবরণে সত্যি-মিথ্যে দুই-ই থাকতে পারে। কিন্তু একথা সত্যি, জায়গাটা মোটেই আধুনিক নয়। এর অস্তিত্বের শিকড় রয়েছে অনেক গভীরে। তাই ইতিহাসের পাতায় এর খোঁজ করা যেতেই পারে কিন্তু সেখানেও রয়েছে অনেক লোককথার মিশেল।

নানা ধরনের কাহিনির সূত্রে জানা যায়, পাল রাজত্বের সময়ও অস্তিত্ব ছিল কর্ণগড়ের। একাদশ-দ্বাদশ শতকের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিতম্' কাব্যে অনেক কিছুর সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কর্ণগড় দুর্গের।

পাল আমলে যে কর্ণগড় ছিল, সে সম্পর্কের আরেক কাহিনি, জয়পালদেবের আমলে তাঁর সেনাপতি জ্ঞাতবর্মার সাহায্যে চেদিরাজ কর্ণদেব গৌড় আক্রমণ করে এই অঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন। অবশেষে বৌদ্ধপণ্ডিত ও ধর্মগুরু অতীশ দীপঙ্করের প্রচেষ্টায় অবসান হয় যুদ্ধের। দু'পক্ষের মধ্যে হয় সন্ধিও। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী চেদিরাজ কর্ণদেব জঙ্গলমহলের এই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করেন বলে এর নাম কর্ণগড়।

ইতিহাসের ওই পথ ধরে এগোলেই কোনও এক বাঁকে শোনা যাবে অন্য কিছু কথা। চতুর্দশ শতকে নাকি বর্ধমান প্রদেশে দামোদরের তীরে ছিল একটি রাজ্য। রাজার নাম হেমাসিংহ। জাতে ক্ষত্রিয়। তাঁর ভাইয়ের নাম বীরসিংহ। মহাবলী তিনি। নিজের বাহুবল আর পরাক্রমে তিনি জয় করেছিলেন তাম্রলিপ্ত, বরদাভূমি ও কর্ণদুর্গও। আর এর থেকেই বোঝা যায়, এই ঘটনার আগে থেকেই কর্ণগড়ের অস্তিত্ব ছিল।

বীরসিংহের বংশে জন্মেছিলেন এমন চারজন রাজা যাঁরা শক্তি ও বীরত্বে ছিলেন তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই চারজন হলেন অভয়া সিংহ, কুমার সিংহ, জামদার সিংহ ও সুরথ সিংহ। এঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নির্মাণ করেন চার-চারটি দুর্গ। শালবনির সাতপাটি গ্রামের অদূরে 'অভয়গড়' নির্মাণ করেন অভয়াসিংহ। একই ভাবে গোদাপিয়াশালের কাছে 'কুমারগড়' নির্মাণ করেন কুমার সিংহ এবং 'জামদার' দুর্গ স্থাপয়িতা জামদার সিংহ। এই বংশের শেষ রাজা সুরথ সিংহ একই সঙ্গে কর্ণগড় ও বলরামপুরে রাজত্ব করেন।

রাজা সুরথ সিংহের দুই ঘনিষ্ঠ অনুচর লক্ষ্মণ সিংহ ও ভীম মহাপাত্র চক্রান্ত করে হত্যা করেন সুরথ সিংহকে। তারপর ভাগ করে নেন তাঁর রাজত্ব নিজেদের মধ্যে। এটা ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। লক্ষ্মণ সিংহ হন কর্ণগড়ের অধিপতি এবং বলরামপুরের রাজা হন ভীম মহাপাত্র।

'মেমোরান্ডা অব মিডনাপুর' গ্রন্থে এইচ. ভি. বেনি বলেছেন সুরথ সিংহ ছিলেন 'খয়রা জাতির' রাজা। আর কর্ণগড়ের নতুন রাজা লক্ষ্মণ সিংহ ছিলেন বঙ্গের উন্নত কৃষিজীবী সম্প্রদায় সদগোপ বংশোদ্ভব। লক্ষ্মণ সিংহই কর্ণগড়কে এক শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত করেন একই সঙ্গে জঙ্গলমহলেরও প্রভূত উন্নতি ঘটান। তবুও তিনি নিহত হন ভাই শ্যাম সিংহের হাতে। রাজা হন শ্যাম সিংহ। ১৬৬১ থেকে সাত বছর রাজত্ব করেন তিনি।

দাদাকে হত্যা করে শ্যাম সিংহের সিংহাসন দখলকে মেনে নিতে পারেননি লক্ষ্মণ সিংহের ছেলে পুরুষোত্তম। সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন তিনি। একসময় আসে সুযোগ। শ্যাম সিংহকে সিংহাসন থেকে হটিয়ে তা দখল করেন পুরুষোত্তম সিংহ। তাঁর পর রাজা হন তাঁরই ছেলে সংগ্রাম সিংহ। সংগ্রামের পর তাঁর ছেলে ছটু রায়। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে ছটু রায়ের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই রঘুনাথ রায় রাজ্যপাট সামলান। তাঁর পর কিছুদিনের রাজা হন ছটু রায়ের ছেলে বীর সিংহ। কিন্তু তাঁর সময়ে রাজ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। শান্তি ফিরিয়ে আনতে বীর সিংহকে সরিয়ে রঘুনাথের ছেলে রাম সিংহকে সিংহাসনে বসান বঙ্গের সুবেদার দ্বিতীয় ইব্রাহিম খান ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

লক্ষ্মণ সিংহের পর এই রাম সিংহকে বলা যায় কর্ণগড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদগোপ রাজা। তিনি মেদিনীপুর শহরের উত্তরে তৈরি করেন 'আবাসগড়' নামে একটি দুর্গ। কর্ণগড় ও

আবাসগড়কে পরিখাবেষ্টিতও করেন। কেশপুরের কাছে 'রাম সরোবর' খনন করান তিনিই। তবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান সম্ভবত 'শিবায়ন'-এর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে আশ্রয়দান।

রাম সিংহের পর সিংহাসনে বসেন তাঁরই ছেলে যশোবন্ত সিংহ (১৭১১-১৭৪৯ খ্রিঃ)। তিনিই ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। রাজ্যের সবরকম উন্নতির দিকে ছিল তাঁর নজর। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন প্রজাদের পিতা। তাদের কল্যাণের জন্য তিনি সবসময় থাকতেন সচেষ্ট। কূটনীতিতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কুশলী। বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে রাজকাজ শিখেছিলেন তিনি কিছুদিন। নবাব সুজাউদ্দিনের ছেলে সরফরাজ খাঁরও দেওয়ান ছিলেন তিনি কিছুদিন। আর এইসব অভিজ্ঞতাই তাঁকে কর্ণগড়ের শ্রেষ্ঠ রাজার তকমা এনে দেয়।

ব্যক্তিগত জীবনে যশোবন্ত সিংহ ছিলেন ধার্মিক। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধপুরুষ। শোনা যায়, তিনি বাঁদর, শেয়াল, প্যাঁচা, বাদুর ও কুমির বা বাঘের পঞ্চমুণ্ডি আসনে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রাজার সভাসদ রামেশ্বর ভট্টাচার্যর কথায়—
"... যশোবন্ত সিংহ সর্ব গুণবন্ত, শ্রীযুত অজিত সিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে অবস্থিতি, ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ।।"

**সাদর আহ্বান—আয়**

যশোবন্ত পুত্র অজিত সিংহের হাত ধরে কর্ণগড় দুর্গে ঢোকার মুহূর্তে অতীত ইতিহাসে যেন ডুবে যায় শিরোমণি। দাঁড়িয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়। এতদিন কর্ণগড় সম্পর্কে যতকথা শুনেছে, আজ নিজেও সেই ইতিহাসেরই একজন হয়ে যাচ্ছে ভেবেই শিরোমণি শিহরিত, স্তব্ধগতি। তার ওই থমকে যাওয়াটা, অজিত সিংহ যেন কিছুটা উপভোগই করেন। তাই নববধূর পাশে তিনিও স্থির। তাঁদের দুজনের ওই হত-গতি অবস্থা দেখে সকলেই দাঁড়িয়ে থাকে ছবির মতো। কেবল বাদ্যকররাই বাজিয়ে চলেছে সুর তুলছে নানা।

ওদিকে বরণডালা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানি ভবানী। দাঁড়িয়ে আছে রানির সহচরী দাসী এবং অন্যান্যরাও নানা বহুমূল্য উপচার হাতে নিয়ে। ওই ভাবেই কেটে যায় বেশ কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর শোনা যায় রানি ভবানীর কণ্ঠস্বর, কী হলো, সকলে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এগিয়ে এসো। প্রবেশ করো গড়ে।

রানির কথায় চেতনা আসে সকলের। সচল হয় তারা। রাজা অজিত সিংহও মৃদুস্বরে আহ্বান জানান তাঁর বালিকাবধূকে। বলেন এসো।

যে ঘোরের মধ্যে এতক্ষণ ছিল শিরোমণি, তা কেটে গেছে রানি ভবানীর প্রথম আহ্বানেই। এখন স্বামী রাজা অজিত সিংহের কথায় লজ্জাজড়ানো পায়ে হয় গতিময়ী।

রানি ভবানীর নির্দেশে আবার থামে সকলেই। নব পরিণীত রাজা অজিত সিংহ এবং শিরোমণি উঠে দাঁড়ান বরণপীঠের ওপর। সানাই, শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে ভবানী বরণ করে নিজেরই স্বামী অজিত সিংহ এবং তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী শিরোমণিকে। বরণডালার দীপালোকে রাজা এবং শিরোমণির মুখ উজ্জ্বল বুঝি-বা আনন্দ বিহ্বল। বরণডালার দীপের পেছনে থাকা রানি ভবানীর চোখ কি তখন বিপদের সজল মেঘের ধারায় চিকচিক করে উঠেছিল! সে চোখের দিকে নজর যে নেই কারও। রানি ভবানী নিজেকে সংযত রেখেই আহ্বান জানায় শিরোমণিকে নিজের ছোটোবোন হিসেবে। স্নেহভরা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—আয়, ভেতরে আয়। তুমিও এসো।

**কবি রামেশ্বরের কথা**

আনন্দপুরের কৃষক কন্যা, অরণ্যবালিকা শিরোমণি রানি হয়ে এলো কর্ণগড়ে। রাতারাতি বদলে গেল তার জীবনের সবকিছু। একদিন যে, খোলা আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াত, সে আজ বন্দি রাজকীয় আদব-কায়দা আর নানা সহবতের সোনার খাঁচায়। ডানা ঝাপটাতে পারে না—উড়তে পারে না আকাশে, তাতেই হাঁফিয়ে ওঠে। ভুলতে পারে না তার ফেলে আসা জীবনটাকে। ভুলতে পারে না তার সেই গ্রামের পরিবেশ—তার ছেলেবেলার সাথীদের—সেই মুক্ত জীবনকে।

একথা সত্য, শিরোমণি এখন রাজবধূ। কিন্তু মনে মনে এখনও সে সেই ছেড়ে আসা গ্রামেরই বালিকা। তাই সে কেমন মনমরা। কিছুই ভালো লাগে না তার।

শিরোমণির মনের অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারে রানি ভবানী। বয়সে শিরোমণির চেয়ে অনেকটাই বড়ো। তাই সপত্নী নয়, বড়ো দিদি হয়েই বুকে টেনে নেয় তাকে ছোটো বোন হিসেবে। রানি ভবানীর বরাবরই মনে হয়ে শিরোমণি যেন তার বাপের বাড়িতে ফেলে আসা ছোটো বোনটি। তাই অসূয়া নয়, পরম আদরেই ভরিয়ে দিতে থাকে তাকে। শিরোমণিও আঁকড়ে ধরে তার এই নতুন পাওয়া দিদিকে পরম বিশ্বাসে—শর্তহীন নির্ভরতায়। প্রায় সারাটা সময়ই কাটায় তার সঙ্গে। চলে কত না গল্পগাছা।

গল্প শুনতে খুবই ভালোবাসে শিরোমণি। বিশেষ করে রাজবাড়ির পুরনো দিনের কথা। আর সেসব কাহিনি শোনাতে কোনো আলস্য নেই রানি ভবানীর। তার কাছ থেকেই শিরোমণি শোনে কর্ণগড় রাজবাড়ির নানা পুরনো কাহিনি।

সেদিন গড়ের ছাদে বসে গল্পে মেতেছিল দুজনে নিত্যদিনের মতোই। সেটা ছিল পূর্ণিমার এক সাঁঝবেলা। আকাশের পূর্ণশশী। তার আলোয় চারিদিকটা যেন রুপো চকচক। দূরে মহামায়ার মন্দিরে বেজে উঠল আরতির ঘণ্টা। চকিতে দুই রাজবধূই করাঞ্জলি বদ্ধ হয়ে প্রণাম জানায় দেবীকে।

থেমে যায় কথা। দু'জনেই নীরব প্রার্থনায় মুখর মনে মনে। মন্দির থেকে ভেসে আসা কাঁসর ঘন্টা আর ঢাকের বাজনায় আবিষ্ট তখন সকলে। এক সময় শেষ হয় আরতি। থামে বাজনা। তখনই স্ব-ভাবে আসে দুই রানি। শুরু হয় আবার। ভবানী হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করে, বলতো আজ কোন তিথি।

তিথি? একটু অবাক হয়েই বলে শিরোমণি। হঠাৎ তিথির কথা

কেন দিদি।

ভবানীর কথায় লাগে কৌতূহলের সুর। চোখ নাচিয়ে বলে, বল না আজ কোন তিথি?

একটু ভাবে শিরোমণি। তারপর মাথা নাড়িয়ে বলে, না মনে পড়ছে না।

তার গালটা একটু টিপে বলে, আজ হলো পূর্ণিমা। দেখছিস না, চারদিকে জোছনা লুটোপুটি খাচ্ছে।

শিরোমণি তড়িঘড়ি বলে, আমিও তাই ভাবছিলুম দিদি, মনটা এমন আনচান করছে কেন?

—আর ভেবে কাজ নেই। এ সময় তোর মন যে এমন করবে এতো জানা কথা। তবে যে আমি কথাটা বলছিলুম শোন সেটা।

উদগ্রীব শিরোমণি বলে, হ্যাঁ দিদি বলো তোমার কথাটা।

—কথা নয়রে, ঘটনা, আর সেটা আমাদের শ্বশুরঠাকুর আর রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে নিয়ে। শুনেছিস তো রামেশ্বর ভট্টাচার্যের নাম।

—ওই যে, যিনি পুঁথি লেখেন, তিনিই তো! তেনার সাধনের পঞ্চমুণ্ডির আসনই তো রয়েছে মহামায়ার মন্দিরে, তাই না দিদি।

—ঠিক ধরেছিস। উনি ছিলেন শ্বশুরঠাকুরের সভাসদ, সাধনার সঙ্গী, সিদ্ধ সাধক আবার বেশ উঁচুদরের কবি। অনেক পুঁথি আছে ওঁর।

—উনি কি বরাবরই এই কর্ণগড়ের বাসিন্দে?

—নারে, ওঁর বাড়ি ছিল যদুপুরে। জমিদারের অত্যাচারে ভিটে ছাড়া হন ওঁরা।

—কেন, কী করেছিলেন ওরা যে এভাবে উৎখাত করা হলো?

—প্রজারা থাকবে রাজা বা জমিদারের পায়ের তলায়। যত অন্যায়ই করুক না কেন রাজা বা জমিদার, তার প্রতিবাদ করা যাবে না কোনোভাবেই। করলেই অত্যাচার। উৎখাত, এমনকী প্রাণও নিয়ে নিতে পারে। এক্ষেত্রে জান ও মান বাঁচাতেই প্রজাকে ছাড়তে হয় সাতপুরুষের ভিটেও।

বিষণ্ণ হয়ে শিরোমণি বলে, ভারি অন্যায় এটা।

—তা হলে হবেটা কী? এটাই যে চলে আসছে বরাবর।

—না-না, এটা কখনই হতে পারে না। আমি এমনটা হতে দেব না কখনই।

—বেশ, বেশ, তোর হাতে ক্ষমতা এলে তুই তাই করিস। এখন শোন রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কথাটা।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই বলো।

রানি ভবানী শোনাতে থাকে সেই ঘটনার কথা, শুনতে শুনতে শিরোমণির মুখটা রাগে লাল হয়ে ওঠে। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে থাকে, না—না, এ ভারি অন্যায়। রানি ভবানী একটু ধমকের সুরেই বলে শান্ত হ' তো। শোন সব কথা।

শান্ত হয় শিরোমণি। ভবানীও বলতে থাকে রামেশ্বরের দুর্ভাগ্যের কথা। রামেশ্বররা থাকতেন যদুপুরে। গ্রামটা ছিল বরদার জমিদার রাজা শোভা সিংহের জমিদারিতে।

এক দিনের কথা। রামেশ্বরের স্ত্রী সুমিত্রা স্নান করছিলেন গ্রামের পুকুরে। সেই সময় পুকুরের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ঘোড়সওয়ার শোভা সিংহ। সুমিত্রা ছিলেন খুবই সুন্দরী। তাঁকে দেখেই শোভা সিংহের মাথায় যেন বায়ু চড়ে। জোর করে সুমিত্রাকে তুলে নেয় ঘোড়ায়।

আত্মরক্ষার জন্য সুমিত্রা চেঁচামেচি করতে থাকায় কিছুটা বেগতিক দেখেই তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়ে পালায় শোভা সিংহ। মান বাঁচে সুমিত্রার।

ব্যাপারটা কিন্তু ওখানেই মেটে না। শোভা সিংহ চলে যাওয়ার পরই সরব হয় সমাজপতিরা। ফতোয়া দেয় সুমিত্রাকে আর ঘরে নিতে পারবে না রামেশ্বর। ত্যাগ করতে হবে তাকে। সমাজপতিদের এ বিধান মানতে নারাজ রামেশ্বর। বাবার ভিটে ছেড়ে গ্রামেরই এক প্রান্তে কুটির বেঁধে বাস করতে থাকেন তিনি।

রামেশ্বর কিন্তু শোভা সিংহকে ক্ষমা করতে পারেন না। তাঁর এই দুর্গতির জন্য তাকেই দায়ী করেন তিনি। আর সেই জন্যই তাঁকে শাস্তি দিতে শুরু করেন মারণ যজ্ঞ।

শোভা সিংহের স্ত্রী অজিতা সুন্দরী কথাটা জানতে পেরে স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য কেঁদে পড়েন রামেশ্বরের পায়ে। দয়া হয় তাঁর। বন্ধ করেন সেই মারণ যজ্ঞ। শোভা সিংহ কিন্তু ঘটনাটা জানতে পেরে স্ত্রী অজিতা সুন্দরীকেই ত্যাগ করেন।

এরপরই ঘটল আরেকটা ঘটনা। ১৬৯৫—৯৬-এ শোভা সিংহ বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে মেরে তার মেয়ে সত্যবতীকে জোর করে ভোগ করতে যায়। তৈরি ছিল সত্যবতীও। হত্যা করে সে শোভা সিংহকে।

খবরটা কানে আসে রামেশ্বরেরও। একজন শত্রুনিধনের আনন্দে গান বেঁধে ফেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তিনি লেখেন—

'হেরি শোভা ভোগবতী বর্ধমানে গেল ছুটি
সত্যবতীর লুটিতে যৌবন।
ভগবতীর রোষানলে বক্ষবিদ্ধ হল শেলে
ধ্বংস হল কলির রাবণ।।'

লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে গানটা। একসময় তা কানে আসে শোভা সিংহের ভাই হেমৎ সিংহের। জ্বলে উঠল হেমৎ সিংহের চোখ। জ্বলে গেল রামেশ্বরের বাড়িঘর। গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো তাঁর সবকিছু। গ্রাম ছাড়া করা হলো তাঁকে।

এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের দুর্গতির কথা শুনছিল শিরোমণি। শোভা সিংয়ের ওই বর্বরতা, ওইরকম নির্মম শোষণের কথা শুনতে শুনতে শিরোমণি কখনও উত্তেজনায় হুংকার দেয়, আবার কখনও রামেশ্বরের দুঃখের কথায় চোখের জল মোছে। কান্না-ভেজা গলায় প্রশ্ন করে, তারপর?

রানি ভবানী বলে, তারপর আর কী। অসহায় রামেশ্বর সপরিবারে চলে আসেন তাঁর মামার বাড়ি কাপাসটিকরি গ্রামে। তাঁর সবকথা কানে এল আমাদের শ্বশুরঠাকুরের বাবা রাজা রাম সিংহের কানে। দয়ায় উথলে উঠল হৃদয়। তিনি তাঁকে অযোধ্যানগরে জমিজমা দিয়ে বাড়ি ঘর করে থাকার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেন। সেই সঙ্গে তাঁকে দেন পুরাণ পাঠকের কাজ।

কৃতজ্ঞতায় রামেশ্বর তাঁর নতুন কাব্য 'শিবায়ন'-এ লিখেছেন—

''পূর্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিং ভাঙ্গে তারে—
রাজা রাম সিং কৈল প্রীত
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে করিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।''

১৭১১ সালে রাজা রাম সিংহের মৃত্যুর পর রাজ সিংহাসনে বসেন আমাদের শ্বশুরঠাকুর যশোবন্ত সিংহ। এরপর রামেশ্বর তাঁর 'শিবায়ন' কাব্য শেষ করে রাজসভায় পাঠ করেন। সে পাঠ শুনে রাজা-প্রজা সকলেই খুব খুশি। জয়, জয়ধ্বনি ওঠে চারিদিকে।

জানিস তো, আমাদের এই কর্ণগড়ে যে দণ্ডেশ্বর শিবমন্দির রয়েছে, তারই দক্ষিণদিকে বসে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর ওই 'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য' 'শিবায়ন' কাব্য লেখা শেষ করেন।

অত্যাচারী জমিদারের হাতে কবি রামেশ্বরের নির্যাতিত হওয়া, পিতৃভিটে ছেড়ে এই কর্ণগড়ে আশ্রয় পাওয়ার কাহিনি শিরোমণির মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। অহরহ মনে হয় ওই একই কথা—কেন মানুষ মানুষকে দেয় এমন কষ্ট। কী লাভ হয় তাতে। শেষ পর্যন্ত তো কোনো না কোনো ভাবে শাস্তিই তো পেতে হয়। তাহলে কীসের জন্য এসব কথা।

শিরোমণি মনে মনে এইসব প্রশ্ন তুলে কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। ঠিক করে, সুযোগ পেলে সে এর প্রতিকার করবেই করবে।

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয় শিরোমণি। আর তখনই মনেপড়ে সেই পূর্ণিমার কথা, যার থেকে শোনা হলো এত কথা। সেটা মনে পড়তেই শিরোমণি বলে, দিদি আসল কথাটাই যে শোনা হলো না।

—কোন আসল কথা?

—ওই যে, পূর্ণিমের কথা বলছিলে—কী হয়েছিল পূর্ণিমাতে?

—হ্যাঁ সেটাই এবার বলছি। এটা অবশ্য আমারও শোনা কথা। যখন এসব হয়েছিল, তখন আমি কোথায়? তা আমি যেমন শুনেছি তেমনই বলছি, শোন।

আমাদের শ্বশুর ঠাকুরের সঙ্গে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ছিল বন্ধুর সম্পর্ক। সময় পেলেই দুজনে মেতে যেতেন নানা কথায়। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত সে খেয়ালই থাকত না কারও। শেষে শাশুড়ি ঠাকরুনই লোক দিয়ে খবর পাঠাতেন, তাতেই নাকি ফিরত হুঁশ!

যাই হোক সেদিনের কথা। আমাদের শ্বশুরঠাকুর হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করলেন আজ কোন তিথি?

রামেশ্বর ভট্টাচার্য তখন কী যেন কী একটা ভাবছিলেন। তাই সব কিছু ভালো করে না শুনেই বলেন, 'আজ পূর্ণিমা'?

পূর্ণিমা! খটকা লাগে আমাদের শ্বশুরঠাকুর রাজা যশোবন্তের মনে। একটু কিন্তু কিন্তু করেই তিনি বলেন, কয়েক রাত থেকেই যেন একটু অন্ধকার ঠেকছে চারিদিক।

ততক্ষণে হুঁশ ফিরেছে রামেশ্বর ভট্টাচার্যেরও। 'তাই তো, একী বললাম, আজ তো পূর্ণিমা নয়, তাহলে এত বড়ো ভুলটা করলাম কী করে। এখন অন্য কথা বললে তো রাজার মনে সন্দেহ জাগবে! হে মহাদেব, হে মহামায়া, পথ দেখাও।'

এসবই মুহূর্তের ভাবনা। রামেশ্বর ভাবেন, মা যখন একথা তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনে কিছু একটা আছে। হয়তো আজ প্রকাশ পাবে মা মহামায়ার কোনো লীলা।

'জয় মা' ধ্বনি দিয়ে রামেশ্বর আবারও বলেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আজ পূর্ণিমা—পূর্ণিমা-ই।

মুখে একথা বললেও, রামেশ্বর কেমন যেন আনমনা। রাজা যশোবন্তও তাই। দুজনেরই সব কথা হঠাৎ-ই যেন ফুরিয়ে যায়। আসরের ঘটে অকাল সমাপ্তি। যশোবন্ত ফিরে যান প্রাসাদে আর রামেশ্বর যান মহামায়ার মন্দিরে।

মায়ের মূর্তির কাছে আকুল কান্না রামেশ্বরের। এ কী বলে ফেললাম। নাকি তুমিই বলিয়েছো—মান রাখো মা।

মহামায়া দিলেন প্রত্যাদেশ, আজ রাতে রাজাকে নিয়ে মন্দিরে আয়। তখনই জানবি আজ কোন তিথি!

নিশ্চিন্ত হয়েই ঘরে ফেরেন রামেশ্বর। অপেক্ষা করেন সন্ধ্যার। রাত নামতেই রাজাকে নিয়ে আসেন মন্দিরে। প্রণাম করেন দেবীকে। তারপরই ঘটে এক অলৌকিক ঘটনা।

তাঁরা দেখলেন মহামায়া তাঁর বাঁ হাতটা তুললেন বরাভয়ের ভঙ্গিতে। তাঁর হাতের বালা থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে হাজার চাঁদের আলো।

দেখতে দেখতে রাজা যশোবন্ত বিভোর হয়ে যান। তাঁর অন্তরলোক দেখে চারিদিক ভরে গেছে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়-আলোয়।

কেটে যায় অনেক মুহূর্ত। সেই দেবী মন্দিরেই রাজা এবার লুটিয়ে পড়েন রামেশ্বরের পায়ে। আর রামেশ্বর তখন বাহ্যজ্ঞান রহিত। মা মহামায়ার লীলায় বিভোর তিনি বারবার প্রণাম জানান মা মহামায়াকেই।

ভবানীর মুখে এই কাহিনি শুনে শিরোমণিও চলে যায় কোনো এক নাম না জানা দেশে। সেইসঙ্গে প্রণাম জানাতে থাকে মা মহামায়াকেই। বারবার বলতে থাকে মনে মনে অনেকটা মন্ত্রের মতোই, —মা আমাকে শক্তি দাও। তুমি তো জাগ্রত মা—তুমি রক্ষা করো আমাদের পরিবারকে—কর্ণগড়ের প্রতিটি মানুষকে। সেইসঙ্গে দাও শুভবুদ্ধি, মানুষে মানুষে হানাহানি বন্ধ হোক। সকলে যেন শান্তিতে থাকে। আমিও যেন সকলকে রক্ষা করতে পারি। তুমি সবসময় আমার সঙ্গে থেকো মা। কৃপা করো।

শিরোমণির ওই বিভোর ভাব দেখে এক ঠেলা দিয়ে বলে ভবানী, কীরে, কী হলো? অমন থম মেরে গেলি কেন?

—এমনি-ই।

—এমনিই!

—হ্যাঁ দিদি, আমি ভাবছি অন্য একটা কথা।

—কী?

—দেবী সবসময়ই আমাদের রক্ষা করেন, তাই না?

ভবানী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানান দেবীর উদ্দেশে।

তারপর বলেন, শুনবি দেবীর করুণার কথা?

সেদিন গল্প বলা আর শোনায় পেয়েছিল ভবানী ও শিরোমণিকে। গল্পের প্যাটরা উজাড় করে ভবানী আর নিবিষ্টভাবে শোনে শিরোমণি। ভবানী বলে, তবে শোন, মায়ের কৃপার কথা।

সেবার শ্বশুরঠাকুর যশোবন্ত সিংহ মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এমনসময় বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ তাঁদের কুলদেবতা মদনমোহনকে সঙ্গে নিয়ে অতর্কিতে কর্ণগড় আক্রমণ করেন। সেই মুহূর্তে ধ্যানমগ্ন রাজার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ না পেয়ে কর্ণগড়ের সেনারা পালিয়ে যায়। হই হই করে বিষ্ণুপুরের বাহিনী গড়ে ঢুকে পড়ায় শুরু হয় দারুণ কোলাহল। তাতেই ধ্যান ভাঙে যশোবন্তর। অবস্থা বুঝে নিরুপায় রাজা দেবী মহামায়ারই শরণ নেন। আকুল হয়ে ডাকতে থাকে তাঁকে।

তারপরই অবাক কাণ্ড। একটি ঘোড়ায় চেপে দেবী মহামায়া ঘোর রণে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে থাকেন। তখন এগিয়ে আসেন মদনমোহন কিন্তু পরাজিত হয়ে মদনমোহন ফিরে যান বিষ্ণুপুরে। রক্ষা পায় কর্ণগড়।

জানিস তো, এই কাহিনি রামেশ্বর ভট্টাচার্যই তার একটা ছোটো পুঁথিতে লিখেছেন—

''মহামায়া মদনমোহনের ঠেলাঠেলি
দ্বিজ রামেশ্বর ভনে কলিকালে কেলি।''

এই সব কাহিনি বলতে আর শুনতে কেটে যায় অনেকটা সময়। দুই রানি ভবানী আর শিরোমণি ধীরে ধীরে নেমে আসে নীচে। প্রতীক্ষা করতে থাকে তারা আরেকটি নতুন দিনের জন্য।

**বয়ে চলে পারাং**

পারাং নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। জঙ্গলমহলে শাল-সেগুনের পাতা ঝরা আর নতুন পাতা গজানোর চাকাটা ঘুরেছে অনেকবার। বদলের রং লেগেছে অনেক কিছুতেই। কর্ণগড়ের রাজবধূ শিরোমণির দেহে এখন ভরাবর্ষার ভার। চঞ্চলা শিরোমণি এখন অনেক ধীর স্থির।

অজিত সিংহ ক্রমে হয়ে উঠেছেন জঙ্গল মহলের সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাজা। প্রথমেই সুসংহত করেন তিনি তার সেনাবাহিনীকে। বাহিনীতে ছিল পনেরো হাজারেরও বেশি সেনা। বস্তুত সেই সেনার দাপটেই তিনি দাবিয়ে রাখেন জঙ্গলমহলের ছোটোবড়ো আর সব রাজাকে। তাঁর প্রতাপের কথা জানা যায় কোম্পানির সরকারের ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের এক চিঠি থেকে জানা যায়, ছোটোবড়ো মিলিয়ে তিনি নাকি একুশটি জমিদারির ওপর আধিপত্য করতেন।

রাজার সব আছে, নেই কেবল সন্তান। বড়ো রানির সন্তান না হওয়ায় একরকম তাঁর কথাতেই বিয়ে করেছিলেন শিরোমণিকে। অবশ্য কেবলই যে রানি ভবানীর কথায় অথবা সন্তান কামনায় তিনি শিরোমণিকে বিয়ে করেছিলেন তা অবশ্য নয়। বিয়ে করেছিলেন, তাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিল বলে। মজেছিলেন শিরোমণির রূপে, তার সদা চাঞ্চল্যে। সেই সঙ্গে বংশরক্ষার একটা সুপ্ত বাসনা যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, শিরোমণিও ফলবতী হলো না।

অনেকে অনেক কথা বললেও, রাজা অজিত সিংহ অবশ্য কোনো দিনই সন্তানহীনতার জন্য রানিদের দায়ী করেননি। বরং বহুবার তাঁর মনে হয়েছে, তাঁর কারণেই রানিরা হয়তো মা হতে পারেননি। আর সে কারণেই সবটাই তিনি মহামায়ার ইচ্ছা বলেই মেনে দিয়েছিলেন। ভাগ্য এবং ঈশ্বর-নির্ভরতার কারণেই তিনি তাঁর অস্থির চিত্ত স্থির করেছেন শক্ত হাতে লাগাম টেনে।

রাজার মতোই সন্তান না হওয়ার জন্য নানা মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে রাজার দুই রানিই। বিশেষ করে ভবানী। প্রায়ই মনে হয়, তার অক্ষমতার কারণে রাজার সন্তান হয়নি। কিন্তু শিরোমণির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল কেন? কোনো দিক থেকেই শিরোমণি তো অসম্পূর্ণা নয়। তাহলে—?

এই 'তাহলে'-টাই নিরুচ্চার ভাবে পাক খায় কর্ণগড়ের কোণায় কোণায়। শিরোমণির অবশ্য এ ব্যাপারে তেমন হেলদোল নেই। মা না-হবার যন্ত্রণা তাকেও ক্ষতবিক্ষত করে। কিন্তু প্রকাশ করে না তীক্ষ্ণ শরে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ হওয়া তার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণের কথা। নিজের যন্ত্রণার কথা, নিজের সন্তান না হলেও শিরোমণি খুশি রাজ্যের প্রজাদের নিয়ে। অল্পদিনের মধ্যে শিরোমণি হয়ে ওঠে প্রজাদের ছোটো রানিমা বা কেবলই মা জননী।

শিরোমণির কিশোরীবেলার সেই চঞ্চলতা কমেছে একথা ঠিক। তা বলে সে যে ঘরে বসে থাকত তাও নয়। শিরোমণি প্রায়ই বেরিয়ে পড়ত রাজপ্রাসাদ থেকে। কোনোরকম রক্ষী না নিয়েই। সটান চলে যেত রাজ্যের বিশেষ করে গরিবগুর্বো প্রজাদের ঘরে। দাওয়ায় বসে শুনতো তাদের দুঃখকষ্ট, অভাব অভিযোগের কথা। যেগুলোর প্রতিকার তার আয়ত্তের মধ্যে থাকত সেগুলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে করত সে। আর যেগুলো তার ক্ষমতার বাইরে তার জন্য এক ধরনের আবদার করত স্বামী রাজা অজিত সিংহের কাছে।

রাজা সত্যিই ভালোবাসতেন শিরোমণিকে। কেবল স্ত্রী অথবা সুন্দরী নারী হিসেবে নায়, রাজার প্রেমে কেমন যেন একটা স্নেহের মাখামাখি ছিল। হয়তো-বা ছিল এক ধরনের অপত্যস্নেহও। সন্তান থাকলে তার আবদার মেটানোর জন্য যা যা করতেন, সেগুলোই তিনি করেন রানি শিরোমণির ক্ষেত্রে। এর যে বাঁকা অর্থ কেউ করে না, তা নয়। কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না রাজা অজিত সিংহের।

আর রানি শিরোমণি। পতি অজিত সিংহের মাঝেমাঝেই এই পিতা হওয়াটা তার কাছে ছিল রীতিমতো ভালো লাগার বিষয়। ওইসময় তার বারবার মনে পড়ত আনন্দপুরের কথা। মনে পড়তো বাবার কথা। সাধ্য না থাকলেও বাবা তার সবসময়ই ব্যস্ত থাকত মেয়ের সাধ পূরণের জন্য। বাবার মুখের সেই ছায়া সে দেখতো স্বামী অজিত সিংহের তৃপ্ত মুখে। সেটা দেখতে দেখতে

শিরোমণি হারিয়ে যেতো তার ছেড়ে আসা গ্রাম—তার বাবা মা—খেলার সাথী—সেখানকার সব আপন হওয়া সব মানুষজন আর সেখানকার প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে।

তার সেই আনমনা ভাব দেখে রাজার বেশ ভালোই লাগতো। অনেকক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন তিনি ওই ভালো লাগাটাকে। তারপর আলতো ঠেলায়, জিজ্ঞেস করতেন, কী হলো? কোথায় হারিয়ে গেল আমার ছোট্ট বউটা।

লজ্জা পেতো শিরোমণি। মেনি বেড়ালের মতো এক ধরনের আদুরে গলায় বলতো, হারাবো কোথায়? এই তো আমি রয়েছি তোমারই কাছে।

—তাই! কিন্তু মনটা কোথায় গেল?

উত্তরে ভারী হতো শিরোমণির গলা। বলতো, হঠাৎ-ই আনন্দপুরের কথা মনে পড়ে গেল। বাবা-মা, সেখানকার মানুষ—সকলে যেন আমার চোখের সামনে এসে পড়লো। তাই—

পতি আবার পিতা। অথবা সখা। নরম গলায় বলেন অজিত সিংহ, কী যাবে সেখানে? ব্যবস্থা করবো সব?

ঘনঘন মাথা নাড়ে শিরোমণি। না, না, সেখানে যাওয়ার কী আছে। তাছাড়া ওখানে যাওয়াটা বেশ হ্যাপার ব্যাপার।

—বেশ তো, তাহলে ওদেরই বরং আসতে বলি। তাতে তোমার ওই 'হ্যাপাও' থাকবে না, আর দেখাটাও বেশ হয়ে যাবে।

একথার আর না করে না শিরোমণি। বলে, সত্যি সত্যি তুমি আমার বাবা-মাকে এখানে নিয়ে আসবে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আমার বউয়ের মন যখন খারাপ, তখন ও কাজটা তো আমাকে করতেই হবে। না হলে হয়তো, রাগ করবেন রানি, আর এক হুকুমে আমার গর্দানটাই কেটে নেবে।

শিরোমণি স্বামীর বুকে মাথা রেখে শুধু বলে, যাও।

রাজপ্রাসাদের সকলের সঙ্গেই বেশ ভালো ভাব রানি শিরোমণির। প্রজাদের ঘরেও তার নিত্য যাতায়াত। তবুও, মনের কথা বলার মতো মানুষ তার বড়োই কম। তাই সকলের মধ্যে থেকেও শিরোমণির মাঝে মাঝে নিজেকে বড়ই একা লাগে।

স্বামী সোহাগিনী সে। একথাটা নিজেও জানে শিরোমণি। কিন্তু স্বামীকে তো আর সবসময় কাছে পাওয়া যায় না। সব সময় বলাও যায় না সব কথা। স্বামী তার রাজা। কত কাজ তার। নিজের রাজ্য রক্ষা করা, শত্রুদের থাবা যাতে রাজ্যে না পড়ে তার জন্য সব ব্যবস্থা করা, সজাগ থাকা, রাজ্যের সীমানা যাতে এক জায়গাতেই আটকে না থাকে, তারজন্য নতুন নতুন জায়গা দখল করা। সেই




**শারদীয়া দুর্গোৎসব ও দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন**



**Seva** mudran

A HOUSE OF WEB & SHEET FED OFFSET PRINTING

**OFFSET PRINTING (B/W & MULTI COLOUR), DTP & PERFECT BINDING**

**ALL UNDER ONE ROOF**

**We specialise in :**

Bulk Offset Printing • Government & Institutional Printing • DTP Composition • Perfect Binding • Four Colour Offset Printing • Publishing

**43, Kailash Bose Street, Kolkata - 700 006**

**Phone**: 033-2350-5468 / 2350-0058 • **Mob**: 9836013270

**E-mail:** sevamudran@gmail.com

**URL:** www.sevamudran.com

**GeM Registered | MSME/Udyam Registered**

সঙ্গে প্রাসাদে কেউ যাতে গুপ্ত চক্রান্ত না করতে পারে সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয় রাজাকে। তাই সব মিলিয়ে রাজার নিজের কাজে সময় বড়োই কম। আর রাজা তো একা তার নয়, ভবানীও তো আছে। তাকেও তো সময় দিতে হয়। সে কারণে স্বামী তার সব সময় সব কথা বলার মানুষ নয় কখনই।

সেদিক থেকে প্রাসাদের তার সত্যিকার আপনজন বলতে বড়োরানি ভবানী। লোকে বলে সতীন কাঁটা। কিন্তু তারা যদি এই কর্ণগড় রাজপ্রাসাদে আসে তাহলে বুঝবে কথাটা সবসময় সত্যি নয় কখনই। প্রথম দিন থেকেই ভবানী নিয়েছে শিরোমণির দিদির আসন। আর শিরোমণিও ছোটো বোনটি হয়ে আছে বেশ আনন্দেই। ওপরের ঝড়ঝাপটা সবই সামলান দিদি—ভবানী।

এই দিদির সঙ্গে সব সুখ-দুঃখের কথা ভাগ করে নেয় শিরোমণি। মনের ইচ্ছে অনিচ্ছে সব কথা সে অকপটে জানাতে পারে ভবানীকে। আবদার যা করার তাও করে সে তার এই দিদির কাছেই। রানি হলেও তাদের দুজনের দুঃখই যে একরকম। বাইরে যত সম্পদ, আলো-হাসি-গান থাকুক, তাদের দুজনের হৃদয়ই একধরনের অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, তার যাতনা যে কী ভয়ানক, সে কথা তারা বোঝাবে কাকে? তাই তারা দুজনেই এক্ষেত্রে দুজনের একমাত্র অবলম্বন।

এই দুজন ছাড়া আর যার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায় সে হলো তার চুনিদা। রাজবাড়ির দেওয়ান চুনিলাল খান। নাড়াজোল রাজবাড়ির সন্তান। কর্ণগড়ের রাজাদের সঙ্গেও তার একটা সম্পর্ক ছিল। একইভাবে চুনিলাল ছিল শিরোমণির বাবা বৈদ্যনাথের তুতো দাদার ছেলে। সেই সূত্রেই আনন্দপুরে ছিল তার নিত্য যাতায়াত। শিরোমণি সেই শিশু বয়সে আধো আধো সুরে ডাকত তাকে—চুনি দা– চুনিদা বলে। তখন থেকেই তার যত আবদার চুনিদার কাছে।

আর চুনিলালও কেমন একটা মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছিল শিরোমণির সঙ্গে। তার টানেই সে ঘন ঘন চলে আসতো আনন্দপুরে। মাঝে কাজের চাপে কিছুদিন সে আনন্দপুরে আসতে পারেনি। এমন কী শিরোমণির বিয়েতেও। তার জন্য শিরোমণির ছিল ভারি অভিমান।

বিয়ের কিছুদিন পর সেই চুনিলালকে শ্বশুর বাড়িতে দেখে শিরোমণি ভারি খুশি। সব অভিমান জল। তারপর যখন শুনল চুনিলাল তাদের রাজবাড়ির নতুন দেওয়ান, তখন আর তাকে পায় কে! আবার সেই বালিকাবেলার মতোই চুনিলালের সঙ্গে গল্পগুজব করা। মাঝে মাঝে আবদার করত। মোটকথা, জমিদারির কাজের বাইরে শিরোমণির সঙ্গে গল্প করাটাও হলো চুনিলালের আরেকটি বড়ো কাজ।

চুনিলাল আর শিরোমণির এই মেলামেশা নিয়ে রাজবাড়িতে কোনো সমস্যা ছিল না। রাজা অজিত সিংহেরও ওই দুই ভাই-বোনের ভাব, খুনসুটি দেখে ভারি মজাই লাগত। তাই কোনো মন্দ চিন্তা ছুঁতে পারেনি রাজাকে।

**শুরু চক্রান্ত**

একজন কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে মনে মনে শকুনির মতোই ঘুঁটি সাজাতে থাকে। লোকটি কর্ণগড়েরই এক রাজ কর্মচারী। রাজ সেরেস্তায় বেশ বড়ো পদেই কাজ করে সে। কিন্তু সে পদে সন্তুষ্ট নয় সে। অনেক দিন থেকেই রাজবাড়ির দেওয়ানের গদির দিকে নজর ছিল তার। কিন্তু কিছুতেই পৌঁছাতে পারছিল না সে লক্ষ্যে। তবে হাল ছাড়েনি কোনোদিন।

লোকটির নাম যুগলচরণ। চুনিলালের আগের দেওয়ান চলে যাওয়ার পর যুগলচরণ ছিল ওই পদের দাবিদার। তাঁর নিয়োগও ছিল প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু শেষমুহূর্তে রাজা তাদের আত্মীয় চুনিলালকে দেওয়ান করার পর থেকেই যুগলচরণ যেন বিষধর সাপ। ছোবল মারার জন্য মুখিয়ে থাকে।

রাজা অজিত সিংহের ওপরই ছিল যুগলচরণের সবচেয়ে বেশি রাগ। কিন্তু রাজার ওপরে রাগের কারণে কিছু করে বসলে তার যে ফল ভালো হবে না, তা বেশ ভালোই জানতো। তাই লক্ষ্য বদলায় সে। রাজা নয়, তার যত রাগ এখন চুনিলালের ওপরে। তাকে পদ থেকে সরানোর জন্য একটার পর একটা চক্রান্তের জাল বিছোতে থাকে।

চুনিলালের ওপর রাজা এবং তাঁর পরিবারও যেভাবে নির্ভর করছে, তাতে তাকে সরানো যে খুব একটা সহজ হবে না এটা বেশ ভালোই বোঝে যুগলচরণ। তাই আবোল তাবোল অনেক কিছুই ভাবে কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পায় না। একসময় চুনিলালকে হত্যা করার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু ঝুঁকির কথা মনে রেখেই সে চিন্তা ছাড়ে সে। খোঁজে অন্য কোনো পথ।

সেই পথ খুঁজতে গিয়ে যুগলচরণ একটা কদর্য খেলায় নামে। রানি শিরোমণি আর চুনিলালের সম্পর্কে ফিসফাস করে সে। একে একে অনেককেই সে দলে টানে। তখনই লাগে রাজা অজিত সিংহের কান ভাঙাতে। কানে ঢালতে থাকে নানা সন্দেহের বিষ। অবশেষে সফলও হয় যুগলচরণ।

এমনিতেই রাজারা কান দিয়েই দেখেন। আর সেটা স্ত্রীর সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক নিয়ে হলে তো একসময় অতি বড়ো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও ভুল করেন। সেই সুযোগ নিয়ে চুনিলাল সম্পর্কে আরও নানা অভিযোগ তুলে রাজাকে বিরূপ করে তোলে। তারই জেরে রাজা বরখাস্ত করেন চুনিলালকে। তার ফলে শিরোমণির জীবনের একটি খোলা জানলা বন্ধ হয়ে যায়।

**চুক্তি তিন শর্তে**

তবু মিটল না সাধ। পুরণ হলো না আশাও। কর্ণগড়রাজা অজিত সিংহ মারা গেলেন নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ভাগ হয়ে গেল অজিত সিংহের রাজ্য বা জমিদারি। দুই ভাগের অধিকারী হয় ভবানী আর শিরোমণি। রাজা নয় এবার শুরু হলো মেদিনীপুরের রানি-জমানা।

অজিত সিংহের মৃত্যুর প্রায় পরে পরেই ঘটে এমন একটি ঘটনা, যাতে বদলে যায় কর্ণগড়ের ইতিহাসের গতিপথ। ইংরেজ

ঐতিহাসিকদের বিকৃত রচনায় 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামে আখ্যাত কৃষক ও সাধারণ নিম্নবর্গীয় অধিকার হারা মানুষের যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল জঙ্গল মহলে, তারই একটি আঘাত এসে পড়ে কর্ণগড়েও। সম্ভবত, জমিদারি বা রাজ্যের অধিকারী মহিলা ভেবে ওই কৃষক বিদ্রোহীদেরই একটি অংশ আক্রমণ করে কর্ণগড়। ওই আক্রমণকারীদের নেতা ছিল গোবর্ধন দিকপতি নামে এক বাগদি সর্দার।

সেই আক্রমণের মুখে অপ্রস্তুত দুই রানিই আত্মরক্ষার তাগিদেই নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খাঁয়ের কাছে আশ্রয় নেয়। দুই রানি কর্ণগড় ছেড়ে ত্রিলোচন খাঁয়ের সঙ্গে যেখানে দেখা করে, সে জায়গর নাম 'রানি পাটনা'। সেখানে দুই রানির সঙ্গে একটি চুক্তি হয় ত্রিলোচনের। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে ওই চুক্তিপত্র বা 'অছিয়তন একরার'-এ ছিল মূলত তিনটি শর্ত। সেগুলি হলো—

ত্রিলোচন খান চুয়াড়দের বিদ্রোহ দমন করবেন।

রানিদের জীবদ্দশায় ত্রিলোচনই কাজ করবেন নায়েব হিসেবে।

রানিদের মৃত্যুর পর ত্রিলোচন অথবা তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন কর্ণগড় তথা মেদিনীপুর রাজ্যের অধিপতি।

এই অঙ্গীকারপত্র সম্পাদনের মধ্য দিয়ে কর্ণগড় ও নাড়াজোলের সম্পর্ক আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। দুই রানিই কর্ণগড় ছেড়ে আশ্রয় নেয় নাড়াজোলে।

ত্রিলোচন কথা রেখেছিলেন। গোবর্ধন দিক্‌পতির হাত থেকে উদ্ধার করেন কর্ণগড়সহ মেদিনীপুরের জমিদারি এবং তিনিই হন এক অর্থে জমিদারির সর্বেসর্বা, যদিও সাধারণ হিসেবে তিনি ছিলেন রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে কর্ণগড়ের বড়োরানি ভবানীর মৃত্যু হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার নানা রকমের আইনের প্যাঁচে রানি ভবাণীর জমিদারিটুকু প্রায় জবরদখল করে। শিরোমণি অবশ্য তার অংশের মালিক থাকেন যথারীতি। আর ত্রিলোচন যথারীতি দেওয়ান হিসেবে জমিদারি সামলাতে থাকেন।

শিরোমণি ততদিনে অনেকটাই বদলে গেছে। শিরোমণি নিজেকে বদলে নিয়েছে। এবং সেটা অবস্থা আর পরিস্থিতির চাপে। অথচ এটা সে চায়নি কখনই। রানি হয়ে কর্ণগড়ে এলেও মনের দিক থেকে সে কোনোদিনই রানি হিসেবে এই জমিদারির ভার নিতে চায়নি। বারবারই তার মনে হয়েছে, রানির রাজদণ্ড হাতে নিলে সে হয়তো মাটির ছোঁয়াটা হারিয়ে ফেলবে। আর সেই ভয়টাতেই ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে।

সেই ছোটোবেলা থেকেই শিরোমণি শিকড়-মুখী। সাধারণ কৃষক ঘরের কন্যা কর্ণগড়ের রানি হয়েও হয়নি আকাশ-বিলাসী। ভোলেনি তার পিতৃকুলের অবস্থার কথা। ভোলেনি তার গ্রামের মানুষজনের কথা। তাই বা কেন, ভোলেনি সে তার গ্রামের মতোই আর সব মানুষের কথা। ভোলেনি বলেই রাজরানি হয়েও সাধারণ প্রজাদের ভালোর জন্য যা যা করা উচিত, সেটাই করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু গোবর্ধন দিকপতি কর্ণগড় দখল করার পর তার বিশ্বাসের ভিতটা একটু হলেও নড়ে গিয়েছিল।

শিরোমণি নাড়াজোলে যাওয়ার পর ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভালো করে দেখেছে। পরে মনে হয়েছে সব-হারানো রায়ত-পাইকদের কাছে সব জমিদার রাজাই শোষক। সেই শ্রেণীবিদ্বেষের কারণেই হয়তো তারা ওই আক্রমণ চালিয়েছিল। তাছাড়া হয়তো আরও একটা কারণ ছিল।

হ্যাঁ, অনেক কিছু ভাবার পর এটাও মনে হয়েছিল শিরোমণির। ওই বিদ্রোহী চাষি-পাইকদের দরকার অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের। হয়তো তাদের মনে হয়েছিল রাজা অজিত সিংহের অবর্তমানে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। এই সময় সেখানে হানা দিলে হয়তো সবকিছু দখল করা অনেক সহজ হবে। বাস্তবে তো সেটাই হয়েছিল। সে কারণেই বিদ্রোহীদের কর্ণগড় দখলটাকে শিরোমণি শান্তমনেই মেনে নেয়। মেনে নেয় বলেই বিদ্রোহীদের কেবল ক্ষমাই করেনি, তাদের মতো সব-হারানো মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন করে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কেবল মুখের কথায় নয়, তাদের জুগিয়েছে অর্থ ও বুদ্ধি। লড়াইয়ের কৌশল ঠিক করার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে নানাভাবে। কোম্পানির সরকারের বিষনজরে পড়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও তাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখেনি। বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে।

অজিত সিংহ বেঁচে থাকার সময় তো বটেই তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারির একটা বড়ো অংশের অধিকারী হয়েও বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে রানি শিরোমণি খুব একটা মাথা ঘামায়নি। তার একটা কারণ, বড়ো রানি ভবানী। রানি হিসেবে কর্ণগড়ে পা রাখার পর থেকে রানি ভবানীই ছিল শিরোমণির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন ও আদর্শও। সে কারণে দিদি হিসেবে মেনেছে যাকে তাকে ডিঙিয়ে সম্পত্তির ব্যাপারে তৎপর হতে পারেনি। কিন্তু ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রানি ভবাণীর মৃত্যুর পর পরিবর্তিত অবস্থায় রানি শিরোমণিকে অবশ্যই সক্রিয় হতে হয়।

অন্যান্য ব্যাপারে সক্রিয় হলেও জমিদারির বৈষয়িক দিকটা দেখাশোনার দায়িত্বটা ছিল ত্রিলোচন খানের ওপরই। ত্রিলোচনের প্রতি এই নির্ভরতার মূলত দু'টি কারণ। প্রথমত, এই কাজে ত্রিলোচন ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, কুশলী এবং অবশ্য সৎ। তাঁর সততা নিয়ে কখনই কোনো প্রশ্ন উঠেনি। দ্বিতীয়ত, ত্রিলোচন ছিলেন তাঁদের অতি নিকট জন। সম্পর্কে রাজা অজিত সিংহ এবং ত্রিলোচন খান ছিলেন মামাতো-পিসতুতো ভাই। দু'জনের মধ্যে ছিল খুবই ভাব-ভালোবাসা। দু'বাড়িতে যাতায়াতও প্রায় নিত্যই। সে কারণেই ভবানী ও শিরোমণি ছিল তাঁরই উপর নির্ভরশীল।

এই আত্মীয়তা, দক্ষতা ও সততার কারণেই ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো মতিরামকে ওই পদে বসানো হয় প্রায় নির্দ্বিধায়। মতিরামের মৃত্যুর পর ওই দায়িত্ব বহন করেন সীতারাম খান। এই সীতারামের পরিবারের সঙ্গে এক ধরনের আত্মিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে শিরোমণি।

রানি শিরোমণিরা যেসময় নাড়াজোলে ছিলেন তখন

সীতারামের বড়ো ছেলে আনন্দরাম শিশু। তার আধো আধো কথা, টলো মলো চলা, সবকিছুই শিরোমণির মাতৃহৃদয়ে একধরণের আলোড়ন তোলে। অনাস্বাদিত অপত্যস্নেহের ধারায় আনন্দরামকে সবসময় যেন অভিষিক্ত করত শিরোমণি। আনন্দরামও ছিল শিরোমণির খুবই ন্যাওটা। সব সময় সে ঘুরতো একবারে শিরোমণির পায়ে পায়ে।

পুনর্দখলের পর রানিরা কর্ণগড়ে ফিরে আসার পরও আনন্দরামকে প্রায়ই নিয়ে আসতো সেখানে। আনন্দরামও কর্ণগড়ে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। কর্ণগড়ে আনন্দরাম যে আনন্দ পেত, যেটা নাড়াজোলে তার কাছে অধরাই ছিল। শিরোমণিকে আনন্দরাম মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। কথায়বার্তায় এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট ছিল, রানির অবর্তমানে আনন্দরামই হয়তো হবে কর্ণগড়ের রাজা। শিরোমণির নিজেরও ছিল তেমনই ইচ্ছা। কিন্তু কাগজে কলমে শিরোমণি কখনই আনন্দরামকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেনি। যদিও আনন্দরামই ছিল শিরোমণির হৃদয়ের মণি।

**রটনা, নাকি—**

ক্ষমতা যেন বারুণী। সোজা কথায় ধেনোমদ। তার টানে ভনভন করবে উড়বে মাছি। এটাই স্বাভাবিক। রাজা কিংবা জমিদার এমনকী সাধারণ পরিবারেরও থাকে ওই রকম কিছু মাছি। ক্ষমতা দখলের জন্য ভন ভন করবেই তারা। কান ভাঙাবে, মনে ঢালবে বিষ। এমনই কিছু লোক রানি শিরোমণি আর আনন্দরামের সম্পর্কটা বিষিয়ে দিতে রটায় অনেক কিছু। তারই জন্য রানি শিরোমণিরও একসময় মনে হয়েছিল আনন্দরামও বোধ হয় ষড়যন্ত্রকারী। এই সন্দেহে রানি আদালতেও যায়।

এত সবের পরেও মনে হয়, সবই রটনা। তা যদি না হবে তাহলে রানি কেন এরপরেও 'হেবা নামা' বা দানপত্রের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত রাজ্য আনন্দরামকেই দিয়ে যাবে। মৃত্যুর বছর দুই আছে ১২১৭ সালের ১৯, আষাঢ় (১৮১০ খ্রিঃ) ওই আনন্দরামের নামে ওই দানপত্র সম্পাদন করে রানি। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর (১২১৯-এর ভাদ্র) রানি শিরোমণির মৃত্যুর পর ওই দানপত্রের বলে কর্ণগড়-সহ মেদিনীপুরের অধিপতি হয়।

আনন্দরাম অপুত্রক অবস্থাতেই মারা যায়। মৃত্যুর আগে আনন্দলাল এক ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করেন। সেই ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী মেদিনীপুরের জমিদারির মালিক হয় ছোট ভাই মোহনলাল এবং পৈতৃক সম্পত্তি নাড়াজোলের সম্পত্তির অধিকার পায় মোজোভাই নন্দলাল। অবশ্য এইসব সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কম মামলা মোকদ্দমা হয়নি। প্রিভি কাউন্সিলে পর্যন্ত যায় কোনো কোনো মামলা। সেখানেই হয় মামলার চূড়ান্ত ফয়সালা। আর সেসবের মধ্য দিয়েই একসময় কর্ণগড় এবং নাড়াজোল হয় একীভূত। পুরো সম্পত্তির অধিকারী হয় নাড়াজোলের খান বংশ।

সে সব অবশ্য ভিন্ন কথা। ফেরা যাক রানি শিরোমণির কথায়।

**বিদ্রোহের পথে**

সময়—মানুষের চরিত্র বিনির্মাণের সময়ই নেয় সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা। রানি শিরোমণির জীবনে সময়ই নানা সময় ফেলে নানা মায়ার খেলা। সে খেলা খেলতে খেলতে শিরোমণি হয়ে ওঠে পরিণত।

সাধারণ কৃষকের ঘর থেকে কর্ণগড়ের রানি হওয়ার পর শিরোমণি দেখেছে বৈভব। দেখেছে ঐশ্বর্যের প্রকাশ। আবার স্বামী অজিত সিংহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী গোবর্ধন দিকপতিরা কর্ণগড় দখল করলে রানির জীবনে হঠাৎ-ই আসে অমাবস্যার অন্ধকার। বিপর্যয় কাকে বলে তা বুঝেছে তখন। তারপর প্রতিপদের পর্যায়ক্রমে শিরোমণির জীবনে আবার এনেছে শুক্লপক্ষ।

শিরোমণি বুঝেছে এটাই জীবন। এখানে সবই অনিত্য। সত্য একমাত্র কর্ম। কর্মই মানুষের বর্তমান এবং ভবিষ্যতও। এই সময় তার জীবনবোধকে বিশেষভাবে আলোকিত করে তার চুনিদাদা। চক্রান্তের শিকার হয়ে কর্মচ্যুত হলেও সম্পর্কের অধিকারে চুনিলাল আগের মতোই থাকে শিরোমণির জীবন দিশারি।

নাড়াজোল রাজ বাড়ির সন্তান চুনিলাল। কিন্তু রাজসম্পদের চেয়েও সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তার টান। সেকারণেই ইংরেজের নির্মম শোষণে দেশের সাধারণ মানুষ এমন কী ভূস্বামীরাও সব হারিয়ে একবারে নিঃস্ব হচ্ছিল, তখন চুনিলাল মিশে যায় তাদের সঙ্গে। তাদের সংগঠিত করতে থাকে গোপনেই। সেই গঠনপর্বে ধীরে ধীরে শিরোমণির মননের ক্ষেত্রেও প্রভাব দেখতে থাকে চুনিলাল। শিরোমণিও হয়ে উঠতে থাকে সাধারণ অভিজাত নিম্নবর্গীয়দের লড়াইয়ের শরিক।

কেবল চুনিলালের শিক্ষা বা জীবনদর্শন নয়, পারিপার্শ্বিক আরও বেশ কিছু ঘটনা ক্রমেই রানি শিরোমণিকে কৃষক বিদ্রোহের শরিক হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। একটা সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে রানির পক্ষে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না। সময় ও পরিস্থিতিই রানিকে করে তোলে ভারতে প্রথম বিদ্রোহী নেত্রী।

দণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির থেকে ভেসে আসছে ডমরুর ডমডম শব্দ। যেন মহাকালের ঘোড়া ছুটছে দুর্বার গতিতে। রানি শিরোমণির বুকের ভিতরেও। তীব্র হচ্ছে যেন ওই ধ্বনি। যেন কাছে, আর কেন অলস-বিলাস? এখনও কি হয়নি সময়? আর কবে—কবে—

শিরোমণি স্থির হয়। হয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবস্থা ক্রমশ যে দিকে চলেছে, তাতে আর দূরে থাকা নয়। এবার আসতে হবে সামনে। হাতে তুলে নিতে হবে হাতিয়ার।

রানি শিরোমণির এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ হয়ে ওঠে বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসক। বঙ্গের মানুষের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দেওয়ার জন্য তারা করে যাচ্ছে একটার পর একটা আঘাত। ভূমি সংস্কারের নামে বড়লাট কর্ণওয়ালিস যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বলবৎ করে, তাতে একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হলো কেবল কৃষক-পাইক এবং সাধারণ মানুষই জমিহারা হয় না, ছোটো-বড়ো জমিদার,

ভূস্বামীরাও অনেকেই রাতারাতি সব হারিয়ে একবারে পথে এসে দাঁড়ায়। ধূমায়িত হতে থাকে ক্ষোভ ও ক্রোধ। যেন আগ্নেয়গিরির লাভা। উত্তপ্ত হচ্ছে—ফুটছে—জ্বালামুখ দিয়ে উদ্‌গীরণের প্রহর গুনছে।

ইংরেজ বেনিয়া সরকারের ওই নীতির খাড়ায় বিক্ষত হলো রানি শিরোমণির কর্ণগড় ও মেদিনীপুরের সম্পত্তিও। সরাসরি এই আঘাতে শিরোমণি উদ্বিগ্ন—প্রত্যাঘাত করার জন্য ক্রমশ সক্রিয়।

রানির বিরাগ কেবল নিজের সম্পত্তি বা স্বার্থে নয়, রানির দুশ্চিন্তা দেশের সাধারণ মানুষের জন্যও। কার্যত সর্বস্ব হারানোর মানুষগুলির স্নায়ু বিবশে কোম্পানির দালালরা গোপনে যেভাবে আফিং বিলোচ্ছে বিনা পয়সায় তাতে রানি রীতিমতো ক্রুদ্ধ।

মানুষের কায়িক ও মানসিক শক্তি এরকম চোরাপথে বিফল করে দেওয়াটা মানবতার চরম অবমাননা বলে মনে হল রানির। একইসঙ্গে জমিজমা কেড়ে নেওয়া মানুষগুলির উপর কোম্পানির কর্তা এবং তাদের পুলিশ ও দালাল ইজারাদাররা যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছিল তাও রানিকে প্রকাশ্য বিরোধিতায় সরব হতে উদ্বুদ্ধ করল। এরই মধ্যে রানির জমিদারিতেই রতন সিংহ, রাম সিংহ, রঞ্জিত মহাপাত্র প্রমুখ সর্দার তহসিলদারদের কোম্পানি বরখাস্ত করল। রানির এবার স্পষ্ট নির্দেশ, খতম করো নির্দয়-নিষ্ঠুর খাজনা আদায়কারী রামমোহন রায়কেও। বিদ্রোহীরা প্রজাদের সঙ্গে একই সারিতে শামিল এবার রানি শিরোমণি।

১৭৯৪-এ ইংরেজ শাসক এক ফতোয়ায় রানির জমিদারি বাজেয়াপ্ত করায় শিরোমণির নিজেকে অপমানিত ও অন্যায় অবিচারের শিকার বলে মনে হলো। কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি এবং জমিদারিরই কিছু সন্দেহভাজন কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে দহরম মহরম রানিকে বিচলিত করে তোলে। চরম আঘাত হানার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হয় রানি শিরোমণি।

ইংরেজকে প্রত্যাঘাত করার প্রস্তুতি হিসেবেই রানি শিরোমণি কতকগুলি আগাম ব্যবস্থা নিতে থাকে। রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে রানি বিদ্রোহী প্রজাসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের সুসংহত করার জন্য তৎপর হয়। তাতেই রানিকে সমর্থন করার সবরকম আশ্বাস দেয় উপজাতি সর্দাররা।

ইংরেজের শোষণনীতির ফলেই অনিবার্য হয়ে ওঠে কৃষক ও সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ। জমি নিলামে তোলা, নিষ্কর জমিকেও সকর করা, স্থানীয় শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত পাইকদের বরখাস্ত করে পশ্চিমি কায়দায় পুলিশি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে জমি-বাস্তু ও কর্মচ্যুত মানুষ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওই রকম একটা অবস্থায় রানি শিরোমণি তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসায় তাদের বল ও ভরসা দুটোই বেড়ে যায়।

রানি শিরোমণিও সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার তাগিদে জঙ্গল মহলের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ছোটো বড়ো জমিদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রক্রিয়াটি সচল রাখে।

আর এইভাবেই রানি শিরোমণি ইংরেজ সরকারের ওপর বড় ধরনের আঘাত হানার প্রস্তুতি চালাতে থাকে।

রানি ধীমতী। রানি প্রায় নিরক্ষর। কিন্তু সহজাত বুদ্ধি ও প্রতিভায় অতুলনীয়া। অধ্যয়নের সুযোগ ছিল না রানির কিন্তু অধ্যবসায়ের সাহায্যে বহু বিষয়ে রানি হার মানায় ধুরন্ধর সব প্রবীণকে। বঙ্গের মেয়েরা সেযুগে অনেকেই পড়াশোনার সুযোগ না পেলেও সাংসারিক বুদ্ধিতে পোড়খাওয়া রাজনীতিকদেরও ঘোল খাওয়াতে পারতেন। সেই ধারাতেই শিরোমণি জমিদারি পরিচালনার কূটকৌশল আয়ত্ত করে প্রায় অনায়াসে।

একইভাবে নিয়মমাফিক শরীরচর্চার সুযোগ না পেলেও সাঁতার কাটার মতো দেশজ ব্যবস্থাতেই শরীরটা বেশ ভালোভাবেই গড়েছিল রানি। ছোটোবেলায় গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে নানা খেলা বা দুষ্টুমিতে এগিয়ে থাকার ফলে প্রথাসিদ্ধ অস্ত্র শিক্ষা না করলেও তরবারি চালনায় রীতিমতো দক্ষই ছিল রানি।


*With Best Compliments From -*

**GURDEV SHARMA**

**(DEVI)**

Cashier BJP Punjab & Incharge Central Constituency Ludhiana

689, Issa Nagri Puli, Ludhiana - 141 008

(Punjab) India

গ্রামে থাকার সময় গোরু-মহিষের পিঠে চেপে গোষ্ঠভ্রমণ ছিল তার একটি প্রিয় খেলা। অশ্ব চালনাটাও রপ্ত করে গ্রামে চড়ে বেড়ানো কিছু ঘোড়াকে ধরে। এইভাবে শিরোমণি প্রায় সব বিষয়েই ছিল একজন কৃতবিদ্য। আর সেই কারণেই রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর সাময়িক শোক ও বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলিয়ে শক্ত হাতে জমিদারির চলমান রথটির কর্ণধার হয়ে ওঠে শিরোমণি।

রানি এভাবে সক্রিয়ভাবে জমিদারির হাল ধরায় সাধারণ প্রজারা খুবই খুশি। কেবল সুশাসন নয়, রানির কোমল হৃদয়ের ছোঁয়া প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে প্রজারা। একজন সফল প্রশাসক বা রাজা জমিদারের মতোই যে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল রানির। দক্ষতা বা বুদ্ধির নিরিখে নয়, রানি সবকিছু বিচার করত হৃদয় দিয়ে। সব অর্থেই রানি ছিল করুণাময়ী, অপরের দুঃখে অন্তর কাঁদত তার। শক্তি বা রুক্ষ বাস্তবতার নিরিখে বিচার না করে সংবেদনশীলতার সঙ্গে সব কিছু দেখার কারণেই রানি সব প্রজার কাছেই সমব্যাথী ও স্নেহময়ী জননী হয়ে ওঠে।

**শুরু চক্রান্ত**

রানির এই উত্তরণে অসহ্য হয়ে ওঠে অনেকে। রানির নায়েব যুগলচরণ তাদেরই একজন। স্বভাবে যুগলচরণ শিয়ালের চেয়ে ধূর্ত। হায়নার চেয়েও হিংস্র। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবকিছু করতে পারে। এব্যাপারে তার কাছে নৈতিকতা, মানবতা বা সম্পর্কের কোনো মূল্য নেই। একইসঙ্গে শকুনিমামা আর বিশ্বাসঘাতকের যুগলমূর্তি সে। তার মধ্যে রয়েছে একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। সব গ্রাস করতে চায়। ভোগ করতে চায় সব কিছু একাই।

কর্ণগড়ের নায়েব তখন চুনিলাল খান। তারই অধীনে শুরু তার কর্মজীবন। প্রথম থেকেই ওই নায়েবের গতির দিকেই পড়ল নজর। ওটা তার চাই, তা যে করেই হোক।

শুরু হলো নানা কারসাজি, কারচুপি। কান ভাঙানো, জাল জোচ্চুরি। তার ফল ফলল কিছুদিনের মধ্যেই। রাজ পরিবারের অমন সে বিশ্বস্ত নায়েব চুনিলাল, তাকে বরখাস্ত করে যুগলকেই নায়েব করেন রাজা অজিত সিংহ।

লক্ষ্যের প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই থেমে থাকল না যুগলচরণ। সে এবার রাজা হতে চায়। কিন্তু অজিত সিংহ বেঁচে থাকতে যে সেটা সম্ভব নয় তা বুঝেই অপেক্ষা করতে থাকে। সে জানে রাজা অপুত্রক। তার মৃত্যু পর্যন্ত তাই চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। বুদ্ধিমান যুগলচরণ তাই তলে তলে কাজ গুছোতে থাকে।

রাজা অজিত সিংহের পর সবকিছুর মালিক হলো রানি ভবানী আর শিরোমণি। যুগলচরণ ভেবেছিল, এবার শুরু হবে তার দিন। কিন্তু দুই রানিই নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচনকে সব দায়িত্ব দেওয়ায় যুগলচরণের যেন বাড়া ভাতে ছাই পড়লো। গোপনে গোপনে তাই আরও সক্রিয় হতে থাকে সে।

কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেলেন ত্রিলোচন। দেশের পরিস্থিতিও দ্রুত বদলাতে থাকে। বণিক ইংরেজ রাজা হয়েই নানাভাবে উৎখাত করে দেশের কৃষক, পাইক ইত্যাদি খেটে খাওয়া মানুষকে। সব হারিয়ে ওইসব কৃষক-পাইক প্রভৃতি সর্বহারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওইসময় তাদের পাশে দাঁড়ায় তাদের মাতৃস্বরূপা রানি শিরোমণি। গোপনে গোপনে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে থাকে রানি। দুর্বার হয়ে ওঠে আন্দোলন। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে ইংরেজ।

যুগলচরণ এবার তৎপর। সটান হাজির ইংরেজ শিবিরে। বলে 'কর্ণগড় থেকে আসছি'। সাহেবদের সঙ্গে কথা আছে।

—কথা?

—হাঁ, কিছু সওদা করতে চাই আমি।

—সওদা?

ভ্রূ কুঁচকোয় সাহেবদের। তা দেখে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে যুগলচরণ বলে, আমি হলাম কর্ণগড়ের নায়েব। সেখানকার সবকিছু আমার নখদর্পণে। সেইসব খবর আমি বেচতে চাই। তোমরা কি কিনবে?

খেলতে চায় সাহেবরা। বলে, কী খবর? তাতে আমাদের লাভ কী? অযথা সেসব খবর কিনবো কেন আমরা।

যুগলচরণ বলে, দেখ সাহেব, নাচতে এসে ঘোমটা টানার নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। আমি জানি শিরোমণি তোমাদের মনে ভয় ধরিয়েছে। তোমরা ভয়ে কাঁপছ। কী করে রানিকে বাগে আনবে তাই ভাবছ!

—ভয়! কে বলেছে তোমাকে এসব কথা। আমরা খামোখা রানিকে ভয় পাব কেন?

কুটিল হাসিতে মুখ ভরিয়ে যুগলচরণ বলে, দেখো আমার কাছে লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। সব জানি আমি তাই সোজাসুজি বলছি, আমি তোমাদের রানির সব খবর দিতে চাই। রানির গোপন পরিকল্পনার কথা আগাম জানলে তোমাদের যে সুবিধে হবে তা আমি জানি। তাই বলছি, কিনবে খবর?

—তা কী দাম দিতে হবে তোমার ওই খবরের জন্য?

—বেশি কিছু নয়।

—তবুও শুনি?

যুগলচরণ বলে আমি ওই কর্ণগড়ের সিংহাসনে বসতে চাই। রানিকে ধরিয়ে দেবো। বদলে চাই ওই সিংহাসন।

হাসে সাহেবরা। আবার সেই বিশ্বাসঘাতক হাজির তাদের দুয়ারে। এসেছে অযাচিত ভাবেই। তাই আঁতাত করে যুগলচরণের সঙ্গে, পেতে থাকে খবর।

ইংরেজরা রানি শিরোমণিকে নিয়ে সত্যিই ভয়ে ভয়ে আছে। কখন যে কোন দিক থেকে হঠাৎ হানা দেবে তা কেউ জানে না। এই তো কিছুদিন আগের কথা। শ'তিনেক বিদ্রোহী আচমকা হানা দিয়ে তাদের অস্ত্রাগার থেকে সবকিছু লুঠ করে নিয়ে পালায়। ওই বিদ্রোহী দলকে নাকি শিরোমণি নিজে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু সব খবর ঠিক ঠিক না পাওয়ায় কিছুই করা যায়নি সেভাবে।

তবে একা যুগলচরণ নয়, ইংরেজরা খবর জানার জন্য

নিজেরা বহু চর নিয়োগ করেছে। তারা কেউ ভিখিরি, কেউ সন্ন্যাসী বা ওইরকম কিছু সেজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে খবর আনছে। তবে ভেতরের খবর জানার জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। যুগল চরণকে পেয়ে সে দিক থেকে কিছুটা সুবিধাই হলো ইংরেজের। এখন তারা আরও সুনির্দিষ্টভাবে ভেতরের খবর পাচ্ছে।

সেইসব খবরের ভিত্তিতেই মেদিনীপুরের কালেকটর কলকাতার ওপরওয়ালাদের জানায়, কর্ণগড়ের রানি শিরোমণির গতিবিধি মোটেই সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। শিরোমণি যে কোনো মুহূর্তে নাড়াজোল রাজার আত্মীয় চুনিলালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চোয়াড়দের নেতৃত্ব দিতে পারে। তাই অবিলম্বে সেনা পাঠিয়ে শিরোমণির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কালেক্টর বেশ জোরের সঙ্গে তাঁর রিপোর্ট লেখেন। চুনিলাল-শিরোমণি জোট ভাঙতে না পারলে সমূহ বিপদ। দেশের শান্তিরক্ষাও বেশ কঠিন হয়ে উঠবে।

কালেক্টর অন্য এক রিপোর্ট লেখেন, গুপ্তচর (যুগলচরণ) জানাচ্ছে বিদ্রোহীরা নিয়মিতভাবে কর্ণগড়ে এসে রানির পরামর্শ নিচ্ছে। লড়াই চালানোর জন্য নাড়াজোল থেকে চার গোরুর গাড়ি অস্ত্রও আমদানি করা হয়েছে।

টনক নড়ে কোম্পানির কর্তাদের। রানি শিরোমণি-সহ জঙ্গল মহলের সব জমিদারদের হুঁশিয়ারিপত্র পাঠাতে বলা হয়। চোয়াড়দের কোনোরকম ভাবে সাহায্য বা আশ্রয় দিলে ফল হবে মারাত্মক। একই সঙ্গে কোম্পানির নির্দেশে চোয়াড়দের বিরুদ্ধে শুরু হলো লাগামছাড়া অত্যাচার। রানি শিরোমণিও এবার প্রায় প্রকাশ্যে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। ইংরেজও প্রতিশোধ নিতে রানির জমিদারি পরিচালনার অধিকার কেড়ে নেয় ১৭৯৪ এর ১৮ জানুয়ারি।

অবশ্য এই প্রথম নয়। কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুলাই কর্ণগড়ে সীতারাম খান ও বনসুরাম (বাঞ্ছারাম) বক্সিকে বন্দি করে মেদিনীপুরের ফৌজদারি আদালতে সোপর্দ করা হয়। আর বিদ্রোহে মদত দেবার অভিযোগে রানিকেও সতর্ক করে ইংরেজ। বলে, ভবিষ্যতে এমন অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হবে। এরপর ১৭৯০-তে ১১৯৫ টাকা খাজনা বাকির দায়ে রানির খাজনামুক্ত 'নানকর' জমি ক্রোক করে ইংরেজ সরকার।

ইংরেজ সরকারের এই ধরনের নিপীড়ন, অত্যাচার রানির জেদটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। রানি বোঝে ভয় পেয়েছে ইংরেজ। সাপ যেমন ভয় পেয়েই ছোবল মারে, ইংরেজের অবস্থাও এখন তেমনই। তাই তৎপরতা বাড়ে রানির।

ইংরেজের ওপর বড়ো আঘাত হানার জন্য রানি এবার রণকৌশলে শান দেয়। আধুনিক আগ্নেয় অস্ত্রে বলীয়ান ইংরেজ যে কোনও মুহূর্তে সবশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তির ধনুক,


# ANOOPAM

## METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

*Manufacters & Exporters of :*

**CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS**

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

লাঠি-সড়কি নিয়ে সামনা সামনি তার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সে কারণেই রানি জোর দেয় চোরাগোপ্তা আক্রমণে। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলে গেরিলা যুদ্ধ—সেটাই হলো রানিরও যুদ্ধকৌশল।

শুধু হাতে নয়, ভাতেও ইংরেজকে মারার পথটাও নেয় রানি শিরোমণি। গোপনে হুকুম জারি হয়, ইংরেজ বা তার তাঁবেদার মহাজন, ইজারাদার বা পুলিশকে কোনো কিছু বিক্রি করা চলবে না। খাদ্যদ্রব্য থেকে জল সব কিছু সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দেয় রানি। সেই সঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারি, এটি যে মানবে না তার গর্দান যাবে—অন্যথা আর কিছু নয়।

ইংরেজের বিরুদ্ধে এধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি জোতদার ও কৃষক বিরোধীদের জমির ফসল কেটে তা সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া শুরু হলো। সব মিলিয়ে ইংরেজ ও তার সহযোগীদের একবারে কোণঠাসা করাই ছিল রানি শিরোমণির লক্ষ্য।

রানির রণকৌশল, চুনিলাল খানদের যোগ্য নেতৃত্ব আর স্বজনহারাদের বেপরোয়া প্রতিহিংসার লড়াইতে সারা জঙ্গলমহল তখন উত্তেজনায় যেন বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের মতো টগবগ করে ফুটছে। বিদ্রোহীদের ভয়ে থরহরি ইংরেজ শাসক বার্তা পাঠাচ্ছে কলকাতায়, বাঁচাও। অবিলম্বে অনেক-অনেক সেনা পাঠাও নাহলে মরবো আমরা সকলে।

এই ধরনের 'বাঁচাও', 'বাঁচাও' বার্তা পাওয়া মাত্রই কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম থেকে মেদিনীপুরে সেনা পাঠানো সম্ভব হয়নি। কলকাতা থেকে সেনা আসতে একটু দেরিই হয়। আর সেই সুযোগই নিতে চায় রানি।

ইংরেজকে বিভ্রান্ত করতেই রানি এক বার্তা পাঠায় মেদিনীপুরের কর্তাদের কাছে। রানি জানায়, বিদ্রোহীরা এখন পাত্তা দিচ্ছে না তাকেও। তারা এখন কর্ণগড় আক্রমণের ছক কষছে। এরকম অবস্থায় নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত রানি কোম্পানির সঙ্গে সন্ধি করতে চায়। কর্ণগড়ের সুরক্ষায় কোম্পানির সরকার অবিলম্বে সেনা পাঠাক—এমনই করুণ আর্তি ছিল রানির বার্তায়।

রানির এহেন বার্তা পেয়ে ইংরেজ কর্তারা রীতিমতো বিভ্রান্ত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারেও দেখা দেয় দ্বিমত। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে রানি কি সত্যিই বিপন্ন? নাকি এটা রানির কোনো চাল? ইংরেজ সেনাদের ফাঁদে ফেলার কোনো চক্রান্ত নয়তো এটা? উল্টো দিকেও আবার সেই একই ধরনের প্রশ্ন, রানি যদি সত্যিই বিপন্ন হয়, তাহলে কি তাকে রক্ষা করা উচিত নয়? রক্ষা করলে তো জঙ্গলমহলে সরকারের বড়ো সহায় পাওয়া যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসবের প্রেক্ষিতেই একদল বলে, রানির ডাকে সাড়া দেওয়া হোক। পাঠানো হোক সেনা। অন্যজনের বক্তব্য, রক্ষা করলেও রানি যে পরে ভোল বদলাবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর সত্যিই রানি বিপন্ন হলে তো তাদের একটা বড়ো শত্রু নিকেশ হয়ে যাবে বিদ্রোহীদের হাতে। তো শাপে বর, লাভ তো তাদেরই। তাহলে খামোখা সেনা পাঠানো কেন?

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ওই টালবাহানার মুহূর্তে সেখানে হাজির যুগলচরণ। জানায়, রানির ওই সন্ধির কথা একটা চাল। সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে রানি সময় কিনতে চায়। আর ওই ফাঁকে আরও সংগঠিত করতে চায় বিদ্রোহীদের। একই সঙ্গে কোম্পানি সেনাদের ভাগ করে দুর্বল করতে চায়। তাই সন্ধি নয়, এই মুহূর্তে রানিকে আক্রমণ করাটাই সঠিক পথ। তাছাড়া রানি এসময় আবাসগড়ে রয়েছে। কর্ণগড়ের তুলনায় আবাসগড় এখন কিছুটা অরক্ষিত— এটাও মনে রাখবেন।

**শনি আর রাহু**

সে সন্ধ্যায় আবাসগড় দুর্গে রানি শিরোমণি তখন কিছুটা চিন্তামগ্ন। সাহেবরা কি তার সন্ধির প্রস্তাবে সাড়া দেবে, নাকি—

ওই সময় বাইরের একটা গোলমালে শিরোমণির চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে যায়। রানি তাড়াতাড়ি বাইরে আসে। দেখে একজন ভিখিরির মতো লোককে ধরে বেদম মারছে একজন প্রজা। রানি জানতে চায় কারণটা।

সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে এই লোকটা কোম্পানির একজন চর। ছদ্মবেশে জোগাড় করছি খবর। কথাটা শুনে শিরোমণি ভালো করে দেখে। দেখেই চমকে ওঠে, একী, এ কি সেই! অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তুমি?

লোকটির মুখে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসি। রানি তাড়াতাড়ি বলে, ওকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু ওতো ইংরেজদের চর। আমাদের শত্রু। প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে সকলে। চরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বলুন কীভাবে হত্যা করা হবে ওকে।

রানি বলে, যা বললাম তাই করো, যাও তোমরা। ওকে যা শাস্তি দেওয়ার তা আমিই দেবো।

রানির কথায় চলে যায় সকলে। শিরোমণি লোকটিকে টেনে নিয়ে আসে দুর্গের মধ্যে। বলে তুমি—তোমার এই বেশ।

—হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছো। আমি জনার্দন।

—তা এতদিন পরে, এখানে?

—তোমাকে দেখতে এলাম।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, তোমাকে। দেখতে এলাম সেই সর্বনাশের আশীর্বাদ কীভাবে ফলছে।

—কী দেখলে?

—আর দেরি নেই। ফলবে আমার আশীর্বাদ। তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শিরোমণির কণ্ঠ, দেখা হয়েছে তো, এবার যাও—যাও এখান থেকে।

একইভাবে বলে জনার্দন, শাস্তি দেবে না।

—দেবো তো। শিগগির বেরিয়ে যাও এখান থেকে। না—সদর দরজা দিয়ে নয়। এসো আমার সঙ্গে।

দুর্গের গোপন দরজা দিয়ে জনার্দনকে বের করে দিল শিরোমণি বলে, যাও, চলে যাও—আর কোনোদিন এসো না এখানে।

জবাবে একটা তীক্ষ্ণ হাসিতে চারিদিক কাঁপিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় জনার্দন। যা জানার তা জানা হয়ে গেছে তার। এবার ফলবে তার আশীর্বাদ—সর্বনাশ—চরম সর্বনাশ হবে শিরোমণির।

সেখান থেকে জনার্দন চলে যায় ইংরেজ শিবিরে। জানায় আবাসগড় দুর্গের গোপন দরজার কথা।

যুগলচরণ আর জনার্দন। রানি শিরোমণির জীবনে দুই দুষ্ট গ্রহ—শনি ও রাহু। দুজনের দৃষ্টি একসঙ্গে পড়ল রানির ওপর। এরপর যা হলো তার জন্য মোটেই তৈরি ছিল না শিরোমণি।

**বন্দি হলো রানি**

দিনটা ছিল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ছয় এপ্রিল। ইংরেজ বাহিনী সেদিন একইসঙ্গে আক্রমণ করে আবাসগড় আর কর্ণগড় দুর্গে। সেই অতর্কিত আক্রমণে বন্দি হয় চুনিলাল খান, রানি শিরোমণি এবং বিদ্রোহের আরও কয়েকজন নায়ক। তারপর শুরু হলো বিচার। পঁচিশ বছর আগে যে বিচারের প্রহসনে ফাঁসি হয় মহারাজা নন্দকুমারের—সেই বিচার!

প্রথমে মেদিনীপুর, তারপর কলকাতা আবার মেদিনীপুর অবশেষে প্রিভি কাউন্সিল দিল চূড়ান্ত যায়। যাবজ্জীবন বন্দি থাকতে হবে রানি শিরোমণিকে। যদিও ইংরেজ মামলাটা সাজিয়েছিল শিরোমণির ফাঁসির জন্য। আর সেইভাবে মামলা সাজাতে মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন কর্ণগড় দুর্গ থেকে বাজেয়াপ্ত করা বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র পেশ করে। সেগুলির মধ্যে ছিল, ২৭টি গাদা বন্দুক, ৪টি বিলাতি গাদা বন্দুক, ২৫টি তলোয়ার, ৪টি যুদ্ধ কুঠার, ৪টি বল্লম, ১০টি ছোট গোল ঢাল, ৫টি বাঁশের ধনুক, ১৪টি তির রাখার ছোট থলি, ৯টি ছোরা, ৪টি গুঁড়া বারুদের বস্তা এবং একটি রুপোয় মোড়া ছোট তলোয়ার।

শিরোমণির বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে কোম্পানির সেনাবাহিনীর এই অস্ত্রগুলি বয়ে এনেছিল। পুরো ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত হাস্যকর। এরচেয়ে কিছু বেশি অস্ত্রতো দেশের অনেক ছোট জমিদারের ঘরেও থাকে। তাহলে কী হবে? এসব যে ইংরেজের পেশ করা অস্ত্র। এর গুরুত্ব অন্যরকম!

প্রাথমিকভাবে ইংরেজ ফাঁসি দিতে চেয়েছিল শিরোমণিকে। সেই ভাবেই মামলা সাজাচ্ছিল তারা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজ বুঝতে পারে রানিকে মৃত্যুদণ্ড দিলে উত্তাল হবে গোটা জঙ্গলমহল। কৃষক বিদ্রোহ স্তিমিত তো হবেই না, বরং তা হয়তো দাবানলে পরিণত হবে। আর সেই আশঙ্কা থেকেই মত বদল করে বেনিয়া কোম্পানি। মৃত্যুদণ্ড না দিয়েও শিরোমণিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে আবাসগড় দুর্গেই আটকে রাখা হয়।

কর্ণগড় নয়, জীবনের শেষ তেরোটা বছর শিরোমণি কাটায় আবাসগড়েই। সেটা বন্দি না মুক্ত জীবন তা হলফ করে বলা শক্ত। শিরোমণি দণ্ডিত হবার পরই নাড়াজোলের অধিপতি সীতরাম খানের ছেলে আনন্দরাম মধ্যস্থের ভূমিকায় নেমে রানিকে মুক্ত করেন। কিন্তু মুক্তি খোলা আকাশে নাকি পাখির অভয়ারণ্যে তা বলা যায় না।

* * * * *

২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে পেছন পানে হাঁটলে ২১৪ বছর আগে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে আবাসগড়ে রানি শিরোমণির মৃত্যু হয়। তারপর থেকে পারাং নদী দিয়ে বয়ে গেছে বহু জল। একদা তরঙ্গসংকুল পারাং এখন স্রোতহীন প্রায় মৃত এক নদী। কর্ণগড়ের অবস্থাও প্রায় তাই। রানি শিরোমণি এখন বন্দিকন্যা, অরণ্যবন্দি, অরণ্যবালিকা ইত্যাদি নামাবলীতে কিংবদন্তীর এক বীরাঙ্গনা নারী। তাঁর জন্মের ১৬ বছর পরে জন্ম ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের। তাই তিনি নন, বঙ্গের শিরোমণিই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারিণী প্রথম রণরঙ্গিনী। প্রথম নারী স্বাধীনতা সংগ্রামী শিরোমণি তাই 'বঙ্গের লক্ষ্মীবাঈ' নন, লক্ষ্মীবাঈ-ই 'ঝাঁসির রানি শিরোমণি'।

ইতিহাসের বহু চরিত্রের মতো রানি শিরোমণির মৃত্যু নিয়েও আছে নানা কাহিনি। কেউ বলেন, রানিকে গুপ্ত হত্যা করা হয়েছিল। কারো মতে, জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। অন্য কথায়, দুর্গে স্বাভাবিক কারণেই জীবনাবসান হয় তাঁর। তবে জনচিত্তে তিনি এক অমর রমণী। সে কারণেই তির বেঁধা পাখির শেষ গানের মতোই লোক কবির কণ্ঠে কান্নার লহর তোলে গান—

'কর্ণগড়ের রানি মাগো অস্ত্র ধরেছিল,
কলকাতার লোক উকে চুয়াড় বলেছিল।' □


***With Best Compliments from -***

**ARIES ENGINEERS**

JALANDHAR
PUNJAB
M: 9815479543




# দ্রোহকাল (২০২৩ - ২০২৬)

সুজিত রায়

আকাশে উড়ছে যে শকুনগুলো
ওদের নামও শাসক!
মাটিতে যে শেয়ালগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে
তাদের নামও শাসক!
তোমাদের বুকে যে আগুন জ্বলছে
তার নাম ভালবাসা!
তোমাদের মস্তিষ্কে যে ঝড় বইছে
তার নাম যন্ত্রণা।
.....
আর মোমবাতি নয়, এবার জ্বালাও মশাল
ওরা মানুষ নয়, জন্তু নয়, ওরাই গণতন্ত্রের কঙ্কাল!
জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও অভিশপ্ত রাত
জ্বলুক ধর্ষক, পুড়ুক খুনি, চক্রান্তকারীদের বিষাক্ত হাত।
রাত দখল চাইছে ন্যায় বিচার, চাইছে বর্বরতার ছাই।

—রাত দখল ঃ সন্দীপ গোস্বামী

সাল ২০২৪। তারিখ ১৪ আগস্ট। নাম না জানা, পরিচয়হীন একরত্তি মেয়ে রিমঝিম সিনহা 'মুখ বইয়ের' একটি পাতায় ডাক দিল—Reclaim the Night। রাত দখল করো। ডাঃ অভয়ার হত্যার, ডাঃ অভয়ার ধর্ষণের জবাব চাই, শাস্তি চাই। চল, আমরা মেয়েরা রাত বারোটার পথে নামি। হতে পারে রিমঝিম প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী। হতে পারে রিমঝিম গবেষক। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় হতে পারে বাম অথবা ডান। কিন্তু সেদিনের রাত দখলের ডাকে কোনো রাজনীতির রং ছিল না। তাহলে? তাহলে কেমন করে

গোটা কলকাতায়, গোটা রাজ্যে, গোটা দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে, গোটা মহাদেশের অন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে গেল সেই তিনটি শব্দ—রাত দখল করো। Reclaim the Night। আর তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মেয়ে খালি হাতে (না কারোর হাতে হাতা খুন্তি ঝাঁটাও ছিল না) পথে নেমে পড়ল। সবার মুখে এক দাবি—We want justice —আমরা বিচার চাই। অভয়া হত্যার বিচার চাই।

সে এক উত্তাল প্লাবন। তরুণী, যুবতী বেরিয়ে পড়েছে মাকে সঙ্গে নিয়ে। মা বেরিয়ে পড়েছে কচি সন্তানের হাত ধরে। শত্রুতা ভুলে সব মেয়ে হাত ধরেছে সবার। মায়েরা সেদিন কেউ বলেননি— গভীর রাতে কোথায় যাস বাছা! মেয়েরা কেউ ভয় পায়নি। বলেছিল—মা, আমরা আমাদের বাঁচার জন্য রাস্তায় নামছি। হাতে আর মোমবাতি নেই মা। এবার আমাদের হাতে হাতে মশাল। ধর্ষক এগিয়ে এলে ওর পুরুষাঙ্গ পুড়িয়ে ছাই করে দেব। তুমিও চল আমার সঙ্গে জীবন ধন মন প্রাণ বাঁচাতে।

এক অদ্ভুত উন্মাদনা। এক অদ্ভুত উদ্বেলতা। মধ্যরাতে শহর থেকে গ্রাম, সমতল থেকে পাহাড়, মরুভূমি, বরফে আচ্ছাদিত কানাডার শহর, শহরতলী, জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গা ঘেঁষে শুধু মেয়েদের মিছিল। শুধু মেয়েদের উত্তাল কণ্ঠ। একটাই দাবি—We want Justice।

কেউ কখনও দেখেনি কলকাতায়? কেউ কখনো ভেবেছে, কলকাতার ডাক পৌঁছে যাবে এশিয়া মহাদেশের বাঙ্গালির কণ্ঠেও? না ভাবেনি, তাহলে এমনটা হলো কী করে?

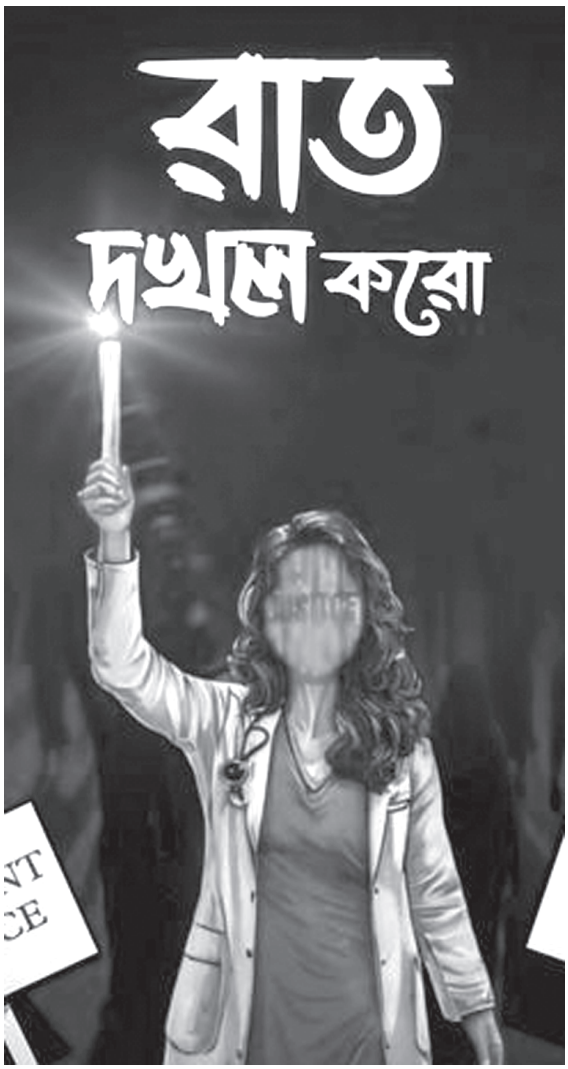
সেদিন অনেকেই বোঝেননি—২০২৪-এর ১৪ আগস্টের রাতে পশ্চিমবঙ্গের মাটি একটা নতুন রং ধারণ করেছিল। বাম ও অতিবামপন্থীরা সেই আন্দোলনকে লালরঙা করতে চাইলেও এরাজ্যের জাগ্রত, জাতীয়তাবাদী জনতার সম্মিলিত সেই জন-আন্দোলনের ভিত্তি ছিল কবিগুরুর সেই অমোঘ বাণী—'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান!' মুখ বই (ফেসবুক), হোয়াটস্‌অ্যাপ, এক্স-হ্যান্ডল, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক মাধ্যমে বামপন্থীরা ফতোয়া দেয় যে, এই আন্দোলনে শাঁখ বা ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে কেউ যেন শামিল না হয়। কিন্তু তাদের ফতোয়া অগ্রাহ্য করে পশ্চিমবঙ্গের বুকে 'মানবধর্ম' রক্ষার আন্দোলনে শামিল হন অগণিত মানুষ। গভীর রাতে অসংখ্য জাগ্রত জনতার স্রোতে প্লাবিত হয় এরাজ্যের অজস্র রাজপথ। শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস। সেই বিদ্রোহের মাটিতে সেদিনই বীজ পোঁতা হয়েছিল রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসক, স্বৈরাচারী সরকার, স্বৈরাচারী প্রশাসনের নাম ও নিশান মুছে দেওয়ার। যারা বোঝার তারা বুঝেছিল রাত দখলের ডাক শুধু মেয়েদের আত্মসম্মান, আত্মশ্লাঘা এবং আত্মজাদের বাঁচানোর ডাক ছিল না। এ ডাক ছিল এক সার্বিক বিদ্রোহের, এক সর্বগ্রাসী বিপ্লবের। গত ৫৪ বছরের স্বার্থপুষ্টির রাজনীতি, মানুষের পকেট থেকে রাজ্যের কোষাগার পর্যন্ত খালি করে দিয়ে সিরিয়ার বাশার-আল-আসাদ কিংবা তিউনিসিয়ার জিন আল আবিদিন বেন আলি অথবা ফিলিপিন্সের ফার্দিনান্দ মার্কোসের মতো একনায়ক হয়ে ওঠার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গত ৫৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শেকড় গেড়ে বসেছিল এবং শেষ পনেরো বছরে রাজ্যটাকে যেভাবে শুধুমাত্র অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল, রাত দখলের ডাক ছিল সেই শিকড়কে উপড়ে ফেলার ডাক। দুর্ভাগ্য শাসকদলের, ক্ষমতার নেশা, অর্থের গরিমা, আত্ম-অহঙ্কারের মদমত্ততায় এ যাবৎ এ রাজ্যের শেষতম 'হিটলার' বুঝতে পারেননি, তিনি যুগাবতার নন। তিনি দেবী নন। হিরণ্যকশিপুর বুক চিরে রক্তপানের জন্য যেমন প্রহ্লাদের জন্ম হয়েছিল, তেমনই লক্ষ লক্ষ নারী পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে বসেছিল একটি সুযোগের অপেক্ষায়। না, ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহ নয়। এ দ্রোহের মশালের আগুনে রাজ্য পোড়ে না। শাসক পোড়ে। কিন্তু শাসকই বোঝেনি—

নারীরা জেগেছে দুর্গার মতো
করবে আঁধার জয়।
তিলোত্তমায় নব পিশাচের হাতে
তিলোত্তমার মৃত্যু যেন না হয়।
.....
রাতের দখল নিচ্ছে মেয়েরা
শুনে নাও দুর্বৃত্ত।
মানুষরূপী অসুর নিধনে
কাঁপবে না মা'র চিত্ত।

**পাঁচ দিন আগে**

মাত্র পাঁচ দিন আগেই ৯ আগস্ট কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের অভ্যন্তরে মিলেছিল এক জুনিয়র ডাক্তার তথা ছাত্রী ডাঃ মৌমিতা দেবনাথের মৃতদেহ। রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। হয়তো-বা ধর্ষিতাও। আইনি কবজ রক্ষায় তার নাম ছড়িয়েছিল মুখে মুখে কখনও অভয়া, কখনও তিলোত্তমা বলে। যে নামেই ডাকি না তাকে—সে আমাদের ঘরের মেয়ে। সে আমাদের সরকার পোষিত হাসপাতালের চিকিৎসক। হাসপাতালের মধ্যেই তাকে এমন নৃশংসভাবে মারল কে বা কারা? কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দাসানুদাস আজ্ঞাবাহী চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট সমাজ একযোগে ময়দানে নেমে পড়ে দু'দিনের মধ্যেই একজন 'খুনি'কে আবিষ্কার করে ফেলেন। ৩ দিনের এক এমন তদন্ত যা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও হার মানায়। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারি আবরণের আড়ালে দলদাস কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্য প্রশাসকরা। রাজ্যের চিকিৎসক সমাজকে অগ্রাহ্য করে, আইন-কানুন, নীতি নিয়মকে কানে পাক দিয়ে সরিয়ে রেখে অভয়ার মা-বাবাকে কিনে নিতে দশ লক্ষ নগদ টাকা পাঠিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। যে টাকা হেলায় ছুঁড়ে ফেলে তিলোত্তমার বাবা মা সেদিন দাবি তুললেন—টাকা নয়, আমার মেয়েকে ফেরত দিন, সেদিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর

রণংদেহী মূর্তি ধারণ করলেন। রাতারাতি অভয়া হত্যার যাবতীয় ক্লু সরিয়ে ফেলা হলো, মুছে ফেলা হলো হত্যা এবং হত্যাকারীদের ইতিহাস ও পরিচয়। দুর্গাপুরের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, রাত আটটার পর মেয়েরা আর রাস্তায় বেরোবে না। জনতা মুচকি হাসল। সে হাসি আসলে এমন এক হাসি যেখানে লুকিয়ে ছিল পরবর্তী বিদ্রোহের চাবিকাঠি। জুনিয়র ডাক্তাররা পথে নামলেন। সঙ্গে চিকিৎসক সমাজের অগ্রবর্তী স্বজন এবং অবশ্যই খোলা সমাজ। সকলেই মনে করিয়ে দিল—২০১২ সালে দিল্লিতে 'নির্ভয়া' ওরফে জ্যোতি সিংহের ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের প্রধান মুখ রাম সিংহ নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েও বলেছিল—'কোনো ভদ্র মেয়েরই রাত ন'টার সময় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। একজন পুরুষের হাতে ধর্ষিতা হওয়ার জন্য ওই পুরুষটির চেয়ে মেয়েটি বেশি দায়ী। মেয়েদের কাজ হলো বাড়িতে থাকা। ঘরের কাজকর্ম করা। উল্টোপাল্টা উত্তেজক পোশাক পরে রাতবিরেতে ডিস্কোথেক আর বার-এ উদ্দাম নাচানাচি নয়। .....যখন কোনো মেয়ে একজন ধর্ষকের পাল্লায় পড়ে তখন তার বাধা দেওয়া উচিত নয়। চুপচাপ মেনে নেওয়াই শ্রেয়। তাহলেই পুরুষটি আর ঝামেলা না করে কাজ সেরে চলে যায়।' একেবারে একই সুরের অনুরণন ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে। না, সেদিনও বোঝেননি— সে আসছে—দ্রোহ। ঝড়ের মতো, আগুনের মতো।




**রাতদখলের পাঁচ দশক**

শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী ইতিহাসের ছাত্রী। তবে হ্যাঁ, ইসলামিক ইতিহাস। তাই বোধহয় কখনও 'আসল ইতিহাস' পড়ার সুযোগ বা ইচ্ছে হয়নি। কারণ রাজনীতির ময়দানে তার টার্গেটই ছিল শুরু থেকে মুসলমান ভোটব্যাংক তৈরি করে ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং মুসলমান তোষণ করে ক্ষমতার তখতে বসে পশ্চিমবঙ্গের শিকড় উৎপাটন করে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানানো। যদি ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতেন, জানতে পারতেন কলকাতায় যে রাতদখল হলো ২০২৪-এ তার আগে দশকের পর দশক জুড়ে হয়ে এসেছে রাত দখলের বিদ্রোহ দেশের নানা প্রান্তে এবং এই প্রত্যেকটি 'রাত দখল'-এর দ্রোহ ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এক একটি মুষলাঘাত।

**রাতদখল ২০১২**

জ্যোতি সিংহ ওরফে 'নির্ভয়া'র গণধর্ষণ ছিল অভয়া হত্যার চেয়েও নৃশংস। সভ্য সমাজে রাক্ষসদের আমরা দেখি না। যা দেখি রূপকথার পাতায়। কিন্তু ছয় ধর্ষক মিলে ২০১২-র ৬ ডিসেম্বর রাতে রাজধানী দিল্লিতে একটি বেসরকারি বাসের মধ্যে যে গণধর্ষণ চালিয়েছিল তা কোনো মানুষের কাজ ছিল না। একাজ সম্ভব ছিল রাক্ষসদেরই। যেন সেদিন রাতে রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নির্ভয়ার ওপর। সেদিনও পাড়ার মোড়ে মোড়ে, চায়ের দোকানের টেবিলে, বাড়ির খাবার টেবিলে, কলেজের ক্লাসরুমে, কমনরুমে একটাই চর্চা ছিল কেন্দ্রবিন্দু—রাতে মেয়েরা না বেরোলে ধর্ষিত হবে না। মেয়েদের ঘরবন্দি করে রাখার এই ফন্দিফিকিরের বিরুদ্ধে সেদিনও রাতদখল করেছিলেন নাট্যকর্মী জনেরা। ২০১৬ সালে তাদের ডাকেই শুরু হয় Woman walk at midnight (WWaM) কর্মসূচি। নাট্যকর্মী মায়া কৃষ্ণা রাও দিলেন এই কর্মসূচির অনুপ্রেরণা যিনি ২০১২-র ৩১ ডিসেম্বর দিল্লির মুনিরকাতে একটি কবিতা প্রকাশ্যে পাঠ করেছিলেন। কবিতার নাম ছিল 'হাঁটা' (Walk)। অংশত এখানে তুলে ধরছি—

Walk... walk.... walk walk...
Should I... can I...
Not Seven, not eight, not nine, not ten
but after 12 midnight...
I try not to be afraid of dark.
I want to walk; I want to sit on the bus...
I want to lie in the park...

And I want to try not to be afraid of the dark...
If a man doesn't know how to sit...
look... talk with a woman,
a man, a girl, a boy, a partner...
don't walk with him... don't lie with him
... don't vote for him, don't talk for him ...

'হাঁটা' কবিতাটি ছিল প্রত্যক্ষভাবে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ। এবং ওই কবিতার সূত্র ধরেই নাট্যকর্মী তানেজার Woman Walk at Midnight-এর সূচনা। রাত দখলের কর্মসূচি এরপর আরও প্রবল হতে থাকে।

### রাতদখল ২০১৬

পরের প্রতিবাদ গুরুগ্রামে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এক ২৬ বছরের যুবতী গুরুগ্রামে বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার করে উবের বুক করে বাড়ি ফিরছিলেন। উবেরের চালক তাঁকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মুম্বইতে দেভিনা কাপুর এবং নেহা সিংহ 'Why Loiter' শিরোনামে একটি কর্মসূচি চালু করেন। অনেক মহিলা তাঁদের নেতৃত্বে রাত ১২টা থেকে ৩টের মধ্যে রাস্তায় হাঁটেন। পার্কের বেঞ্চে বিশ্রাম নেন। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে চা খান, সাইকেল চালান।

### এবার পাকিস্তানে

দেভিনা ও নেহার এই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হন পাকিস্তানের নারীবাদী লেখক ও সাংবাদিক সাদিয়া খাত্রি। ২০১৫ সালে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তিনি Girls at Dhabas কর্মসূচি চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিল, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাতে ধাবায় চা খাওয়া, নিজেদের মধ্যে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা, এমনকী রাস্তায় ক্রিকেট খেলাও। কর্মসূচি আরও জোরদার হলো, লাহোরে সাইকেল চালনারত এক তরুণী সাদিয়াকে লক্ষ্য করে এক গাড়ির চালকের কুশ্রী ইঙ্গিত এবং সদর্থক সাড়া না পেয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা সংঘটিত হওয়ার পর। দেভিনা ও নেহা এবার বার করেন সাইকেল মিছিল। প্রতিবাদী গর্জনের ভাষা ছিল—'কটা সাইকেলে ধাক্কা মারবি মার দেখি।'

### দিল্লিতে পিঁজরাতোড় আন্দোলন

এটি ছিল এক অনবদ্য আন্দোলন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ের পরে রাতের দিকে হোস্টেল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে গড়ে ওঠে 'পিঁজরাতোড় আন্দোলন'। অর্থাৎ অনেকটা ওই 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট'-এর মতোই জোরালো আন্দোলন। মেয়েরা দাবি তুলেছিল—'হোস্টেল জীবন ছিল কারাবাসের মতো ভয়ঙ্কর। এর অবসান ঘটাতে হবে'। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিভিন্ন বেসরকারি মেসেও শুরু হয় প্রতিবাদ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সিদ্ধান্ত নেন, লাইব্রেরির সামনে তারা সারারাত পড়াশোনা করবে। রাস্তায় হাঁটবে এবং বাসে চড়ে গান গাইবে।

### বাঙ্গালোরে 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া' আন্দোলন

৩১ ডিসেম্বর। রাজ্যের বর্ষপূর্তি উৎসব। প্রতিবছর ওই দিনে রাতে শহরের প্রাণকেন্দ্র এম জি রোডে বিশাল মানুষের ভিড় হয়। নারীরাও থাকেন পুরুষের সঙ্গে। ২০১৬ সালে বর্ষপূর্তির উৎসব কিন্তু অসহায় মানুষের আর্তনাদের রাতে পরিণত হয়েছিল। বেশ কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতা মহিলাদের মৌখিক অশালীন শব্দাবলী আর বিকৃত অঙ্গভঙ্গী থেকে শুরু করে তাদের শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গে হাত দিতে থাকে। একটা সময় গোটা উৎসব ভরে ওঠে মহিলাদের আর্তনাদে। তারপর উৎসবে হাজির পরিণত ও ভদ্র পুরুষেরা একরকম জোর করেই মহিলাদের ঘিরে তৈরি করে সুরক্ষা বলয়। ঘটনাস্থলে হাজির প্রায় ১৫০০ পুলিশ কর্মীও দুর্বৃত্ত ও কামুক পুরুষগুলিকে শায়েস্তা করতে পারেননি। তারা সুরক্ষা বলয়ের ফাঁক ফোকর গলে মহিলাদের কুর্তি, শাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করে বেলেল্লা হাসিমুখে। বহু মহিলা ছুটে পালাতে গিয়ে ওই অমানুষ কামবুভুক্ষু পুরুষগুলির হাতে যৌন লাঞ্ছনার শিকার হন। এই ঘটনার পর শুরু হয় এক নয়া আন্দোলন— Night in My Shining Armour। আন্দোলনের রূপকাররা ডাক দেন মহিলাদের— পথে নামুন। চীৎকার করে স্লোগান তুলুন—'I will go out'। অনেকটা অভয়া আন্দোলনের ধাঁচেই ওই 'We want Justice'-এর মতোই 'I will go out' স্লোগানে কেঁপে ওঠে রাতের বাঙ্গালোরের শহর থেকে শহরতলী। রাত দখল করেন মা-বোনেরা। বৃদ্ধা থেকে নাবালিকা সকলে। আন্দোলন দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় সেদিনের কামুকেরা। কিন্তু সরকার কারও জবাবদিহি চায়নি। এটাই ট্র্যাজেডি।

বাঙ্গালোরের এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয় বহুদিন আগে সেই ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরের Take Back the Night আন্দোলনের কথা। সেদিন শহরের কোনও মহিলা রাতে ঘরে ছিলেন না। ছিলেন রাস্তায়। প্রতিবাদ করেছিলেন গভীর রাতে একা বাড়ি ফেরার সময় শহরের বুকে যুবতী সুশান আলেকজান্ডার স্পিথকে নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনার। সেদিনও রাত দখল করেছিলেন মেয়েরাই, মুখে ছিল স্লোগান—Take Back the Night।

পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই, প্রাচীন লন্ডনের রাতের অন্ধকারে সিরিয়াল কিলার জ্যাক দ্য রিপারের নারী হত্যার সেই একাধিক নৃশংস ঘটনার। একের পর এক ডার্ক লন্ডনের অলিগলিতে খুন হয়ে পড়ে থাকতেন দেহপোজীবিনীরা। জ্যাক দ্য রিপার ওই মহিলাদের বুক থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত চিরে ফেলে কি খুঁজতেন তা

জানা যায়নি। কারণ জ্যাক কোনোদিনই ধরা পড়েনি, এমনকী তেরোটা খুনের পরেও। কিন্তু সেসময় পুলিশ যেসব এক্সপেরিমেন্ট করেছিল তা হলো—রাত ৮টার পরে মহিলাদের পথে নামা নিষিদ্ধ করে আদেশ নামা জারি করার মতো হাস্যকর পদক্ষেপ। যে পদক্ষেপের কথা পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন এক তরুণী রাতের দুর্গাপুরে ধর্ষিতা হওয়ার পর। আসলে মাননীয়া 'বাংলার মেয়ে'র লন্ডনের প্রতি ছিল এক অপত্য টান। তিনি ক্ষমতায় এসেই বলেছিলেন কলকাতা লন্ডন হবে। নিজেও ভাঁওতা দিয়ে 'অক্সফোর্ডের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি' বলে সপারিষদ লন্ডনের রাস্তায় মর্নিং ওয়াক করেছেন। হয়তো দুর্গাপুরের ছাত্রীটি রেপড্ হওয়ার পর তাঁরও মনে পড়ে গিয়েছিল জ্যাক দ্য রিপারকে। তাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের আদেশনামাকে স্মরণ করে বলে দিয়েছিলেন—রাত আটটার পর মেয়েরা আর রাস্তায় বেরোবে না। অভয়া হত্যার পরও সেই একই ফরমান দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সমস্ত বিকৃত মানসিকতা-প্রসূত আদেশনামাকে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শহর, শহরতলী, গ্রাম-গ্রামান্তরে, রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যের, দেশ থেকে দেশান্তরে মহিলারা রাত দখল করেছেন অবলীলায়। একজন ধর্ষকও সেদিন ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। 'Reclaim the Night'-এর অবিস্মরণীয় সেই আন্দোলনের কিছুদিন আগেই সুদূর সুন্দরবন লাগোয়া সন্দেশখালির নারীরা জেহাদি, নারীলোভী শেখ শাজাহান আর তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে দা, বঁটি, কাটারি, ঝাঁটা, হাতা, খুন্তি নিয়ে পথ দখল করেছিল দিনে ও রাতেও। যেন ফিরে এসেছিল সেই তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি। কিন্তু সুজেট? সুজেটকে মনে পড়ে সেই সংখ্যালঘু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটিকে যাঁকে কয়েকজন বড়লোকের বখে যাওয়া যুবক পার্কস্ট্রিটে ট্যাক্সির মধ্যে গণধর্ষণ করেছিল? সেদিন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছিলেন, ভুলে যাননি নিশ্চয়ই। বলেছিলেন, সুজেট দুশ্চরিত্রা। রাতে বারে বা নাইটক্লাবে কি ভালো মেয়েরা যায়? পুরুষের সঙ্গ পাওয়ার রেট নিয়ে গণ্ডগোল থেকে ধর্ষণ। মনে পড়ে কামদুনির সেই কলেজ ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনা যাকে একদল যুবক যথেচ্ছভাবে গণধর্ষণের পর উলঙ্গ দেহটাকে দুই পা ধরে টেনে মাঝখান থেকে চিরে ফেলেছিল? তারাও কি ভুগছিল জ্যাক দ্য রিপার সিনড্রোমে? জানা যায়নি। কারণ তখনকার সেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যার কাছে ধর্ষণ, খুন, যৌনহেনস্তা—সবই ছিল 'ছোটো ঘটনা', তিনি স্বয়ং প্রতিবাদী মহিলাদের 'মাওবাদী' আখ্যা দিয়ে গোটা ঘটনার মোড় ঘোরাতে চেয়েছিলেন। প্রাথমিক ভাবে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু তার পর?

**'দ্রোহকাল'কে চিনতে পারেননি মমতা ব্যানার্জি**

প্রবাদ নয়, অতি বাস্তব কথাটি হলো—অশিক্ষা আর অপাত্রের ক্ষমতার দম্ভ অতি ভয়ঙ্কর। তখন যে কোনো জীব নিজেকে ঈশ্বর মনে করে এবং ভেবে নেয়—তিনিই সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির শেষ কথা। আর এই আত্মম্ভরিতা তত প্রবল হতে থাকে যখন জলের মতো জনগণের ট্যাক্সের টাকা উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে আত্মপ্রচারের বিজ্ঞাপনে ব্যয় করা হয়। তিনি বিজ্ঞাপনে ঝাঁ চকচকে আলো আর অমুখ ভাতা, তমুক ভাণ্ডারে মহিলাদের শাড়ির আঁচলে গুঁজে দিয়ে ধরেই নেই—সব তার কেনা বাঁদি। এরা ভোট দেবে। না দিলে ধর্ষিতা হবে। খুন হবে।

টানা পনেরো বছর পশ্চিমবঙ্গে এটাই চলেছে। মূর্খের স্বর্গবাস। যেমন ভোটপ্রার্থী, তেমনি ভোটাররা। মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের নামে ঘুষ দিয়েছেন আর বিশেষত মহিলারা সামান্য প্রাপ্তির বিনিময়ে ঢেলে ভোট দিয়েছেন ২০২৪-এর নির্বাচন পর্যন্ত। মমতা ব্যানার্জি কি ধরেই নিয়েছিলেন—আমৃত্যু তিনিই ঈশ্বরী হয়ে বিরাজ করবেন পশ্চিমবঙ্গের গদিতে আর ধীরে ধীরে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে 'টুপি' পরিয়ে, নিজে 'হিজাব'-এর মুখোশ পরে রাজ্যকে জামাতি আর জেহাদিদের সাহায্যে বৃহত্তর 'বাংলাদেশে' পরিণত করবেন?

তাঁর স্বপ্নটা তেমনই ছিল। যেমন ওনার সন্তানসম ভাইপো চেয়েছিলেন 'পিসির ঘাড় ভেঙে' একটা অরবপতি হয়ে যেতে পারলেই পিসিকে হটিয়ে মসনদ দখল করবেন রাজ্যের। তিনি হবেন সম্রাট আর শেখ শাজাহান, শেখ জাহাঙ্গির, শওকত মোল্লাদের রইসুল উজারা, ওয়াজির বানিয়ে আওরঙ্গজেব হয়ে উঠবেন। স্বপ্ন দেখা ভালো। কিন্তু আগে থেকে স্বপ্নটাকে যাচাই করে নিতে হয় সেটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে কিনা। আসলে কালীঘাটের খালপাড়ের সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত শাসকের এসব শিক্ষা থাকার কথা নয়। একবার প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়কে আমি একমাত্র শিক্ষিত তৃণমূলি নেতা ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'তোমাদের বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে' এটার সঠিক ইংরেজি অনুবাদ কী হবে বলবেন? সৌগতবাবু একটু ভেবে আদ্যন্ত শিক্ষিত মানুষের মতোই জবাব দিয়েছিলেন—'Your demon is at your doorstep'। অনেকদিন আগের কথা। সৌগতবাবুর মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু এতদিনে আমার স্মৃতি থেকে তা মুছে যায়নি তা প্রমাণ হলো সেদিন সেই ২০২৩-এর ১৪ আগস্ট মেয়েদের রাতদখলের ঘটনা ঘটার পর। সেটাই ছিল ইঙ্গিত— 'Your demon is at your doorstep'। সৌগত রায় হয়তো চিনতে পেরেছিলেন। তাই বহুবার সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ তো মানুষকে অন্ধ করে দেয়। তবে ওপর দুর্যোধনসম ভাইপোকে স্নেহ করার বাধ্যবাধকতা।

ভাববার বিষয়— We want Justice কোনো রাজনৈতিক স্লোগান ছিল না। Reclaim the Night আন্দোলনের পিছনে কোনোও রাজনৈতিক দল ছিল না। গোটা আন্দোলনের কোনো নেতা বা নেত্রী ছিলেন না। হয়তো আবেগে, হয়তো দেশবিদেশে রাতদখলের আন্দোলনে ইতিহাসে সঞ্জীবিত হয়ে এবারও গবেষক ঝিলমিল সমাজমাধ্যমে ডাকটা দিয়ে দিয়েছিল। সেটা যে আরও একবার তিউনিসিয়া বা মিশর বিক্ষোভের মতো গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেবে, রিমঝিম নিজেও জানতো কি? অনেকে সেই রাতের

বাহ্যিক চেহারা দেখে হেসেছিলেন, ঠাট্টা করেছিলেন— আরে ওসব হুজুগ। সেলফি তোলা আর লোক দেখানো বিপ্লবী দাপট সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য। অনেকে আবার বাড়ির ৪/৫ বছরের শিশুগুলোর হাতে We Want Justice পতাকা ধরিয়ে দিয়ে পথে নামিয়ে দিয়েছিলেন। ফোটোগ্রাফারদের পছন্দের বিষয় হয়ে উঠবেন, অভিভাবকরা ধরেই নিয়েছিলেন, কিংবা ৯০ বছরের বৃদ্ধাও রাতদখলে নেমেছেন—সেও তো ভালো ছবি।

কিন্তু সবার ভাবনা, সবার ভয়, ভীতি, সবার আতঙ্কের মধ্যেই অতি সংগোপনে অনুপ্রবেশ করেছিল একটা ফুলকি—আগুনের ফুলকি। শিরশিরে উষ্ণ স্রোতের মতো সেই ফুলকি বয়ে গিয়েছিল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ভেতরে ভেতরে সঞ্চারিত হয়েছিল উত্তাপের সুনামি—একদিনে নয়। টানা ১৫ মাসের যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর সারা রাজ্যে শাসক তথা সরকার বিরোধী মানসিকতা। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সাত সাতটি সরকার পেয়েছে রাজ্য। নির্বাচিত সরকার। কিন্তু এত অপশাসন, এত অরাজকতা, এত অপমান, এত চুরি, এত ডাকাতি, এত মারপিট, এত দাঙ্গা, এত থার্ড গ্রেডেড উৎসব, এত খুন, এত ধর্ষণ বাঙ্গালি আগে দেখেনি। বাম আমল একেবারে ধোওয়া তুলসীপাতা ছিল না। উচ্চমার্গের নেতৃস্তরে নয়, দুর্নীতির জাল ছড়িয়েছিল নীচের স্তরের নেতা কর্মীদের মধ্যে। সিন্ডিকেটরাজ চালু হয়েছিল বাম আমলেই। সেও ছিল মস্তানি। তবে তার শিকড়ের বিস্তৃতি ছিল কম। তৃণমূল আমলে দুর্নীতির শিকড়টা ছড়িয়েছিল মাকড়সার জালের মতো। তাও দলের একেবারে মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুলের নখের ডগা পর্যন্ত। চুরি দুর্নীতির এক অনন্ত যাত্রাপথ রচনা করেছিল তৃণমূল সরকার। সরকারের দায়-দায়িত্ব শিকেয় তুলে 'সরকার' নামক সার্কাস পার্টি দুর্নীতির এবং অপশাসনের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা লিখতে পারলে একটা নব্য মহাভারত হয়ে যেতে পারে। রাস্তার রিকশাওয়ালা থেকে অটোওয়ালা, সবজিওয়ালা থেকে ফেরিওয়ালা, ছোট-মাঝারি-বড় শিল্পপতি থেকে আরবপতি, প্রমোটার গোষ্ঠী, শিক্ষক থেকে অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শিক্ষনবিশী, চিকিৎসক থেকে নার্স, ঘরোয়া মহিলা থেকে স্বরোজগেরে গিন্নি—সকলকে একটা সুতোয় বেঁধে ফেলেছিল তৃণমূল। সেই সুতোর নাম দুর্নীতি। সেই সুতোর নাম তোলাবাজি, সেই সুতোর নাম অপশাসন। সেই সুতোর নাম মস্তানি। কেউ প্রত্যক্ষভাবে। কেউ পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবাই। শিশু থেকে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ থেকে অতি বৃদ্ধ। রাজনীতির জগতে ডান থেকে বাম। বাম থেকে অতি বাম। পনেরো বছর ধরে প্রথমে ছারপোকার মতো রক্ত শুষেছে। ২০১৬-র পর এরা হায়নার মতো নিকৃষ্ট এবং নৃশংস মনুষ্যেতর জীব হয়ে উঠেছিল। সমাজ থেকে রাতারাতি উধাও হয়েছিল মানবিকতা। মানুষে মানুষে সম্মান অন্তর্হিত হয়েছিল। মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল মানবিক মূল্যবোধ, সম্পর্কের পরম্পরা। হাজারে হাজারে স্কুল বন্ধ হয়েছে। বিনা পরিকাঠামোয় জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে মাল্টি-সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। ছিটেবেড়ার ঘরে অথবা অন্ধকার স্কুল/কলেজের দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে খুলে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায়। শিক্ষক নেই, শিক্ষাকর্মী নেই, ল্যাবরেটরি নেই, লাইব্রেরি নেই। ছাত্র-ছাত্রীই-বা আসবে কেন? বেকারত্ব বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। আর 'বাংলার দিদি' ব্যানার্জি পরিবারের পিসি ৬ হাজার, ৮ হাজার, ১০ হাজার টাকায় সিভিক পুলিশ, সিভিক স্বাস্থ্যকর্মী, সিভিক অধ্যাপক, সিভিক শিক্ষক পুষে রেখে প্রচার করেছেন—চার কোটি বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। টাটাকে তাড়িয়ে যিনি বিপ্লব করেছিলেন, মনে করেছিলেন, তিনি বুঝেও বোঝেননি টাটাকে তাড়ানো মানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পকে তাড়িয়ে দেওয়া। বছর বছর 'এগিয়ে বাংলা'-র ঢাক পিটিয়ে কোটি কোটি টাকার মুনাফা ঢুকিয়েছেন নিজের পরিবারে ভাই-ভাইপো, ভাই-বউ, ভাইপো বউ, বোনপো, বোনঝি, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, মামাতো, মাসতুতোদের বেনামে। কালীঘাটের গোটা ব্যানার্জি পরিবার রাজ্যের মানুষকে যখন পথে বসিয়ে ভিক্ষে নিতে বাধ্য করেছে, ছাত্রদের, ছাত্রীদের মা-বোন, মাসিমা, কাকিমা, দিদিমা, ঠাকুমাদের, ঠাকুর্দা, দাদুদেরেও। তখন ওঁর পরিবার কিন্তু ধাওয়া করেছে স্বর্ণমৃগকে। সাদা শাড়ি, সাদা চটির মুখোশে সন্ন্যাসিনীর মতো নিজেকে উপস্থাপন করানোও, তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যেত নামিদামি পার্লারের পালিশ পড়ে সপ্তাহে ক'দিন।

নাটক, গান, মিম, প্যারোডি, কার্টুন এত বেশি তৈরি হয়নি ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে কোনোদিনও। অথচ ক্ষমতায় এসেই কাটুন আঁকার জন্য অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে জেল খাটতে হয়েছিল। অন্যায় না করেও বরখাস্ত হতে হয়েছিল রোগীদের ঈশ্বর ডাঃ শ্যামাপদ গড়াইকে। আর গত ২০২৬ সালের পর থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে সহ্য করতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ কটূক্তি, প্যারেডি, ব্যঙ্গ, বাক্যবানের লাইভ সমাজ মাধ্যমে। সে এক আশ্চর্য বহমান স্রোত। দেখলে হাসি পায়, শুনলে হাসি পায়। অথচ সেই হাসিই কখন আগুনে পরিণত হয় তা ভুক্তভোগীরা নিজেরাও বুঝতে পারেননি।

### 'রাতদখল' আসলে এক জন-আন্দোলন

তৃণমূলিরা বলেন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একটি 'জন-আন্দোলন'। তাই তাদের চোখে সিঙ্গুর আন্দোলন আর নন্দীগ্রাম আন্দোলনও ছিল জন-আন্দোলন। ওই দুই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নাকি সরকারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যে দলের কোনও নীতি নেই, নৈতিকতা নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের কথাই যেখানে দলীয় সংবিধান, সেখানে জন-আন্দোলন? ছোঃ! সিঙ্গুর আন্দোলন আসলে ছিল শিল্পবিরোধী আন্দোলন, কৃষক-দরদি সাজার আন্দোলন। আর নন্দীগ্রাম আন্দোলন ছিল নন্দীগ্রামের জনতাকে 'ক্ষমতারোহণের সিঁড়ি' বানানোর রাজনীতি।

ভয়াবহ কমিউনিস্ট হার্মাদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী জনতা। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হওয়া সেই তীব্র জন-অসন্তোষকে সুকৌশলে কাজে লাগান তৃণমূলনেত্রী। স্থানীয় মানুষ এই আন্দোলন সংগঠিত করলেও আন্দোলনের পুরো ক্রেডিট নিয়ে নেন তিনি। ২০১১-য় ক্ষমতায় এসে নন্দীগ্রাম আন্দোলনে নিহতদের আত্মবলিদান ভুলে যান তৃণমূলনেত্রী। নন্দীগ্রামে গণহত্যাকারী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নন্দীগ্রাম আন্দোলন চলাকালীন এই আন্দোলনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে মাওবাদী, অতিবামপন্থী আন্দোলনজীবী ও তথাকথিত মানবাধিকাররক্ষাকর্মীরা। মাওবাদী তথা অতিবামেদের বশে রেখে ক্ষমতার তখতে বসার নোংরা রাজনীতি করেন তৃণমূলনেত্রী। এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সত্যিকারের জন-আন্দোলন গড়ে ওঠা ছিল খুব শক্ত ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গের কপাল ভালো, নামহীন, গোত্রহীন একটা অরাজনৈতিক আন্দোলন শুধু 'We want Justice' স্লোগান তুলে সত্যিকারের এক জন-আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল 'রাত দখলের আন্দোলন'। এবং এ আন্দোলনের মুখ মেয়েরাই। একটা মহিলা দুর্বৃত্তের মুখের বদলে হাজার হাজার লক্ষ, লক্ষ, কোটি কোটি মহিলা রাতের ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখে ২০২৪-এর ১৪ আগস্ট এক অনাস্বাদিত জন-আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। যে জন-আন্দোলনের নাম ছিল Reclaim the night। আর সেই জন-আন্দোলনের মধ্যে ছিল স্বাধীনতা দিবসের মধ্যরাতে গৃহকোণের বাসিন্দাদের স্বেচ্ছায় ঘরের চৌকাঠ ডিঙোনোর আহ্বান।

সেই রাতের পর হঠাৎ করেই যেন থমকে গেল মেয়েদের স্পর্ধা। পুরুষরা গলাবাজি করে বলতে শুরু করল, আমরা পাশে ছিলাম বলেই মেয়েরা সাহস পেয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন, এটাই হয়। হুজুগে আন্দোলনের এটাই ভবিতব্য। আর সেই সুযোগে মমতা ব্যানার্জি স্নেহ মমতা সব মাথায় তুলে বলে বসলেন—''এখনও এফআইআর করিনি। যেদিন করব সেদিন বুঝবে।''

হ্যাঁ, কয়েকদিন পরেই বুঝে নিয়েছিল এরাজ্যের জাগ্রত, প্রতিবাদী জনতা ২০২৪-এর ২৭ আগস্ট ডাঃ অভয়ার মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবিতে 'নবান্ন অভিযান'-এ। ডাঃ অভয়ার হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আরজি কর হাসপাতালের যে স্থানে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেই স্থানে ভাঙচুরের দ্বারা প্রমাণ লোপাটে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে 'নবান্ন অভিযান'-এর ডাক দেয় অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন—'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'। রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে ঘেরাওয়ের লক্ষ্যে এই প্রতিবাদী পদযাত্রাকে সমর্থন করে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বৃহত্তম সংগঠন— 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'। রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দানে পুরোপুরি ব্যর্থ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল— 'দফা এক, দাবি এক— মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ'। নবান্ন অভিমুখে হাওড়া ও কলকাতায় অগণিত প্রতিবাদী মানুষের জনস্রোত আছড়ে পড়লে নবান্নকে ঘিরে পুলিশের ত্রি-স্তরীয় নিরাপত্তা বলয় হয়ে ওঠে অতি-সক্রিয়। আন্দোলনকারীদের ওপর চলে ব্যাপক আকারে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের শেল বর্ষণ। জনস্রোতকে প্রতিহত করতে নির্বিচারে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। 'নবান্ন অভিযান' চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়ে যে, দৃঢ়ভাবে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে একজন গৈরিক বসনধারী প্রবীণ ব্যক্তি নির্ভয়ে জলকামানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আন্দোলনরত যুবসমাজকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। জলকামান থেকে নির্গত জলের প্রবল আঘাতে বিচলিত না হয়ে তিনি পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের সংকল্পে অটল থাকার ইশারা করছেন; তাঁর শরীরী ভাষার মাধ্যমে— জলকামানের বাধাকে উপেক্ষা করে আন্দোনকারীদের 'নবান্ন অভিযান' অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছেন। বলরাম (প্রবীর) বসু নামক ওই ব্যক্তি পরে সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, পদযাত্রা নবান্ন পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারলেও তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর যাতে মুখ্যমন্ত্রীর কর্ণকুহর পর্যন্ত পৌঁছায়, সেই লক্ষ্যেই তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এই অদম্য সাহসিকতার প্রকাশ।

ডাঃ অভয়ার হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনরতদের 'আন্দোলন করার পরিণতি' বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। ডাঃ অভয়ার হত্যাকাণ্ডের চার মাস পরে ১৪ ডিসেম্বর রাতে প্রতিবাদী জনতা সেই 'পরিণতি' বুঝে নিয়েছিল বিভিন্ন লিঙ্গের মধ্যে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠাকামী মানুষের মহা সম্মেলন 'স্পর্ধার চিৎকার'-এ। আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে রানুছায়া মঞ্চে নারী-ট্রান্স-ক্যুয়ার সহ প্রান্তিক এলজিবিটিকিউ মানুষেরা 'অভয়ার দল'-এর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে রাতের কলকাতায় জমায়েত হয়েছিল। যাদের কথা এতদিন কেউ শোনেনি, সেদিন ওই প্রান্তিক মানুষেরা অন্য মানুষদের শুনিয়েছিল রাত দখলের উৎসব শেষ হয়নি। হতে পারে না।

'অভয়ার ভয় নাই
রাজপথ ছাড়ি নাই।'

এ আন্দোলন আলমারিতে সাজিয়ে রাখা আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন বিশ্বাসঘাতকতার আন্দোলন নয়। যেমনভাবে হীরকরানি 'জন-আন্দোলন'-এর নামে স্থানীয়দের 'ক্ষমতারোহণের সিঁড়ি বানিয়ে' নন্দীগ্রামে জিতেছিলেন। মাওবাদীদের সাহায্য নিয়ে এরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন বিধানসভা আসনে জিতেছিলেন। জনগণকে ধোঁকা দিয়ে সিঙ্গুরে জিতেছিলেন। তারপর মাওবাদী নেত্রী সুচিত্রা মাহাতকে দাবার বোর্ডের বোড়ে বানিয়ে কিষেণজীকে হত্যা করে গোটা মাওবাদীদেরই নিকেশ করে দিয়েছিলেন। কোমর ভেঙে গিয়েছিল সুচিত্রা মাহাতদের। পূর্বতন মাওবাদী পাঁচু রায়, পূর্ণেন্দু বোস, দোলা সেনদের কড়ির বাজারে

কিনে নিয়েছিলেন জলের দরে। নগদা-নগদি হিসেবে।

কিন্তু জন-আন্দোলন সে তো তার নিজস্ব প্রতিবাদের ভাষা নিত্যনতুন করে খুঁজে নেবে। সে আন্দোলন তো কালীঘাটের আরবপতির ঘরে সাজানো থাকবে না। পথেই থাকবে। পথই পথ দেখাবে। এটাই ছিল রাতদখলের মহিমা, সুপ্ত বার্তা।

এক আন্দোলনেই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল 'বাংলার মেয়ে'র ভবিষ্যৎ। সবাই বুঝেছিল, সব্বাই। শুধু বোঝেননি কালীঘাটের ওই অহঙ্কারী দলনেত্রী যে এমন আন্দোলন সমাজকে নতুনের সন্ধান দেয়। এমন আন্দোলন সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার না করে গণ্ডী ভাঙে, রাজনৈতিক বোধবুদ্ধিতে শান দেয়। মানুষেরাই মানুষকে ভবিষ্যতের দিশা দেখায়। ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে সেই দিশা স্পষ্ট হলো। অত্যাচারী শাসক তাঁর নিজের ঘরে হারলো। ৪ মে যখন নির্বাচনের ফল ঘোষণা হচ্ছে, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পনেরো হাজারেরও বেশি ভোটে হেরেছেন, তখন যেন ভেসে আসছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই সার্জিকাল স্ট্রাইকের পূর্ববর্তী ভাষণ—'পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করেই আমরা পুলওয়ামা হত্যার প্রতিশোধ নেব'। নিয়েও ছিলেন। এবার স্বয়ং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ভবানীপুরে পা রেখেই নিজের বাড়ির উঠোনে দাঁড় করিয়ে হারিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজ্য জুড়ে দিকে দিকে সে কী উল্লাস! দুপুর গড়াতে না গড়াতেই ৪ মে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তৃণমূলের বিসর্জন ঘটতে চলেছে। শুধু কিছু মুহূর্তের অপেক্ষা। তারপরেই আবাহন হবে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। যা ছিল স্বপ্নের অতীত—সেটা হলো। ৪ কোটিরও বেশি মানুষের অবিরাম আশীর্বাদ নিয়ে ২০৮টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। যেন এক বিপ্লবের সাধন হলো। সল্টলেকে বিজেপি অফিসের সামনে সেদিন গেরুয়া আবিরের পরতই বুঝিয়ে দিচ্ছিল বিপ্লব সফল। হবেই তো— বহু আগেই স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যখন চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে বিধ্বংসী হানা দিয়ে সাহেব মারলেন এবং ধরা না দিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড চুষে আত্মবলিদান দিলেন, সেদিন তাঁর প্যান্টের পকেটে একটি চিরকুট খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল— LONG LIVE REVOLUTION। এবার পশ্চিমবঙ্গে ভোটের পর যদি মহিলাদের অন্তরে কী লেখা ছিল তা পড়া সম্ভব হতো তাহলে ওই কথাটাই পাওয়া যেত— LONG LIVE REVOLUTION। দীর্ঘ ৩৪ বছরের জরদ্‌গব বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষ সরিয়েছিল মমতা ব্যানার্জির কথার মোহে সেটা কোনো বিপ্লব ছিল না। কলকাতা লন্ডন হবে, দার্জিলিং সুইজারল্যান্ড হবে জাতীয় মৌতাতে বুঁদ হয়ে মানুষ সরকার বদলেছিল। সেটা হয়তো ঠিকই ছিল। কিন্তু ভুল ছিল মমতা ব্যানার্জিকে বেছে নেওয়া। তখন মানুষ ছিল নিরুপায়। আর কোনো বিকল্প পথ সামনে ছিল না। আর এর জন্য এরাজ্যের মানুষকেই ১৫ বছর ধরে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। গোটা রাজ্য দেউলিয়া হয়ে গেছে। একটু দেরিতে হলেও ভুলটা মানুষ বুঝেছে, বিশেষত মেয়েরা। কয়েকটা বছর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীতে বুঁদ হয়ে থাকলেও অবশেষে ভুল ভেঙেছে। বাঁধ ভেঙেছে ধৈর্যের। মানুষ বুঝেছিল এবার তৃণমূল জিতলে নিজভূমে পরবাসী হতে হবে। বঙ্গের মহান সন্তান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান ব্যর্থ হয়ে যাবে। সর্বোপরি, যে কোনো ছুতোনাতায় কেন্দ্রের বিরোধিতা করে উন্নয়নের নৌকা ভাসানোর অপারগতার গ্লানিতে ভুগতে হবে না। পিসি-ভাইপোর সার্কাস আর চলতে দেওয়া যাবে না। এবার নিজেদের বাঁচতে হবে। মানুষ বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে। নতুন ভাবনা, নতুন স্বপ্ন নিয়ে এসেছে নতুন সরকার। মানুষের সামনে নতুন দিশা। এবার শিক্ষার হাল ফিরবে। এবার স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত হবে। এবার সংস্কৃতি ফিরবে। আবার ফিরবে সামাজিক সম্পর্ক, মানবিক মূল্যবোধ। অবলুপ্তি ঘটবে স্বৈরাচারের, গুন্ডামির, মস্তানির, কাটমানির, তোলাবাজির, দুর্নীতির, সিন্ডিকেটরাজের। কারণ 'গুন্ডাদের কন্ট্রোলার' মমতা ব্যানার্জি নিজেই সব হারিয়ে বসে আছেন।

**ইতিহাসের শিক্ষা— ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না**

যথা কর্মঃ তথা ফলম্। আয়নাকে তুমি যেমন দেখাবে সেও তেমনই তোমায় দেখাবে। ইঁট ছুঁড়লে পাল্টা কেউ রসগোল্লা ছুঁড়বে না। Everybody will be paid in his own coin। এ বিশ্বে অপরাধ, স্বৈরাচারের কোনো ঠাঁই নেই। এজন্মের পাপের শাস্তি এ জন্মেই পেতে হবে। মানুষ তাদের চোখে পরানো ঠুলি সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। তাই রাতদখলের ডাক। তাই স্পর্ধার চিৎকার। তাই পালাবদলের পালার সাক্ষী থেকে থেকে যাওয়া। ১৯৯২ থেকে ২০২৩। রাজস্থানের ভানওয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গের অভয়া বা তিলোত্তমা বা মৌমিতা— যে নামেই ডাকা হোক না তাঁকে— পথ ছিল দুর্গম। সেই দুর্গম পথের ঠিকানা ও সমাধানের ছবিটা ফুটে উঠেছিল আগেই ১৯৭৪ সালে— ভারতে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষা 'Towards Equality' রিপোর্টের পাতায় পাতায়। সেখানেই উঠে এসেছিল অন্য দেশের মেয়েদের ছবিও— কতখানি স্বাধীন তাঁরা। শক্তি জুগিয়েছিল সেই রিপোর্ট। সময় লেগেছে। ইতিহাস কি একদিনে সৃষ্টি হয়? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় মেয়েরা জেগেছে স্বাধীনতার দাবিতে, স্বরোজগারের দাবিতে, স্বশাসনের দাবিতে। কুচক্রী শয়তান শাসকদের দু'গালে সপাটে থাপ্পড় মেরে বলতে— দূর হ, ফোট্। ছোঁয়ার চেষ্টা করলেই খাসি করে দেব শ্লা! শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। নতুন সূর্যের আলো বড় মিষ্টি। বড় স্নেহময়। সুরে সুরে বাঁধা এক সুন্দর সকাল।

*(লেখক বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও গবেষক)*

*(কৃতজ্ঞতা : সিউ পত্রিকা বুলেটিন; ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪)*



# সাম্প্রতিক

**দেবদাস কুণ্ডু**

ইদানীং একটা অস্থিরতা নিবারণ চক্রবর্তীকে চঞ্চল করে তুলেছে। সেই অস্থিরতায় সে আজকাল অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছেন। বাজারে মাছের দাম দিয়েছেন। বাড়ি এসে চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন সবে। দু' একটা টান দিয়েছেন। সামান্য ধোঁয়া বাতাসে ছেড়েছেন, এমন সময় ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মল্লিকা বললেন—কী গো মাছ আননি?

সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ চক্রবর্তীর ভিতর সংশয় দেখা দিল, মাছ আনিনি!

বললেন—ভালো করে ব্যাগটা দেখতো।

মল্লিকা বললেন—ব্যাগ খুলে দেখেই তো বলছি।

—তাই! দাঁড়াও, বাপনকে একটা ফোন করি।

—কে বাপন? মল্লিকা প্রশ্ন করলেন।

—বাপনের কাছ থেকেই মাছ আনি। ভূতদার ছেলে। আগে বাবার সঙ্গে ছিল। বিয়ে করে আলাদা হয়েছে। আলাদা দোকান দিয়েছে।

—এতো কথা শুনতে চাই না। তুমি মাছ আনো আগে।

সিগারেট টানতে ভুলে গেছেন নিবারণ চক্রবর্তী। আঙুলের ফাঁকে নিঃশব্দে সিগারেট পুড়ছে। ফোনে রিং হয়ে যাচ্ছে। বাপন ধরছে না। মিসকল হয়ে গেল। কী ভেবে আবার ফোন করলেন নিবারণ চক্রবর্তী। এবার ধরেছে। বাপন বলল—

—কে বলছেন?

—আমি নিবারণ চক্রবর্তী বলছি।

—হ্যাঁ কাকু বলুন, কী মাছ লাগবে?

—আমি তো বাজার করেই ফিরেছি। তোর কাছ থেকে কি আজ মাছ নিয়েছি?

—নাতো। আপনি তো আজ আমার দোকানে আসেননি। ফোনটা কেটে দিয়ে নিবারণ চক্রবর্তী আবার সিগারেটে বড়ো করে একটা টান দিলেন। তবে কার কাছ থেকে মাছ নিয়েছি? ঝন্টু না ভোলা? না রাজু? কার কাছ থেকে? না, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

—কীগো বসে বসে কী ভাবছো? মাছটা তো আনতে হবে। মল্লিকা তাড়া দিয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি মাছ নিয়ে এসো। রান্না করে আমাকে আবার বের হতে হবে।

—কোথায় যাবে তুমি?

—মায়ের বাড়ি।

নিবারণ চক্রবর্তী জানে মায়ের বাড়ি মানে বাগবাজারে মা সারদার বাড়ি।

—সেখানে কী আছে আজ?

সিগারেটে টান দিলেন নিবারণ চক্রবর্তী।

—ভক্ত সম্মেলন।

—কখন?

—দশটায়।

সিগারেট ছাইদানিতে গুজে উঠে দাঁড়ালেন নিবারণ চক্রবর্তী। এর আগে একদিন ব্যাংক থেকে টাকা তুলে হাত ব্যাগটা ফেলে এসেছিলেন কোনো একটা দোকানে। বাড়িতে এসে হাতটা খালি খালি লাগছিল। মনে পড়ল হাতে তো টাকার ব্যাগটা ছিল। সেটা কোথায় গেল? টেনশন শুরু হলো। স্ত্রীকে কিছু বললেন না। লাস্ট মা সারদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে সন্দেশ




ANU SAREES

**ANUSHREE TEXTILES PVT. LTD.**

14, Amratalla Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001 (W.B.)
Phone : 033-22351257, E-mail : anusaree@gmail.com

এনেছেন। খাবার শেষে তাঁর একটু মিষ্টি চাই। মা সারদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যেতে নিমাইদা ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার ফোন নাম্বার আমার কাছে থাকলে একটা ফোন করে দিতাম। টাকার ব্যাগ এভাবে কেউ ফেলে যায়?

নিমাইদাকে বললাম না একটা অস্থিরতায় খুব ভুগছি। তাই ভুল হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাগটা খুলে দেখে নিলেন। না, টাকার বান্ডিলটা আছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে কথা। হাঁফ ছাড়লেন। ধীরে ধীরে বাড়ি চলে এসেছিলেন।

আজ আবার মাছ ফেলে এসেছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে একটু দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। একটা অস্থিরতা সব সময় শরীরের ভিতর হেঁটে বেড়াচ্ছে। মল্লিকার এসব নেই। সারদা মায়ের বাড়ি যাবে মানে আজ দুপুরে মল্লিকা বাড়িতে খাবে না। ভক্ত সম্মেলনে খাবারের প্যাকেট দেবে। মল্লিকা ধর্ম নিয়েই আছে। খুব ধার্মিক সে। ভোর চারটের সময় উঠে ধর্মীয় পুস্তক পড়ে। খাতায় দুর্গা নাম লেখে একশো একবার। জপ করে, সারদা মায়ের বই, ঠাকুরের বই পড়ে। এছাড়া স্নান করে লাল পেড়ে শাড়ি পরে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো দেয় ঘণ্টা খানেক সময় ধরে। তারপর আধঘন্টা চোখ বুজে গভীর মগ্নতায় জপ করে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন মিশনে বেড়াতে যায়। রাত দশটায় মোবাইলে অনলাইনে গ্রুপে ওদের কথামৃত পাঠ হয়। সেখানে কোনো কোনো দিন মল্লিকা পাঠ করেন। কোনো কোনো দিন গ্রুপের অন্য কোনো সদস্য পাঠ করেন। নিবারণ চক্রবর্তী মাঝে মাঝে বলেন, তুমি তো রিটিয়ার করে সম্পূর্ণ ধার্মিক হয়ে গেলে! আমার দিকে একটু তাকাও।

—দেখো ছোটোবেলা থেকে আমি পুজো অর্চনা করি, আমাদের বাড়িতে সব উৎসব হতো। বাসন্তীপুজো, দোল, গনেশপুজো, রামনবমী, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজো। আমার মা আমাদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতেন। তখন থেকেই আমার ঈশ্বর ভক্তি ধর্মাচরণ পালন। এতদিন চাকরি করেছি তাই পুজো অর্চনা দিকে মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারিনি। এখন ধর্ম-কর্ম করবো না তো আর কবে করব? যার ধর্ম নেই তার জীবনও নেই। আমাদের সনাতন ধর্মই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

—আরে চক্রবর্তীদা হন হন করে যাচ্ছেন কোথায়? আবাসনের ব্যানার্জিবাবু জিগ্যেস করলেন।

—বাজারে।

—একটু আগে তো বাজারে আপনাকে দেখলাম। ঝন্টুর দোকানে মাছ কিনছিলেন।

—ঝন্টুর দোকানে মাছ কিনেছি। দেখুন কাণ্ড! দাম দিয়েছি, মাছ নিয়ে আসিনি।

—ঝন্টু হয়তো রেখে দিয়েছে। কেউ না নিয়ে গেলে পেয়ে যাবেন।

**দুই**

মাছ ভাজতে ভাজতে মল্লিকা বললেন—তোমার কী হয়েছে বল তো?

ডাইনিং টেবিলে ঝুঁকে কাগজ পড়ছিলেন নিবারণ চক্রবর্তী। পড়তে পড়তে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। শরীরের ভিতর অস্থিরতা বাড়লে তার ধূমপানের সংখ্যা বেড়ে যায়।

—তুমি বলছো তোমার কিছু হয়নি তাহলে তুমি আজকাল এত ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছ কেন? যখন কোনো কিছু নিয়ে তোমার ভিতর অস্থিরতা বাড়ে তখন তোমার ধূমপানের সংখ্যা বাড়ে। ডাক্তার তোমাকে বলেছেন, ধূমপান ছেড়ে দিতে। কী, বলেননি ডাক্তার ঘোষ?

—হ্যাঁ। তা অবশ্য বলেছেন। নিবারণ চক্রবর্তী কাগজের উপর চোখ রেখেই বললেন।

—হার্টে সামান্য ব্লকেজ ধরা পড়েছে। মেডিসিন দিয়েছেন ডাক্তার ঘোষ। বলেছেন, ধূমপান না ছাড়লে বড়ো রকমের সমস্যা হতে পারে। কি বলেছেন তো? কড়াইতে মাছ উল্টে দিতে দিতে বললেন মল্লিকা।

—হ্যাঁ বলেছেন। তুমি দেখছি ডাক্তারের কথা পাই-টু-পাই মনে রেখেছো।

—মনে রাখবো না কেন? আমাদের তো ছেলে-মেয়ে নেই। ঈশ্বরই একমাত্র ভরসা। আমার কিছু হলে তুমি মনে রাখবে, তোমার কিছু হলে আমি মনে রাখব। এটাই তো দাম্পত্য সম্পর্ক। তুমি মা সারদার কথা ভাবো একবার। ঠাকুরের অসুখের দিনগুলোতে মা সারদা কী রকম সেবা যত্ন করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট ঘরে শিকে জিওল শিং মাছ ঝুলিয়ে রাখতেন মা। সারারাত কলকল করতো মাছ গুলো। ঘুম হতো না মায়ের।

—হ্যাঁ আমিও জানি। ওই রকম মানবী আর আসবেন না এই পৃথিবীতে।

—তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না, কী হয়েছে তোমার? রাতে বারবার বাথরুম যাচ্ছ। তোমার তো সুগার নেই। এক ঘুমে ভোর হয়ে যায়। আজকাল তুমি কথামৃত পড়া শুনছো না আর। আগ্রহ যেন অনেক কমে যাচ্ছে। কী হয়েছে বল না আমায়?

—বলছি তো কিছু হয়নি। সিগারেট নিভিয়ে দিয়ে আবার একটা ধরালেন নিবারণ চক্রবর্তী। মল্লিকার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সব অবজারভেশন করে। যা কিছু করে গভীর মনোযোগ দিয়ে করে। যখন বই পড়ে তখনও মনোযোগের গভীরে ডুবে যায়। সেদিন দশটা বেজে গেছে। খিদে পেয়েছে তাঁর। অনেক বার ডাকলেন। মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়নি। টু রুমের ফ্ল্যাট। সাড়ে ৬০০ স্কোয়ার ফুট। একটা রুমে মল্লিকা থাকে, অন্যটায় থাকে নিবারণ চক্রবর্তী। তিনি একজন লেখক। এত ডেকেও যখন মল্লিকার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তিনি মল্লিকার ঘরে গেলেন। মল্লিকা হাতে পেন্সিল নিয়ে একটা বইতে আন্ডারলাইন করছিল। এটা ওর স্বভাব। ভালো ভালো জায়গা গুলো মেনশন করে রাখে।

—কীগো তখন থেকে ডাকছি তুমি সাড়া দিচ্ছ না। রাত দশটা হয়ে গেল খাবো কখন?

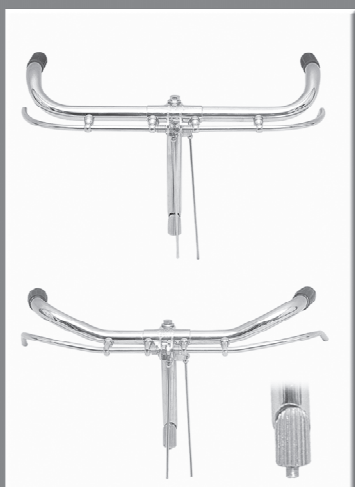
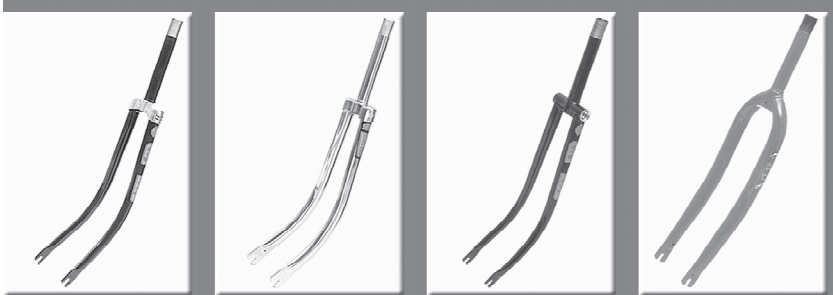
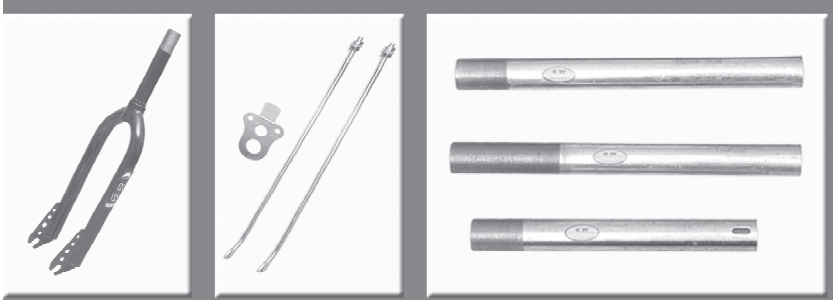
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মল্লিকা তরাক

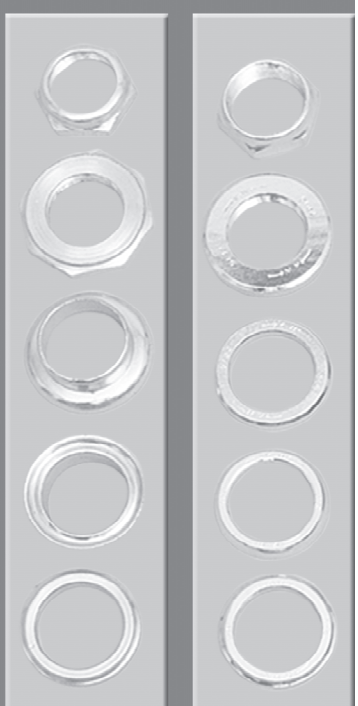







**Manufacturers & Exporters of**
**SUPREME QUALITY BICYCLE &**
**RICKSHAW PARTS**



# K. W. Engineering Works (Regd.)

B-11, Phase-II Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA

Phones : 5010958, 5010960

Email : kwenggworksregd@gmail.com

করে উঠে বইটা বন্ধ করে বলেছিল—চলো খাবার গরম করে দিচ্ছি।

নিবারণ চক্রবর্তী দেখলেন বইটার নাম প্রাচীন ভারতের সাধুদের কথা। আর একদিনের ঘটনা। সেদিন মল্লিকা খেতে খেতে বলেছিল—জানো তো, প্রাচীন ভারতে আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নত ছিল।

—হ্যাঁ, জানি। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে নিবারণ চক্রবর্তী বলেছিলেন।

—কিন্তু কেন আরও উন্নত হলো না আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সেটাই আমি ভাবছি। মল্লিকা বললেন।

—সেদিন একটা বই না ম্যাগাজিন পড়ছিলাম বলতে পারব না এখন। তবে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা পদ্ধতি আরও উন্নত হয়নি বৌদ্ধ মতের উত্থানের পর।

— কীরকম? মল্লিকা চোখ দুটো বড়ো করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

নিবারণ চক্রবর্তী বলেছিলেন—বৌদ্ধমতের নিয়ম হলো মৃতদেহ ছোঁয়া যাবে না। ফলে মৃতদেহ কাঁটা ছেঁড়া করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

—কী গো তখন থেকে শুধু সিগারেট খেয়ে যাচ্ছ।

মল্লিকার কথায় নিবারণ চক্রবর্তী অতীত থেকে ফিরে আসেন। মল্লিকা কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেটটা টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

কাগজ নিয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে এলেন নিবারণ চক্রবর্তী। ঘরের দরজার ছিটকিনি দিয়ে দিলেন। এবার আর তার ধূমপানে মল্লিকা বাধা দিতে পারবে না। তিনি মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে কাগজটা পড়তে পারবেন।

### তিন

লেখার টেবিলে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ চক্রবর্তী। একটা পত্রিকায় পূজাসংখ্যায় একটা গল্প দিতে হবে। কিন্তু প্লটটাকে কিছুতেই গুছিয়ে আনতে পারছেন না। মনের ভিতরে অস্থিরতা তাকে স্থির ভাবে কিছু ভাবতে দিচ্ছে না। তাঁর ঘুম কমে গেছে। কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে। চেনা মানুষকে অচেনা লাগছে। বই পড়তে ইচ্ছে করছে না। একটা রাগ তাকে তীব্রভাবে অস্থির করে তুলেছে। একটা চেয়ার টেনে পাশে বসলে মল্লিকা।

বললেন—তুমি দেখছি চুপচাপ বসে আছ। তোমার ভিতরে কী হচ্ছে আমাকে কিন্তু এখনো বলনি। যাক, আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

নিবারণ চক্রবর্তী একটা সিগারেট ধরিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—বল কী বলবে?

—এই যে বাংলাদেশে প্রতিদিন হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে এর কোনো বিহিত নেই? শুনেছি আগে ২২ শতাংশ হিন্দু ছিল এখন দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশের কম। এরপর কি এটা শূন্যে গিয়ে দাঁড়াবে? একটাও হিন্দু কি আর বাংলাদেশে থাকবে না? এই অত্যাচার তো আজ নয়। স্বাধীনতার আগে থেকেই হচ্ছে। তাই তো আমার বাবা-মা ওই দেশ থেকে এ দেশে এসেছেন। রিফিউজি হয়েছেন। লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে।

—আমার বাবা-মাকেও রিফিউজি হতে হয়েছে। ফরিদপুর বাবার বাড়ি ছিল। মাদারিপুর সাব ডিভিশন।

—অবাক কাণ্ড দেখো, একটা সন্ন্যাসীকে জেলে আটকে রেখেছে। তার হয়ে কোনো উকিলকে সওয়াল করতে দিচ্ছে না।

তাহলে সন্ন্যাসীর জামিন হবে কী করে? তিনি কি জেলেই পচে পচে মরবে?

নিবারণ চক্রবর্তী কোনো উত্তর দিলেন না। চুপচাপ সিগারেটের আগুনের দিকে তাকালেন। একটা টান দিলেন।

মল্লিকা বললেন—অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ করে সবাই চিৎকার করছে। কিন্তু অনুপ্রবেশটা বন্ধ হচ্ছে না কেন?

আরও একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল সেদিন। একটা ছেলেকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে গাছে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলো।

কিছু লোক সেই নিষ্ঠুর বর্বরতার ভিডিও তুলল। এখানেও এক সন্ন্যাসীকে জড়িয়ে অশ্লীলতার সংবাদ বাতাসে ভেসেছিল। আমি মাঝে মাঝে এসব চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। বাংলাদেশের নৃশংসতা এখানে না ছড়িয়ে পড়ে। আজ মানুষ বড় বিপন্ন। এসব নিয়ে তুমি ভাবো না? তুমি তো লেখক মানুষ। তোমাকে এসব ঘটনা অস্থির করে তোলে না?

নিবারণ চক্রবর্তী মল্লিকার দিকে গভীর চোখে তাকালেন। তারপর সিগারেটে একটা বড়ো টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—

সাম্প্রতিক এইসব ঘটনাগুলোই আমাকে বেশি অস্থির করেছে। তুমি যে বারবার বলছো না তোমার কী হয়েছে? এর কী জবাব দেবো তোমায়। আমি এসব ঘটনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে জীবনের ছন্দটাই ভুলে যাচ্ছি। নিজের ভিতরেও এক ধরনের বিপন্নতা বোধ কাজ করছে। তুমি তো সব সময় থাকো ধর্মকর্ম নিয়ে। এতো সব ঘটনা জানলে কী করে?

—কেন তুমি যখন থাকো না তখন কাগজটা পড়ি। মাঝে মাঝে টিভির খবর শুনি। আমাদের গ্রুপের মধ্যেও আলোচনা হয়। বাসে ট্রেনে টুকরো টুকরো সংলাপ শুনি। আচ্ছা, এসব নিয়ে কিছু লেখা যায় না? তুমি লেখার কথা ভাবছ না?

—ভাবছি। খুব গভীরভাবে ভাবছি। তাই তো একটা অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটছে। ভিতরে ভিতরে রক্তাক্ত হচ্ছি। একটু থেমে নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তুমি তো জানো সাম্প্রতিক অনেক ঘটনা নিয়েই আমি গল্প লিখেছি। নিবারণ চক্রবর্তী আবার সিগারেটে টান দিলেন। তার মনে হলো সিগারেটের আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে তার ভিতর।

*With Best Compliments From -*



# A

# WELL WISHER

MF

## SHREE JAIN VIDYALAYA

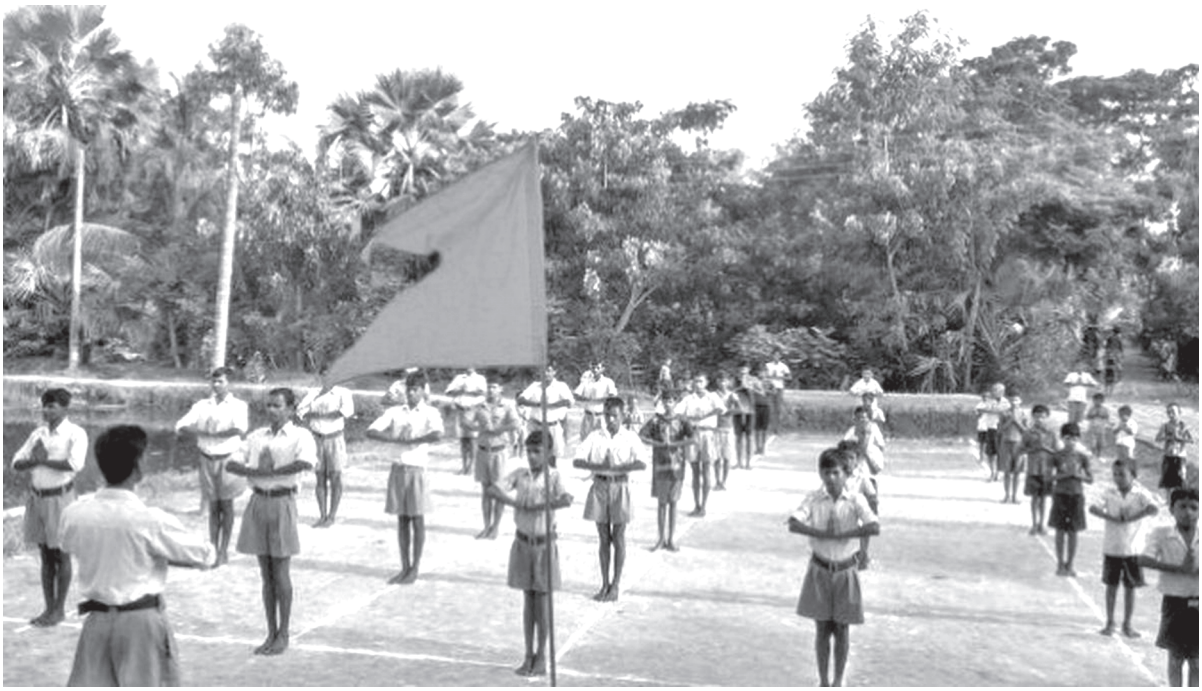
*Educational institution in Howrah, West Bengal*

***Address***

25/1, Bonbehari Bose Road, Sandhya Bazar,

Choura Bustee, Shibpur, Howrah, West Bengal- 711101

Phone - 033-22426369



# সঙ্ঘ মানে সাধনা

বিজয় আঢ্য

সালটা ১৯৬৮-৬৯ হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রচারকদের মধ্যে আমি তখন সর্বকনিষ্ঠ। সেই এক-দু'বছরের কয়েকটা ঘটনা স্মৃতির দরজায় এখনও টোকা মারে। প্রচারকদের বৈঠক হবে। কলকাতায় সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে ঘনশ্যাম বেরিওয়ালজীর বাড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠে বাঁ-হাতে বড়ো ঘর। ঘরে তখন তিরিশ-পঁয়ত্রিশজন হবে। তখন যাঁদের চিনতাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন বসন্তদা, মাধবদা, অনন্তদা, অমলদা, কেশবজী, বংশীদা, কেষ্টদা (বালকৃষ্ণ নাইক), মধুদা (মধুকর মালসে), রামদা (রামপ্রসাদ দাস), গজাননদা, গৌরাঙ্গদা এবং আরও অনেকে। কালিদা ও কেশবজীকে আগে থেকে চিনতাম। তাঁদের দেখেছি ১৯৫৭ সালে কলকাতার একটা শিবিরে। শিবিরটা হয়েছিল হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে। ক্লাস ফাইভে পড়ি। শূন্যে সৌধ নির্মাণ করাটা শুনেছি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ খাড়া করে বসন্তদা দেখিয়েছেন যে তা করা যায়। অমলদা জীবনের অনেকটা সময়ই ২৬ নং কার্যালয়ে কাটিয়েছেন। কার্যালয় কেমন হবে তা জানিয়ে বলতেন, স্বয়ংসেবকরা গোমরা মুখে কার্যালয়ে এলেও হাসি মুখে ফিরে যাবে। বৈঠক তখনও শুরু হয়নি। শ্রীগুরুজী একটা বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন। ক্যানসার ধরা পড়েছে। সুজিতদা (ডঃ ধর) শ্রীগুরুজীর বি পি চেক করছেন। ঠিক এমন সময় অনেকটা স্বগতোক্তির (SOLILOQUY) মতো শ্রীগুরুজী বললেন, 'হাম সব ইহ রাষ্ট্র কা এক-এক বুঁদ হ্যায়।' বৌদ্ধিক নয়, বৈঠক নয়, আলাপচারিতাও নয়। শুধুই স্বগতোক্তি। অন্য কেউ শুনেছেন কিনা তাও জানি না। তবে এটাই আজীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে রইল।

শ্রীগুরুজীকে প্রথম দেখি ১৯৬৩ সালে, কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। সম্ভবত ১৭ জানুয়ারি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে। সে বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। বাচ্চুদা (স্বর্গীয় ভূমানন্দ পাল) ও গৌরাঙ্গদার (স্বর্গীয় গৌরাঙ্গ দাশগুপ্ত) সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। কালিদা (স্বর্গীয় কালিদাস বসু) সভা পরিচালনা করছিলেন। পরে শুনেছি ওইদিনের সভায় সভাপতি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজ। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩— এই দশ বছরে শ্রীগুরুজীকে দর্শন করার, বৌদ্ধিক শোনার, বৈঠকে থাকার সুযোগ পেয়েছি। খুব কাছে থেকে সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম ১৯৬৮ সালে ইটাচুনায় সঙ্ঘের শিক্ষা বর্গে। এই বর্গে আমার অধিকারী বিভাগের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল।

শ্রীগুরুজী খুব গরম চা পছন্দ করেন— অনন্তদা তা পাখিপড়ার মতো বুঝিয়েছিলেন। বস্তুত চা করার ক্ষেত্রে তখন অনেকটাই নবীশ। একটু পরে অনন্তদা এসে বললেন— 'পাশ করেছিস'। তখন ঘাম

দিয়ে জ্বর ছাড়ল মনে হলো।

৬৯-৭০-এ পরপর এই দু-বছরে পশ্চিমবঙ্গে এমন কয়েকটা কার্যক্রম হয়েছিল যেখানে শ্রীগুরুজী উপস্থিত ছিলেন। যেমন১৯৬৯ সালে পাথুরিয়াঘাটার এক ধর্মশালায় বৈঠক হয়েছিল, যেখানে দুটো শাখার দায়িত্ব আছে এমন কার্যকর্তাদের ডাকা হয়েছিল। তখন কাটোয়াতে রয়েছি। এই বৈঠকটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘের কাজের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক। শ্রীগুরুজী এই বৈঠকে শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক হিসেবে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ এই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রান্ত কার্যকারিণী গঠন সম্পূর্ণ হলো। সেসময় প্রান্ত স্তরের কার্যকর্তাদের বৈঠকে শ্রীগুরুজী যেসব প্রশ্ন করতেন বা প্রত্যুত্তরে যা বলতেন, তা জেনে ইদানীং অনেকে হয়তো একটু অবাক হবেন এবং তা স্বাভাবিকও। সঙ্ঘের নামের মধ্যে ক'টি শব্দ আছে— তিন না চার? কিংবা সঙ্ঘের প্রার্থনার প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ কী? অথবা সঙ্ঘকে বোঝাতে সক্ষম এমন সক্রিয় ও নিরংহকার কার্যকর্তা তোমার ক্ষেত্রে কতজন আছে? প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে রয়েছে। শ্রীগুরুজী প্রশ্ন করলেন, কাদের কাদের কার্যক্ষেত্রে এরকম কার্যকর্তা রয়েছে? একজন হাত তুললে শ্রীগুরুজী হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুম তো স্বয়ং অহংকারী হো'। 'আমি'-কে কতটা মাটির তলায় পুঁতে দিতে হবে— বোধোদয়ের জন্য এর থেকে যথেষ্ট আর কী আছে? অথবা শ্রীগুরুজীর ভাষণে একটা কথা প্রায় শুনেছি— 'অন্তর্বাহ্য শুদ্ধ হোনা চাহিয়ে'। সঙ্ঘের শতবর্ষ পার হয়েছে। বাস্তবিকই সঙ্ঘ আজ দেশব্যাপী ও সর্বস্পর্শী হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বসবাসকারী হিন্দুদের উপরও সঙ্ঘের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের কেন্দ্র ও অধিকাংশ রাজ্য সরকার হিন্দুত্ববোধে অনুপ্রাণিত মানুষরাই পরিচালনা করছেন। সঙ্ঘ বরাবরই যুগানুকূল পরিবর্তন এবং বিরোধিতার পথে না গিয়ে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে চলায় বিশ্বাসী। সঙ্ঘের মূল ভাবনা আবর্তিত হচ্ছে সম্পর্কের উপর, আত্মীয়তার উপর— একটা পরিবারে যেমন হয়ে থাকে। যেখানে আমি নয়— আমরাই। এই আত্মীয়তাবোধের কারণেই সঙ্ঘ ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে (Progressive Unfoldment)।

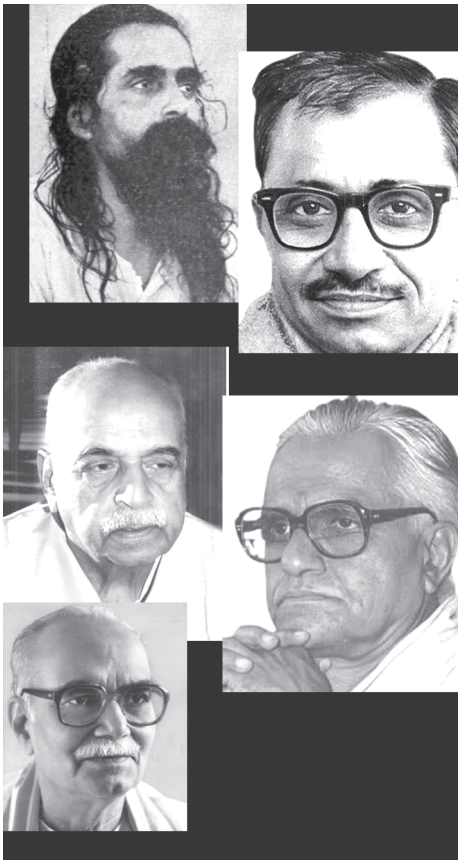
ঘটনা হলো, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক এমনই সব পারিবারিক একাত্মতার কথা বলতে পারবেন, যা তাদের চলার পথে প্রেরণা দিয়েছে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তবে ডাক্তারজীর ডান হাত বলে পরিচিতকে দেখেছি। ১৯৬৯ সালে নাগপুরে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে মাননীয় আপ্পাজী যোশী-র বৌদ্ধিক ছিল। পূজনীয় শ্রীগুরুজীকে যখন 'সরসঙ্ঘচালক' নিযুক্ত করা হয়, তখন সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি ডাক্তারজীর এত পুরনো বন্ধু, বলতে গেলে তাঁর ডান হাত, তবুও আপনার থেকে অনেক নবীন শ্রীগুরুজীকে সরসঙ্ঘচালক করা হলো কেন? উত্তরে আপ্পাজী বলেছিলেন, 'ঠিকই, তিনি ডাক্তারজীর ডান হাত-ই। এখন এই ডান হাত দিয়েই নবনিযুক্ত সরসঙ্ঘচালককে প্রণাম করব। সঙ্ঘের এটাই সংস্কৃতি। এরকমই একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল ১৯৮৪ সালে নাগপুরে সঙ্ঘের প্রতিনিধি সভায়। সঙ্ঘের তৎকালীন সহসরকার্যবাহ এইচ ভি শেষাদ্রিজীকে সরকার্যবাহ ঘোষণা করে নিজেকে সহ-সরকার্যবাহ রূপে পরিচয় দিলেন মাননীয় রাজেন্দ্র সিংজী (রজ্জু ভাইয়া)। এ এক অনন্য অনুভূতি, যা মানুষকে নত হতে শিক্ষা দেয়।

সঙ্ঘ বরাবরই বলে আসছে— ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণ। সঙ্ঘ শুধুই ব্যক্তি নির্মাণ করবে, আর স্বয়ংসেবকরা রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য সব কিছুই করবে— কোনো কিছু ছেড়ে দেবে না। আর ব্যক্তি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধির কৌশলটিও শিক্ষণীয়— যার একটি ইট বহনের ক্ষমতা আছে তাকে দুটো ইট বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সঙ্ঘের নেতৃত্ব মূলত নৈতিক ও কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নির্ধারিত। সঙ্ঘ ব্যক্তি নির্মাণের জন্য লিটারেচার, সেমিনার, এডুকেশনাল ট্যুর ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করেনি, কিন্তু জোর দিয়েছে আচরণের উপর— 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'— এই আপ্তবাক্যের উপর। বস্তুত ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলাভাষায় সঙ্ঘসাহিত্য বলে কিছু ছিল না। দশ-বারো পৃষ্ঠার দুটি বই তখন দেখেছি— ব্যক্তিদর্শন ও বিচারদর্শন। দুটি বইয়ের প্রচ্ছদেই শ্রীগুরুজীর ছবি ছিল। স্বস্তিকা-র আর্কাইভ-এ এখনও বইদুটি আছে। যদিও ষাটের দশকের শেষে 'বাঞ্চ অফ থটস্' প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্ঘ সম্বন্ধে জানার জন্য বইপত্তরের অভাবের কথা বললে সঙ্ঘের অধিকারীরা তখন বলতেন— 'এত লিভিং লিটারেচর' থাকতে একথা বলছো কেন? এখনও পশ্চিমবঙ্গে এমন কয়েকজন প্রবীণ স্বয়ংসেবক রয়েছেন, যাঁরা এমন অনুভবের কথা বলতে পারবেন। সঙ্ঘের শিক্ষা প্রণালীতে প্রথমে দেখা, পরে শোনা, শেষে পড়াশোনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সঙ্ঘ যে ব্যক্তি নির্মাণের পদ্ধতি নিয়েছে তা সর্বদাই 'পজিটিভ'— ইতিবাচক। যেমন ধরুন, একটা ছোটো বালতিতে ময়লা জল রয়েছে। এই বালতিতে পরিষ্কার জল দেখতে চান। এখন এই বালতিতে যদি বেশ কিছুটা সময় ধরে পরিষ্কার জল ঢালতে থাকা হয় তাহলে কিছুক্ষণ পরে ওই বালতির জলও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। উদাহরণ, একটা চিঠিতে লিখেছিলাম, আপনি অমুক তারিখে আসবেন। চিঠিটা দেখে অনন্তদা বলেছিলেন, লেখো— আপনি অমুক তারিখে এলে ভালো হয়। সামান্য লেখাতেও বিনয়ের ভাব থাকা দরকার। কিংবা শাখার পরে বা কোনো বৈঠকের শেষে খবরের কাগজের উপর বেগুনি বা আলুর চপ দিয়ে মুড়ি খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বেগুনি বা চপটা এঁটো করিনি। হাত দিয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছি। কেননা, কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে তবে তাকেও ভাগ দেওয়া যাবে। কাউকে কথা দিলে তা রাখার জন্য সঙ্ঘের রীতির কথা বলতে গিয়ে মাননীয় একনাথজী (কন্যাকুমারীতে স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তির প্রধান পুরোহিত) বলতেন, 'রঘুকুলরীত সদা চলি আঈ / প্রাণ যাঈ পর বচন না যাঈ।' তৃতীয় পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবকে বলতে শুনেছি, 'you will correct Swyamsevaks without stupid' — একটা ছুঁচ ফোটালে যে ব্যথা লাগে তার থেকেও যেন কম ব্যথা লাগে। সঙ্ঘে এটাই হয়।

একটা ঘটনার কথা মাননীয় পিঙ্গলেজীর (মোরপন্থ পিঙ্গলে - শ্রীরামমন্দির আন্দোলনের অন্যতম মার্গদর্শক) কাছে শুনেছি।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যারোহণের সাড়ে তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে (১৯৭৩-৭৪) স্থানীয় মানুষজন মুম্বাইতে এক সভার আয়োজন করেছিল। ওই অনুষ্ঠানে যিনি সভাপতি ছিলেন, অনুষ্ঠানের শেষে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে একজন স্বয়ংসেবক যান। তিনি দেখলেন, সভাপতি মশায় কয়েকবার কিছু বলতে গিয়েও বলছেন না। তাঁর এই দ্বিধার কারণ জিজ্ঞেস করলে সভাপতি মশায় বললেন, 'আচ্ছা, এই অনুষ্ঠানটার পিছনে কি আর এস এস আছে? স্বয়ংসেবকটি যখন জানাল, কয়েকজন স্বয়ংসেবক পরিচালন সমিতিতে রয়েছেন। তখন সভাপতি মশায় বলে উঠলেন, তাই, তাই। লাইন করে জুতো সাজানো দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল এটা সঙ্ঘ। বস্তুত এটাই সঙ্ঘ। সঙ্ঘের অনুশাসন।



সঙ্ঘের অনুশাসন ভঙ্গ করলে তাকে যে কোনো শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে এমন নয়, বড়ো জোর তাকে হয়তো কিছুদিন এড়িয়ে যাওয়া হবে। ঠিক যেমন আমাদের পরিবারে হয়। সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তাদের কেউ কেউ তা জানলেও কখনও বলেননি, বা বলবেনও না। কেননা, সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের গণেশ দেবতার মতো হতে বলা হয়— তাঁর কান বড়ো, তাই শুনবে। কিন্তু পেট মোটা। তাই শুনবে, কিন্তু বলবে না। পেট মোটা করবে। আর সত্যিই যদি এজন্য পেটব্যথা করে তবে ঊর্ধ্বতন অধিকারীকেই জানাবে— নীচেও নয়, পাশেও নয়। মালদার ঘনিষ্ঠ এক স্বয়ংসেবক বন্ধু নিজের কিছু কথা জানিয়ে নাগপুরে চিঠি দিয়ে তা জানিয়েছিলেন। সেসময় মাননীয় রজ্জুভাইয়া সরকার্যবাহ। দিল্লিতে তখন এক বৈঠকে গেলে সেই চিঠিটা হাতে দিয়ে প্রান্তের অধিকারীদের ফেরত দিতে বলেছিলেন।

আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ষাটের দশকের শেষের দিকে বর্ধমান বিভাগের প্রচারক তখন শ্যামমোহনদা (দে)। স্থানীয় এক বৈঠক চলার সময় এক স্বয়ংসেবক বড্ড বেশি কথা বলছিল। সামান্য একটু গলার স্বর উঁচু করে কথা বলতে বারণ করা হয়। পরে শ্যামমোহনদা কাজটা ঠিক হয়েছে বলেও পরদিন সেই স্বয়ংসেবকটির বাড়ি যেতে বললেন। বস্তুত এটাই সঙ্ঘ। সঙ্ঘের একটা গান আমরা গাই— 'শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেম হমারা / সঙ্ঘকার্য কা আধার হ্যায়।' শ্যামমোহনদার কথা মনে পড়লে শ্যামচাঁদদার কথাও মনে পড়ে। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির প্রাণভোমরা ছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে তখন বড়ো কোনো অনুষ্ঠান হলে তার দায়িত্ব শ্যামচাঁদদার ওপরই থাকত।

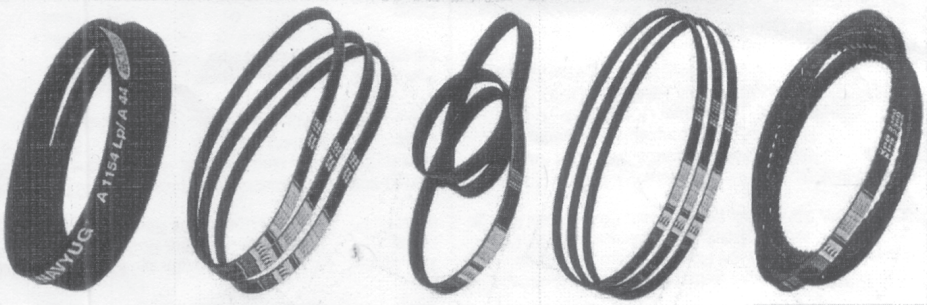
বিগত শতকের সত্তরের দশকের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের বৌদ্ধিক বিভাগের দায়িত্ব থাকার সময় দেখেছি, বৌদ্ধিকের একটা বিষয় থাকত— সঙ্ঘকার্য ঈশ্বরীয়। সেই ৬৯ সালের বৈঠকেই শ্রীগুরুজী প্রার্থনার 'ত্বদীয়ায় কার্যায়' প্রসঙ্গে বলেছিলেন--- শ্রীভগবানের কাজ তিনটি— দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মের সংরক্ষণ। সঙ্ঘ যে এই ধর্ম সংরক্ষণ— 'বিধায়াস্য ধর্মস্য সংরক্ষণম'-এরই কাজ করে রাষ্ট্রকে পরমবৈভশালী করতে চায়। সঙ্ঘকার্য ঈশ্বরীয় (ত্বদীয়ায় কার্যায়)— এটা যে শুধু কথার কথা নয়, খুবই 'প্র্যাকটিকাল' তা অনেক স্বয়ংসেবকেরই অনুভূতির গভীরে সঞ্চিত হয়ে আছে। আসলে একটা স্মৃতি আরেকটা স্মৃতিকে উস্‌কে দেয়। প্রার্থনার প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ বলতে গিয়ে শ্রীগুরুজী বলেছিলেন, 'মাতৃ ভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতার পরিণাম ভক্তি আর ভক্তির পরিণাম সর্বস্ব সমর্পণ।' বর্তমান পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনজী এজন্য প্রায়ই বলে থাকেন— ভালো ভাষণ দেওয়া বা লেখালিখি গুণবাচক হলেও সমর্পণই স্বয়ংসেবকত্বের ভিত্তি। শাখায় উপস্থিতি বা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শুধু হুইসেল ছাড়া কোনো বাহ্যিক উপকরণ বা মাধ্যম তখনও ছিল না এখনও নেই। তাহলে উপায়? মাননীয় ভাউরাওজী (ভাউরাও দেওরস - সহসরকার্যবাহ ও উত্তরপ্রদেশে সঙ্ঘকার্যের সূচনা করেছেন) বলতেন— বাণী ও ব্যবহার। ব্যক্তিকে দেখেই লোকে শাখায় আসবে। ক্রমে তা বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, ভাব (সাধনা) এবং পরিণামে রাষ্ট্রের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করবে। হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণা ও ঈশ্বরভাবনা সমার্থক। 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহম্ পৃথিব্য।' এই একাত্মতাই সঙ্ঘের রাষ্ট্র দর্শন। পণ্ডিত দীনদয়ালজী উপাধ্যায়ের ভাষায়, 'একাত্মমানবদর্শন।' 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'-দ্দ যুগানুকূল ব্যাখ্যা।

দীনদয়ালজীর কথা যখন উঠলই, তখন তাঁর সান্নিধ্যে একটা প্রসঙ্গের কথা বলি। ১৯৬৫ সালে বর্ধমানে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য গিয়েছি। তখন বিএ সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। দীনদয়ালজী সেই বর্গে এসেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে কলেজ ছাত্রদের বৈঠকে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন--- বঙ্গের তীর্থস্থানগুলির নাম কে কে বলতে পার? আমাদের অনেকেই একে একে বলতে শুরু করলেন— তারকেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, গৌড়, জল্পেশ ইত্যাদি। আমরা এক একটা নাম

NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

# NAVYUG



RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119

IS : 2494
CM/L NO. 9065679

ISO 9001:2008

## NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

বলছি। আর দীনদয়ালজী বলছেন— আর? আর? তারপরও কেউ কেউ বলল— নবদ্বীপ, গঙ্গাসাগর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী। দীনদয়ালজী এবার একটু গম্ভীর। বললেন— ঢাকেশ্বরী, যশোরের কালীবাড়ি, চট্টগ্রামের পাহাড়ে চন্দ্রনাথেশ্বর, চট্টেশ্বরী— পূর্ববঙ্গের এগুলি কি আমাদের তীর্থস্থান নয়? আমরা তো অখণ্ড ভারতের পূজারি। দেশভাগ হয়েছে বলে কি আমরা আমাদের তীর্থস্থানগুলিকে ভুলে যাব? আমরা সবাই নীরব। সবাই মাথা নীচু করে বসে আছি। অখণ্ড ভারত চেতনা জাগরণের শিক্ষা এর থেকে বেশি আর কোথায় পাওয়া যাবে?

আর একটা ঘটনার কথা পড়েছি। দুপুরে খাওয়ার পর হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য একজন স্বয়ংসেবক দীনদয়ালজীকে জল দিচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল— দীনদয়ালজী, এবারে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে জনসঙ্ঘ ক'টা আসন জিতবে? দীনদয়ালজী স্বয়ংসেবকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন— তুমি এটা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে প্রশ্ন করছ না একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে জিজ্ঞাসা করছ? স্বয়ংসেবকটি যখন বলল সে স্বয়ংসেবক হিসেবেই জিজ্ঞেস করছে, তখন দীনদয়ালজী বললেন— তাহলে সব আসনেই আমরা জিতব। আর একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে জিজ্ঞেস করলে বলব, চব্বিশ-পঁচিশটা আসনে জিতব। বস্তুত, সঙ্ঘের এটাই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ। দলের লাভ-লোকসান নয়, রাষ্ট্রহিতই লক্ষ্য।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণ কলকাতার গাঁজা পার্কে শ্রীগুরুজী যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা নিয়ে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম ছিল 'একাত্মতার আহ্বান'। শ্রীগুরুজীর এটাই শেষ পশ্চিমবঙ্গে আসা। ঁপ্রদীপদা (ঘোষ) পুস্তিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন। সঙ্ঘের যুবক স্বয়ংসেবক / প্রচারকরা সম্পর্কের জন্য এই পুস্তকটি নিয়ে বিভিন্ন পরিবারে যাবে। এজন্য সঙ্ঘের একটা সাবধানবাণী চালু আছে। বলা হয়, 'চুলা তক'। সম্পর্কের জন্য রান্নাঘর পর্যন্ত যাবে, কিন্তু চুলায় (উনুনে) ঢুকবে না। প্রচারক পরম্পরা শুরুর প্রথম দিকে এরকম একটা সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। এখনও আছে। পূজনীয় বালাসাহেবজীর মুখে এটা শুনেছি। এমনকী বিপরীত পরিস্থিতিতেও মানুষের সঙ্গে কেমন করে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তার একটা ঘটনার কথা মোরপন্তজীর মুখে শুনেছি। মোরপন্তজী একদিন ট্রেনে যাচ্ছিলেন। পাশে এক মা তার ছোট শিশুকে নিয়ে বসেছিলেন। বাচ্চাটা প্রস্রাব করে ফেললে মোরপন্তজীর জামা-কাপড়ে একটু লাগে। সেই মা তখন বাচ্চাটার গালে টোকা মেরে বলে, ভারি অসভ্য, মামার কাপড় ভিজিয়ে দিলি! ঘটনাটা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড়। সম্পর্ক স্থাপন কত সহজে করা যায়, তার উদাহরণ দিতে গিয়ে মোরপন্তজী এই ঘটনাটার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বস্তুত, রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ কয়েকজনের এক ছাদের তলায় বসবাসই পরিবার। 'সঙ্ঘ পরিবার' বলে যা বলা হয় তার ভাবনা মূলত একই। আত্মীয়তাই মুখ্য, পার্থক্য শুধু ডিগ্রির।

সঙ্ঘের চলার পথ যে কাঁটায় ভরা তা কথার কথা নয়, রূঢ় বাস্তব। সঙ্ঘস্থানকে কেন্দ্র করে দখলদারদের সঙ্গে বিবাদ, হাতাহাতি, মারামারি, সরকারি নানা ধরনের বাধাবিপত্তি, গ্রেপ্তার, কারাবাস, অপহরণ, নির্মমভাবে আঘাত, হত্যা— কী নেই? পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় সঙ্ঘকাজের জন্য যাওয়া যে চারজন ছিলেন তাঁদের একজন সুধাময় দত্ত। স্বস্তিকার একই ঘরে আমরা দুজনে থাকতাম। দীনেন দে— আমার ভগ্নীপতির (ঁদীপেন দে) সহোদর। সোনারপুরে (বৈকুণ্ঠপুর) শাখা যখন শুরু (১৯৬২) হয়, তখন ওরা দুই ভাই, সহোদর দিলীপ ও সমীর, বাপি (জয়দেব দাস) এবং কয়েকবছর পর জয়ন্ত (বর্তমান ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক) ও তার ভাই অমিত রায়চৌধুরী এবং অপূর্ব ও অমিত (মুখোপাধ্যায়) শাখায় আসতো। যেদিন চারজনের মৃত্যুর খবরটা সরকারিভাবে জানানো হয়— ফোনের ওপারে কান্নায় ভেঙে পড়া দীপেনের কণ্ঠস্বরটা এখনও শুনতে পাই। শুধু শাখা করার অপরাধে সঙ্ঘস্থানেই সুকেশের (মণ্ডল) ভাই প্রশান্তকে হত্যা করা হয়। গত একশো বছরে সারা ভারতে এমন কতজন স্বয়ংসেবক যে আত্মবলিদান দিয়েছেন, বর্তমান প্রজন্মের কতজনই-বা তা জানে?

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের স্বয়ংসেবকদের সহ্য করতে হয়েছিল শুধু উপেক্ষা আর উপহাস। আর যারা তৃতীয় প্রজন্মের স্বয়ংসেবক তাদের বেশিরভাগ সময়টাই বিরোধিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আর নেই। বাকিরা জীবনের শেষ লগ্নে। এদের কেউ কেউ হয়তো একটু আশার আলো দেখে যেতে পাচ্ছেন— এই যা। যে পশ্চিমবঙ্গে শত শত যুবক নৃশংস অত্যাচার সহ্য করেছেন, কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, আত্মবলিদান করছেন— সেই পশ্চিমবঙ্গে আবার জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' সম্পূর্ণ গাওয়া শুরু হয়েছে। হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ হচ্ছে।

জরুরি অবস্থার বিরোধিতা থেকে রামমন্দির পুনর্নির্মাণ ও ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বনিষ্ঠ সরকার গঠনে সঙ্ঘের কী ভূমিকা তা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। এর পেছনে রয়েছে 'A band of intoxicated workers'। আশির দশকে বহরমপুরে সঙ্ঘের এক প্রাদেশিক শিবিরে তৎকালীন সহ- সরকার্যবাহ যাদবরাওজী যোশী কথাটা বলেছিলেন। ১৯৬৯ সালে সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষের এক চর্চাগটে তাঁর কথা— স্বয়ংসেবকদের এই অদম্য ইচ্ছাশক্তির মূলে রয়েছে 'Divine Discontent' —দৈবিক অতৃপ্তি।

বহরমপুরে সেই আশির দশকে পরপর কয়েকটা শিবির হয়েছে। আজ যে অনুপ্রবেশ নিয়ে এত চর্চা চলছে তার সূচনাপর্ব দেখেছি এই শিবিরে। মোরপন্তজী এই সমস্যার মোকাবিলা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের করতে হবে বলে জানিয়েছিলেন। প্রচার করা হবে যতটা কাজ হয়েছে ততটাই। সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক মনমোহন রায় ও ডা: সুজিত ধরকে তখন এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী ব্যারিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। পুরনো স্বস্তিকার পাতা উলটালেই এসবের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে। বহরমপুর শিবির নিতান্ত একটা ব্যক্তিগত কারণে স্মরণীয়। সেসময় পূজনীয় বালাসাহেব দেখে বলেছিলেন, 'আঢ্যোঽভিজনবানস্মি....' (গীতা, ১৬।১৫)। এযাবৎ বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে 'আঢ্য' শব্দটি পড়েছি। কিন্তু তা এত প্রাচীন ও তার

অর্থ যে 'শ্রেষ্ঠ' তা জানতাম না।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের এই ধরনের বড়ো শিবিরের পূর্ণতা পেয়েছিল ১৯৯২ সালের ২৪-২৬ জানুয়ারি মাসে কল্যাণী শিবিরে। পশ্চিবঙ্গের স্বয়ংসেবকরাও পারে— এই আত্মবিশ্বাসের সূচনা। আঠারো হাজার পূর্ণ গণবেশধারী স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিল সেই শিবিরে। হ্যাঁ, এটা ঠিকই, সঙ্ঘের শাখায় আসতে অভ্যস্ত এমন স্বয়ংসেবক সবাই নয়। সেই শিবিরে যে পথসঞ্চলন হয়েছিল তা দেখে বালাসাহেব হেসে বলেছিলেন, যেন 'বরাত' (বরযাত্রী) যাচ্ছে।

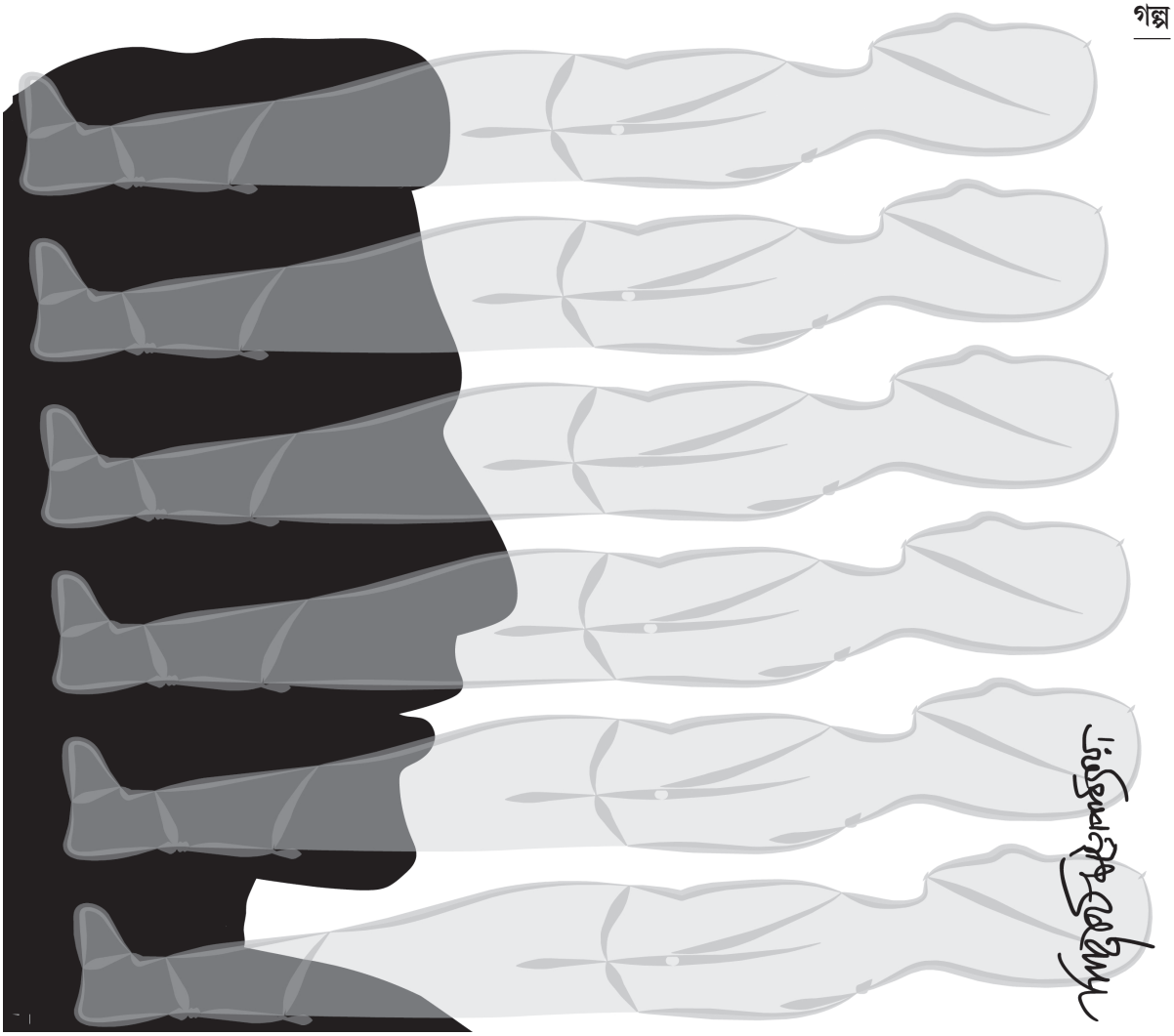
হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করাই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য— এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডা: হেডগেওয়ার থেকে বর্তমান সরসঙ্ঘচালক পর্যন্ত একথা বলে চলেছেন। 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব'— এই রাষ্ট্রীয়তার ধারণা ভৌগোলিক নয়, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক। চিন্তাবিদ চন্দ্রনাথ বসু 'হিন্দুত্ব' শব্দটি তাঁর প্রণীত গ্রন্থের (১৮৯২) শিরোনাম হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর ভাষায়— 'সোঽহং— সেই আমি— এই কথা কহে বলিয়া হিন্দু হিন্দু— এই কথাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব'। সঙ্ঘ তাই অনুভবের বিষয়, পুকুরে ডুব না দিলে যেমন তার গভীরতা বোঝা যায় না, সঙ্ঘের শাখার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলে সঙ্ঘকে জানা-বোঝা সম্ভব নয়। আর তা না হলে সেটা হবে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো। উপেক্ষা, উপহাস, বিরোধিতার পর আজ সমাজ সঙ্ঘকে গ্রহণ করেছে। সঙ্ঘের এই যে ক্রমবিকাশ তা বহু স্বয়ংসেবকের সাধনার ফল। অথচ বলা হয়— সঙ্ঘের কোনো মুখ নেই। কথাটা যে নেহাত মিথ্যে নয়, তার একটা উদাহরণ নব্বইয়ের দশকে সুদর্শনজী যখন সহ-সরকার্যবাহ তখন শ্রীমানী মার্কেট স্টপেজ থেকে হাফপ্যান্ট পরিহিত তাঁকে চেতলাগামী ১৭ নম্বর বাসে উঠিয়ে দিয়েছি। এটা এক-দুবার নয়, বেশ কয়েকবারই। তাঁকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা, চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়েছেন। আদি শঙ্করাচার্য ভাগ্যবান মানুষের যে তিনটি লক্ষণের কথা বলে গেছেন তার একটি হলো 'মহাপুরুষসংশ্রয়'। স্বয়ংসেবকরা সেই ভাগ্যে সৌভাগ্যবান।

তখন ক্লাস ফোর-এ পড়ি। কলকাতায় দর্জিপাড়া শাখায় (ফোয়ারাবাগান) বাচ্চুদা মাঝেমাঝেই শিশুগণের সঙ্গে খেলতে পাঠিয়ে দিতেন। সেটা ১৯৫৬-৫৭ সাল হবে। শুনেছি, সঙ্ঘ এক নলওয়ালা চৌবাচ্চা। জল ঢোকে, কিন্তু বেরোতে পারে না। বাস্তবেও তাই হয়েছে। বয়স আশির কোটায় হলেও মাননীয় কেশবজীর কথা মনে পড়ে। একজন স্বয়ংসেবক বিস্তারক হিসেবে যাবে। ক'দিন কেশব ভবনে আছে। কেশবজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করতে এসেছ? সে বলল, বিস্তারক হিসেবে যাব, তাই সঙ্ঘ বুঝতে কয়েকদিন কেশব ভবনে থাকতে বলা হয়েছে। কেশবজী জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্ঘ বুঝেছ? স্বয়ংসেবকটি কী উত্তর দেবে তা ভাবতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেশবজী বললেন, পারবে না। বলতে পারবে না। আমিও পারিনি। বস্তুত, আমরাও কি পেরেছি? দিগন্তরেখার দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া যাক না কেন, দিগন্তরেখা যেমন একই রকম দূরে থাকে— সঙ্ঘও তাই। আসলে সঙ্ঘ হচ্ছে সমগ্র হিন্দু সমাজকে সংগঠনের সাধনা। একাত্মতার সাধনা। আনন্দে থাকার সাধনা। □

*With Best Compliments from-*

**KOHINOOR INDIA (P) LIMITED**

Basti Bawa Khel, Kapurthala Road,
Jalandhar - 21 (Pb.) India
Phone : (O) 3050052, 3050057, 3050066
Fax : +91-181-3050014
E-mail : nipun@kohinooronline.com
Web : www.kohinooronline.com



# মৃত্যুর প্যাকেট

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

রাত ক'টা হলো? মোবাইল ফোন থেকে টাইম দেখল তপন। প্রায় একটা চল্লিশ। শ্মশানে একটা চায়ের দোকান আড়মোড়া ভেঙে খুলছে। ঘুমচোখে কাপে চামচ ঘোরাচ্ছে দোকানদার। চারদিক নিঝুম। সোদপুরের এই শ্মশানটা বড় সুন্দর আর পরিষ্কার। এখানে বাঁক নেওয়া গঙ্গার চেহারাও পরিচ্ছন্ন। গভীর রাতে মাঝগঙ্গায় এসে পড়েছে ওপারের ফ্যাক্টরি শেডের আলো। প্রায় নিস্তরঙ্গ অন্ধকার মাখানো নদীতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সেই লাইট। বাতাসে একটা শিরশিরে কাঁপুনি। পুরনো শ্মশানের ভাঙা দেওয়ালে গায়ের জোরে বেড়ে ওঠা অশ্বত্থগাছ বহু যুগের জলহাওয়ায় তাগড়াই হয়ে উঠেছে। হাল্কা হাওয়ায় মাঝে মাঝে দুলে উঠছে পাতাগুলো।

মনীশ ডাক্তারবাবুকে আজ সকালেই নার্সিং হোমে ভর্তি করেছিল বাড়ির লোক। অনেক দিনের ক্যানসার পেশেন্ট। তা বারো বছর তো হবেই। ভালোই ছিলেন, হঠাৎ কী যে হলো! এক ঝটকায় চিকিৎসার ওপারে চলে গেলেন। সকালে ভর্তি। দুপুরে কোনোমতে বেড থেকে তুলে ভেন্টিলেশন। রাত আটটার মধ্যে বেরিয়ে গেল প্রাণবায়ু। মানুষের বেঁচে থাকাটা

দিনে দিনে কী যে অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে! কাচের গাড়ি হাজির হতে রাত প্রায় এগারোটা। তারপর কান্নাকাটি, ফুল-মালা, বাড়ির সামনে একপ্রস্ত ঘুরিয়ে আনা, পাড়াপড়শিদের দীর্ঘশ্বাস।

এক মহিলা বললেন, ডাক্তারবাবু গেলেন চেক আপে, ফিরে এলেন ডেডবডি হয়ে। হায়রে মানুষ! ভিড়ের পেছন থেকে কে যেন বলল, বড্ড ভালোমানুষ ছিলেন আমাদের ডাক্তারবাবু। শরীরে এত দরদ।

শ্মশানটা যতই ছিমছাম হোক, শোনা যায় রাতের দিকে নিশির ডাকের মতো কী যেন একটা হয়। কেউ একা থাকলে তাকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে চিকচিকে কালো জলের গঙ্গা। বদনাম আছে এই শ্মশানের। সম্ভবত সেই কারণেই সন্ধে গড়িয়ে গেলে এখানে আর বিশেষ 'বডি' ঢোকে না। রাত বারোটা পঞ্চাশে চারটে গাড়ির সঙ্গে কাচের গাড়িটা যখন শ্মশানে ঢুকল, চারদিক একেবারে শুনশান। ডাক্তারবাবুর দেহ নামানো হলো এক নম্বর চুল্লির সামনের বেদিটায়। অনেক ডাকাডাকির পর ঘাট রেজিস্ট্রার ঘুম থেকে উঠলেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় সামনের দরজাটা খুলে দিলেন। তারপর কুলুঙ্গি-মার্কা জানলার সামনে খাতা নিয়ে বসলেন। কোত্থেকে আসছেন? কী হয়েছিল? ডেথ সার্টিফিকেটটা বের করুন ইত্যাকার বাঁধা গতের কথাবার্তা। তবে হ্যাঁ, রেজিস্ট্রারবাবুর হাতের লেখাটি বড় সুন্দর। যদিও লেখালেখি শেষ হওয়ার আগে একবারও বলেননি এক নম্বর চুল্লিটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। বললেন সবশেষে, পেমেন্টটেমেন্ট চুকিয়ে নিয়ে খাতা বন্ধ করে। আপনারা এক কাজ করুন। বডি নিয়ে সামনের রাস্তা ধরে সোজা ওপাশের চুল্লিতে চলে যান। এদিকেরটা কাল বিকেল থেকে দেহ রেখেছে।

— সে কী, এতক্ষণ বলেননি তো! বডি নিয়ে ফের এতখানি ঘুরে যেতে হবে? এ তো আচ্ছা জ্বালাতন!

— মনে ছিল না। কী করা যাবে? আপনারা তো দেখছি অনেকে আছেন। হয়ে যাবে, ঘাবড়াবেন না।

কাচের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে অগত্যা সবাইকে কাঁধ দিতেই হলো। ডাক্তারবাবু দীর্ঘদিনের ক্যান্সার পেশেন্ট হলেও শরীরটা সেই অনুপাতে ভাঙেনি। ওজনও বেশ ভালোই। এক নম্বর চুল্লির সামনের বেদি থেকে বডি তুলে নিয়ে, বেশ কয়েক বার ওঠানামা করে একটা দেওয়ালের ফাঁক গলে শ্মশান চত্বরের বারে গিয়ে পড়তে হয়। তারপর হরিধ্বনি দিতে দিতে ওধারের ক্যাম্পাসে ঢুকে, আট-দশটা সিঁড়ি ভেঙে দু নম্বর চুল্লি। বডি নামিয়ে সবাই দম নিচ্ছিল। তখনই পাশে একটা গেট খুলে বেরিয়ে এল সুদর্শন একটি ছেলে। চেহারা সুন্দর তো বটেই, পরনের পোশাকআশাকও বেশ দুরস্ত। এই এলাকার পুরনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট তপনের দিকে এগিয়ে এসে বলল, ও, আপনারাই পার্টি? ফোন পেলাম আধঘণ্টা আগে। সাইকেল বার করতে যেটুকু টাইম লাগে। পুরুতমশাইয়ের কাজ এখনও তো হয়নি দেখছি। সেরে নিন। দাঁড়ান, আমি ডেকে দিচ্ছি। এখানে চায়ের দোকান দুটো আছে। একটা রাতে খোলে। ভিড় বেশি হলে দু'নম্বরও খোলে। তবে তেমন দরকার হয় না। বডি চুল্লিতে ঢুকে গেলে আপনারা দোকানের রকে গিয়ে বসে পড়বেন। তাহলে পাতাখোরগুলো আর সুবিধা করতে পারবে না। ওদের পয়সা দেবেন না খবরদার। তপন আর ডাক্তারবাবুর ছেলে অরুণাংশু জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এখানে কাজ করেন?

হ্যাঁ, আমি লাশ পোড়াই। সারাবছর নাইট ডিউটি করি। দিনের বেলা অন্য লোক, রাতে আমি। টেনশন নেবেন না, সব কাজ সুষ্ঠুমতো হয়ে যাবে। ওয়েট করুন, যাব আর আসব।

আপনার নাম কী ভাই?

সজ্জন সিংহ। পাঞ্জাবি। তবে পাঞ্জাবে কোনদিন যাইনি। কলকাতারই ছেলে।

মিনিট দশেকের মধ্যে পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল সজ্জন। নিন, আপনারা শুরু করে দিন। আমি ওদিকটা গুছিয়ে রাখছি। রাত দুটো বাজে। আর দেরি করা যাবে না।

দক্ষ পুরোহিত বেশি সময় নিলেন না। গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছিল ঘট ভরে। প্রয়াত ডাক্তারবাবুর ছেলে অরুণাংশু ডেডবডির বেদির পাশে ছেতড়ে বসে পড়েছিল। চোখ দুটো টকটকে লাল। পুরুত মশায়ের মন্ত্র পড়া শেষ। এবার শুরু হলো মৃত মানুষটিকে প্রদক্ষিণ করে মুখাগ্নি-পর্ব। ডেড বডিকে ফোকাসে রেখে পুরো অনুষ্ঠানটি ভিডিও বন্দি করছিলেন মনীশ ডাক্তারবাবুর শ্যালক, এলাকার আর এক পরিচিত ডাক্তার অমলকান্তি রায়, সব কাজ সেরে তারপর সবাই মিলে বলহরি—হরিবোল। সজ্জন ততক্ষণে চুল্লি রেডি করে ফেলেছে। বাখারির শয্যায় শায়িত মনীশ ডাক্তারবাবুর দেহটা টানতে টানতে চুল্লির সামনের রেলে এনে ফেলা। চোদ্দ-পনেরোটা মানুষের নড়াচড়া আর হরিধ্বনির কোলাহলের মধ্যেই কখন যেন ধিকিধিকি আগুনের গ্রাসে ঢুকে গেলেন মনীশ ডাক্তার।

এবার কিছুক্ষণের অখণ্ড অবসর। অন্তত পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট। শ্মশান যাত্রীদের হাঁটাচলায় অসীম ক্লান্তি আর রাতজাগা আলস্য। এক নম্বর চুল্লির গা ঘেঁষে একটা পায়ে চলার রাস্তা ঢালু হয়ে গঙ্গার দিকে নেমে গেছে। তার ডানদিকে সাবেক শ্মশান। যেখানে আবহমান কাল কাঠে পোড়ানো হতো মৃতদেহ। এখনও অবাঙ্গালি কোনও বডি এলে কাঠের সন্ধানে এখানে আসে তার বন্ধুরা। সামনের নিশীথ নদীতে কালো পোঁচ দিয়ে গেছে কারা যেন। মাঝগঙ্গায় চিকচিকে আলোয় জোয়ারের টান। সজ্জন নিজের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখে কখন যেন ঢাল বেয়ে নদীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। গঙ্গা থেকে জল তুলে নিজের মাথায় ছেটাল। তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কাদাটে ঢাল বেয়ে একেবারে ওপরে। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকজন। এসেছে তিন গাড়ির তিনজন ড্রাইভার, ডাক্তার অমলকান্তির অ্যাসিস্ট্যান্ট তারাদাসবাবু, মৃত মনীশ ডাক্তারের দু'তিনজন প্রতিবেশী— এমনই আরও কেউ কেউ। সজ্জনকে দেখে অনেকেরই কৌতূহল হচ্ছিল। ছেলেটার

হাবভাব চালচলন কোনোকিছুই শ্মশানের ডোমের মতো নয়। বরং মনে হয় সওদাগরি অফিসের জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হলে মানাত ভালো। তপন হাঁক দিলো—সজ্জন, এদিকে একবার এসো তো, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি। চা খাবে এক কাপ?

— না না, চা আমি খাই না রাতের বেলা। শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

— আমরা আসছি ব্যারাকপুর থেকে। যিনি মারা গেছেন, তিনি একজন ডাক্তারবাবু। ক্যানসার হয়েছিল।

— তাই নাকি? উনি ডাক্তারবাবু ? ডাক্তারবাবুরা মারা গেলে কীরকম যেন লাগে। ওঁরাই মানুষকে বাঁচান কি না।

— আচ্ছা সজ্জন, তুমি কি এই শ্মশানের পারমানেন্ট স্টাফ? আছো কতদিন?

— আরে না না, পারমেন্ট-টারমেন্ট নয়। ক্যাজুয়াল করি। সবটাই রাত্তিরবেলা। দিনের লোকেদের সঙ্গে দেখাই হয় না।

— তুমি এখানে থাকো কোথায়? দিনের বেলায় কী করো? অন্য কোনও কাজ?

— কী আর করব। খাই দাই ঘুমাই। পাড়ার পার্টি অফিসে বসে থাকি। মাঝে মাঝে দালালির কাজ জুটে যায় দুয়েকটা।

— তা কতদিন এখানে কাজ করছ সজ্জন?

— পনেরো-ষোলো বছর হবে। ক্যাজুয়াল কাজ। ইচ্ছে করলে বহুদিন আগেই বড়ো শ্মশানে কাজ নিতে পারতাম। কিন্তু এখানেই আমার সুবিধা। বাসাটা কাছে। বউ-বাচ্চা আছে, মা-বাবা আছে, পুষিয়ে যায়।

অনেকগুলো কথা একটানা বলে একটু দম নিল সজ্জন। কী যেন ভেবে নিল নিজের মনে। তারপর বলল—স্যার, একটা কথা। আপনারা কিন্তু ভাববেন না রাতে কাজ করি বলে পার্টির কাছ থেকে জোর করে পয়সা আদায় করি। ক্যাজুয়াল হলেও সরকারি কাজ, টাকাপয়সা এরা মন্দ দেয় না।

চলে তো যাচ্ছে স্যার। কী বলেন? ভাববেন না। জবরদস্তি আমি করি না। ঘটে করে গঙ্গার জল এনে দেব। সেই জল দিয়ে নাই-কুণ্ডলি ঠাণ্ডা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন। কোনও অসুবিধা নাই। তারপর যা ভালো লাগে, দেবেন।

— আচ্ছা সজ্জন, এই কাজ করতে তোমার ভালো লাগে? রোজ রোজ কত রকমের ডেড বডি আসে। কান্নাকাটি, চ্যাঁচামেচি, হরিধ্বনি, ভালো লাগে এইসব?

—ভালো লাগালাগির কী আছে স্যার, এটা আমার কাজ, সেইভাবে দেখি। পাবলিককে হেল্প করি। মাঝেমাঝে কিছু পার্টি আসে, বহুত হুজ্জতি করে। তখন মনে হয় দুত্তোর ছেড়ে দিই এইসব কাজ। আসলে গরিব ঘরের ছেলে তো, কাজ ছাড়লে খাব কী? ও স্যার, দাঁড়ান দাঁড়ান, চুল্লিতে আজ একটু গড়বড় হয়েছে, হিট ঠিকমত হচ্ছে না। একটু দেখে আসি।

কথা বলতে বলতে থমকে গিয়ে আড়চোখে একবার তপনকে দেখে নিল সজ্জন। চলে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একে কি ভালোভাবে চলে যাওয়া বলে? রাতের পর রাত মরা মানুষ নিয়ে টানাটানি। কখনও ঠায় বসে থাকা, কখনও থইথই বর্ষায় চুল্লি থেকে গরম হাতা দিয়ে টেনে টেনে সদ্য চলে যাওয়া মানুষের চিতাভস্ম পাত্রবন্দি করা। টাকাপয়সা চাইতে হয় না বিশেষ। সরকারের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার পর শ্মশানযাত্রীরা নিজেরাই বুদ্ধিমতো সজ্জনকে কয়েকশো টাকা দিয়ে যায়। গবগবিয়ে ধোঁয়া ওঠা ভস্মাধারে শ্মশানযাত্রীদের দিয়ে মাটির কলসি থেকে গঙ্গাজল ঢালা, তারপর সেই চিতাভস্ম বুকজলে নেমে ভাসিয়ে দেওয়া, মাঝগঙ্গার দিকে টিপ করে নাই—কুণ্ডলি ছুঁড়ে দেওয়া— একেবারে বাঁধা গতের কাজ।

সজ্জন চলে যেতেই তপন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কে কী করছে। ডাক্তার অমলকান্তি প্রথম থেকেই মৃতদেহের ছবি তোলায় ব্যস্ত ছিলেন। মনীশ ডাক্তারবাবুর দেহ ঘিরে যতক্ষণ আচার-অনুষ্ঠান চলছিল, একমনে তিনি সে সব ভিডিয়ো করছিলেন। আর এখন, গভীর রাতের নদীর সামনে দাঁড়িয়ে নানা অ্যাঙ্গেলে ছবিই তুলে যাচ্ছেন। তপন ডাক্তারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, ছেলেটাকে দেখেছেন অমলদা। কেমন যেন অন্যরকম। শ্মশানের ডোম বলে ঠিক বিশ্বাস হয় না।

— হ্যাঁ, তাই দেখছি। আমার মনে হয় ও কিছু একটা পাবে বলে এখানে পড়ে রয়েছে।

— কিছু একটা বলতে? কী পেতে চায় ও?

— সেটাই তো প্রশ্ন। দেখা যাক কী বলে ফিরে এসে।

প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে সজ্জন ফিরে এল গঙ্গার ধারে। বলল, চুল্লির চাতালের কাছে অস্থি রেখেছি। আপনারা যাঁরা জল দিতে চান, এই ঢালু পথ দিয়ে নদীতে চলে যান। আর ডাক্তারবাবু স্যার, সব হয়ে গেলে একটু টাইম দেবেন। কথা আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সব মিটে গেল। চারপাশে কেমন একটা রিক্ততা। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার। খানিক আগে যে মানুষটাকে যত্ন করে কপালে চন্দন পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সর্বাঙ্গে নামাবলী জড়িয়ে পাটভাঙ্গা ধুতি-চাদর পরে যে শুয়েছিল সকলের মাঝে, চুল্লিতে ঢুকতে না ঢুকতেই সে হয়ে যায় আগুনের খাদ্য, অবশেষে পরিত্যক্ত অঙ্গার। দু' নম্বর চুল্লির বাইরের চাতালে এক কোণ ঘেঁষে চিতাভস্মের পাত্রটা রাখা ছিল। সবাই একে একে গিয়ে জল দিচ্ছে। প্রতিবার জল পড়ার সাথে সাথেই ধোঁয়া উঠছে ভুস ভুস করে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই দেখা যাচ্ছে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার চিকচিকে কালো জল। এক রহস্যময় অনন্ত প্রবাহ। নিশুতি রাতে যে রহস্য আরও বেড়ে গিয়ে জেগে থাকা মানুষজনকে আক্রান্ত করে। ঘণ্টা দুয়েক ধরে অমলকান্তি প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো মৃতদেহের ছবি তুলে যাচ্ছিলেন। সজ্জন ডাক্তারবাবুর কাছে এসে বলল, স্যার ডেডবডি তো আর নেই। এখনও ছবি তুলছেন কেন? চোখ থেকে ক্যামেরাটা সরিয়ে বিষণ্ণ হাসলেন অমলকান্তি— অনেক ছবি তুলছি, না? এবার থামব।

আসলে জামাইবাবু যে আমার বন্ধু ছিলেন। উনি চলে যাচ্ছেন, কী করি বলো? ডাক্তারি করছি এত বছর। তবু জীবনমৃত্যুর তফাতটা আজও মানতে পারি না। সজ্জন, এটা রাখো। বলে পকেটে হাত দিয়ে সজ্জনের দিকে এগিয়ে গেলেন অমলকান্তি। পাঁচশো টাকার দুটো নোট।

এ কী, এত দিচ্ছেন কেন? সজ্জন প্রতিবাদ করল। আপনাদের এখন অনেক খরচ। একটা পাঁচশো বাঁ পকেটে ঢুকিয়ে বাকিটা বাড়িয়ে দিল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার ফেরত নিলেন না। সজ্জনের হাতটা ঠেলে দিয়ে বললেন— কী বলবে বলছিলে, সেটাই বলো।

স্যার, আমাকে একটা কাজ দেবেন? আপনার তো অনেক কানেকশন। সারা জীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকব স্যার। আমার জীবনটাই পাল্টে যাবে।

—জীবন পাল্টে যাবে? এমন মনে হচ্ছে তোমার? কী কাজ, বলো?

—স্যার, শুকনো লাশের প্যাকেট। দুশো ছয়খানা হাড়। মানে গোটা একটা কঙ্কাল। একটাও কম হলে চলবে না।

অমলকান্তি হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ সজ্জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

— তুমি ঠিক কী বলছ বুঝতে পারছি না। ওই প্যাকেট দিয়ে কী হয়? কারা এ সব করে?

— স্যার, কিছু মনে করবেন না। আপনারা যখন ডাক্তারি পড়তেন, তখন বোধহয় এ সব ছিল না।

এখনকার বাবা-মায়েরা ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে গিয়ে জান কবুল করে দেয়। একটা প্যাকেট মানে তিরিশ হাজার টাকা। হ্যাঁ স্যার, কড়কড়ে তিরিশ হাজার। শ্মশানের ডোমেরা এ সবের নাগাল পায় না।। পায় মর্গের ডোমেরা। ওরা বাইরের লোককে ভিড়তেই দেয় না।

— কিন্তু এ সব তো বেআইনি কাজ। পুলিশ ধরবে, জেল হবে। এ তো বডি পাচার!

— স্যার, সেই জন্যেই তো আপনাকে বলছি। আপনাদের তো স্যার, অনেক লম্বা হাত। অমলকান্তি হাঁটতে শুরু করলেন। তারপর হাঁটা থামিয়ে পকেট থেকে বার করলেন অনেকগুলো পাঁচশো টাকার নোট।

— সজ্জন, এটা রাখো। না বোলো না। জামাইবাবুর সৎকারের কাজে আমরা সকলেই খুশি হয়েছি। কিন্তু মনে রেখো সজ্জন, জামাইবাবু শুধু আমার আত্মীয় নন, আমার খুব বড়ো বন্ধু ছিলেন। বন্ধু কখনও লাশ হয় না। আমার কাছে চিকিৎসা করতে এসে অনেকেই মারা গেছেন, ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হয়েছে, আমি কিন্তু কোনোদিন তাঁদের লাশ ভাবিনি। যিনি এতদিন আমারই কাছেপিঠে কোথাও ছিলেন, আমার চেম্বারে আসতেন, গল্প করতেন, বাজারেও দেখা হতো, তিনি তো আমারই আপনজন।

কাছে পিঠেই কোথাও আছেন এখনও। সজ্জন, একটা কথা বলি শোনো, মানুষ কিন্তু মানুষই থাকে, লাশ হয় না। তুমি জীবনে আরও অনেক ভালো সুযোগ পাবে। কিন্তু এই নোংরা লাইনে ঢুকো না। আমার অনুরোধটা রেখো, তোমার ভালো হবে।

—স্যার, স্যার একটা কথা। আমি অনেকদিন ধরে ওয়েট করছি, ঠিকঠাক লোক খোঁজার চেষ্টা করছি। পাইনি স্যার, কাউকে পাইনি। কিন্তু আপনাকে দেখেই বুঝেছি, ঠিক মানুষটা এসে গেছেন। যদি একটু দেখেন স্যার, আমার জীবনটাই ঘুরে যাবে। আপনি একটু দয়া করলে কাজটা হয়ে যাবে স্যার, হবেই হবে।

অমলকান্তিরা গাড়িতে উঠলেন। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। একে একে বেরিয়ে গেল চারটে গাড়ি। হাত নাড়লেন অমলকান্তি, কোনও কথা বললেন না। চায়ের দোকানে গ্যাসের উনুনে শোঁ-শোঁ শব্দ। দুটো কুকুর ছেঁড়া পাঁউরুটির টুকরো টানাটানি করছে। দোকানের রকে বসছিল সজ্জন, অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে অবসন্ন পায়ে এগিয়ে গেল চিতাভস্মের দিকে। সকলে হাতে হাতে জল দেওয়ার পরেও ভস্মাধার থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছিল। ছাই আর জলে মাখামাখি পাত্রটা হাতে নিয়ে ঢালু রাস্তা বেয়ে গঙ্গার দিকে নেমে গেল সজ্জন। এমন সময়ে আবার গাড়ির আওয়াজ। আর একটা পার্টি ঢুকছে। ছোটো ম্যাটাডোরে চাপিয়ে লাশ নিয়ে আসছে অন্য এক দল। পুরো দেহটা ব্যান্ডেজে মোড়া।

অ্যাকসিডেন্ট কেস।

পুবের আকাশ লাল হয়ে আসছে। হু হু হাওয়া। হাতে এখনও অনেক কাজ। গোটা একটা বডি পোড়াতে হবে। নাভি-কুণ্ডলি খুঁজে বার করতে হবে।

বড্ড ক্লান্ত লাগছে। বাড়ি ফিরতে হবে। একটু ঘুমোতে পারলে ভালো হয়। নদীর দিকে আরও তাড়াতাড়ি পা চালাল সজ্জন। □


*With Best Compliments from-*

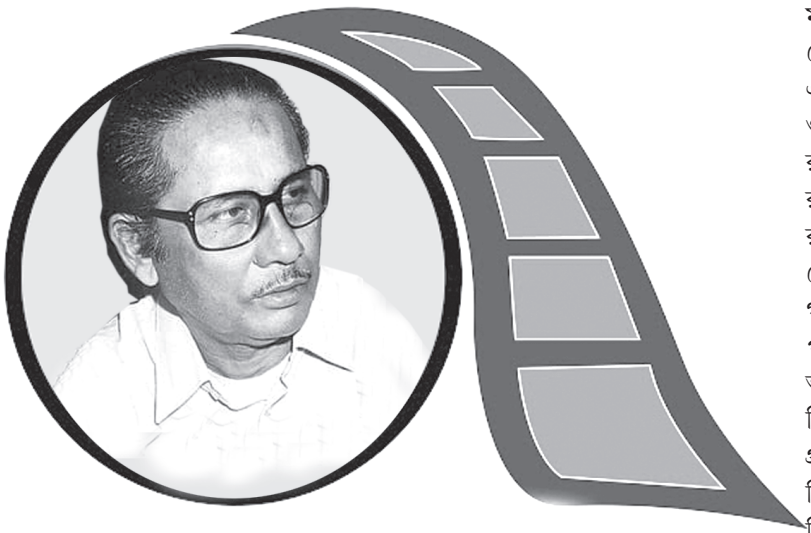
**Laghu Udyog Bharati**

***All India Organisation in the Service of small scale industries***

**ADVOCATE ARVIND DHUMAL**

*All India Vice President*
*Co-ordinator Punjab, Chandigarh, J/K & Laddakh*





# বলয়গ্রাসে রাজেন তরফদার

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋত্বিক ঘটক তাঁর চলচ্চিত্রীয় জীবনকালে সাকুল্যে ৯টি ছবি পরিচালনা করেছেন। আজ ভারতীয় তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের পরিসরে তাঁর একটি অনুপেক্ষণীয় উপস্থিতি বিদ্যমান। তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ছিল অবিভক্ত বঙ্গের মাঠ-ঘাট, নদ-নদী ও মানুষজনকে ঘিরে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ 'মেঘে ঢাকা তারা'র নাম সর্বাধিক আলোচনায় আসে। তাঁর ছবিটির ছায়ায় আবার একটি মেঘে ঢাকা তারা প্রায় তাঁর জীবনানুগ ভাষ্য হিসেবে নির্মাণ হয়েছে। প্রসঙ্গত, বহু চলচ্চিত্রই মানুষের অপরিমেয় আকর্ষণ, তার বিষয়বস্তু ও নির্মাণ কুশলতায় একটি সময়কালের পর পুনর্নির্মিত হয়েছে। এমনকী তারা দেশের বিভিন্ন ভাষার গণ্ডিকেও অনায়াসে অতিক্রম করেছে। দেবদাস, পরিণীতা ইত্যাদি বহু উদাহরণ আছে। কিন্তু এখানে বিষয়বস্তু ছবিটির আদিকাণ্ড অর্থাৎ কাহিনির অপ্রতিরোধ্যতাগুলি। ঋত্বিকবাবুর ক্ষেত্রে সদ্য একটি নাটক 'মেঘে ঢাকা ঋত্বিক'ও মঞ্চস্থ হয়ে গেল। তাঁকে নিয়ে যথাযথ কারণেই কৌতূহল, চর্চা সীমাহীন যা তিনি ৫০ বছরের এলোমেলো জীবনকালে কোনোদিনই পাননি। ওই একই সময়ে ১৯১৭ সালে পূর্ববঙ্গের রাজশাহীতে জন্মেছিলেন আর একজন বাঙ্গালি রাজেন তরফদার। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন অবধি রাজশাহীতেই পড়াশোনা করেন। তারপর দেশভাগের আগেই কলকাতায় এসে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস থেকে ডিগ্রি পান পপুলার আর্টস-এর। সেই সব দিনকাল আজকের মতো ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গেই সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞাপন সংস্থায় De Walter Thomson গ্রাফিক ডিজাইনারের চাকরি পান। যেমন জি.ডি ফিমার কোম্পানিতে প্রায় একই ধরনের পেশায় ছিলেন সত্যজিৎ রায়।

চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনার বিষয়টিকে একটু বিশ্লিষ্টভাবে দেখলে পরিষ্কার হয় বহু প্রতিভাবান মানুষই নিরাপদ জীবনযাত্রায় থিতু হওয়ার নিরাপত্তাকে পরিত্যাগ করে 'মারের সাগর পাড়ি দেব গো' বলে চিত্র নির্মাণের তরঙ্গসঙ্কুল পথ ধরেছেন। সকলেই জানেন Performing Arts-এর এই ধারাটি সর্বাপেক্ষা কঠিন, বিশেষ করে যদি পরিচালক চিন্তাশীলতার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে দীর্ঘস্থায়ী কোনো অভিঘাত দর্শক চিত্তে রেখে যেতে চান বা আরও সহজ কথায়—মানুষ ও সমাজের স্মৃতিবন্দি হয়ে থাকার ইচ্ছায় প্রেরিত হন। রাজেনবাবু আর্ট কলেজে পড়ার সূত্রে অসাধারণ স্কেচ করতেন। সেই দক্ষতা ব্যবহার করে তিনি কাটিয়ে দিতে পারতেন। ৫০-এর দশকের নিম টুথপেস্ট ও নিমসাবানের

বিজ্ঞাপন তাঁরই হাতের। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণ তো বই লেখা, ছবি আঁকার বা অন্য শিল্পচর্চার মতো একার চেষ্টায় হয় না। এ-এক যূথবদ্ধ জটিল পথ। প্রথমত, গল্প নির্বাচন, তার চিত্রনাট্য নির্মাণ। এই দু'টি কাজ অনেক সময় পরিচালক নিজেই সম্পাদন করতে পারেন। এরপর সঙ্গীত, আবহ সঙ্গীত, অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন, আলোকচিত্রী, স্টুডিয়ো ভাড়া, ছবির সম্পাদনা এগুলির খরচ মেটাতে প্রযোজক লাগে এবং তার অনুসন্ধান এবং সর্বোপরি ছবি সমাপ্ত হলে সেটি কোন কোন প্রেক্ষাগৃহগুলিতে (এসব ৬০–৭০ দশকের Mall হীন সময়ের কথা) মুক্তি পেয়ে দর্শক আশীর্বাদ পাবে তার অনুসন্ধান। সমগ্র ইউনিটকে সফলভাবে একাঙ্গী করা দুরূহ কাজ। কিন্তু রাজেনবাবু ১৯৫৭ সালের আগেই চাকরিবাকরি ছেড়ে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রীয় আত্মপ্রকাশ ঘটালেন 'অন্তরীক্ষ' ছবি দিয়ে। ছবিটির কাহিনি অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী ও পরিচালক রাজেনবাবু। আশ্চর্য যে, এই ছবিটিতে অত্যন্ত জটিল কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্মম গ্রামীণ বঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতিকে সটান পর্দায় তুলে এনেছিলেন পরিচালক। প্রথম ছবিতেই তিনি সমালোচকদের সম্ভ্রম আদায়ে সক্ষম হন। তৎকালীন গ্রামীণ বাঙ্গালির সামাজিক জীবনে জমিদার ও সাধারণ শ্রেণী তুমুল বিভাজন বিদ্যমান। এই ছবিতে 'গৌরীদান' প্রথার কথা রয়েছে। তা যেমন করে একটি সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত নারীর ছাপোষা জীবনকে ছারখার করে দিচ্ছে তার মর্মান্তিক দৃশ্যপটগুলি আবেগের তীব্রতায় ও আলোছায়ার কারুকাজে মানুষের মনে ওলট পালট ঘটিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে উঠে এসেছিল গ্রাম-বাঙ্গলার প্রাণবন্ত হোলিখেলায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের একেবারে মাটির গন্ধনিঃসৃত উৎসব উদ্‌যাপন যা খুব বেশি চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি। এখানেই তরুণীটিকে সামান্য ফাগ ছোঁয়ানো ও তার লজ্জাবনত দৃষ্টিতে বেশ বোঝা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়ে বাঙ্গালিয়ানার একটি প্রায় তথ্যচিত্রের মতো ডিটেল যাকে বলে নিবিড় পর্যবেক্ষণ। ১৯৫৭ সালে প্রখ্যাত অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়কে তিনি 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে প্রথম সুযোগ দেন।

রাজেন তরফদারের চলচ্চিত্রজীবনে বরাবরের দায়বদ্ধতা ও আকর্ষণ ছিল জন্মভূমির নদীমাতৃক প্রকৃতির ওপর। স্থলভাগের সমাজ ও উপকূল নির্ভর সম্প্রদায় উভয়ের উপরেই এই ব্যবস্থার প্রভাব কখনও সমন্বয়কারী কখনও দ্বন্দ্বাত্মক।

তাঁর নদীনির্ভর তিনটি ছবি (১) গঙ্গা (১৯৬০), (২) পালঙ্ক (১৯৭৫) ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনা। (৩) নাগপাশ (১৯৮৭) পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রযোজিত ছবিগুলি তৈরি হয়েছিল বিপদসঙ্কুল গোসাবা ও সুন্দরবন অঞ্চলে। বিপুল ঝুঁকিপূর্ণ ক্রেনের ওপর থেকে নেওয়া সট সেই অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ক্যামেরাকে স্থির রাখা অত্যন্ত কঠিন (পরিচালক গৌতম ঘোষ)। গঙ্গা ছবির ফোটোগ্রাফার প্রখ্যাত দীনেন গুপ্তর দক্ষিণেশ্বর সেতু থেকে গঙ্গায় পড়ে গিয়ে প্রায় প্রাণসংশয় হবার উপক্রম হয়েছিল। এখানেই ছিল বাংলা ছায়াছবির সেই ঐতিহাসিক গানটি নির্মলেন্দু চৌধুরীর 'আমায় ডুবাইলি রে আমায় ভাসাইলি রে অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাইরে'। গানটির তীব্র আবেদন ও মধুরতা মানুষকে চিরকালীন ভাবেই ভাসিয়ে দিয়েছিল। সদ্য ইউটিউবে দেখলাম টাকার অঙ্কে একেবারে দিকপাল সব বহুমূল্য তারকারা শ্রেয়া ঘোষালের লাস্যময় দেহ প্রদর্শনকে তুচ্ছ করে গানটির মূর্চ্ছনায় তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন। এরই নাম কালোত্তীর্ণতা। এই ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন দুই চৌধুরী —সলিল ও নির্মলেন্দু। একেবারে চটুল ও ভিন্ন স্বাদের গ্রাম-বাঙ্গলার পল্লী মানুষের আবেগ ভরা। 'ইচ্ছা করে ও পরানটারে গামছা দিয়া বাঁধি' হাসির তুফান তুলে দেয়। নদীর উপকূলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনের কড়া ও মর্মভেদী ভালবাসাকে জীবন্ত করতে তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিতে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ও ঋজু মানসিকতার প্রতিফলন সম্ভাবনায় অভিনেতাদের এনেছিলেন। গঙ্গায় নিরঞ্জন রায়, অন্তরীক্ষে 'প্রবীর কুমার', নাগপাশে সুমন্ত মুখার্জিরা জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়কৃতি দেখিয়ে গেছেন। একই সঙ্গে বাঙ্গালির দেহসৌষ্ঠবের তেজোদৃপ্ততা সেখানে নজরকাড়া।

গঙ্গা ছবির কাহিনিকার ছিলেন তুমুল জনপ্রিয় সমরেশ বসু। ত্রুটিহীন ও মানবিক দলিল হিসেবে ছবির নির্মাণে কোনো ফাঁক না রাখতে তিনি বহুবার সমরেশ বসুকে ছবির শুটিঙের খণ্ডচিত্র দেখাতেন। গঙ্গার জন্য ৩ হাজার ফুট শট নেওয়া হয়েছিল। বম্বে থেকে এনেছিলেন প্রখ্যাত সম্পাদক ও পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জিকে। ছবিটির নির্মাণ সময় ছিল ৬ বছর। তিনি বলেছিলেন যত শট কাটা হলো সেগুলি ফেলা যাবে না এমন নিখুঁত শটগুলি দিয়ে প্রয়োজনে গঙ্গার ওপর তথ্যচিত্র করে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, দিনে ১৯ ঘণ্টার প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও আজকের বাঙ্গালি 'অস্মিতার' বিস্ফোরণ ঘটানো গঙ্গা রাজেনবাবুকে দর্শকরা ভালোবাসায় ধন্য করে দিয়েছিল। রাজেনবাবুর নদীমাতৃক তিনটি ছবিতে 'সোনার বাঙ্গলা'-কে খোঁজার একটি আকুলতা ছুঁয়ে রয়েছে। এমনই সব হারানো বাঙ্গালি গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি ফ্রেমে। প্রাচীন লোকগান 'আধিরাতে রাম-সীতার বিবাহক্ষণে আধা করি সুতা ৭ পাক দিলা' (সাত পাকে বাঁধা হলো)।

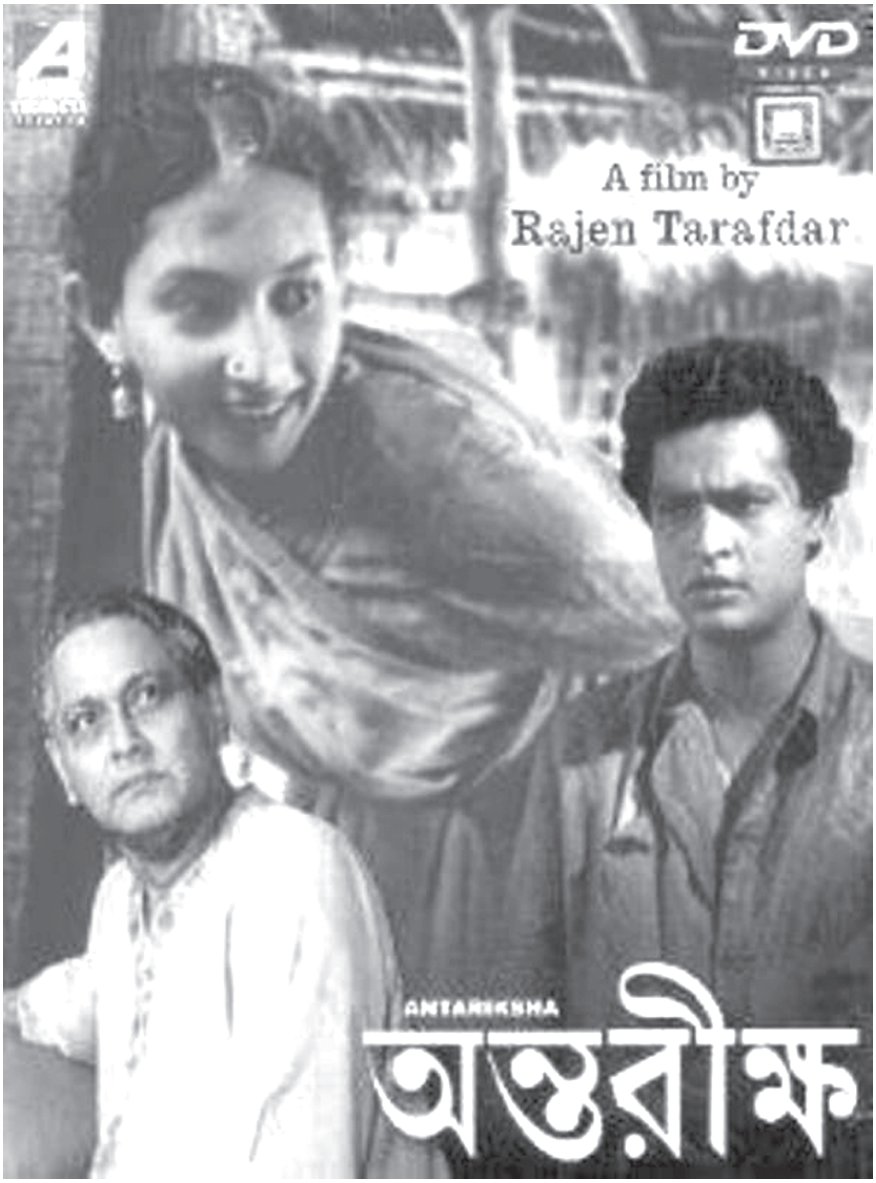
'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখে অদ্বৈত মল্লবর্মন অমর হয়ে গেছেন। ঋত্বিক তাকে 'ডবল ডবল' চাকরির মতো অক্ষয় অমরত্ব দিয়েছেন। রাজেনবাবুরও তেমন দাবিদার হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।


Trackon
SWIFT . SAFE . SURE
DOMESTIC & INTERNATIONAL COURIER SERVICES
AUTHORISED FRANCHISEE:
SSP ENTERPRISE
GSTIN : 19BMAPS3805A1ZD
Dashadrone Super Market, Shop No - 48,
Kolkata - 136, Near : Rajarhat Township SBI Bank
9681889939
sudipta.saha2010@gmail.com

INTERNATIONAL SERVICES :
DHL BLUE DART
FedEx Corporation
ups
aramex

''আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালবেসে, জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এই সবুজ করুণ ডাঙায়,''...

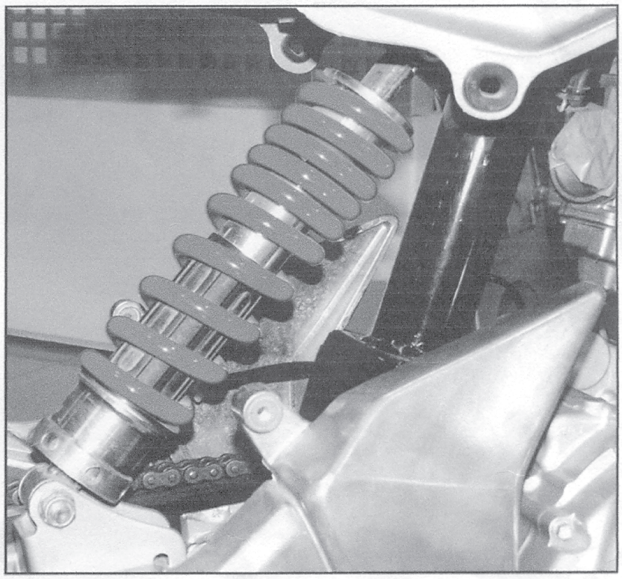
জীবনানন্দের এই অবিস্মরণীয় আর্তিকেই যেন দৃশ্যমানতায় সারিবদ্ধ নৌকায় মৎস্যজীবীদের জীবিকার সন্ধানে গৃহ নিষ্ক্রমণের প্রাক্কালে সম্মিলিত শঙ্খধ্বনি, গঙ্গা প্রণামের দৃশ্য হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া আবেগঘন ভালবাসার প্রতিফলন। বাঙ্গালি চিরকাল মাছ খেয়ে গেছে কিন্তু জীবন বাজি রাখা 'ইলিশ জেলেদের' সে কখনো দেখেনি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়া চাচার সমস্ত শরীর ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে গঙ্গার বুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মর্মন্তুদ আর্তনাদ চলচ্চিত্রের মহাফেজখানায় রাখা আছে। National Film Heritage Mission যা শিবেন্দ্র সিংহ দুঙ্গারপুরের তত্ত্বাবধানে International Federation of Film Archieve-এর অন্তর্গত সেখানে সংগৃহীত রয়েছে।




১৯৬০ সালের দিল্লিতে আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবে 'গঙ্গা' শ্রেষ্ঠ ছবির শিরোপা পায়। কাকার ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় অনবদ্য চরিত্ররূপ দেন। ছবিটি সে বছর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছিল। এরপর রাজেনবাবুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ 'পালঙ্ক' (১৯৭৫) নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রখ্যাত গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একই নামের গল্পটি দেশভাগের ও তৎপরবর্তী টানাপোড়েনের সময়কার। ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি আপাত প্রাণহীন 'পালঙ্ক' যেটি আগেকার সময়ের নির্মাণ সৌকর্যের মনোহারী নিদর্শন। এটি তৎকালীন পলায়নপরতায় বাধ্য হিন্দু জনগোষ্ঠীর যে বহিরাগত হয়ে যাওয়ার অনুভূতির জন্ম হয়েছিল তাই আজ রক্তক্ষয়ী হারিয়ে যাওয়ার সহৃদয় করুণ আবর্তে এসে পড়েছে। উল্লেখ্য, পালঙ্কের সহৃদয় জমিদারের বিশাল ভদ্রাসন, আসবাব সবই ছবির সপ্রাণ চরিত্র। জমিদার কিন্তু সাধারণ ধুতি-চাদরের আভরণে কাঁধে একটি গামছা নিয়ে নির্ভেজাল মমতায় পালঙ্কটিকে সদা চাকচিক্যময় করে রাখতে তৎপর। কারও সাহায্য নেন না। বৃদ্ধের জীবনের সঙ্গে মুসলমান সমাজের মকবুল ওতপ্রতোভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশ ছেড়ে যাওয়া হিন্দুর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তগত করার লিপ্সা তখন থেকেই ক্রমবর্ধমান যা সমান উগ্রতায় আজও হিন্দুদের বিতাড়িত করে চলেছে। তৎকালীন ছিন্নভিন্ন সময়ের অর্থনৈতিক আবেগ, তাড়না ও ধর্মীয় ভেদাভেদ রাজেনবাবু নিপুণ চলচ্চিত্র নির্মাণ কুশলতায় তুলে এনেছেন। রাজেনবাবুর সেই দেশভাগজনিত দুরদৃষ্টি ও বাংলাদেশি (পাকিস্তানি) হিন্দুর ক্রমিক দুর্দশার পরিণতির দিকেই সমকালীন কোনো চিত্র নির্মাতাই নজর দেননি বা দিতে অজানিত কারণে কুণ্ঠিত ছিলেন। অথচ তাঁদের অধিকাংশই শেকড় ছেঁড়া অবিভক্ত বঙ্গবাসী। ছবিটি ১৯৭৫ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরে নির্মিত হলেও ছবির পটভূমি ছিল স্বাধীনতা উত্তর-পূর্ব পাকিস্তান। তিনি নির্মাণপর্ব নিয়ে লেখক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতেন যাতে বিশ্বাসযোগ্যতা না টাল খায়। নৌকায় বসা জমিদার ধলাকর্তাকে (উৎপল দত্ত) সঙ্গী মকবুল দেখাচ্ছেন ''ওই দ্যাখেন কর্তা, ঘোষবাড়ির পালঙ্ক ভারতে চলে যাচ্ছে। ওরা সব দ্যাশ ছাড়ছে

# MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.



**TPM Certified Company**

**ISO / TS - 16949 – 2002 Certified**

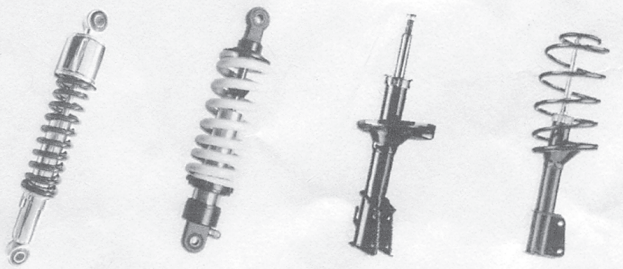
**ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified**

## Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

## Our Products

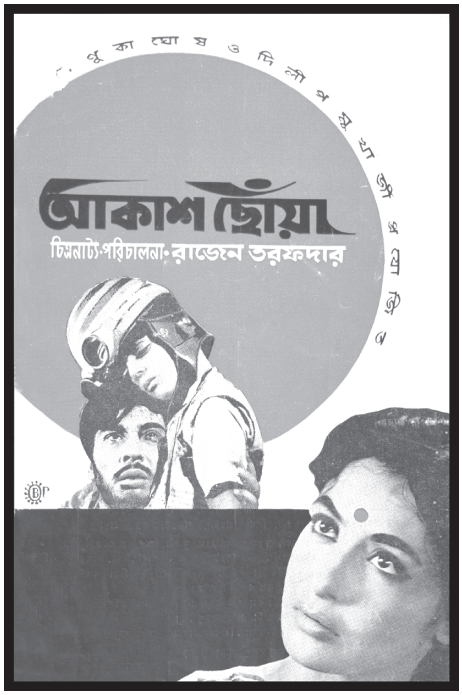
- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs



**MUNJAL SHOWA LTD.**

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

যে।" পালঙ্কের খণ্ড অংশগুলি তখন আসন্ন ভবিষ্যৎ দেশত্যাগীদের একটি মৌন মিছিলের কল্পিত প্রতীক হয়ে ওঠে। এই সমাপতন সহজ করে দেয় সিনেমার ফোটোগ্রাফি, ক্যামেরা ও লেন্সের প্রতিস্থাপন ও পরিচালকের অন্তর্দৃষ্টি। সমগ্র দৃশ্যায়নটিকে চাক্ষুষ বিষয়বস্তুর অন্তরালে থাকা মানুষের ভাবনালোকে পৌঁছে দেওয়ার এই মুনশিয়ানা করায়ত্ত ছিল রাজেনবাবুর।



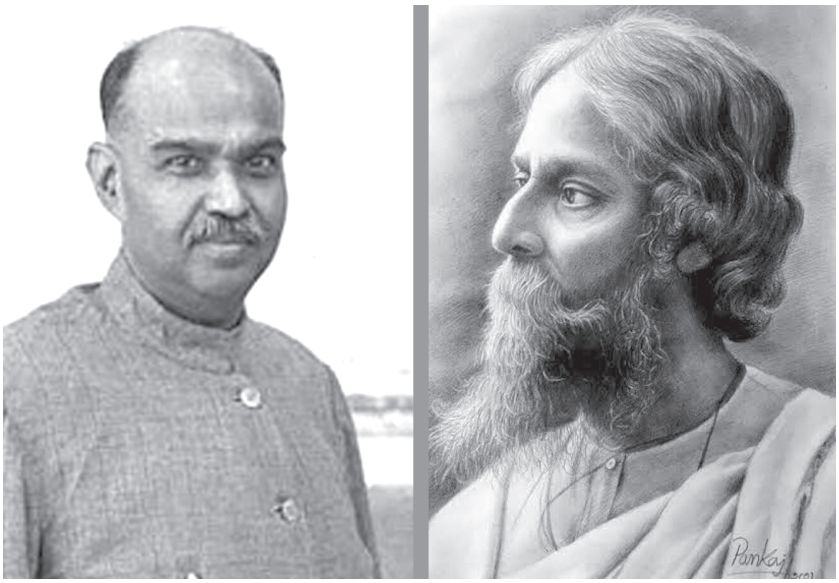

ওই দৃশ্য ধলাকর্তার ওপর কিন্তু কোনো রেখাপাত করে না, কেননা তিনি তাঁর আবেগের আত্মীয় পালঙ্কটিকে কখনই স্থানচ্যুত করবেন না এবং নিমিত্ত হবেন না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যে প্রসঙ্গ উঠেছিল তারই ফলশ্রুতিতে ধলাকর্তার ছেলে আগেই কলকাতায় চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে পুত্রবধূ চিঠিতে লিখছে আমাদের টাকার অনটন কাটাতে ওই পালঙ্কটিকে যদি বিক্রি করে কিছু অর্থ পাঠানো যায়। এতে প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠেন নিতান্তই ক্ষয়িষ্ণু জমিদার যাঁর আয় প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু পালঙ্ক হস্তান্তরের কথা তাঁর কল্পনাতীত। এই সময়ই চিঠির জের টেনেই মকবুল অর্থের বিনিময়ে মনিবের তীব্র হতাশা ও বেদনার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে পালঙ্কটি নিজের মাটির ঘরে নিয়ে যায়। মাটির ঘর ও অভিজাত পালঙ্কের পারস্পরিক বিপরীতাত্মক সহাবস্থান এই অসামান্য ব্যঞ্জনাময় দৃশ্যের সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে জানা যায় এমন বিড়ম্বিত ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানে তখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে ওঠে। তাই অনেক পরে ছবিটি সম্পর্কে বলা হয় পরিচালক একজন 'underrated gem with high quality (Shyam Benegal) ছবিটি ১৯৭৫-এর জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়। ১৯৭৬ সালে বেঙ্গল ফিল্ম সাংবাদিক সংস্থা (BFJA) পুরস্কারও ছবিটি পায়। ২০০০ সালে ফেব্রুয়ারি ফিল্ম উৎসবে বিশেষভাবে বঙ্গভাগের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র হিসেবে এটি সম্মানিত হয়। আনন্দের কথা, ছবিটির সম্পূর্ণ সংলাপ ওয়েভ সিরিজে পাওয়া যায়। তবে দর্শক নগণ্য। তারা আত্মভোলা।

স্বাধীনতার প্রাক ও পরবর্তী সময়ের সন্ধিক্ষণে বহু সাহিত্য উঠে আসে কিন্তু সমাজের বিবর্তন ও চলচ্চিত্রে তার প্রতিফলন সেভাবে এল না। নতুন সৃষ্ট 'উদ্বাস্তু' শব্দটিকে প্রথম চলচ্চিত্রে সরাসরি নিয়ে আসেন রাজেন। আসন্ন সামাজিক ডামোডোল ও চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সঙ্কেত সত্যদ্রষ্টার মতো তিনি পালঙ্ক ছবিটিতে তুলে আনেন। অভিজাত মুসলমান শ্রেণী তাদের দরিদ্র দেশবাসীকে যে কুটিলতায় নিরীক্ষণ করে তা আজও প্রত্যক্ষ হচ্ছে তাদের গৃহযুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে হিন্দু বিদ্বেষের কথা নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র শিল্পের কারণেই শিল্প নির্মাণে চির অবিশ্বাসী রাজেনবাবু সমাজের শ্রেণী বিভেদ, কুসংস্কারগুলির ওপর আলোকপাত করেছেন তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট দিয়ে।

আজকের বাংলাদেশে জেহাদি আক্রমণে ক্রমহ্রাসমান হিন্দুর যে বিলাপ পদ্মা-মেঘনা পার করে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার আগাম অশুভ ইঙ্গিত রাজেনবাবু তাঁর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পালঙ্ক ছবিতে দিয়ে গেছেন। হিন্দু সম্পত্তি আগ্রাসনের লালসাময় ইঙ্গিত আপাত নিস্তরঙ্গতার আড়ালে ক্রমবর্ধমান হতে দেখা যায়। পরিচালক কিন্তু তুমুল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে তাঁর ক্ষয়িষ্ণু জমিদারকে মুসলমান কর্মচারীর গৃহে সেই পালঙ্কটির প্রতি মমতায় পৌঁছে দেন। বাঙ্গালি হৃদয়ে যে চিরকালীন সমবেদনা ও স্বার্থহীন স্নেহের ধারা প্রবাহমান তারই স্বাভাবিক প্রতিফলন হিসেবে তিনি যখন তাঁর প্রাণপ্রিয় পালঙ্কে দুটি কচি শিশুকে নিদ্রিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন তখনই Melodramatic চলচ্চিত্রীয় উত্তরণে পালঙ্ক ও নিজের সমস্ত বিষয় আশয় মকবুলকে অবলীলায় দান করে দেন। ইতিমধ্যেই মোল্লাদের মধ্যে পালঙ্কটি অধিকার করা নিয়ে রেষারেষি বেধে যায়। রাজেনবাবু অব্যর্থ সঙ্কেত রেখে যান মুসলমান জাতিসত্তায় সহমর্মিতা প্রায় অনুপস্থিত। আমরা স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যার ক্রমিক পতনেই তার প্রত্যক্ষ হিসেব পেয়ে যাই।

রাজেনবাবু ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা ও বাংলা চলচ্চিত্রে তদানীন্তন সময়ে অপরিচিত সব বিষয় নিয়েই ছিল তাঁর নির্মাণ কার্য। কৈশোরের গ্রামীণ যাত্রাপালা থেকে শহরে অপেশাদারি থিয়েটার সবেতেই ছিল অবাধ গতি। আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর ছবির অলঙ্করণ থেকে বিখ্যাত পরিচালকদের তুমুল বাণিজ্যসফল ছবির চিত্রনাট্য তিনি লিখেছেন। প্রখ্যাত পরিচালক তরুণ মজুমদারের 'সংসার সীমান্তে' (১৯০৭৫) সেরার পুরস্কার জেতে। এর পর তারাশঙ্করের কালজয়ী 'গণদেবতা'র চিত্রনাট্যও তাঁর কলমের সৃষ্টি। তরুণ মজুমদারের এই ছবিটিও বহু পুরস্কারে ভূষিত। এখানেই থেমে থাকেননি মানুষটি। বিখ্যাত 'ত্রয়ীর' পরিচালকদের অন্তর্গত মৃণাল সেনের আকালের সন্ধানে ও হিন্দি 'খণ্ডহর' ছবিতে তিনি অসাধারণ অভিনয় করেন। ভারত বিখ্যাত পরিচালক শ্যাম বেনেগালও তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেননি নিজের 'আরোহণ' ছবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় নিয়ে আসেন নিপাট অহঙ্কার ও প্রচার বিমুখ রাজেন তরফদারকে। পরিশেষে বলা যায়, ১৯৫৭ থেকে আমৃত্যু ১৯৮৭ সময়কালে তিনি মাত্র ৭টি ছবি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বিষয় বিন্যাস ও বৈচিত্র্যে সেগুলি অনবদ্য।

'গঙ্গা' থেকে 'পালঙ্ক' হয়ে 'আকাশ ছোঁয়ার' Circus -এর পটভূমিতে চলচ্চিত্র বাংলায় কখনও হয়নি। চলচ্চিত্রের বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর পরিসর ছিল অনেক বড়ো এবং পারদর্শিতার চমৎকার নিদর্শন। হয়তো কালের বিরূপতায় চলচ্চিত্রের মায়াবী আলো সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণালের প্রায় সমকক্ষ হয়েও তাঁর ওপর বর্ষিত হলো না। তিনি যেন কিছুটা বৃত্তচ্যুতই রয়ে গেলেন। তবে তাঁর ছবির গানের ভাষায় কোটি কোটি বাঙ্গালি 'ইচ্ছা করে ও পরানটারে গামছা দিয়া বাঁধি'-র মতো তাঁকে স্মৃতিবন্দি করে রেখেছে। □




# রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদ
# বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ভিন্ন ভাবনার অনুরণন

ড: পঙ্কজ কুমার রায়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২১ সালের ১ জুন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ভ্রমণকালে জার্মানির বার্লিনের Humboldt University-তে 'The Message of the Forest' শিরোনামে বক্তৃতা দেন। 'রবীন্দ্র জীবনকথা' গ্রন্থে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দিন যে ভিড় হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। পনেরো হাজার লোক ভারতীয় কবিকে দেখতে সমবেত হয়েছিলেন। একদিনে রেহাই পাননি, পরের দিনও কবিকে বক্তৃতা করতে হয়।''[১]

সেই বক্তৃতা বার্লিনে অবস্থিত Hotel Esplanade-এ ৪ জুন, ১৯২১ রেকর্ডিং করানো হয়। বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথ নিজ কণ্ঠে 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' গানটি রেকর্ড করান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আঘাতে গানের রেকর্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান প্রযুক্তিবিদরা গানটি পুনরুদ্ধার করেন। ১৯৫৯ সালে পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী অটো গ্রোটেভোল (Otto Grotewohl) ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য জওহরলাল নেহরুর মাধ্যমে বিশ্বভারতীয় হাতে তুলে দেন। গানটি Humboldt University-তে Alex Dunedis দ্বারা 'Kalinette des wissens' নাম দিয়ে তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে। জার্মানি থেকে পাওয়া রেকর্ডটি বিশ্বভারতীতে কেমনভাবে সংরক্ষিত আছে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ''The Message of the Forest, which Tagore gave in many places of his travels around Europe and North America, he refers to the Union of a World University where people from different cultures and religions form an academic community. Later that year he formed ''Vishva Bharati'' in Santi Niketan India.''[৩] পরবর্তী পর্যায়ে, বিশ্বকবি ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্ব শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে 'ব্রহ্মচর্য আশ্রম' গড়ে তোলেন। পরবর্তী পর্যায়ে কবিগুরু এই আশ্রমের নামকরণ করেন— 'বিশ্বভারতী', যা প্রকৃত অর্থেই বিশ্বশিক্ষার অঙ্গনে পরিণত হয়েছে। যেখানে পৃথিবী শান্তির নীড়ে বাসা বেঁধেছে 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' (Where the world makes a home in the nest.)। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর 'ইউনেস্কো'র পক্ষ থেকে 'বিশ্বের প্রথম ঐতিহ্যবাহী এবং এখনও ক্রিয়াশীল বিশ্ববিদ্যালয়' (World's first 'living heritage University') হিসেবে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর স্বীকৃতি প্রদান করা হলো। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিশ্বের সাথে ভারতের যোগসূত্র গড়ে তুলবে। বিশ্বভারতী সেই ধারাই অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।"[৪]

১৯৩২ সালের ২০ জুলাই সেনেট মিটিঙে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করার প্রস্তাবে বঙ্গদেশে বিতর্কের ঝড় ওঠে। ২১ জুলাই, ১৯৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

.....আমার দেশের লোক অনেকে আমার প্রতি নিষ্ঠুর, তাদের নির্মমতাকে জাগরুক করে তোলবার উপলক্ষ্য দিচ্ছি বলে মনে আমার সঙ্কোচ বোধ করছে। বুঝতে পারছি কঠিন প্রতিকূল দৃষ্টির সামনে আমাকে কাজ করতে হবে, পদে পদে অশান্তি ঘটবে— এমনতর অবস্থায় নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করাও দুঃসাধ্য হবে। অতএব কী উপায়ে আমার শান্তি ও সম্মান যথোচিতভাবে রক্ষা হতে পারে সে কথা তোমাকেও আমার প্রতি মমতা রক্ষা করে চিন্তা করতে হবে। আমার শরীর এখন ক্লান্ত, বন্ধুর পথে নিরন্তর আঘাত সহ্য করে চলবার শক্তি আমার নেই—এই কারণে শঙ্কিত হয়েছি। কী করা কর্তব্য যথার্থ বন্ধুভাবে সে কথা চিন্তা করে পরামর্শ দিয়ো। দেশের কাছে আমার জীবনের যদি কোনো মূল্য থাকে তবে যাতে আমার মানহানি ও শান্তি নষ্ট না হয় সে কথা চিন্তা করা তোমাদের কর্তব্যই হবে।

২১ জুলাই ১৯৩২ ইতি —

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ জুলাই, ১৯৩২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট মিটিঙে ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয় ঃ

''That Dr. Rabindranath Tagore be invited to accept an engagement with the University for two years with effect from 1st August, 1932.''

বিশেষ অধ্যাপক রূপে দু'বছরের জন্য ৫০০০ টাকা বাৎসরিক সাম্মানিক রামতনু লাহিড়ী ফান্ড থেকে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সেনেট মিটিং থেকে ফিরে এসে চিঠি পাওয়ার পর ২৪ জুলাই, ১৯৩২, ৭৭ নম্বর আশুতোষ মুখার্জী রোড থেকে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন।

শ্রীচরণকমলেষু 77 Asutosh Mukherjee Road

Calcutta

২৪ জুলাই, ১৯৩২

যে কাজের জন্য আপনার সাহায্য ভিক্ষা করেছি, সে কাজ যথার্থ দেশের মঙ্গলকারক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে এইরূপ সংস্কারের দাবি আপনি বহুকাল হতে করে এসেছেন। আজ যখন বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে এই বৃহৎ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে, আপনি দ্বিধাশূণ্য মনে এই আহ্বান গ্রহণ করুণ, এই আমার প্রার্থনা।

ইতি

প্রণত ঃ

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়[৫]

১৯৩৪ সালের ২০ জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হন মাত্র ৩৩ বছর বয়সে। ১৭ জুলাই, ১৯৩৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্যের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন।

''..... ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাপ্রীত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গমঙ্গ চূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে..... বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একাঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য আবহাওয়াতে শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এক নব পল্লবের উৎসব।"[৭]

১৮৬১ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। ১৮৬৬ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুর জমিদারবাড়ির সন্নিবিষ্ট স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নামকরণ করেন 'শান্তিনিকেতন'। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পাঠভবন' প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রাচ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্রতী হন। ১৯১৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন, ''শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিশ্বের সাথে ভারতের যোগসূত্র গড়ে তুলবে।" বিশ্বভারতীর ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে জার্মানি ভ্রমণের অনেক আগেই প্রোথিত হয়েছিল।

অপরদিকে ১৮৫৭ সালে ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সংস্কার হয়। এই সংস্কারে বঙ্গদেশে ঝড় ওঠে। ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তুষাগ্নি তখন থেকেই জ্বলছিল। বঙ্গভঙ্গ তাতে ঘৃতাহুতি দেয়। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পাঁচবার উপাচার্য হন (১৯০৬-১৯১৪, ১৯২১-১৯২৩)। ১৯২৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর ১৯৩৪ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কনিষ্ঠতম উপাচার্য নিযুক্ত হন। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, বাঙ্গলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষায় স্বীয় গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছে। পুত্রই পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র কেবল যে পিতার বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী

# ARYA TOURIST LODGE

*Just 5 Minute walk from New Delhi Rly. Station*
*Only 1 km. from Cannaought Place*
*Homely Atmosphare*
*Day & Night Taxi Facilities*

**8526, Ara Kashan Road, Ram Nagar, Pahar Ganj**
**New Delhi - 110055 (India)**

**Phones : +91 11 43505463 (10 Lines)**
**Cont : 9811044543**

**E-mail : info@aryatouristlodge.in**
**website : www.aryatouristlodge.in**

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

**PISTA LAUJ & BADAM KATLI,**
**BENGALI SWEETS & NAMKEENS**

হয়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যে পুত্র পিতার কার্য চিন্তা ও ভাবধারার অধিকার লাভ করে— সেই পুত্রই পিতার উপযুক্ত পুত্র। স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীমান শ্যামাপ্রসাদ তাহার স্বাধ্যায় গাহিয়া বাংলাভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পৃক্ত হন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সারস্বত সাধনার অঙ্গন থেকে বিশ্বশিক্ষা অঙ্গনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলে বঙ্গ-বাঙ্গালি ও ভারতকে বিশ্বদরবারে গৌরবান্বিত করেন।

The Viswa Bharati Bill (1950) আইনসভার কক্ষে পেশ করা হয় ২৮.৪.১৯৫১। বিলটি নিয়ে আইনসভায় তুমুল বিতর্ক হয়। ডঃ মুখার্জী তাঁর ভাষণে বলেন, ''বিশ্ববিদ্যালয়কে কলেজ ও ভবন বা ছাত্রাবাসগুলি পরিচালনার অথবা স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়গুলির ঠিক কী অবস্থান হবে? এই বিলটি স্পষ্টতই কলেজগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার অর্থ ম্যাট্রিকুলেশন স্তরের পরবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে পাশ হওয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বিল অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয় পর্ষদের (বোর্ডের) নিয়ন্ত্রণে আসবে। তাহলে শান্তিনিকেতনে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির কী হবে? আমি সুনিশ্চিতভাবে এই মত পোষণ করি যে, বিশ্বভারতীকে যদি কিন্ডারগার্টেন স্তর থেকে নিজস্ব বিদ্যালয় পরিচালনার অধিকার দেওয়া না হয়, তবে এই বিল এবং বিশ্বভারতী উভয়েই চরমভাবে ব্যর্থ হবে। শান্তিনিকেতনে এক অভিনব ধারার মাধ্যমিক শিক্ষাদান করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বিশেষ অবদান।''

বিশ্বভারতীকে আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীতে ফেলতে চেয়েছিল বিশ্বভারতী বিল। সিংহগর্জনে ডঃ মুখার্জী বলেন, ''প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যগুলিকে সংশোধন করা আমাদের কাজ নয়। তা করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আপনারা যদি বলেন যে, আপনারা এই উদ্দেশ্যগুলি স্বীকার করেন না, তবে বিলটি পাশ করবেন না। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ হওয়া উচিত বলে মনে করেছিলেন, সেই আদর্শের ভিত্তিতে সরকার বিশ্বভারতী বিলটি পাশ করতে প্রস্তুত নয়।'' রবীন্দ্রনাথ বলতেন, বিশ্বভারতী হলো এমন এক তরীর মতো যা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সখাদের ভার বহন করে চলেছে।'' স্ত্রীর শেষ সম্বল গহনা বিকিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের শিক্ষাসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিলটি প্রস্তুত হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে এবং সেখানে 'স্কুল' শব্দটির উল্লেখ ছিল না। অর্থাৎ পেশ করা বিলে শুধু কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষার প্রসঙ্গই আসছে।'' ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত না করলে বিশ্বভারতীর স্কুলশিক্ষা রবীন্দ্রচিন্তার বাইরে চলে যেত, যা রবীন্দ্রনাথ কখনোও চাননি।

তথ্যসূত্র ঃ ১। জীবন কথা, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ২। রবীন্দ্রজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, আনন্দ, ১৪০৭, অষ্টম খণ্ড, ১১৪–১১ ISBN : 81-7756-141-3 ৩। www.lautarchiv.hu-berlin.de ৪। রবি তীর্থের হেরিটেজ স্বীকৃতি, পঙ্কজ কুমার রায়, বিতর্ক Cons, সেপ্টেম্বর, ২০২৩। ৫। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, শতবর্ষের আলোকে শ্যামাপ্রসাদ, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতি, সৃষ্টি প্রকাশন, ২০২২, পৃঃ ৪১, ৬। তদৈব পৃঃ ৪১-৪২, ৭। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষান্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

*(লেখক যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ)*

***With Best Compliments from -***

**NITIN** ENTERPRISES

Engineers & Die Castings

HAND TOOLS

D-138A, Phase-V, Focal Point, Ludhiana

M: 9814025239, 9814126239

(O) 0161-2676985

# মানবজমিন

গার্গী দেব



বোশেখ মাসের মাঝদুপুরে মুরাইডিহির শাল-মহুয়ার জঙ্গলটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। সূর্যদেবের অগ্নিঝরা দৃষ্টি থেকে রেহাই নেই কারোর। রুক্ষ গরম হাওয়ায় গায়ে ছ্যাঁকা লেগে যায়, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত লু চলে। শুকনো পাতার রাশি গরম হাওয়ায়

দুরন্ত বেগে উড়ছে এদিক-ওদিক। এরই মাঝে হিংস্র সরীসৃপের সরসর শব্দ। লোকে বলে মুরাইডিহির জঙ্গলে সাবধান। সর্বক্ষণ সেখানে মৃত্যুদূতের আনাগোনা। দিনে-রাতে সেখানে চরে বেড়ান তেনারা। যত নাম, ততই বাহার তাদের, খরিশগোখরো, শঙ্খচুড়, কালকেউটে। আর রাতে শোনা যায় চিতার হুঙ্কার। হলেই বা! ঝুমরি আর মুংরুদের ওসব গ্রাহ্য করলে চলে না। পেটের টানে ওদের মৃত্যুকে পরোয়া করলে চলবে না। এখন আবার হোটেল মালিকদের কাছে শুকনো শাল, গরান, মহুয়া পাতার খুব চাহিদা। জ্বালানি গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, তাই বস্তা প্রতি দোকানিরা দশ টাকা করে দিচ্ছে। সেই জন্য পাতা কুড়ানোর তাগিদে খুব সকালে উঠে ওরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

আজ যেন সকাল থেকেই আগুন ঝরছে। কোন্ সকালে নুন লঙ্কা দিয়ে মেটে আলু সিদ্ধ খেয়ে দুজনে বেরিয়েছে। ঝুমরি আর মুংরু। ঘরে ওদের পান্তাভাতেরও সংস্থান নেই। সারাদিন এই কাঠফাটা রোদে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে মারাংবুরুর কৃপায় দুটো বস্তা ভরলে দিনের শেষে সাঁঝের বেলায় জুটতে পারে দু'মুঠো ভাতে ভাত। দেবতার উদ্দেশে ওরা কপালে হাত ঠেকায়। ওরা অরণ্যের সন্তান। জঙ্গলই ওদের অন্ন দেয়, আশ্রয় দেয়। ওদের শীর্ণ শরীরে জীর্ণ মলিন কাপড়, কাঁধে দুটো বড়ো বড়ো বস্তা, হাতে লাঠি। খিদে তেষ্টা পেলে ঝোরার জল ছাড়া গতি নেই। ঝুমরি আর মুংরু তা-ই করল। দিনের অর্ধেকের বেশি চলে গেছে, একটামাত্র বস্তা ভর্তি হয়েছে। বাকি এখনও পুরো দুটো বস্তা। মারাংবুরু কৃপা না করলে আজ পেটে বোধহয় ভাত জুটবে না। ক্ষুধায় অশক্ত শরীরটা একপাও চলতে চায় না, তার উপর সূর্যদেবতার রোষ। হায়! গরিবদের জন্য কি তার মনে কোনও দয়া নেই? ক্ষুধার জ্বালায় অসহায় অশ্রুতে তাদের দু'চোখ ভরে যায়। আঁজলা ভরে মুখে-চোখে ছিটিয়ে দেয় ঝোরার ঠাণ্ডা জল। ভিজিয়ে নেয় মুখ-হাত-পা। ক্লান্ত পা দু'টো চালিয়ে দেয় নতুন উদ্যমে। চোখে ভাসতে থাকে এক থালা গরম ভাতের স্বপ্ন।

ঝোরার ধারের জায়গাটা ছায়াময়। মুংরু হাতের লাঠিটা দিয়ে গরানগাছের তলাটা খোঁচাতে থাকে। হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জন করে দু'হাত ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে এক প্রকাণ্ড খরিশগোখরো। সভয়ে একলাফে পিছিয়ে আসে মুংরু। ওর হাতটা আঁকড়ে ধরে ঝুমরু— 'ঘর চল্ রে মুংরু, আজ আর জঙ্গলে গিয়া কাম নাই। বেলা পড়ে এল, সাঁঝের বাতাস বইছে। দিনটো ভালো ঠেক্ছে নাই রে।' কিন্তু পেটের ক্ষিদের কাছে হার মানে মনের দুর্বলতা আর ভয়। সভ্য মানুষের কাছে ভয় বিলাসিতা, কিন্তু গরিব জনজাতিদের কাছে পেটের তাগিদে ভয় পাত্তা পায় না।

—'ভয় কী রে ঝুমরি, আমি তো আছি তুর সাথে।' নির্ভয়ে মুংরু এগিয়ে চলে গরানগাছটার তলায়। এখানে প্রচুর পাতায় বস্তাটা প্রায় পুরোটা ভরে গেল। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের সরল মুখগুলো। এদিক-ওদিক করে আর কিছুটা ভর্তি করে ওরা বন থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তায় ওঠে। গরমে পিচ গলে গেছে, হাঁটা যায় না। ওরা লালমাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়।

ক্লান্তিতে ওদের পা চলে না। রাস্তার ওপারেই একটা ঝাঁ চকচকে রেস্তোরাঁ, মাংস আর অন্যান্য সুখাদ্যের লোভনীয় সুগন্ধ আসছে। ওরা আর থাকতে পারে না, 'শুকনো পাতা লিবেন বাবু? তিন বস্তা দিব বাবু, সদ্য কুড়িয়ে আনলাম জঙ্গল থিক্যা গো।' ওদের মলিন কাপড়চোপড়, বাতাসে উড়ছে রুক্ষ নোংরা চুল, অসহায় মুখে ফুটে উঠেছে দুরন্ত খিদের গন্ধ।

রাস্তার পাশে লাইন দিয়ে রাখা দামি গাড়িগুলো থেকে নেমে আসছিল বিলাসবহুল ধনী বাবুলোক। তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। ওদের মধ্যে একজন মন্তব্য করল—'ভারতে দারিদ্রসীমা দিন দিন বেড়ে চলেছে, এত বিরক্তিকর'। ওদের মনে বিরক্তি। আর ঝুমরিদের ক্ষুধার তীব্রতা, গায়ের ঘামের গন্ধ, সীমাহীন দারিদ্র, অভিযোগহীন সহ্যশক্তি, অপর্যাপ্ত সততা আর সারল্য— সবই বাবুদের অসহ্য। তবু মুংরুরা মানুষ। মারাংবুরুর কৃপায় ওদের মধ্যেই বইছে স্বচ্ছ মানবিকতার রক্ত।

—'আরে না, না, এখানে ওসব লাগবে না। ওইদিকে যা বরং।' ম্যানেজার দয়াপরবশত হাত নেড়ে কাছেই একটা ঝুপড়ির দিকে দেখিয়ে দিল। ঝুমরি আক্ষেপ করে বললো—'ওরা কত্তো বড়োলোক, ধনী, আমাদের ওরা ঢুকতে দেবে কেন?'

রাস্তার পাশে ছন্নছাড়া পাইস হোটেলে শেষ বিকেলের হাঁড়ি চড়েছে। ঝুমরিদের আর তর সয় না। বস্তাগুলো জমা দিয়ে রংচটা, ভাঙা বেঞ্চিতে বসে পড়ে একপাশে দুজনে সঙ্কোচে। একটু পরেই এসে যায় অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, আলুর চোখা আর জলের মতো ডাল। পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে তাই তারা গোগ্রাসে খেতে থাকে। খাওয়ার




পর ঢক্‌ঢক্‌ করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নেয়। ড্রামে রাখা জলে হাত মুখ ধুয়ে মুংরু ম্যানেজারের কাছে পয়সা মেটাতে যায়।

—'দে, দুজনের পঁচিশ টাকা করে পঞ্চাশ টাকা। বস্তার জন্য দিলাম তিরিশ টাকা। আর বাকি কুড়ি টাকা দে।' নির্বিকারভাবে কথাগুলো বলে হাত বাড়ায় দোকানি।

মুংরুর মুখ নিমেষে রক্তশূন্য—'সে কী কুথা বাবু, ডাল ভাত তো কুড়ি টাকা বটে।'—'আর আলুটা? সেটা কি তোর ফিরি? যত্তোসব! রাগে উত্তেজিত দোকানি খিঁচিয়ে ওঠে। হাতজোড় করে মুংরু কাকুতি মিনতি করতে থাকে। সে সবের কোনো পাত্তাই দেয় না দোকানি।

চিৎকার চেঁচামেচিতে দোকানের সামনে লোক জমে যায়। সামনের দামি রেস্তোরাঁ থেকে চারটি যুবক বেরিয়ে এল। সামনেই দাঁড় করানো ছিল ওদের ঝকঝকে লাল মারুতি। বোধহয় কলেজের ছাত্র ওরা। বন্ধুরা মিলে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ঘটনা সব জেনে প্রত্যেকেই পকেট থেকে পঞ্চাশ-একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল মুংরুর দিকে, 'আহা, গরিব মানুষ। নে ভাই, কাঁদিস না।' মুংরু হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছেলেটির পায়ে।

—'না বাবু, হামরা ভিখারি নয়। হামরা রুপেয়া চাই না। বাবু, হামরা খেটে খাই। বেইমানি করি না বাবু।' ঝুমরি আর মুংরু কাঁদতে থাকে অঝোর ধারায়।

নিদারুণ দারিদ্রে অসহায়তায় এই জনজাতি মানুষটির সততায় ছেলেগুলো অবাক হয়ে গেল। নোংরা গামছার খুঁটে চোখের জল মুছে মুংরু দোকানির পা দুটো জড়িয়ে ধরল—'হামরা বেইমান নয় গো বাবু। কাল এসে পাতার বস্তা দিয়ে বাকি দাম মিটিয়ে দিয়ে যাব। বাবু দয়া করুন গো, বাবু।'

ছেলেগুলির চোখ ছলছল করছিল। কে বলে মানুষ আর নেই আজ। আজও বেঁচে আছে মানুষ জীবনের প্রতিটি প্রান্তে। আজও আছে দয়া-মায়া-করুণা।

—'শোন্‌রে ভাই, কাঁদিস না। তোর কুড়ি টাকা আমরা মিটিয়ে দিয়ে গেলাম। কুড়ি টাকার জন্য এই গরমে তোদের কাল আসতে হবে না, বুঝলি? এখন বাড়ি ফিরে যা, আর কাল দুপুরে ওই হোটেলে এসে মাংস-ভাত খেয়ে যাবি। নে, এই টাকাগুলো রেখে দে। মনে রাখিস—দয়া আর ভিক্ষা এক জিনিস নয়। দয়ার মধ্যে আছে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য আর ভিক্ষার মধ্যে থাকে তাচ্ছিল্য মেশানো দয়া।'

মুংরির মনে হলো ওদের মধ্যে যেন মারাংবুরুর মুখের ছবি ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে দেবতার উদ্দেশে ওরা প্রণাম জানায়। মিষ্টি হেসে মারুতিতে উঠে পড়ল ওরা। কালো পিচের রাস্তার বাঁকে শাল মহুয়ার অরণ্যের ফাঁকে লাল মারুতিটা ধীরে ধীরে দূরে, অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। □


011-32306597
011-30306592

SNEH RAMAN
ELECTRICALS PVT. LTD.
E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

***Manufacturer :***

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

**Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi**

***With Best Compliments from -***

**SANT VALVES PVT. LTD.**

G.T. Road, By-pass,
Jalandhar
Pin - 144012 (PB.) India

Mfrs. of **SANT**
**IBR CERTIFIED :** BRONZE, CAST IRON, CAST STEEL, FORGED STEEL, BOILER MOUNTINGS
**IST MARKED :** GM VALVES, CI BALL VALVES, SLUICE VALVES, BUTTERFLY VALVES, **'SBM'** BRONZE INDUSTRIAL VALVES
Ph. +91 181-5084693-94-95, 2603308
FAX : +91-181-5062270
E-mail : info@santvalves.com
Website : www.santvalves.com

*With Best Compliments from :-*

M/s. Sant
Steel Forgings
Private Limited

G. T. Road Bye Pass
Jalandhar - 144012
Tel. 0181-2601719

Phones : Fac : 2222224, 2222225,
2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

***With Best Compliments from -***

# SHILPA METAL INDUSTRIES

***AN ISO CERTIFIED COMPANY 9001:2015***

B-5, Friends Industrial Estate. Opp. Aarti Steels,
Focal Point, Sherpur, Ludhiana - 141010

**Manufactures of High Quality SHOVELS & FASTENERS**

Phone ; +91 98559 77770,
E-mail : salesexport@muwo.co.in, abhishekgsmi@gmail.com
Website : www.muwo.co.in

*With Best Compliments from :-*

## RAJKUMAR KARWA

***Managing Director***

# SANAUTO ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.

***Manufacturers of***

## ENGINEERING COMPONENTS

**AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE**

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2989789 / 790

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com